তাফসীরে মাযহারী

ষষ্ঠ খণ্ড

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পারা
(সুরা হুদ থেকে সুরা নাহ্‌ল পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্‌ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা তালেব আলী অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ মাওলানা তালেব আলী

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।
প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা-১২০৩।
ফোন ঃ ২৩৯৪৯০, ২৩১০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ইং জমাদিউস্ সানি, ১৪২০ হিজরী
ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে (ইন্তেকালের তারিখ বাইশে জমাদিউস্ সানি,পঞ্চদশ হিজরী)।

বিনিময় ঃ দুই শত সত্তর টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI – (6th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Taleb Ali and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Two Hundred seventy only. US$20

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অভিযাত্রীরা সাবধান! বিস্মৃতির বিভ্রম তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ঘিরে ফেলেছে তথাকথিত সভ্যতার সংক্ষুব্ধ ব্যতিব্যস্ততা। বিশ্বসংসার এখন নীড়হীন পাখির মতো। বিপর্যস্ত বিশ্বাসের মতো। অনিকেত অক্ষিবিক্ষেপের মতো। বিতর্কিত, বিড়ম্বিত ও বিক্ষত সমীক্ষণের মতো। সুতরাং পদবিক্ষেপ করো ধীরে, যথাযথ ছন্দে ও সুষমায়। পরিহার করো চাঞ্চল্য ও চমক। ভাবো। ভাবতে চেষ্টা করো। দারিদ্র জমেছে আমাদের জ্ঞানে ও প্রেমে, পার্থিবতায় নয়। ঔদাসীন্যের ঘন কুয়াশা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে আমাদেরকে প্রকৃত প্রজ্ঞা থেকে। আকাশজ ঐশ্বর্য থেকে।

ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে আমাদের নিঃশ্বাসের সংখ্যা। আয়ুর আতর। প্রশ্রয়ের পরিসর। অবকাশের আঘ্রাণ। আমরা কি এবার দৃষ্টি ফেরাবো না মহাজীবনের দিকে? অনিঃশেষ আত্মার দিকে? মহাসৃষ্টির উৎসের দিকে। সকল উৎসারণের আনুরূপ্যবিহীন মহাসৃজকের দিকে?

একটি মহৎ উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে আমাদেরকে। পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করবার জন্য। বুঝবার জন্য— আমাদের অক্ষমতাকে, অসম্পূর্ণতাকে, সম্ভাবনাকে। দেখবার জন্য— আমাদের মধ্যে কে সচেতন, কে নয়। সুতরাং আমাদেরকে মান্য করতেই হবে সমর্পণসিদ্ধতাকে। সত্যকে। জ্ঞানের ও প্রেমের

পথের অনন্ত পরিব্রাজনাকে। আমরা যে মানুষ। নিসর্গের নেতৃত্বাধিকারী। শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ কর্তৃক আনীত মহাকল্যাণের পতাকাবাহী। আমাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে কল্যাণের জন্য। দেয়া হয়েছে দায়িত্ব-দীপিত জীবন। তাই পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের ধর্ম। নিজের জন্য। দেশবাসীর জন্য। বিশ্ববাসীর জন্য। সকল মানবের জন্য। সকল মানবীর জন্য।

অনস্তিত্বের পটভূমিতে আমাদের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ীরূপে মুদ্রিত করেছেন কে? কে দিয়েছেন বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেম, সংবেদনশীলতা? কে উন্মোচন করেছেন আমাদের জন্য অনন্ত সফলতার নির্নিমেষ তোরণ? আমাদের আশ্রয়ণ, জীবনোপকরণ, স্বজন-বন্ধন, ভিতর ও বাইরের শতসহস্র সৌন্দর্যের অবাক বিচ্ছুরণ— কার দান? কার দয়া? বৃষ্টিবাহী মেঘ, দিবস ও বিভাবরীর বিবর্তন, নক্ষত্রখচিত মহাকাশ, বিভঙ্গিত বাতাস, পুষ্প, বৃক্ষ, পতঙ্গ, প্রজাপতি, পাখি — এ সকল নিদর্শন তবে কার? এতো রূপে ও রহস্যে সাজানো হয়েছে আমাদের প্রতিবেশ কার জন্য? মানুষের জন্যই নয় কি? তবে কেনো মানুষ আত্মসমর্পণ করবে বিস্মরণের কাছে, অযথার্থ ব্যতিব্যস্ততার কাছে, অশুভ ও অন্যায়ের কাছে, লোভের কাছে, হিংস্রতার কাছে, প্রবৃত্তির কাছে?

পথযাত্রীরা সাবধান! হুঁশিয়ার! অবসন্নতা, অবসাদ, স্থবিরতা — সবকিছু ভেদ করতে হবে আমাদেরকে। যুদ্ধ করতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অকল্যাণের বিরুদ্ধে। অসুন্দরের বিরুদ্ধে। নির্বিবেকতার বিরুদ্ধে। বিকৃতির বিরুদ্ধে। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে। আমাদের পরম প্রেমময় প্রভুপ্রতিপালক আমাদেরকে এ রকমই নির্দেশ করেছেন। আমাদের জন্যই যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রিয় প্রেরিত পুরুষগণকে। আকাশী গ্রন্থগুলোকে। তাই আমরা পথনির্দেশহীন যেমন নই, তেমনি নই নিরাশ্রয়।

মহামানবতার শেষতম প্রবাহ আমরা। শেষতম, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুলের মহাসৌভাগ্যশালী উম্মত। তিনি তো ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী— উম্মী। সরাসরি তিনি আহরণ করেছেন জ্ঞান , জ্ঞানের মূল কেন্দ্র থেকে। প্রকৃত অর্থে যিনি মহাজ্ঞানী — সেই পরম মহিমময় পবিত্র সত্তা থেকে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীকে তাঁর পথে সমর্পিত হতেই হয়। আশ্রয় করতে হয় নির্দর্পিত জীবনকে। সমর্পণশোভিত আয়ুষ্কালকে ।

সামনে সায়াহ্ন। সময় ক্ষেপণ করবার মতো সময় আর কোথায়? লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবার এইতো সময়। সীমাবদ্ধতা ও নশ্বরতার গ্লানি মোচনের এইতো সুযোগ। তওবার তৃষিত তোরণ আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এইতো এখানে জ্ঞান ও প্রেমের মহা আয়োজন। চেতনা ও বেদনার মহান মজলিশ। চিরন্তনতার চন্দ্রালোক। অক্ষয়তার অবাক পুষ্প। নিসর্গোত্তর নৈশব্দের নিঃসীম আওয়াজ। এসো সত্তার সাম্রাজ্যে। সত্যের স্বাপ্নিকতায়। সত্তাতীত সৌরভে।

এইতো এখানে পরিত্রানের জাগ্রত জোয়ার— চিরঅব্যয়, চিরঅক্ষয় মহাগ্রন্থ আলকোরআন। নির্ভুল পথনির্দেশক এই কোরআনের যথাভাষ্যও তো সতত প্রস্তুত। এই নিখুঁত, নির্মল ও নির্নিমেষ আয়োজন সুসম্পন্ন করেছেন তিনিই— যাঁর উপরে ক্রমাগত তেইশ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে এর বিভিন্ন আয়াত ও সূরা। কথা দিয়ে, আচরণ দিয়ে, জীবন দিয়ে তিনিই তো প্রতিষ্ঠা করেছেন এই কোরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা, প্রাণময় বিশ্লেষণ— যথাযথ তাফসীর। এভাবেই সুপ্রোথিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্রের মহান মহীরুহ। সেই মহা মহীরুহের এক কালজয়ী কমলের নাম তাফসীরে মাযহারী। জ্ঞানের রাজ্যে এ যেনো এক অপ্রতিরোধ্য উপপ্লব। অজেয় আলোকস্তম্ভ।

কোরআন মজীদের এই প্রাণপ্রাচুর্যময় তাফসীর গ্রন্থের সম্মানার্হ গ্রন্থকারের নাম কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী আল ওসমানী আল হানাফী আল মোজাদ্দেদী। ইতিহাসখ্যাত পানিপথ শহরের পবিত্র মৃত্তিকায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন ১১৪৩ হিজরী সনে। আর এ নশ্বর ধরাধাম থেকে প্রস্থান করেন ১২২৫ হিজরীতে। তাঁর দীর্ঘ বিরাশি বছরের জীবন ছিলো নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জন, জ্ঞানবিতরণ ও আধ্যাত্মিক সাধনার সাফল্যে ভরপুর। তিরিশটি কালোত্তর গ্রন্থের সৌভাগ্যশালী রচয়িতা তিনি। তন্মধ্যে তাফসীরে মাযহারীই তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। দশটি বিশাল খণ্ডে যুগোপযোগী আরবী ভাষায় তিনি এ গ্রন্থের রচনা সমাপন করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের নিকটে এ গ্রন্থের সমাদর এখনো অক্ষুণ্ন। জ্ঞানের এ স্রোতবতী নির্ঝরিণী এখনো সমতেজে প্রবহমান। এখনো জ্ঞানপিপাসুরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করে চলেছেন এই অনিঃশেষ শারাবান তহুরা। আশা করা যায়, মহাপ্রলয় পর্যন্ত এর দুর্বার গতিময়তা থাকবে অমলিন ও অনিমিখ।

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র উত্তরপুরুষ। ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এক অনিম্প্রভ বাতিঘর। ছিলেন ইমাম আবু হানিফার মাজহাবভুক্ত। আর তরিকাভুক্ত ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির। তাঁর প্রিয়তম পীর ও মোর্শেদের নামানুসারেই তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সকলকে এ কথাটিই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, হৃদয়জ জ্ঞান (কলবী এলেম)-ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল বা ভিত্তি । আর ওই ভিত্তি-নির্মাতা ছিলেন তাঁর প্রিয়তম পীর ও মোর্শেদ শায়েখ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা। তাঁর ঊর্ধতন পীর ও মোর্শেদগণের আধ্যাত্মিক পরম্পরা এ রকম, শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদাউনি— শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী— খাজা মোহাম্মদ মাসুম— হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহ্মতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। এভাবে নেসবতে সিদ্দীকি নামের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রবাহটি ঊর্ধতন আরো একুশজন কালজয়ী পীর ও মোর্শেদের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু'র সঙ্গে।

তিনি ছিলেন অলৌকিক প্রতিভার এক বিরল প্রতিভূ। সাত বছর বয়সে কোরআন মজীদ স্মৃতিবদ্ধ করার পর জবানী এলেম শিক্ষা সমাপন করেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে। তাঁর হাদিস শাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন প্রথিতযশা আলেম শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী। তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'এ যুগের বায়হাকী' বলে। তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ বলতেন, ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশতারাও সম্মান করে। আরো বলতেন, আমাকে মহাবিচারের দিন 'তুমি কী নিয়ে এসেছো'— এ রকম প্রশ্ন করা হলে আমি বলবো, 'ছানাউল্লাহ্কে।' তাঁর পীর মোর্শেদ তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'আ'লামুল হুদা' (হেদায়েতের নিশান)।

তাঁর পূর্বপুরুষগণের অনেকেই ছিলেন শ্রদ্ধার্হ বিচারপতি। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারেই হয়তো তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো পানিপথ শহরের বিচারকর্তার পদ। প্রতিদিন এক মঞ্জিল কোরআন তেলাওয়াত ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। আর প্রতিদিন কমপক্ষে নামাজ পাঠ করতেন একশত রাকাত। পুণ্যময় জীবনের অধিকারী এই অনন্যসাধারণ জ্ঞানতাপস তাঁর প্রিয় প্রভুপ্রতিপালকের একান্ত সন্নিধানে চলে যান রমজান মাসের ১১ তারিখে ১২২৫ হিজরী সনে। তাঁর পবিত্র সমাধি এখনো আলোকিত করে রেখেছে ঐতিহাসিক পানিপথ শহরকে।

এবার আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে চাই আমাদের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা। দীর্ঘদিন ধরে আমরা খানকাবাসী কিছু ফকির দরবেশ কী কারণে যেনো এই অনন্য জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য হৃদয়ে লালন করে চলেছিলাম পিপাসা ও প্রতীক্ষা। ঐকান্তিক আগ্রহভরে চেয়েছিলাম বাংলায় এর সফল অক্ষরান্তর ঘটুক। সহসা সচকিত হয়ে এক সময় দেখলাম, আমাদের স্কন্ধেই অর্পিত হয়েছে এই মহান গুরুভার। অজ্ঞতা আমাদের সীমাহীন। তদুপরি রয়েছে আচরণগত অপরিচ্ছন্নতা। কিন্তু আমাদের পরম করুণাপরবশ মহান প্রভুপালনকর্তা বলেন— আমি যা খুশী তাই করি। অতএব আমরা নিশ্চিত, তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ের বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। তিনি তো তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন, চিরঅমুখাপেক্ষী। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। সকল পবিত্রতা, প্রশংসা, স্তব-স্তুতি তাঁর, কেবলই তাঁর। সকল উৎকৃষ্ট দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। সেই মহাসম্মানিত রসুলের পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দের প্রতি। রসুল অন্তপ্রাণ পীর-আউলিয়াগণের প্রতি। আমাদের একান্ত ঘনিষ্ঠজন মহান পীর ও মোর্শেদ ইমামুল আউলিয়া শায়েখ হাকিম আবদুল হাকিমের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

হে আমাদের ক্ষমাপরবশ ও করুণানিধান আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করো। এই খণ্ডের অনুবাদক প্রিয় আধ্যাত্মিক আত্মজ মাওলানা তালেব আলীকে, যুথবদ্ধ তাফসীর কর্মীদেরকে, তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়ার সকল সালেক ও সালেকাকে, এই মহান গ্রন্থের সঙ্গে আর্থিক ও অন্যবিধ সহযোগীদেরকে এবং মহৎ হৃদয় পাঠক-পাঠিকাদেরকে দান করো পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। দান করো কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয়, সৌন্দর্যমণ্ডিত আচরণ ও কল্যাণকামিতা ভরা কর্মমুখরতা। হে মহাবিচার দিবসের একক অধিকর্তা! হে পরম পরিত্রাতা! আমাদেরকে দান করো চিরস্থায়ী পরিত্রাণ। পাপী আমরা। কিন্তু আমরা তো তোমারই বান্দা। তোমারই প্রিয়তম রসুলের উম্মত। আমরা তোমাকে যেমন ভয় করি, তেমনি ভালোও বাসি। আমাদের ভয় ও ভালোবাসাকে তুমি দয়া করে গ্রহণ করো। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

আরো দু'টো কথা জানাবার আছে আমাদের। যেমন— ১. মূল তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। আমরা অনুবাদ করেছি দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফিনের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। অবশ্য আরবী অনুলিপিও আমরা রেখেছি পাশাপাশি। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা ও অনবধনতাজনিত ত্রুটি পরিদৃষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরীক্ষা করেছি আরবী অনুলিপি দেখে। বঙ্গরূপটিকেও যুথবদ্ধভাবে করতে চেষ্টা করেছি যত্নায়িত, শীলিত, পরিমার্জিত ও বিদগ্ধপাঠককুলের রুচির অনুকূল। ২. আয়াতের বঙ্গানুবাদটি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে।

পরিশেষের বক্তব্য— মুদ্রণজনিত ও অন্যবিধ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনার সঙ্গে আপনাদের সংশোধনী গৃহীত হবে। বিদগ্ধ পাঠককুলের প্রতি এটা আমাদের আন্তরিক উপরোধ।

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়নগঞ্জ।

সূচীপত্র

একাদশ পারা — সুরা হুদ ঃ আয়াত ১ — ৫

দ্বাদশ পারা — সুরা হুদ ঃ আয়াত ৬ — ১২৩

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১ — ৫২

ত্রয়োদশ পারা — সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৩ —১১১

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১ — ৪৩

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ১ — ৫২

তাফসীরে মাযহারী

ষষ্ঠ খন্ড

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পারা
(সুরা হুদ থেকে সুরা নাহ্‌ল পর্যন্ত)

সুরা হুদ	ঃ আয়াত ১ — ১২৩
সুরা ইউসুফ	ঃ আয়াত ১ — ১১১
সুরা রা'দ	ঃ আয়াত ১ — ৪৩
সুরা ইব্‌রাহীম	ঃ আয়াত ১ — ৫২
সুরা হিজর	ঃ আয়াত ১ — ৯৯
সুরা নাহ্‌ল	ঃ আয়াত ১ — ১২৮

একাদশ পারা

হে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেউই নেই। আমরা কেবল তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। নিশ্চয় তুমি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে চিরমুক্ত। আমরা শুধু তোমারই শরণ প্রার্থনা করি। মার্জনা প্রার্থনা করি কেবল তোমারই সকাশে। আমাদেরকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করো। দান করো পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। আমাদেরকে ওই সকল মহাত্মাগণের দলভূত করো, যারা হাশর প্রান্তরে থাকবেন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত। আমরা সাক্ষ্য ঘোষণা করি, তুমিই আমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। তোমার অপার করুণা-সলিলের জন্যই আমরা হৃদয়ে লালন করি অনন্ত তৃষ্ণা। আমরা আরো প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়তম অগ্রণী ও প্রাণসখা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধর ও শ্রদ্ধার্হ অনুচরবর্গের প্রতি মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হোক তোমার বিশেষ রহমতের অনিঃশেষ প্রবাহ। শান্তি-স্রোতধারা। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সুরা হূদঃ আয়াত ১, ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الۤرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ

❒ আলিফ-লাম-রা, যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে,

❒ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।

এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১২৩। কেবল 'আক্বিমিস্ সলাতা তারফাই (শেষ পর্যন্ত)' আয়াতটি বাদে অন্য সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে— আলিফ লাম র। এই অক্ষরগুলোকে বলা হয় হরূফে মুক্বাত্তায়াত্ (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এই অক্ষরগুলোর প্রকৃত মর্ম চির রহস্যাচ্ছাদিত। এগুলোর জ্ঞান রাখেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয়তম রসুল। অতি নগণ্য সংখ্যক আলেমও অবশ্য এ বিষয়ে কিঞ্চিত জ্ঞান রাখেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে ওলামায়ে রসিখীন (জ্ঞানে সুগভীর)। এ সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে প্রথম খণ্ডের ৩১ এবং চতুর্থ খন্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায়। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ এই কিতাব তাঁর নিকট থেকে।' একথার অর্থ, এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে অতুলনীয় প্রজ্ঞাধিকারী ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে। সুতরাং এর মধ্যে সংশয়-সন্দেহ বলে কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।' এখানে 'উহ্কিমাত' অর্থ সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ বা নয়নাভিরাম। মুক্তার মালার মতো সুগ্রথিত। অর্থাৎ এই পবিত্র গ্রন্থের বক্তব্য-বৈভব শব্দগত এবং মর্মগত অসংলগ্নতা ও সামঞ্জস্যহীনতা থেকে মুক্ত। 'সুস্পষ্ট' কথাটির অর্থ 'অরহিত'— এরকমও বলা যেতে পারে। কারণ, এই সুরার কোনো আয়াতই রহিত হয়নি। প্রকৃষ্ট দলিল প্রমাণাদি দ্বারা সুরা হুদের অথবা সমগ্র কিতাবের আয়াতসমূহকে সুস্পষ্ট বা বলিষ্ঠ করা হয়েছে— এরকমও বলা যেতে পারে। 'উহ্কিমাত' কথাটির আর একটি অর্থ হতে পারে সুবিন্যস্ত বা নৈপুণ্যমণ্ডিত। কারণ এই পবিত্র বাণীসম্ভারে রয়েছে প্রজ্ঞা ও কল্যাণের সুনিপুণ বিন্যাস।

'ফুস্সিলাত' কথাটির অর্থ— পৃথকরূপে। অর্থাৎ একত্রে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও মুক্তার মালার প্রতিটি দানা যেমন পৃথকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, কোরআনের নির্দেশনাসমূহও তেমনি পৃথক পৃথকরূপে পরিদৃশ্যমান। এভাবেই কোরআন মজীদে কখনো এসেছে বিশ্বাস্য বিষয় সমূহের বিবরণ। কোথাও এসেছে কর্তব্য কর্মসমূহের যথানির্দেশ। কোথাও উপদেশামৃত। আবার কোথাও প্রাসঙ্গিক ঘটনাপঞ্জী।

কোরআনের সুরাসমূহ পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে, 'ফুস্সিলাত' কথাটির মর্ম এরকমও হতে পারে। অথবা অর্থ হতে পারে, কোরআনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে পৃথক পৃথক সময়ে।

'ফুস্সিলাত' কথাটির আর একটি অর্থ, বিশদভাবে। অর্থাৎ মানুষের পরিশুদ্ধি ও পরিত্রাণের প্রয়োজনে এই মহাগ্রন্থে দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় কর্তব্যাকর্তব্যের সুবিশদ বিবরণ। 'বিশদভাবে বলা হয়েছে যে'— এতটুকু বলার পর পরবর্তী বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে পরের আয়াতে। অর্থাৎ ২ সংখ্যক আয়াতে।

বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।' এ কথার অর্থ — 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে না' এই মূল কথাটি কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই হে মানুষ! আমার প্রিয়তম রসুল এই কোরআন ক্রমাগত প্রচার করে চলেছেন এবং তোমাদেরকে জানাচ্ছেন, আমি, একমাত্র উপাস্য সেই পরমতম সত্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ-বাহক।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩, ৪

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

❐ আরও বলা হইয়াছে যে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করিবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি।

❐ আল্লাহেরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।' একথার অর্থ— এই সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত আয়াতবিশিষ্ট কোরআনে আরো বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কৃত পাপ ও অবাধ্যতার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং বিশ্বাস ও আনুগত্যসহ তাঁর প্রতি ধাবিত হও। ফাররা বলেছেন, এখানে 'ছুম্মা' অব্যয়টি সাধারণ সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। আর তওবা (প্রত্যাবর্তন) এবং ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) শব্দ দু'টো সমার্থক।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন।' এখানে 'উত্তম জীবন' অর্থ নিরাপদ জীবন। কৃত পাপের কারণেই মানুষের উপরে বিপদাপদ আপতিত হয়। আল্লাহ্পাক অধিকাংশ পাপ মার্জনা করেন। তবুও কোনো কোনো পাপের কারণে মানুষের উপরে এসে পড়ে নৈসর্গিক বিপদ-মুসিবত। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আর তোমাদের

উপর যে সকল দুর্বিপাক উপগত হয়, তা তোমাদেরই অর্জিত কৃতকর্মের প্রতিফল; আর তিনি তা বহুলাংশে মার্জনা করে দেন।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মাতাআ'ন হাসানা' কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাকের নির্ধারণের প্রতি প্রসন্নচিত্ত থাকা । অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সকল সিদ্ধান্তে ধৈর্যধারণ করা। এরকম জীবনই উত্তম জীবন। যেহেতু মানুষের আয়ুষ্কাল সুর্নিধারিত, তাই এখানে 'আজ্বালিম্ মুসাম্মা' (নির্দিষ্ট কালের জন্য) কথাটির অর্থ হবে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন।' একথার অর্থ— যারা বিশুদ্ধচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠ, আল্লাহ্পাক তাদেরকে মর্যাদার স্তর অনুসারে প্রতিদান দিবেন। পার্থিব জীবনে দিবেন আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহ্র স্মরণের আস্বাদ এবং পৃথিবী-পরবর্তী জীবনে দিবেন পুণ্যের প্রাচুর্য ও নৈকট্যভাজনতার মহিমা।

এরপর বলা হয়েছে—'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য ও উপাসনা থেকে সরে যাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাপুনরুত্থান দিবসের শাস্তির। এখানে 'মহা দিবস' অর্থ সুদীর্ঘ পুনরুত্থান দিবস। হাশরের দিবস। যার সময়সীমা পঞ্চাশ হাজার বছর। ওই মহান দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নির্ধারিত হবে অনন্ত শাস্তি। আর বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত হবে অফুরন্ত কল্যাণ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্রই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুনিশ্চিত। আর পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পুরস্কার ও তিরস্কার সম্পূর্ণতই তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়নির্ভর।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৫

أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا۟ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝

❐ সাবধান! উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। সাবধান! উহারা যখন উহাদিগের অভিসন্ধি গোপন করে তখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বোখারী লিখেছেন, কোনো কোনো মুসলমান অপ্রকাশ্য স্থানেও নিজেদেরকে অতিরিক্ত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখতে পছন্দ করতেন। রমণীদের মুখোমুখী হতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন।

তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে মোহাম্মদ বিন উব্বাদ বিন জাফরের মাধ্যমে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

ইবনে আবু মুলাইকা সূত্রে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, কোনো কোনো লোক বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতো। মহিলাদের সামনেও তারা নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত রাখতো। উন্মুক্ত পরিবেশে বস্ত্রবিবর্জিত শরীরে থাকাকে তারা ভালো মনে করতো না। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ সূত্রে ইমাম বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কতিপয় মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা রসুলেপাক স. এর পাশ দিয়ে গমনকালে নিজেদেরকে কাপড় দ্বারা আড়াল করার চেষ্টা করতো। আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে ইবনে জারীর ও আরো অনেকে অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু বর্ণনাটি অযথার্থ। কারণ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর মক্কায় কোনো মুনাফিক ছিলো না।

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে— আলা ইন্নাহুম ইয়াছনুনা সুদুরাহুম লি ইয়াস্‌তাখফু মিনহু। একথার অর্থ— সাবধান! তারা তাঁর নিকট গোপন রাখবার জন্য তাদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে। এখানে 'মিনহু' (তাঁর) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে রসুল স. এর সঙ্গে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে নয়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে বাগবী লিখেছেন, উদ্ধৃত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আখনাস ইবনে শুরাইককে লক্ষ্য করে। সে ছিলো মিষ্টভাষী ও সুদর্শন। রসুল স. সকাশে সে ছিলো মিষ্টভাষী। কিন্তু তার অন্তরে ছিলো বিদ্বেষ। এখানে 'ইয়াছনুনা সুদুরাহুম' কথাটির অর্থ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ গোপন রাখে।

কাতাদা বলেছেন, তারা তাদের বক্ষাভ্যন্তরকে সংকুচিত করে রাখতো। কোরআন মজীদের আয়াত কিছুতেই শুনতে চাইতো না তারা। সুদ্দী বলেছেন, 'ইয়াছনুনা' কথাটির অর্থ এখানে আন্তরিক উপেক্ষা প্রদর্শন করা। হৃদয়জ আর্তিকে অবদমিত করা। কিছু সংখ্যক অসমর্থিত সূত্রে এসেছে, কোনো কোনো লোক সারা শরীরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে গর্বভরে বলতো, এখনো কি আল্লাহ্ আমাদের মনের কথা জানতে পারবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারা যখন তাদের অভিসন্ধি গোপন করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তা জানেন, অন্তরে যা আছে তিনি তা সবিশেষ অবহিত।' এখানে 'ইয়াছতাগ্ শুনা ছিয়াবাহুম' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। এর শাব্দিক অর্থ বস্ত্রাবৃত হওয়া। আর প্রকৃত অর্থ, অভিসন্ধি

গোপন করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— আল্লাহ্‌তায়ালা নিঃসন্দেহে দূরভিসন্ধিপ্রবণদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে জানেন। তাদের গোপন, প্রকাশ্য— সকল কিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ব। অন্তরের অন্তস্থলের অতীব গোপন ভাবনা সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। তাই তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর প্রিয় রসুলকে এবং তাঁর অনুগতদেরকে সতর্ক করণার্থে ওই সকল গোপন তথ্যাবলী সম্পর্কে যে কোনো সময় জানিয়ে দিতে পারেন।

দ্বাদশ পারা

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

❒ পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহেরই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

'ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ্বি ইল্লা আ'লাল্লহি রিযক্বুহা' অর্থ— পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকই পরম করুণাবশতঃ প্রয়োজনীয় রিজিক প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রাণীর লালন ও পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানে 'আ'লাল্লহ্' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, রিজিক বা জীবিকা অবশ্যই পৌছবে। তাই এ ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌পাকের উপরেই নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'আ'লা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞানে রিজিকের যে বরাদ্দ রয়েছে, প্রাণীকুল তা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রিজিক পাওয়া সম্ভবই নয়। মুজাহিদ বলেছেন, রিজিক অর্থ ওই জীবনোপকরণ যা আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। তিনি যখন রিজিক প্রদান বন্ধ করেন, তখনই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা মৃত্যুবরণ করে।

জ্ঞাতব্যঃ দাব্বাতুল আরদ্ব অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। কিন্তু এখানে একথার মাধ্যমে সকল প্রাণীকুলকে বোঝানো হয়েছে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হলো— আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কিন্তু তিনি অবশ্য তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেন। যেমন, এখানে তিনি অঙ্গীকার প্রদান করেছেন রিজিকের। অন্যত্র অঙ্গীকার প্রদান করেছেন পুণ্যবানদের জান্নাত প্রদানের ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইয়া'লামু মুস্‌তাক্বার্‌রাহা ওয়া মুস্‌তাওদায়াহা' (তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত)। বাগবী লিখেছেন, ইবনে মুকসিম বলেছেন, 'মুস্‌তাক্বার্' অর্থ প্রাণীদের আবাসস্থল— এদিক ওদিক চলে গেলেও প্রাণীরা যে আবাসে ফিরে আসে । আর 'মুস্‌তাওদায়া' অর্থ সমাধি-স্থান। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মুস্‌তাক্বার' অর্থ মাতৃ-জঠর এবং 'মুস্‌তাওদায়া' অর্থ পিতৃ-পৃষ্ঠ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আলী বিন তালহা এবং ইকরামার বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যও অনুরূপ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম হচ্ছে 'মুস্‌তাক্বার' এবং কবরসমূহ হচ্ছে 'মুস্‌তাওদায়া'। কারণ আল্লাহ্‌পাক জান্নাত সম্পর্কে বলেছেন— 'হাসুনাত মুস্‌তাক্বার্‌রা'। আর জাহান্নাম সম্পর্কে বলেছেন, 'সাআত্ মুস্‌তাক্বার্‌রা'।

এরপর বলা হয়েছে— কুল্লুন ফী কিতাবিম্ মুবীন (সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে)। একথার অর্থ— রিজিকসহ আদি অন্তের সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহফুজে। অথবা লেখক ফেরেশতাকুলের রোজনামচায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সৃষ্টির ভাগ্যলিপি প্রস্তুত করেছেন তাদেরকে অস্তিত্বদানের পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। তখন আল্লাহ্‌র আরশ বা সিংহাসন ছিলো পানির উপর।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টির মৌল পদার্থ মাতৃজরায়ুতে বারিবিন্দুবৎ বিদ্যমান থাকে চল্লিশ দিন। পরের চল্লিশ দিনে ওই বিন্দুটি পরিণত হয় রক্তপিণ্ডে। এর পরের চল্লিশ দিনে তা ধারণ করে গোশ্‌তপিণ্ডের আকার। তখন আল্লাহ্ একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন— আয়ুষ্কাল, কর্মকাণ্ড, জীবনোপকরণ এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের পাঁচটি বিষয় নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ— আয়ু, কর্ম, মৃত্যু, প্রভাব ও জীবিকা।

সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াত (৫) এবং এই আয়াতে আল্লাহ্‌পাক যে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিধর— সে কথারই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। একথাও বলে দেয়া হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে সুদৃঢ়। পরের আয়াতদ্বয়ে (৭ ও ৮) দেয়া হয়েছে তাঁর অতুলনীয় সৃজনক্ষমতা ও প্রজ্ঞাময়তার বিবরণ।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

❒ যখন তাঁহার আরশ্ পানির উপর ছিল তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন তোমাদিগের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হইবে' তুমি ইহা বলিলেই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারিগণ নিশ্চয় বলিবে 'ইহা স্পষ্টতঃ অলীক কল্পনা।'

❒ নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য আমি যদি উহাদিগের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'কিসে ইহা নিবারণ করিতেছে?' সাবধান! যেদিন উহাদিগের নিকট ইহা আসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইতে উহা ফিরিবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'যখন তাঁর আরশ্ পানির উপরে ছিলো তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন।' এখানে 'সামাওয়াত' অর্থ আকাশমণ্ডলী। আর 'আরদ্ব' পৃথিবী। আকাশকে বহুবচনে এবং পৃথিবীকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এতে করে বুঝা যায় আকাশ অনেক। আর পৃথিবী মাত্র একটি। বাগবী লিখেছেন, পানি ছিলো বায়ুর কাঁধে ভর করে। কাআব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন একটি সবুজ ইয়াকুত। তার উপর তিনি রোষতপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এতে প্রস্তরটি পরিণত হলো উদ্বেলিত সলিলে। অতঃপর আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন বায়ু। এরপর তার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন পানি। অনন্তর পানির উপর স্থাপন করলেন আরশে আজীম। জুমরাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্পাকের সিংহাসন ছিলো পানির উপর। অতঃপর আল্লাহ্পাক সৃজন করলেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। আরো সৃষ্টি করলেন কলম। অনন্তর তদ্দারা লিখে দিলেন ভবিষ্যতের ঘটিতব্য যাবতীয় বিষয়। আর ভবিষ্যতের সৃজিতব্য বস্তু। প্রতিটি বস্তু সৃজনের পূর্বে হাজার বছর ব্যাপী স্তব ও স্তুতি করেছিলো কলম। হজরত ইমরান বিন হোসাইন সূত্রে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন রসুল স. এরশাদ

করেছেন, আল্লাহ্‌পাকের সিংহাসন পানিতে স্থাপনের পূর্বে কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব ছিলোনা। অতঃপর তিনি সৃজন করলেন আকাশ সমূহ ও পৃথিবী। আর স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ করলেন যাবতীয় বিষয়। আল হাদিস। আরশ সম্পর্কিত হাদিস সমূহের কিয়দংশ সুরা বাকারার আয়াতুল কুরসির ব্যাখ্যায় পরিবেশিত হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করবার জন্য।' একথার অর্থ—সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও এক বিচক্ষণ পরীক্ষকের মতো মানুষের আচরণ বা আমল পরীক্ষা করার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাক আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের উপরেই মানুষের জন্য নির্ধারণ করা হবে পুরস্কার অথবা তিরস্কার। একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিজড়িত রয়েছে মানুষের জীবন। মানুষের জন্যই এই বিশাল আয়োজন। সুতরাং মানুষেরা আল্লাহ্‌পাকের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হবে না কেনো? কেনো মানুষ ভেবে দেখবে না এই বিশাল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবীর শত সহস্র নিদর্শন তো সেই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজকের আনুরূপ্যবিহীন অস্তিত্বের প্রমাণ। এখানে 'ইয়াব্‌লুওয়াকুম' (পরীক্ষা করবার জন্য) কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে 'খাল্‌ক' (সৃষ্টি করেন) কথাটির সঙ্গে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিই মানব সৃষ্টির উপলক্ষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী, তাদের সৃষ্টির উপলক্ষ। গভীরতর অর্থে মানবশ্রেষ্ঠ রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী পুণ্যবানদের সৃষ্টির উপলক্ষ।

'আহ্‌সানু আমালা' অর্থ— আচরণে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বাসগত এবং শরীরগত উভয় প্রকার উপাসনাকে বুঝানো হয়েছে এই কথাটির মাধ্যমে। অপেক্ষাকৃত শিথিলসূত্রে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রেই সম্ভবতঃ রসুল স. বলেছেন, 'আচরণে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ওই সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌তায়ালার নিষিদ্ধকৃত বস্তুসমূহ থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থান করে। আর অতীব গুরুত্বসহকারে পালন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহ।' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আচরণ হচ্ছে হৃদয়ের আচরণ। আর হৃদয়জ আচরণের মধ্যে সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রেম এবং আল্লাহ্‌-স্মরণের বিভোরতা। প্রকৃত কথা এই যে, গগনপুঞ্জ ও ভূবন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আহ্‌লুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করা। 'আহ্‌সান' (শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর) কথাটির মধ্যে এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, প্রজ্ঞা ও কীর্তির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উত্থান কাম্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তুমি এরকম বললেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ নিশ্চয় বলবে, এটা স্পষ্টতঃ অলীক কল্পনা।' এ

কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি অংশীবাদকে আশ্রয়কারী জনতাকে বলেন, কোরআনে বর্ণিত মৃত্যু-উত্তর পুনরুত্থান নিশ্চিত, তবে তারা নিশ্চয় বলবে, এটা তো সুস্পষ্ট অলীক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছে, 'মানুষের হিসাব নিকাশের দিবস সন্নিকটবর্তী'— এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, হাশরের দিবস তাহলে এসেই পড়লো। আবার কেউ কেউ ভয়ে অসৎকর্মসমূহ পরিত্যাগ করলো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই পুনরায় লিপ্ত হয়ে পড়লো পাপাচরণে। এরপর অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্‌র আদেশ এসে পড়েছে, কাজেই ত্বরা কোরো না।' তখন কিছু লোক বললো, এই নাও, আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসেই গেলো। কেউ কেউ ভয়ে তাদের মন্দ কর্মগুলো ছেড়ে দিলো। কিছুদিন পর তারা পুনরায় লিপ্ত হয়ে পড়লো পাপকর্মে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষোক্তটি। ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতিসূত্রে ইবনে জারীর এরকম বলেছেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৮) বলা হয়েছে—'নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা নিশ্চয় বলবে, কিসে এটা নিবারণ করছে।' একথার অর্থ— কিছুকালের জন্য আমি যদি শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতে শুরু করবে, কোন শক্তির বলে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে? এখানে উল্লেখিত 'উম্মাত' শব্দটির অর্থ সময় বা কাল— কামুস অভিধান প্রণেতা এরকম লিখেছেন। বাগবীও এরকম অর্থ করেছেন। আসলে 'উম্মাত' বলতে বুঝায় একটি দলকে— একটি দলের শেষ থেকে অপর দলের সূচনা কাল পর্যন্ত সময়কে। বায়যাবী শব্দটির অর্থ করেছেন, সময়ের সমষ্টি। আর 'মা'দুদাত্' অর্থ এখানে— কিছুদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! যে দিন তাদের নিকট শাস্তি আসবে সেদিন তাদের নিকট থেকে তা ফিরবে না এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞানে যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে (যেমন বদর যুদ্ধের শাস্তি), সে শাস্তি যখন এসেই পড়বে, তখন সে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ তারা পাবে না। যে শাস্তি সম্পর্কে তারা ঠাট্টাস্থলে 'শাস্তি আসেনা কেনো' 'শাস্তি আগমনের ক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়'— এরকম মন্তব্য করতো, সে শাস্তি অতি অবশ্যই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে নিষ্কৃতির সকল সুযোগ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে অতীতকালবোধক বাকভঙ্গি। এভাবে বুঝানো হয়েছে, শাস্তি যেনো এসেই পড়েছে।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ○ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

❐ যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই ও পরে তাহা হইতে উহাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।

❐ দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলিয়াই থাকে, 'আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে' আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী;

❐ কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যদি আমি মানুষকে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই ও পরে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়।' এখানে 'আল ইনসান' শব্দটিতে আলিফ লাম ব্যবহৃত হয়েছে জাতিগত অর্থে। এভাবে বুঝানো হয়েছে মনুষ্য জাতিকে। এখানে 'ইয়াউসুন' অর্থ নেয়ামত বা স্বাচ্ছন্দ্যচ্যুত হওয়ার পর আশাহত হওয়া। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল নয়, ধৈর্যধারণকারী নয় এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তও নয়। তাই তারা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটলেই হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের বিদ্যমানতাই যে একটি নেয়ামত তা তারা বিলকুল ভুলে যায়। অতীতের নেয়ামতরাজির কথা বিস্মৃত হয়েও প্রকাশ করে অকৃতজ্ঞতা। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'অবাধ্য মানুষকে যদি আমি আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তারপর যদি তাদেরকে ওই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করি, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ।'

পরের আয়াতে (১০)বলা হয়েছে—'দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলে থাকে, আমার বিপদ আপদ কেটে গিয়েছে আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।' একথার অর্থ— অবাধ্য মানুষের দুঃখ-দৈন্য অপসারণের পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দান করি, তবে সে বলে, যাক এবার আপদমুক্ত হওয়া গেলো। আল্লাহ্পাকই যে এ বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করেছেন, সে কথা তখন তার মনেই পড়ে না। মনে করে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তাই আসল কথা হচ্ছে, সে উন্নাসিক ও আত্মগর্বিত। তাই সে প্রকৃত পরিত্রাতার কথা বিস্মৃত হয়ে প্রকাশ করে প্রবৃত্তির আনন্দ। উদ্দেশ্য সফল

হওয়ার পর প্রবৃত্তির উৎফুল্লতাকে বলে 'ফারিহ্'। তাই এখানে 'ফারিহুন' শব্দটির অর্থ হবে অহংকার প্রকাশ করা। আর 'ফাখূর' শব্দটির অর্থ এখানে— উৎফুল্লপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট আস্ফালন। অবাধ্যরা আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্ভারকে মনে করে তাদের প্রাপ্য অধিকার। তাই তারা গর্বিত হয় ও প্রদর্শন করে প্রবৃত্তিজাত প্রতাপ। ওই গর্ব ও প্রতাপই তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধক।

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে—'কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম-পরায়ণ, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার।' এ কথার অর্থ— মানুষের মধ্যে যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপ্রবণ, তারা কিন্তু সে রকম নয়। তারা নৈরাশ্য ও অকৃতজ্ঞতা থেকে মুক্ত। তাদের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের আশা। তারা অতীত ও বর্তমানের সকল অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। নেয়ামত লাভের পর প্রতাপ প্রদর্শন তাদের স্বভাব নয়। আত্মগর্বিতও নয় তারা। বিপদে ধৈর্যধারণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশই তাদের বৈশিষ্ট্য। তারাই লাভ করবে আল্লাহ্র তুষ্টি ও জান্নাত।

হজরত সুহাইবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ব্যক্ত করেছেন, বিশ্বাসীদের আচরণ বিস্ময়কর। তাদের বচন ও আচরণ সুন্দর। তারা সুখে কৃতজ্ঞ ও দুঃখে ধৈর্যশীল। আর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা দু'টোই কল্যাণকর। মুসলিম।

ফাররা বলেছেন, এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে বিশিষ্ট মানুষের কথা। এখানে আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'ইল্লা' শব্দটি ইসতেছনায়ে মুনকাতি (বিকর্তিত ব্যতিক্রম)। এভাবে 'ইল্লা'র মাধ্যমে এখানে বিকর্তিত করা হয়েছে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে।

হজরত আয়াজ বিন আম্মার আশ্জায়ীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি এইমর্মে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, বিনয়াবনত হও। গর্বিত হয়ো না। সীমাতিক্রম কোরো না। মুসলিম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১২

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

❒ 'তাহার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাহার সহিত ফেরেশ্তা আসে না কেন?'— উহারা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলে বলিয়া তুমি যেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু বর্জন করিও না এবং উহার জন্য ব্যথিত হইও না। তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের কর্মবিধায়ক।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, হে মোহাম্মদ! তুমি এমন ধরনের কোরআন আনো, যাতে আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর নিন্দাবাদ নেই। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সুতরাং 'বা'দ্বা মা ইউহা' কথাটির অর্থ হবে এখানে ওই সকল প্রত্যাদেশিত আয়াত, যেগুলোতে মুশরিকদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখিত 'লাআল্লা' শব্দটির সরাসরি অর্থ, সম্ভবতঃ। কিন্তু এখানে এর অর্থ হবে সুনিশ্চিত। জনসমক্ষে আল্লাহ্র বাণী প্রচার করাই রসুলগণের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বাতিল উপাস্যদের সমালোচনাসম্বলিত আয়াত প্রচার করা থেকে তাঁরা বিরত থাকতে পারেন না। এমতোক্ষেত্রে কাফেরদের অতুষ্টির পরওয়া করা তাঁদের জন্য অশোভন। কাজেই 'সম্ভবতঃ' বলার অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। আল্লাহ্র বাণীকে গোপন রাখা রেসালতের (বাণীবহনের দায়িত্বের) পরিপন্থী। তাই অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় রসুলগণকে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পালন করতেই হয়। আমি বলি, আল্লামা বায়যাবীর ব্যাখ্যার মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে কোনো কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের অর্থ— ওই কাজ সম্পাদনের বিষয়টি সুনিশ্চিত। কারণ অপারগ বা অক্ষম হওয়া আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— 'তার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেনো?'— তারা তোমার সম্বন্ধে এরকম কথা উচ্চারণ করে বলে তুমি যেনো তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন কোরো না এবং তার জন্য ব্যথিত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অযথার্থ ও অসঙ্গত উক্তি শ্রবণ করে আপনি ব্যথিত হবেন না। যে কোরআন আপনার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কোরআনের প্রচারও বন্ধ করবেন না। তারা তো মূর্খ ও অবাধ্য। তাই আপনার নিকট ধনভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেনো এবং আপনার নিকট ফেরেশতারা আসে না কেনো— এ ধরনের অজ্ঞজনোচিত বাক্য তাদের মুখে উচ্চারিত হয়। তারা মনে করে রাজা বাদশাহদের মতো আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষেরাও ধনভাণ্ডারের মালিক হবেন এবং তাদের সঙ্গে থাকবে একজন করে ফেরেশতা, যে তার রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করবে। এসকল অপবিত্র উক্তি চরম বিরক্তি ও মনোকষ্টের কারণ। কিন্তু আপনি তো আমার রসুল। আমার বার্তা বহনই আপনার মূল কর্তব্য। সুতরাং কাফেরদের অপমন্তব্য সমূহকে আপনি গণ্য করবেন কেনো? সত্যের প্রচার বর্জন করবেন কেনো? কেনোইবা হবেন বেদনাহত? এ ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া মাখজামী থেকে। আলোচ্য বাক্য প্রসঙ্গে এরকমও বলা যেতে পারে যে, অংশীবাদীরা আল্লাহ্পাক কর্তৃক অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের গুরুত্ব কিছুতেই বুঝতে পারতো না। তাই রসুল স. কতিপয় আয়াতের প্রচার বন্ধ রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন আয়াতগুলো শুনে অংশীবাদীরা

হাসাহাসি করে। শুরু করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। তাদের এমতো বিদ্রূপের কারণে আল্লাহ্‌পাক যদি ওই আয়াতগুলো উঠিয়ে নেন— একথা ভেবে তিনি মনোকষ্ট অনুভব করতেন। কখনো ভাবতেন, সাক্ষ্যদাতা কোনো ফেরেশতা সঙ্গে থাকলে হয়তো তারা ইমান আনতো। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে তাঁর প্রিয় রসুলকে ধর্ম প্রচার বন্ধ না করার ও ব্যথিত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি তো কেবল সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র। সুতরাং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করে সত্য ধর্মের প্রচার অব্যাহত রাখুন। মনোকষ্টকে পরিত্যাগ করুন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের কর্মবিধায়ক। তাই তিনি তাদের অপবিত্র উক্তির যথোপযুক্ত প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১৩, ১৪, ১৫

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ○

❒ তাহারা কি বলে,'সে ইহা রচনা করিয়াছে?' বল,'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর।'

❒ যদি তাহারা তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা আল্লাহেরই নিকট হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে না।

❒ যদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি উহাদিগের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং দুনিয়াতে উহারা কম পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা আপনাকে বলে, আপনিই এই কোরআনের রচয়িতা। আপনি তাদেরকে বলুন, তোমাদের

কথা অসত্য। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা এই কোরআনের অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করে দেখাও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের বাতিল উপাস্যসমূহসহ যাকে খুশি সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো।

একটি সন্দেহঃ সুরা ইউনুসে উল্লেখ করা হয়েছে, হে মুশরিককুল! কোর-আনকে যদি তোমরা আল্লাহ্র বাণী বলে স্বীকার না করো, তবে এই কোরআনের অনুরূপ যে কোনো একটি সুরা রচনা করো। মুশরিকেরা আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেনি। তবে এখানে পুনরায় 'দশটি সুরা আনয়ন করো'— এরকম বলা হলো কেনো? যে ব্যক্তি এক টাকা দিতে অক্ষম, তার কাছে দশ টাকা চাওয়া কী অসমীচীন নয়? আল্লাহ্তায়ালার কালামে এরকম বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হবে কেনো?

সন্দেহভঞ্জনঃ উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত দশটি সুরা আনয়ন করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অসমর্থ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইউনুসের ওই আয়াত। এভাবে সমস্যাটি সুরাহা করা যায়। কিন্তু আল্লামা মোবার্রাদ এ কথার ঘোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সুরা ইউনুসই অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমে। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হুদ। তাঁর মতে সুরা দু'টো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সুরা ইউনুসে বলা হয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত বিধান এবং পুরস্কার, তিরস্কার বিষয়ক প্রতিশ্রুতির বিবরণ সমৃদ্ধ একটি আয়াত রচনার কথা, যে আয়াত হবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুরূপ। এ রকম রচনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর সুরা হুদের আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনা ও শৈল্পিক সুষমার দিক থেকে কোরআনের অনুরূপ দশটি সুরা আনয়নের কথা। সুতরাং বর্ণনা-বৈসাদৃশ্যের অবকাশ এক্ষেত্রে নেই। আমি বলি, মুশরিকেরা দু'টো চ্যালেঞ্জের কোনো একটিরও মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়নি। তখন সুরা বাকারার এক আয়াতে কোরআনের সুরাগুলো যে রকম ধারাবাহিক ও সুসঙ্গতরূপে অবতীর্ণ হয়, সেরকম ধারাবাহিকভাবে পুনরায় একটি সুরা রচনার আহ্বান জানানো হয়। বলা বাহুল্য যে, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাও তারা করতে পারেনি।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে, 'যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।' এখানে লাকুম (তোমাদের) বলে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। মহাসম্মানিত ব্যক্তিত্বকে এভাবে বহুবচনবোধক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়। অবশ্য এখানে 'তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়' একথা বলে অন্যান্য মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়ে থাকতে পারে। কারণ তাঁরাও অংশীবাদীদের প্রতি কোরআনের অনুরূপ সুরা রচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, সম্বোধন করা হয়েছে এখানে রসুল স.কে। আর দলগতভাবে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিছুসংখ্যক বিশেষ

নির্দেশ ছাড়া কোরআন মজীদে উল্লেখিত অধিকাংশ নির্দেশ এরকম। অর্থাৎ ওই সকল ক্ষেত্রে সম্বোধিতজন স্বয়ং রসুল স. হলেও সমগ্র মুসলিম জনতার উপরে তা সমভাবে কার্যকর। সুতরাং সকল যুগের মুসলমানেরা তাদের সময়ের অবিশ্বাসীদেরকে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত চ্যালেঞ্জের মতো চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। আর এমতো দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন হবে তাঁদের জন্য অসমীচীন।

'তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়' একথার মাধ্যমে এখানে বলে দেয়া হয়েছে— এমতো আহ্বানে সাড়া দেয়া মুশরিকদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্ই যে কোরআনের একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচয়িতা, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ।'

'তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই'— কথাটির মাধ্যমে এটাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্পাকই যেহেতু একক উপাস্য ও সর্বশক্তিমান, তাই এ রকম অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী-বৈভব রচনা করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অবিশ্বাসীরা এ রকম করতে সমর্থ নয়। আর এ ব্যাপারে তাদের বাতিল উপাস্যগুলো তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে না। এভাবে এখানে অবিশ্বাসীদেরকে এইমর্মে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়েছে যে, বাতিল উপাস্যগুলো যেমন এখন তাদের উপাসকদেরকে সাহায্য করতে পারছে না, তেমনি আল্লাহ্র শাস্তি থেকেও তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুলের সহচরবৃন্দ! এভাবে অবিশ্বাসীদের পরাজয় ও কোরআনের বিজয় দর্শনের পর তোমরা কী আল্লাহ্তায়ালার নিকটে পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধচিত্ত আত্মসমর্পণকারী হবে না? হবেই তো। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'লাম ইয়াস্তাজীবু' (যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে) কথাটির ক্রিয়াবাচক সর্বনামের সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের (১৩) 'মানিস্তাত্বা'তুম' (তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম) এর সঙ্গে। এ সম্পর্কটিকে মান্য করলে এখানকার বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদের সাহায্যকারীরা আমার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারলো না। এটা তো তোমরা স্বচক্ষেই দেখলে। তবুও কী তোমরা এই কোরআনকে আল্লাহ্র বাণী বলে স্বীকার করবে না? ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের চিরন্তন ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে না? প্রত্যাখ্যানের সকল অবলম্বন তো এখন অবলুপ্ত।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কষ্টের পরিমিত ফল দান করি এবং দুনিয়াতে তারা কম পাবে না।' এ কথার অর্থ— যে ব্যক্তি তার সৎকর্ম-

সমূহের প্রতিদান এই পৃথিবীতেই চায়, কামনা করে সম্ভোগ-সম্ভার, বিলাসের উপকরণ, রূপসী রমণী ও অধিক সন্তান-সন্ততি, আমি তা পূর্ণ করি। কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে তারা কিছুই পাবে না। পাবে কেবল জাহান্নাম। কারণ, পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের সৎকর্মের বিনিময়। অতএব অসৎকর্মের প্রতিফলরূপে তাদের জন্য অনন্ত আগুন তো নির্ধারিত হবেই।

সূরা হূদ ঃ আয়াত ১৬

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❒ উহাদিগেরই জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা যাহা করে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীদের পুণ্যকর্ম নিরর্থক। কারণ তারা আল্লাহ্র প্রতি আস্থাবান নয়। আল্লাহ্পাকের সন্তোষ সাধনার্থে তারা পুণ্য কর্ম করে না। করে প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য। সুনাম বা সুখ্যাতির জন্য। এরকম জনপ্রদর্শনপ্রবণ কোনো সৎকাজের বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্তায়ালার উপরে বর্তায় না। পার্থিবতাই যেহেতু তাদের কাম্য, তাই আল্লাহ্পাক পৃথিবীতেই তাদের পুণ্যকর্মের বিনিময় পরিশোধ করে দেন। আখেরাতের অনন্ত জীবনে তাদের পুণ্যকর্ম কোনো কাজে আসবে না বলেই সেগুলো নিরর্থকতায় পর্যবসিত। উল্লেখ্য যে, 'ফীহা' সর্বনামটি আখেরাতের সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে শব্দটির সম্পর্ক ঘটবে 'হাবিত্বা' (নিষ্ফল) এর সঙ্গে। আর দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত হলে সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'সানাউ' (করে) এর সঙ্গে।

এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত অন্য কিছু দেখলাম না। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আপনার উম্মতের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্পাকের নিকট প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্পাক পারস্যবাসী ও রোমানদেরকে অগাধ সম্পদ দান করেছেন। অথচ তারা আল্লাহ্দ্রোহী। রসুল স. তাঁর আসনে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাত্তাব তনয়, তুমি এখনও পার্থিবতার প্রতি তোমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছো! অবিশ্বাসীরা পৃথিবী প্রত্যাশী। তাই তাদেরকে দেয়া হয়েছে ভোগ বিলাসের অঢেল উপকরণ। আর বিশ্বাসীরা চায় পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। সুতরাং ইহকালে তারা পাবে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ এবং পরকালে পাবে পুণ্য।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদেরকে পীড়ন করেন না। ইহজগতে দেন সৎকর্মের যথাবিনিময় এবং পরজগতে দেন অঢেল পুণ্য। আর অবিশ্বাসীদের সৎকর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়রূপে ইহজগতে দেন প্রচুর বিত্ত-বৈভব ও জাগতিক সুখ্যাতি। কিন্তু তাদের পরজগতের প্রাপ্তি শূন্য। সুতরাং সেখানে তারা হবে কল্যাণরহিত। মুসলিম, আহমদ।

আমি বলি, 'তাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত কিছুই নেই'— এ ঘোষণাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। 'আর বিশ্বাসীদের শেষ পরিণতি জান্নাত।' আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম। সুতরাং এই আয়াতে যে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে প্রদর্শনপ্রবণ সৎকর্মে অভ্যস্ত অহংকারীদেরকে লক্ষ্য করে। হজরত আবু সাঈদ বিন ফুজালার বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, পরকালে সকল মানুষ যখন আল্লাহ্পাক সকাশে সমুপস্থিত হবে, তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা সৎকর্ম সম্পাদনের সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যকে সংমিশ্রিত করেছে, তারা যেনো তাদের সৎকর্মের প্রতিদান গ্রহণ করে ওই সকল অংশীদারদের নিকট থেকে। আল্লাহ্ যাবতীয় অংশীবাদিতা থেকে চিরমুক্ত। আহমদ।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেন, আখেরাত যার উদ্দেশ্য, আল্লাহ্পাক তার হৃদয়কে পার্থিব বস্তুর অভাব থেকে মুক্ত রাখেন। দূর করে দেন তার সকল সংশয়। পৃথিবীর সকল অর্জন তখন তার চোখে হয়ে পড়ে তুচ্ছ। আর যার উদ্দেশ্য পৃথিবী, আল্লাহ্ তার দু'চোখের দৃষ্টিতে স্থাপন করেন অভাব আর অভাব। তখন অন্তহীন লোভের বশবর্তী হয়ে পড়ে সে। পার্থিব বৈভব ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য সে তখন হয় বিরামহীন অস্থিরতা ও পেরেশানীর শিকার। অথচ সে লাভ করে ততটুকুই, যতটুকু নির্ধারিত রয়েছে তার ললাটলিপিতে। তিরমিজি। যথাসূত্রে বর্ণিত এই হাদিসটি আবানের মধ্যস্থতায় হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আহমদ ও দারেমী।

একটি সন্দেহঃ কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক পৃথিবীতে প্রদান করেন কাফেরদের কর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়। আর হাদিস শরীফে বলা হলো, 'যতটুকু নির্ধারিত রয়েছে তার ললাট লিপিতে।' তাহলে কোরআন ও হাদিসের বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি?

সন্দেহের নিরসনঃ যদি বলা যায় পুণ্যকর্মের সম্পূর্ণ বিনিময়ই লিপিবদ্ধ রয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ললাট লিপিতে, তাহলে কিন্তু দ্বন্দ্ব বলে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ ভাগ্যলিপি অনুসারে সম্পাদিত হবে তাদের কর্ম এবং ভাগ্যলিপি অনুসারেই তারা পাবে তাদের কর্মের সম্পূর্ণ প্রতিফল।

তাদের তকদীরে যা আছে তার চেয়ে একটুও কম বা বেশী তারা পাবে না। কিন্তু তারা সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকবে লালসার আগুনে। তাই এক হাদিসে বলা হয়েছে, যদি পৃথিবীপূজকের নিকট দু'টি উম্মুক্ত প্রান্তর ভর্তি স্বর্ণ সঞ্চিত থাকে, তবুও সে এরূপ তৃতীয় আর একটি প্রান্তরের অভিলাষী হবে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতটি যদি অহংকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে প্রদর্শনপ্রবণ আমলের কারণে তাদের জন্যও নির্ধারিত হবে জাহান্নাম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১৭

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

☐ যাহারা কেবল পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে, যাহার অনুসরণ করে তাঁহার প্রেরিত সাক্ষী এবং যাহার পূর্ব-সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী। অন্যান্য দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাহাদিগের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইও না। ইহা তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

'আফা মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাতিম মিররব্বিহি' অর্থ, যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে। এখানে 'মান কানা' (যারা) বলে বুঝানো হয়েছে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স.কে। কিন্তু 'মান' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত। তাছাড়া পরবর্তী বাক্যে যেহেতু বহুবচনবোধক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয়েছে, উলাইকা ইউ'মিনুনা বিহি (তারাই তাতে বিশ্বাসী), সেহেতু 'মান কানা ' বলে রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্ত অনুচরবৃন্দকেই বুঝানো হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আবু শায়েখ, আবুল আলীয়া ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, 'মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাত' কথাটির লক্ষ্যস্থল হচ্ছেন রসুলপাক স.। ইবনে মারদুবিয়া এবং ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত আলী। আবু নাঈম তাঁর 'মারেফাত' গ্রন্থে এ রকমই

লিখেছেন। আর 'বাইয়্যেনাত' (স্পষ্ট নিদর্শন) শব্দটির অর্থ কোরআন মজীদ। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণের সমতুল্য হতে পারে কি ওই সকল লোক, যারা কেবল কামনা করে পৃথিবীর জীবন ও পার্থিব চাকচিক্য?

এরপর বলা হয়েছে— 'যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত সাক্ষী এবং যার পূর্বসাক্ষী মুসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ।' একথার অর্থ— যে কোরআন পাঠ করেন হজরত জিবরাইল অথবা হজরত রসুল স.। আর যে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে পূর্বে অবতীর্ণ তওরাত। হজরত মুসার উপরে অবতীর্ণ ওই তওরাত ছিলো অগ্রণী ও রহমত।

এখানে 'শাহেদ' (সাক্ষী) শব্দটির মাধ্যমে হজরত জিবরাইলকে বুঝানো হয়েছে বলে একটি অভিমত রয়েছে। আল্লামা ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী হাতেম ও আবু নাঈম বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য বাক্যের 'শাহেদ' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে। কারণ হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকটে কোরআন মজীদ পাঠ করে শোনাতেন। হজরত মুসার নিকটেও তিনি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তওরাত শরীফ। হজরত ইবনে আব্বাস ছাড়াও আলকামা, ইব্রাহিম, মুজাহিদ, ইকরামা ও জুহাক পর্যন্ত এই বর্ণনাটির বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন আল্লামা বাগবী।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'শাহেদ' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র রসনাকে, যার দ্বারা কোরআন উচ্চারিত হয়। সুতরাং সাক্ষ্যদাতা এখানে রসুল স. স্বয়ং। আর কোরআনের সাক্ষ্যদাতা বা প্রত্যয়নকারী হচ্ছে হজরত মুসার কিতাব, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো পূর্বে।

এখানে 'শাহেদ' বলে হজরত আলীকে বুঝানো হয়েছে— এরকম একটি অভিমত রয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও আবু শায়েখ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার আমার মহান পিতা হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার শ্রদ্ধার্হ পিতা! অনেকে মনে করে 'ওয়া ইয়াতলুহু শাহিদুম মিনহু' আয়াতাংশের শাহেদ হচ্ছেন আপনি। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু না। শাহেদ হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং। মুজাহিদ থেকে আবু বখীহের মাধ্যমে আবু শায়েখ বলেছেন, শাহেদ হচ্ছেন রসুল স. স্বয়ং।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইয়াতলু' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'তিলবুন' থেকে। 'তিলবুন' অর্থ অনুসরণ করা, অনুগামী হওয়া। আর 'শাহিদ' অর্থ সংরক্ষক ফেরেশতা। 'ইয়াতলুহু' এর 'হু' সর্বনামটি এখানে 'মানকানা' এবং 'বাইয়্যেনাত' কথা দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বাইয়্যেনাত' অর্থ সুস্পষ্ট দলিল বা প্রমাণ। আর 'মিন ক্বলিহি কিতাবু মুসা' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মান কানা আ'লা বাইয়্যেনাত' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। আর 'শাহিদুন' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এক ফেরেশতাকে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আলীকে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার একদল লোকের সম্মুখে বললেন, কুরায়েশ গোত্রের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কোনো না কোনো আয়াত নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, তবে আপনার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে কোন্‌টি? তিনি বললেন— 'ইয়াতলুহু শাহিদুম মিনহু।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হজরত আলীকে এখানে শাহিদুন বলা হবে কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

আমি বলি, উদ্ভূত প্রশ্নের যথাযথ জবাব হবে এ রকম— হজরত আলী ছিলেন কামালিয়তে বেলায়েতের (নৈকট্যের পূর্ণতার) কেন্দ্র বা শিখর। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য সাহাবী এবং পরবর্তী সময়ের সকল আউলিয়া অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান হজরত আলীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো কামালিয়তে নবুয়তের (নবুয়তের পূর্ণ বরকতের) ক্ষেত্রে। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য এটাই। কিন্তু বেলায়েতের পরিপূর্ণ বরকত লাভে হজরত আলীই ছিলেন সকলের অগ্রণী। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রহঃ তাঁর মকতুবাত শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যারা এ বিষয়ে অধিক আগ্রহী তারা যথাস্থানে আলোচনাগুলো দেখে নিতে পারেন।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— রসুল স. আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এনেছিলেন অনেক অকাট্য ও বিস্ময়কর প্রমাণ বা মোজেজা। ওই সকল মোজেজার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাঁর রেসালাত। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হচ্ছে কোরআন মজীদ। তাছাড়া খাস বেলায়েতের (বিশেষ নৈকট্যের) পরিচিতিমূলক জ্ঞানও দেয়া হয়েছিলো রসুল স.কে। ওই সকল জ্ঞানে হজরত আলীই ছিলেন সকলের শীর্ষে। তাই বেলায়েতের ক্ষেত্রে সকল আউলিয়ার তিনি ইমাম। আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতসমূহ হচ্ছে রসুল স. এর মোজেজাসমূহের অনুসৃতি। তাঁদের কাশ্‌ফ্‌ এবং এলহামও ওহীর (প্রত্যাদেশের) অনুসরণজাত প্রতিবিম্ব। অলিআল্লাহ্‌গণের কারামত, কাশ্‌ফ্‌ ও এলহাম আসলে রসুল পাক স. এর রেসালতেরই প্রমাণ ও প্রকাশ।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি প্রজ্ঞা-গৃহ এবং আলী তার তোরণ। আরো বলেছেন, আমি জ্ঞান-নগরী আর আলী সেই নগরীর সদর দরজা। জ্ঞানান্বেষীরা জ্ঞান-নগরে প্রবেশের লক্ষ্যে সদর দরজায়

উপস্থিত হয়। হাদিসটি ইবনে আদী তাঁর 'আল কামেল' গ্রন্থে এবং উকাইলি তাঁর 'জুয়াফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী ও হাকেম। হাদিসে বর্ণিত এলেম এবং হেকমত হচ্ছে আউলিয়া কেরামদের প্রজ্ঞা। ফেকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। কেননা হজরত আলী কেবল ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না, ছিলেন মারেফত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। ফেকাহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সকলেই।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'শাহিদ' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ এবং 'মিন ক্বলিহি কিতাবু মুসা' অর্থ তওরাত শরীফ। কারো কারো মতে 'বাইয়্যেনাত' অর্থ জ্ঞান প্রসূত দলিল এবং 'শাহিদ' অর্থ কোরআন মজীদ। হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, এখানে কোরআন হয়েছে 'বাইয়্যেনাত'। আর মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত বর্ণনারীতি হয়েছে 'শাহিদ'। এভাবে মর্ম দাঁড়িয়েছে— যাদের নিকট ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞানগত কোনো দলিল অথবা লিখিত কোনো প্রমাণ নেই তারা কিভাবে জ্ঞানগত দলিল প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিতদের সমকক্ষ হতে পারে? আর কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসুল মুসাও মৌখিক ও লিখিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রতি অবতারিত কিতাবেও এই কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— উলায়িকা ইউ'মিনুনা বিহী (তারাই এতে বিশ্বাসী)। একথার অর্থ, মুসলমানেরাই কোরআনুল করীমের উপর ইমান আনয়নকারী। এখনে 'উলায়িকা' (তারা) শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে 'মান কানা' এর প্রতি, যেহেতু মুসলমানেরাই 'স্পষ্ট নিদর্শনে' (বাইয়্যিনাতে) সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে 'উলায়িকা' দ্বারা 'শাহিদুন' এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— এরকমও বলা যেতে পারে। এ রকম হলে শাহিদুন এর মর্ম হবে হজরত আলী ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ামাঁই ইয়াকফুর বিহি মিনাল আহ্জাবি ফান্নারু মাওই'দুহ্ (অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান)। এখানে 'আল আহ্জাব' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার আওতায় আমার জীবন সেই পরম সত্তার শপথ, আমি যে হেদায়েত সহকারে প্রেরিত হয়েছি, সেই হেদায়েত গ্রহণ না করে কাফের, মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যদি কেউ মারা যায় তবে সে নরকবাসী হবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি এতে সন্দিগ্ধ হয়ো না। এটা তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুলের অনুগামীবৃন্দ! তোমরা কখনো দ্বিধা সন্দেহে পতিত হয়ো না। জেনে রাখো এই কোরআন সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুভবোধ ও বুদ্ধির অভাবে এই কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۭ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

❒ যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলিবে, 'ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।' সাবধান! আল্লাহের অভিশাপ জালিমদিগের উপর,

❒ যাহারা আল্লাহের পথে বাধা দেয় এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে; এবং ইহারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে অধিক জালেম আর কে?' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে শিরিক করে। নবী-রসুলগণের কাউকে বলে আল্লাহ্‌র পুত্র, আবার ফেরেশতাদেরকে বলে আল্লাহর কন্যা। তিনি যা অবতীর্ণ করেননি তাকে তারা বলে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আবার আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, তাকে তারা করে অস্বীকার। নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করে বলে, এই নির্ধারণ আল্লাহ্‌র। তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। সুতরাং তাদের চেয়ে জালেম আর কে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলবে, এরাই এদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিলো।' একথার অর্থ— হাশরের ময়দানে হিসাব গ্রহণের জন্য এই সকল মিথ্যা রচয়িতাকে আল্লাহ্‌পাকের সম্মুখে হাজির করা হবে এবং তখন সাক্ষীগণ এইমর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এই সকল লোকই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। এখানে 'সাক্ষীগণ বলবে' কথাটির অর্থ হবে আমল লেখক ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। মুজাহিদ থেকে এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন আবু শায়েখ। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ 'নবী-রসুলগণ'। জুহাকও এরকম বলেছেন। এক

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'অতঃপর সেটা কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক নবীর উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো, তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবো আপনাকে।' ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এমন কোনো দিবস অতিক্রান্ত হয় না, যে দিবসে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতকে রসুলপাক স. এর সম্মুখে হাজির করা হয়। তিনি তাদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অবলোকন করেন। আর এ সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করবেন হাশরের মাঠে।

কাতাদা বলেছেন,'আশহাদ' অর্থ সমগ্র সৃষ্টিজগত। এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফে একটি বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্ তাঁর এক বিশ্বাসী পাপী বান্দার উরুদেশে হাত রেখে চুপে চুপে বলবেন, তোমার অমুক পাপের কথা কি মনে আছে? সে বলবে,হ্যাঁ । এভাবে আল্লাহ্ তার সকল পাপের কথা একে একে উল্লেখ করবেন। আর ওই বান্দাও তার পাপের স্বীকৃতি দিতে থাকবে। ভাববে, ধ্বংস ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্ বলবেন, পৃথিবীতে আমি তোমার পাপগুলোকে ঢেকে রেখেছিলাম। আজ সেগুলোকে ক্ষমা করে দিলাম। একথা বলার পর তাকে দান করবেন পুণ্যের আমলনামা। তারপর সকল বিশ্বাসী ও কপটদের উদ্দেশ্যে বলবেন, এরাই ওই সকল লোক যারা তাদের প্রভুপালনকর্তার উপর অসত্যারোপ করেছিলো। সাবধান! জালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে অসত্যকথনের নামই জুলুম। আর যারা জালেম, জনান্তিকে তারা আল্লাহ্র আযাব দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই আয়াতে ওই সকল জালেমদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাই বলে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কিয়ামতের দিন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দান করবে। সেদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে 'সাক্ষীগণ বলবে।' আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'সেদিন আমি তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিবো। তখন আমার সঙ্গে কথা বলবে তাদের হাত ও পা।' আরো বলেছেন, 'তারা তাদের গাত্রচর্মের দিকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বলছো কেনো?' অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের রসনা, হাত ও চরণ।'

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, 'সেদিন আল্লাহ্ তাদের মুখের উপরে সীল মেরে দিবেন। অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবেন, এবার তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গে তখন স্থান ও সময়ও সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। এ সম্পর্কে সুরা জিলজালে বলা হয়েছে, 'সেদিন (স্থানও) তাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

ইমাম বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শ্রবণকারী মানুষ ও জ্বিন পুনরুত্থান দিবসে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

ইবনে খুজাইমা বলেছেন, মাটি, পাথর, মানব, দানব, যারা আজান শুনবে, তারা হবে হাশরের প্রান্তরে মোয়াজ্জিনের পক্ষের সাক্ষী। হজরত আবু হোরায়রার মারফু হাদিস উল্লেখ করে ইবনে খুজাইমা ও আবু দাউদ উল্লেখ করে বলেছেন, আজানের ধ্বনির বিস্তার যতবেশী হবে, ততই প্রশস্ত হবে মোয়াজ্জিনের মাগফিরাত। জড় ও অজড় সকলেই তার জন্য সাক্ষ্য দান করবে।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, যে স্থানে সেজদা করা হবে, সেই স্থানের মাটি, বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ড সেজদাকারীর জন্য সাক্ষ্য দিবে হাশরের ময়দানে। আতা খোরাসানীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে আবু নাঈম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নতুন দিবস বলে, হে আদম সন্তানেরা! আমি তো এসেছি। আজ তোমাদের দ্বারা সম্পাদ্য সকল কাজের আমি সাক্ষী। তোমরা যা করবে আগামীতে আমি তার সাক্ষ্য প্রদান করবো। সুতরাং সাবধান! উত্তম কর্ম করতে সচেষ্ট হও। চলে গেলে আমি আর কখনো ফিরে আসবো না। নতুন নিশীথও বলে এরকম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পার্থিব বৈভব দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তরঞ্জক। যথাব্যবহার করা হলে এই বিত্ত-বৈভব হবে বিশ্বাসীদের উত্তম সঙ্গী। যুদ্ধবন্দী, এতিম, অভাবকবলিত ও ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যয়কৃত অর্থ হবে পক্ষের সাক্ষী। আর অন্যায়ভাবে সম্পদভক্ষণকারীরা ওই সকল লোকের মতো, যারা পানাহারের পরেও থাকে অপরিতৃপ্ত। তাদের সম্পদ হবে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ। আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, তাউস বলেছেন, হাশরের দিন সম্পদ ও সম্পদের মালিককে একত্র করা হবে। তখন দু'জনের মধ্যে শুরু হবে তুমুল বাক-বিতণ্ডা।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় এবং তাতে দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে, এবং তারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।' একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণের পথের প্রতিবন্ধক এবং এই ধর্মের মধ্যে দোষত্রুটি তালাশ করে অথবা বিশ্বাসীদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে চায়, তারাই আখেরাতকে অস্বীকারকারী। 'ওয়াহুম বিল আখিরাতিহুম কাফিরূন' অর্থ— এবং এরাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে। এখানে 'হুম' (তারা) ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই সকল অবিশ্বাসীর সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার তাদের বিশেষত্ব।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

❒ উহারা পৃথিবীতে আল্লাহের বিধান ব্যর্থ করিতে পারিত না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল না এবং উহারা দেখিতও না।

❒ উহারা নিজদিগেরই ক্ষতি করিল এবং যাহা ছিল উহাদিগের কল্পনা-প্রসূত তাহা উহাদিগের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

❒ নিশ্চয়ই উহারা হইবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

❒ যাহারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

❒ দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি-সম্পন্নের উপমা; তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— উলায়িকা লাম ইয়াকুনু মু'জিযীনা ফিল আরদ্ব (তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারতো না)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মু'জিযীন' অর্থ অগ্রগামী। কাতাদা বলেছেন, পলায়নকারী। মুকাতিল বলেছেন, বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়নপর। অর্থগুলো সৌসাদৃশ্যপূর্ণ। মূল কথা হচ্ছে— তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান ব্যর্থ করতে পারতো না। না পারতো অগ্রগামী হতে। না পারতো পালাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অপর কোনো অভিভাবক ছিলো না।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর কোনো অভিভাবক বা সুহৃদও নেই, যারা তাদের শাস্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারে। আল্লাহ্পাক

পরকালে তাদের জন্য শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। সে শাস্তি পৃথিবীর শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। তা ছাড়া পৃথিবীর শাস্তি এক সময় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পরকালের শাস্তি অনিঃশেষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে।' সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা রচনাকারী ও সত্য ধর্মের ত্রুটি অনু-সন্ধানকারী, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ। তারা নিজেরা ভ্রষ্ট। আবার অপরকেও ধর্মচ্যুত করতে সচেষ্ট। তাই তাদের শাস্তিকে করা হবে দ্বিগুণ।

শেষে বলা হয়েছে—'তাদের শুনবার সামর্থ্য ছিলো না এবং তারা দেখতোও না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যশ্রবণের ক্ষমতাই দান করেননি। তাই প্রকৃত সত্যবাণী শুনবার সামর্থ্য তাদের নেই। আর প্রকৃত দৃষ্টিপ্রাপ্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই আল্লাহ্র পবিত্র বাণী শ্রবণ করে এবং নিদর্শন সমূহ অবলোকন করেও তাদের কোনো ভাবান্তর ঘটে না।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো এবং যা ছিলো তাদের কল্পনাপ্রসূত তা তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।' এ কথার অর্থ, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এক আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজা করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করলো। জান্নাতের বদলে গ্রহণ করলো জাহান্নামকে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো, পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু পৃথিবী পরিত্যাগের পর তারা বুঝবে, এই অলীক কল্পনা তাদের নিকটে আজ মিথ্যায় পর্যবসিত হলো।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'লা জারামা আন্নাহুম ফিল আখিরাতি হুমুল আখসারুন' (নিশ্চয় তারা হবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত)। এখানে উল্লেখিত 'লা জারামা' কথাটির শব্দগত বিন্যাস ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে 'লা' অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। অর্থাৎ অংশীবাদীরা যেমন ধারণা করে, তেমন কিছুতেই হবে না। 'জারামা' অর্থ অর্জন করা। অংশীবাদীরা পরকালে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, তাদের ধারণার্জিত সবই নিষ্ফল। তাই তখন তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। অথবা 'জারামা' অর্থ অবধারিত বা অনিবার্য। তাই বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তারা হবে পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত'। অর্থাৎ পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'লা জারামা' হচ্ছে দু'টি শব্দসম্বলিত একটি পূর্ণ বাক্য এবং এর অর্থ হবে বাস্তব সত্য। অর্থাৎ পরলোকে মুশরিকদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারটি একটি বাস্তব সত্য। 'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'লা জারামা' অর্থ যার বিকল্প নেই। অর্থাৎ আখেরাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিকল্প কিছু নেই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ— দাঁড়াবে অন্যান্য অবিশ্বাসীদের তুলনায় মক্কাবাসী মুশরিকেরা অধিক অপরাধী। কারণ তারা নিজেরা বিভ্রান্ত। আবার অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট। সুতরাং আখেরাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিকল্পবিহীন অনিবার্য।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আখবাতু' অর্থ শঙ্কিত বা ভীত। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্‌মুখী ও অবনত। মুজাহিদ বলেছেন, প্রশান্ত। কামুস প্রণেতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে বিনয়াবনত।

শেষোক্ত আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'দল দু'টির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের উপমা; তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অন্ধ ও বধির। আর বিশ্বাসীরা চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই দল দু'টো কি একে অপরের তুল্য হতে পারে? মিথ্যা কি কখনো সত্যের সমতুল্য হয়? সুতরাং হে সত্যপ্রত্যাখ্যানপরায়ণ জনতা! এই পরিচ্ছন্ন উপমাটি থেকে এখনো তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?

দ্রষ্টব্যঃ 'মেছাল' শব্দটির অর্থ মর্যাদা, গুণাগুণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বিচার। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 'মেছাল' শব্দটি এসেছে অবস্থাভেদের তুল্যতা অর্থে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

❐ আমি তো নূহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'আমি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,

❐ 'যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তোমাদিগের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি আশংকা করি।'

❐ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যাহারা ছিল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি; আমরা তো দেখিতেছি অনুধাবন না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই যাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম, এবং আমরা আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! শুনুন, আমি নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার প্রত্যাদেশানুসারে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। আমি তোমাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো উপাসনা কোরো না। যদি করো, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এখানে 'মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য। আর 'আলীম' অর্থ মর্মন্তুদ বা যন্ত্রণাদায়ক।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা বললো, আমরা তোমাকে তো আমাদের মতই মানুষ দেখছি।' এ কথার অর্থ, হে নুহ্! তুমি তো আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। তুমি আবার নবী হবে কীরূপে? তোমাকে আমরা নবী বলে মান্যই বা করবো কেনো? উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের সম্প্রদায় মনে করতো বাদশাহ্ বা ফেরেশতা ছাড়া অন্য কেউ নবী হতে পারে না। 'মালাউ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যে ভর্তি করে। এখানে মর্ম হবে সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, জনতা যাদেরকে মান্য করে এবং যাদের উপস্থিতিতে জনসমাবেশের গুরুত্ব ও জৌলুস বৃদ্ধি পায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো দেখছি অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' এখানে উল্লেখিত 'আরাজিল' শব্দটি 'রজুলুন' এর বহুবচন। এর অর্থ অধম বা ইতর শ্রেণী। ইকরামা বলেছেন, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি । 'রাই' অর্থ চোখের দেখা বা অন্তরের দেখা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'রাই' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারণা। 'বাদি' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'বুদ্‌বুন্' থেকে। এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে মতামত প্রদান। 'বাদ্উন' থেকেও শব্দটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। 'বাদ্উন' অর্থ প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক মত। অর্থাৎ গোত্র প্রধানদের মতে দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ভাবনা চিন্তা না করেই হজরত নুহের অনুসারী হয়েছিলো। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী গোত্র প্রধানেরা বললো, হে নুহ্! আমরা তো দেখছি অবিবেচক ও বুদ্ধিহীন একদল নিম্ন শ্রেণীর লোক তোমার অনুসারী হয়েছে। বিত্তহীন ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ওই লোকেরা কোনো দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তাই তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে আমরা মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ○ وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর?

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদিগের নিকট ধন সম্পদ যাচ্ঞা করি না। আমার শ্রমফল আছে আল্লাহের নিকট এবং বিশ্বাসিগণকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

❒ 'হে আমার সম্প্রদায় ! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা অবধান করিবে না?

❒ আমি তোমাদিগকে বলি না, 'আমার নিকট আল্লাহের ধন-ভাণ্ডার আছে।' অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নহি, 'এবং আমি ইহাও বলি না যে আমি ফেরেশ্‌তা।

তোমাদিগের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনই মংগল দান করিবেন না; তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। এইরূপ বলিলে আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা জ্ঞানান্ধ। যদি চক্ষুষ্মান হতে, তবে দেখতে আমি আমার প্রভুপালনকর্তা প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রভুপালক আমাকে দান করেছেন তাঁর আপন অনুগ্রহ। এ কথা যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তবে কি করতে পারি আমি। হেদায়েতপ্রাপ্তি যদি তোমাদের কাম্য না হয়, তবে কিই বা করার আছে আমার। এ ব্যাপারে কি জোর জবরদস্তি করা যায়? তোমরা চাও না, অথচ হেদায়েত গ্রহণে তোমাদেরকে কি বাধ্য করা যায়? কাতাদা বলেছেন, বল প্রয়োগের মাধ্যমে হেদায়েত প্রদানের নিয়ম থাকলে নবী-রসুলগণ তাই করতেন। কিন্তু তাঁরা এরকম নির্দেশপ্রাপ্ত নন।

পরের আয়াতের (২৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ পুনরায় বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! শোনো, তোমাদেরকে সত্য ধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য যে পরিশ্রম আমি করছি, আমি তো তোমাদের নিকটে সেই পরিশ্রমের বিনিময়-প্রত্যাশী নই। এর জন্য কোনো ধন-সম্পদ আমি চাই না। আমার শ্রমফল রয়েছে আল্লাহ্র নিকট। প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন বলে আমার অনুসারীদেরকে তোমরা তাড়িয়ে দিতে বলো। এ কথাও বলো যে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে তোমরা আমার অনুগত হতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তারা যে বিশ্বাসী! তারা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন। পৃথিবীর জীবন শেষে তারা লাভ করবে আল্লাহ্তায়ালার সন্দর্শন। সুতরাং তাদেরকে আমি বিতাড়িত করতে পারি না। অজ্ঞ তোমরা। তাই বিশ্বাসীদের মর্যাদা বুঝতে পারো না। একথাও জানো না যে, আগামীতে তোমাদেরকেও জবাবদিহির জন্য আল্লাহ্পাকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে।

পরের আয়াতের (৩০) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ পুনরায় বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি আল্লাহ্পাকের এই প্রিয়জনদেরকে তাড়িয়ে দেই, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ কি আমার উপরে অপ্রসন্ন হবেন না? তাঁর অপ্রসন্নতাজনিত শাস্তি থেকে আমাকে তখন রক্ষা করবে কে? সুতরাং এখনো কি তোমরা বুঝতে পারছো না যে, বিশ্বাসীদের অমর্যাদা করা অত্যন্ত গর্হিত একটি অপরাধ?

শেষোক্ত আয়াতের (৩১) মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এমনও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। এরকম অযৌক্তিক ও অসমীচীন দাবী তুললে তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পেতে। বলতে পারতে আমার দাবী

অসত্য। তোমরা আমার অনুসারী বিশ্বাসীদেরকে হেয় মনে করো। কিন্তু আমি সেরকম মনে করি না। একথাও বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনোই মঙ্গল দান করবেন না। কারণ অদৃশ্যের (ভবিষ্যতের) জ্ঞান আমার নেই। তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থূল ও অসম্পূর্ণ। তাই তোমরা পার্থিব বিত্ত-বৈভবহীনদেরকে অন্ত্যজ বা ব্রাত্যজন মনে করছো। কিন্তু তোমরা জানো না, তাদের হৃদয়ে রয়েছে ইমান ও হেদায়েতের মতো অক্ষয় বৈভব, যার কারণে আখেরাতের অনন্ত জীবনে তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী মর্যাদা ও সৌভাগ্য। ওই অক্ষয় কল্যাণের তুলনায় তোমাদের জাগতিক বিত্ত-বৈভব ও প্রতিপত্তি কিছুই নয়। সুতরাং কীভাবে আমি বলবো যে, আল্লাহ্ তাদেরকে মঙ্গল দান করবেন না। এরকম বললে আমি হবো সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূত। কেবল আল্লাহ্ই জানেন তাদের অন্তর্গত বিশ্বাস কতখানি বিশুদ্ধ ও উন্নত।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

❐ তাহারা বলিল, 'হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছ— তুমি বিতণ্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায়; সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

❐ সে বলিল, 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

❐ 'আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— গোত্র প্রধানেরা বললো, হে নুহ্! তুমি অযথা আমাদের সঙ্গে ক্রমাগত বাক-বিতণ্ডা করে চলেছো। এরকম করে কোনো লাভ নেই। এভাবে তুমি আমাদেরকে কিছুতেই তোমার দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তুমি বলো, তোমাকে না মানলে আমাদের উপরে আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে। এভাবে আযাবের ভয় দেখিয়েও তুমি আমাদের ভীত করতে পারবে না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে বাদানুবাদ পরিহার করে এখনই আযাব

নিয়ে এসো। হজরত নুহ্ বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! তোমরা এই সহজ কথাটি কেনো বুঝতে পারছো না যে, আমি বার্তাবাহক মাত্র । যার বার্তা আমি তোমাদের নিকট প্রচার করে চলেছি, সেই ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্ই আযাব দেয়া না দেয়ার মালিক। বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। যদি সেই চিরস্বাধীন পবিত্রাতিপবিত্র আল্লাহ্ শাস্তি দিতে চান, তবে কিছুতেই তা রোধ করতে পারবে না। আরো শোনো হে অবিদৃশ্য জনগোষ্ঠী! যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, তবে আমি এভাবে ক্রমাগত উপদেশ দিতে থাকলেও তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ যেমন আমার প্রভুপ্রতিপালক, তেমনি তোমাদেরও প্রভুপালয়িতা। শেষ পর্যন্ত অন্যদের মতো তোমাদেরকেও তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনিই তখন প্রদান করবেন প্রত্যেকের কৃতকর্মের যথাপ্রতিফল।

শেষোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিও আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাসম্পৃক্ত একটি বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোনো কর্ম বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। এরকমও হতে পারে যে 'ইউগবিয়াকুম' শব্দটির অর্থ হবে এখানে, ধ্বংস করা। এরকম হলে বক্তব্যবিষয়টি দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার অবুঝ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার হিতোপদেশ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বেপরোয়া।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩৫

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ○

❐ তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? বল,'আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।'

'তারা কি বলে যে, সে এটা রচনা করেছে' অর্থ মক্কার মুশরিকেরা কি বলে যে, আমার রসুল মোহাম্মদ এই কোরআনের রচয়িতা? মুকাতিল ও হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত বাক্যটির অর্থ হবে— নুহের সম্প্রদায়ের লোকেরা কী মনে করে, আমার রসুল নুহ্ তার প্রতি প্রত্যাদেশগুলোর রচয়িতা?

এরপর বলা হয়েছে—'বলো, আমি যদি এটা রচনা করে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হবো। তোমরা যে অপরাধ করছো, তার জন্য আমি দায়ী নই।' এ কথার অর্থ (মোহাম্মদ অথবা নুহ্) আপনি বলুন, যদি আমি এই

গ্রন্থ (প্রত্যাদেশ) রচনা করে থাকি, তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হবো। আর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে তোমরা। কিছুতেই তোমাদের অপরাধের দায় আমার উপরে বর্তাবে না। তোমাদের অংশীবাদিতা ও সত্য-প্রত্যাখ্যান থেকে আমি মুক্ত ও পবিত্র।

জুহাকের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহ্ আ.কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্মম প্রহারে জর্জরিত করতো। প্রহৃত হয়ে তিনি কখনো কখনো মাটিতে ঢলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। লোকেরা খুশী হতো। মনে করতো, তিনি পরলোকগমন করেছেন। অচেতন নবীকে তারা বস্ত্রাচ্ছাদিত করে ফেলে রেখে আসতো তাঁরই গৃহে। কিন্তু দেখা যেতো দু'একদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আহত নবী পুনরায় শুরু করতেন সত্যধর্মের অন্তরঙ্গ প্রচার। এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক বৃদ্ধ তার ছেলের সঙ্গে পথ চলতে চলতে সাক্ষাত পেলো হজরত নুহের। বৃদ্ধটি বললো, বৎস, সাবধান! এই বুড়োর খপ্পরে পোড়ো না। সে কিন্তু পাগল। ছেলেটি বললো, লাঠিটা দিনতো। একথা বলেই পিতার লাঠিটি নিলো সে। উপর্যুপরি প্রহার করতে লাগলো বয়োবৃদ্ধ নবীকে। তখন আহত নবীকে লক্ষ্য করে প্রেরিত হলো প্রত্যাদেশ। সেই প্রত্যাদেশগুলোর কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতগুলোতে এভাবে—

সুরা হূদঃ আয়াত ৩৬

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

❒ নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! নুহের বৃত্তান্ত কিছু শুনুন। তিনি সুদীর্ঘ দিবস ধরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু অল্প কিছুসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যান্যরা সত্য-প্রত্যাখ্যানকেই আঁকড়ে ধরে রইলো। দিনের পর দিন ক্রমাগত উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে লাগলো তাঁর উপর। আমি তখন প্রত্যাদেশ করলাম— হে আমার প্রিয় নবী নুহ্! এবার আপনি ক্ষান্ত হোন। যে কয়জন এ পর্যন্ত আপনার উপর ইমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ইমান আনবে না। সুতরাং অবাধ্যদের জন্য আপনি আর আক্ষেপ করবেন না। ব্যথিত হবেন না।

উবাইদ বিন উমাইর লায়সী সূত্রে মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, স্বসম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত নুহের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। কখনো করতো প্রহার। আবার কখনো গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো মাটিতে। তারপর

গলাটিপে ধরতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। জ্ঞান ফিরে পেলে প্রার্থনা জানাতেন, হে করুণাময়! হে আমার দয়ার্দ্র প্রভুপ্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোধ-বুদ্ধিহীন। তুমি তাদেরকে মার্জনা করো। কিন্তু এতে করেও বোধোদয় ঘটলো না অবাধ্যদের। বেড়েই চললো অত্যাচার। অত্যাচারের পর অত্যাচার। নবী নুহ্ নিরাশ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো ফিরে আসবে সত্য ধর্মের আশ্রয়ে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা হয়ে পড়লো আরো অধিক উন্নাসিক। বলতে শুরু করলো, এই লোকটি কয়েকজন ইতর শ্রেণীর লোককে নিয়ে আমাদের পিতা, পিতামহের যুগ থেকে আমাদেরকে উত্যক্ত করে চলেছে। এরা বদ্ধ উন্মাদ না হলে একই কথা বার বার বলতে থাকবে কেনো। মনোবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন হজরত নুহ্। প্রার্থনা জানালেন— রব্বি দাআইতু ক্বওমি লাইলাঁও ওয়া নাহারা রব্বি লা তাজার্ আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা (হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে অবশ্যই আহ্বান জানিয়েছি নিশিদিন হে আমার প্রতিপালক! ধরাপৃষ্ঠের কোনো কাফেরকুলকে বাদ দিয়ো না)।

এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্মের আয়াত—

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ○ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

❒ 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।'

❒ সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস করিত; সে বলিত, 'তোমরা যদি আমাদিগকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ;

❒ 'এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি ও স্থায়ী শাস্তি কাহার জন্য অবশ্যম্ভাবী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করো এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না।' এখানে 'আমার প্রত্যাদেশ'(ওহী) অনুযায়ী কথাটির অর্থ হবে আমার নির্দেশ অনুযায়ী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এখানে 'আইনুন' শব্দটির অর্থ হবে, দৃষ্টি (দৃষ্টির সম্মুখে)। মুকাতিল বলেছেন, জ্ঞান (জ্ঞানের আওতায়)। কেউ কেউ বলেছেন, পৃষ্ঠপোষকতায় বা তত্ত্বাবধানে চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানই অধিকতর কার্যকর। তাই এখানে অর্থ করা হয়েছে— আমার তত্ত্বাবধানে (আমার চোখের সামনে)। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয় নবী নুহ্! আপনি আমার সুদৃষ্টিসম্ভূত তত্ত্বাবধান ও আমার প্রত্যাদেশিত নির্দেশানুসারে একটি নৌকা নির্মাণ করুন এবং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সম্পর্কে আমার নিকটে কোনো সুপারিশ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা তো নিমজ্জিত হবে।' একথার অর্থ, হে আমার নবী! এটা সুনিশ্চিত যে, আপনার সম্প্রদায়ের সীমালংঘনকারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এটাই তাদের ললাটলিপি। হজরত নুহের কাহিনী লিপিবদ্ধকালে বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত জিবরাইল হজরত নুহ্‌কে বললেন, হে ভ্রাতঃ নুহ্! আপনার পালনকর্তা আপনাকে একটি নৌকা নির্মাণ করতে বলেছেন। হজরত নুহ্ বললেন, আমি তো নৌকা নির্মাণের কলাকৌশল জানি না। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি তো আপনার প্রভুপালকের সুদৃষ্টিজাত তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কার্য শুরু করবেন। তাই একাজে সফলও হবেন। আর আমিও একর্মে আপনার সহযোগী । হজরত নুহ্ নৌকা নির্মাণ শুরু করলেন। ধীরে ধীরে নির্মিত হলো একটি সুদৃশ্য তরণী। তরণীটির আকৃতি দাঁড়ালো পক্ষীর বক্ষদেশ সদৃশ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৩৮ ও ৩৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে সাথে নিয়ে একটি বৃহদাকৃতির নৌকা নির্মাণ করতে শুরু করলেন। লোকেরা দেখলো নৌকা নির্মাণ ছাড়া আর কোনো দিকেই তাঁর দৃকপাতমাত্র নেই। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত নুহের সম্প্রদায়ের রমণীকুল হয়ে পড়লো বন্ধ্যা। রুদ্ধ হয়ে গেলো তাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা।

নৌকা নির্মাণে ব্যস্ত নবীর পাশ দিয়ে গমনাগমন কালে তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা বিভিন্নভাবে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করলো। কোথাও পানির কোনো চিহ্ন নেই। শুকনো মাটিতে চলেছে নৌকা তৈরীর মহা আয়োজন। এ দৃশ্য দেখে তারা কৌতুক বোধ করলো। ঠাট্টা করে বললো, হে নুহ্! তুমি তো আগে ছিলে নবী। এখন হয়েছো পরহিতৈষী। এক বর্ণনায় এসেছে, তারা জিজ্ঞেস করতো, কী করছো নুহ্? তিনি জবাব দিতেন, একটি গৃহ নির্মাণ করছি, যা হবে সলিলে সঞ্চারমান। একথা শুনে হেসে উঠতো তারা।

সম্প্রদায় প্রধানদের বিদ্রূপের জবাবে হজরত নূহ্ বলতেন, তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো। কিন্তু শুনে নাও, একদিন আমরাও তোমাদেরকে এভাবে উপহাস করবো। অর্থাৎ এখন যেভাবে তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছো, আগামীতে তেমনি তোমাদেরকে উপহাস করবো তোমাদের সলিল সমাধির সময় এবং তোমাদের নরকবাসের সময়। যেমন তোমরা আমাদেরকে নির্বোধ ভাবছো, তেমনি তখন তোমাদেরকেও নির্বোধ ভাববো আমরা। এই বিদ্রূপের মাশুল তোমাদেরকে দিতেই হবে। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর স্থায়ী শাস্তি হবে অনিবার্য।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা মনে করে, হজরত নূহের উপর আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ছিলো এ রকম— নৌকা বানাতে হবে গোফর অথবা শাল কাঠ দিয়ে। অগ্রভাগ ঝুঁকে থাকবে সামনের দিকে। তেলের সঙ্গে ধুপ মিশিয়ে পালিশ করতে হবে ভিতর ও বাহির। নৌকার দৈর্ঘ্য হতে হবে আশি হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং গভীরতা ত্রিশ হাত। আর নৌকাটি হতে হবে ত্রিতলবিশিষ্ট। আল্লাহ্পাকের এই পরিকল্পনা অনুসারে হজরত নূহ্ তাঁর নৌকা নির্মাণ করেছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইসহাক বিন বাশার এবং ইবনে আসাকের উল্লেখ করেছেন, কিশ্‌তি নির্মাণের নির্দেশ পেয়ে হজরত নূহ্ নিবেদন করলেন, তক্তা কোথায় পাবো? আল্লাহ্পাক জানালেন, গোফর অথবা শাল গাছ বপন করুন। তিনি তাই করলেন। গাছ বেড়ে উঠার জন্য অপেক্ষা করলেন বিশটি বছর। ওই বিশ বছর তিনি আর ধর্ম প্রচারের কাজ করেননি। বিরুদ্ধবাদীরাও আর অত্যাচার করেনি। শাল বৃক্ষগুলো যখন পরিণত হলো, তখন তিনি সেগুলোকে কেটে ফেঁড়ে তক্তা বানালেন। শুকিয়ে নিলেন ভালো করে। তারপর নিবেদন করলেন, হে আমার মহাপ্রজ্ঞাধর প্রভুপ্রতিপালক! কী ধরনের গৃহ তৈরী করবো ? আল্লাহ্পাক জানালেন, ত্রিতলবিশিষ্ট। সম্মুখভাগ হবে মোরগের মাথার মতো। পশ্চাৎভাগ হবে মোরগের পুচ্ছের মতো। আর মধ্য ভাগ হবে পাখির বুকের মতো সামনের দিকে প্রসারিত। দু'পাশে থাকবে দরজা। দরজা দু'টোর চারপাশ বেঁধে দিতে হবে লোহা দিয়ে। এরপর আল্লাহ্ হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন কিশ্‌তি নির্মাণের সকল কলাকৌশল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও হজরত কা'ব থেকে হজরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেইবের মাধ্যমে ইবনে আসাকেরও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নির্মিত হয়েছিলো হজরত নূহের নৌকা। সে নৌকার দৈর্ঘ্য ছিলো তিনশত হাত, প্রস্থ পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ত্রিশ হাত। কাঠের তক্তা দ্বারা নির্মিত ওই নৌকাটির ছিলো তিনটি তলা। নিচের তলায় ছিলো বন্য প্রাণী ও হিংস্র জানোয়ার। মধ্যম তলায় ছিলো উট, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। আর উপরের তলায় পানাহারের সামগ্রী ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন হজরত নূহ্ ও তাঁর সঙ্গীগণ।

হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, নৌকাটি লম্বায় ছিলো তিনশ' হাত, পাশে পঞ্চাশ হাত আর উচ্চতায় ত্রিশ হাত।

ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিতে নৌকাটির প্রস্থের পরিমাপ উল্লেখিত হয়নি। কাতাদা সূত্রে আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, তিনশ' হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া এবং ত্রিশ হাত উঁচু ছিলো নৌকাটি। প্রস্থের দিকে ছিলো একটি দরজা।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ত্রিতলবিশিষ্ট ওই তরণীর এক তলায় ছিলো চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র জানোয়ার। এক তলায় ছিলো পক্ষীকুল। খুলাসাতুস্ সিরীন গ্রন্থে রয়েছে, নিচের তলায় ছিলো পাখি, গৃহ পালিত পশু ও বন্য জন্তু। দ্বিতীয় তলায় ছিলো পানাহারের সামগ্রী ও পরিধেয় বসন। তৃতীয় তলা নির্ধারিত ছিলো মানুষের জন্য।

আল্লামা শামী লিখেছেন, হজরত নুহের নৌকা ছিলো আশি হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। আর হাত মানে হবে গজ। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হাত অর্থ হাতই, গজ নয়।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৪০

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

❒ অবশেষে আমার আদেশ আসিলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হইল। আমি বলিলাম, 'ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে।' তাহার সংগে বিশ্বাস করিয়াছিল অল্প কয়েক জন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা জ্বাআ আমরুনা ওয়া ফারাত্ তান্নূর' (অবশেষে আমার আদেশ এলে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হলো)। আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা ও জুহুরী বলেছেন, 'তান্নূর' অর্থ ভূপৃষ্ঠ। বাগবীও এরকম বলেছেন। সাঈদ বিন মনসুর, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ উক্তিটি সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— অবশেষে একদিন আমার আদেশে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হলো।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তান্নূর' অর্থ হবে ভূপৃষ্ঠের উচ্চ স্থান। ইবনে আবী হাতেম বক্তব্যটির সম্পর্ক ঘটিয়েছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এবং 'তান্নূর' থেকে মর্ম গ্রহণ করেছেন— আইনুল ওয়ারদা। আইনুল ওয়ারদা সিরিয়ার একটি ঝর্ণার নাম।

এক বর্ণনানুসারে হজরত আলীর অভিমত হচ্ছে 'ফারাত্ তান্নূর' অর্থ— ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হলো, সকাল হলো। হাসান বসরী, মুজাহিদ ও শা'বীর মতে রুটি প্রস্তুত করার তন্দুরকে বলে তান্নূর। অধিকাংশ তাফসীরকার এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন। আতিয়ার বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমতও এরকম। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য বাক্যের অর্থ করেছেন এরকম— যখন উনুন থেকে পানি উৎসারিত হলো। হাসান বর্ণনা করেছেন, প্রথম জননী হজরত হাওয়ার একটি প্রস্তর নির্মিত উনুন ছিলো। ওই উনুনটি বংশানুক্রমে পেয়েছিলেন হজরত নুহ্। তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিলো— ওই উনুন থেকে জলোৎসারণ দেখতে পেলে নৌকায় আরোহণ কোরো।

কথিত তন্দুরের চুলাটি কোথায় ছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে। মুজাহিদ ও শা'বী বলেছেন, উনুনটি ছিলো কুফা নগরীর প্রান্তদেশে। শা'বী শপথ করে বলেছেন, কুফানগরীর এক পাশে অবস্থিত ওই চুলা থেকেই উদগত হয়েছিলো পানির প্রস্রবণ। এখন কুফা মসজিদ যেখানে, সেখানেই হজরত নুহ্ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর তরণী। চুলাটি ছিলো বাবে কুন্দার প্রবেশ পথের দক্ষিণ প্রান্তে। ওই চুলা থেকে পানি উদগিরিত হওয়াই ছিলো প্লাবন শুরুর আলামত।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, কুফা মসজিদের বাবে কুন্দার পাশ থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো জলস্রোত। শা'বীর মধ্যস্থতায় আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী শপথ করে বলেছেন, মসজিদটি মুসলমানদের প্রধান চারটি মসজিদের একটি। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে দশ রাকাত নামাজ পড়ার চেয়ে ওই মসজিদে এক রাকাত নামাজ পড়াকে আমি প্রিয় বিবেচনা করি। ওই মসজিদের ডান পাশে কেবলার দিকে ছিলো তন্দুরের চুলাটি।

মুকাতিল বলেছেন, চুল্লিটি ছিলো প্রথম পিতা হজরত আদমের । সিরিয়ার আইনুল ওয়ারদাতে রক্ষিত ছিলো চুল্লিটি। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চুল্লিটি ছিলো হিন্দে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল যে, এই হিন্দ কি হিন্দুস্থান, না ইরাকের হিন্দ নামক স্থান। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণিত উক্তিটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, উক্তিটি বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি বললাম, এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া।' এখানে 'জাওজাইন' অর্থ এক এক জোড়া। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত নুহ্ নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি জীবকুলের জোড়া বুঝবো কী রূপে? আল্লাহ্‌পাক সকল প্রাণীকে একত্র করলেন। হস্ত প্রসারিত করলেন হজরত নুহ্।

তাঁর ডান হাতে এলো পুরুষ জাতীয় প্রাণী, আর নারী জাতীয় প্রাণী এলো বাম হাতে। এভাবে জোড়া নির্ধারণ করে তিনি সেগুলোকে নৌকায় উঠালেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে।' একথার অর্থ— হে আমার নবী নুহ্! জীবের এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিবার পরিজনকে এবং তোমার অনুগামী বিশ্বাসীদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নাও। কিন্তু তোমার পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে উঠিয়ো না। কারণ প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়াই তাদের অদৃষ্টলিপি। উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের স্ত্রী ওয়াহিলা এবং তার উদরজাত পুত্র কিনান ছিলো কাফের। এখানে 'যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে' কথাটি বলা হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে।

শেষে বলা হয়েছে—'তার সঙ্গে বিশ্বাস করেছিলো অল্প কয়েকজন।' এ কথায় বুঝা যায় হজরত নুহের সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলো কাফের। ইমানদার ছিলেন অল্প কয়েকজন।

হজরত নুহের সহআরোহী ক'জন ছিলেন সে সম্পর্কে মতপৃথকতা পরিদৃষ্ট হয়। কাতাদা, ইবনে জুরাইজ ও মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর মতানুসারে তাঁর সহআরোহী ছিলেন আটজন। হজরত নুহ্ নিজে, তাঁর এক স্ত্রী, তিন পুত্র শাম, হাম ও ইয়াফিস ও তাঁদের তিন বধু।

ইবনে জারীর ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হজরত নুহের সঙ্গে নৌকায় উঠেছিলেন তাঁর তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধু। পুত্রগণের নাম ছিলো শাম, হাম ও ইয়াফিস। ভাসমান ওই নৌকায় আপন স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়েছিলেন হাম। একারণে হজরত নুহ্ অতুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর প্রতি। ফলে, হামের স্ত্রী প্রসব করেছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি সন্তান। আ'মাশ বলেছেন, সর্বমোট নৌকা আরোহী ছিলেন সাতজন— হজরত নুহ্, তাঁর তিনপুত্র ও তাঁদের তিন পত্নী।

বর্ণিত উক্তিগুলো কোরআনের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ এখানে পরিবার পরিজন ছাড়াও বলা হয়েছে 'এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে।' এক

বর্ণনানুসারে কাতাদা বলেছেন, নৌকার পুরুষ আরোহী ছিলেন দশজন— হজরত নুহ্, তাঁর তিন তনয় এবং হজরত নুহের পরিবার বহির্ভূত ছয়জন। এই দশজনের স্ত্রীরাও ছিলেন ওই নৌকায়। মুকাতিল বলেছেন, হজরত নুহের নৌকায় সর্বমোট আটাত্তরজন আরোহণ করেছিলেন। ওই আটাত্তরজনের অর্ধেক ছিলেন পুরুষ এবং অর্ধেক ছিলেন নারী।

হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত নুহের সহআরোহীগণের সংখ্যা ছিলো সর্বসাকুল্যে আশিজন। তার মধ্যে একজন ছিলেন জুরহাস গোত্রভূত। ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত নুহের সঙ্গে আশিজন আরোহণ করেছিলেন নৌকাটিতে। আর হজরত নুহ্ ছিলেন আরবী ভাষী। হজরত ইবনে আব্বাস একথাও বলেছেন যে, হজরত নুহ্ তাঁর নৌকায় সর্বপ্রথম উঠিয়েছিলেন একটি পিপীলিকা। আর সবশেষে উঠিয়েছিলেন একটি গাধা। নৌকার দরজা দিয়ে প্রবেশকালে ইবলিশ গাধাটির লেজ ধরে আটকিয়ে দিলো। গাধাটি আর অগ্রসর হতে পারলো না। হজরত নুহ্ বললেন, আরে গাধা! ভিতরে প্রবেশ করছোনা কেনো? গাধাটি অগ্রসর হতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। হজরত নুহ্ বললেন, ভিতরে ঢোকো, যদিও তোমার সাথে শয়তান থাকে। অতর্কিতে একথা উচ্চারণ করলেন হজরত নুহ্। শয়তান সুযোগ পেলো। সে গাধার লেজ ছেড়ে দিলো। গাধাটি ভিতরে ঢুকলো। সেও ঢুকলো তার সঙ্গে সঙ্গে। হজরত নুহ্ তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, রে আল্লাহ্র দুশমন! তুই কিভাবে নৌকায় ঢুকলি? সে বললো, আপনি তো গাধাকে এরকম বললেন। হজরত নুহ্ বললেন, এক্ষুণি বের হয়ে যা। সে বললো, আপনার অনুমতি পেয়েছি। সুতরাং আপনি আর আমাকে বের করে দিতে পারবেন না। কেউ কেউ মনে করেন, হজরত নুহের নৌকায় শয়তানও আরোহণ করেছিলো। কিছুসংখ্যক বর্ণনাকারীর অভিমত এরকম— সর্প ও বৃশ্চিক তখন উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিন। হজরত নুহ্ বললেন, না। তোমরা মানুষকে কষ্ট দাও। সর্প ও বৃশ্চিক বললো, যদি কেউ আপনার নাম উচ্চারণ করে, তবে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। অদ্যাবধি এই বিশ্বাসটি প্রচলিত যে, কেউ 'সালামুন আ'লা নুহিন্ ফিল আ'লামীন' পাঠ করলে সাপ ও বিচ্ছু তাকে কামড়ায় না।

হাসান বলেছেন, হজরত নুহ্ তাঁর নৌকায় যে সকল প্রাণীকে উঠিয়েছিলেন, তারাই পরবর্তীতে শাবক অথবা ডিম্বের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। আর যে সকল প্রাণী নর্দমাজাত অথবা পচনক্রিয়ার মাধ্যমে জন্ম নেয়, তিনি সেগুলোকে তাঁর নৌকায় ওঠাননি।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○ قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○

❒ সে বলিল,'ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহের নামে ইহার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

❒ পর্বতপ্রমাণ তরংগ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া চলিল; নূহ তাহার পুত্র, যে উহাদিগের হইতে পৃথক ছিল তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদিগের সংগে আরোহণ কর এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের সংগী হইও না।'

❒ সে বলিল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে।' সে বলিল,'আজ আল্লাহের বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, রক্ষা পাইবে সে যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন।' ইহার পর তরংগ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, এতে আরোহণ করো, আল্লাহ্র নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হজরত নূহ্ তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন, নৌকায় উঠতে উঠতে এই দোয়া পড়তে থাকো— বিস্মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বি লা গফুরুর রহীম (আল্লাহ্র নামের বরকতে এই জলযানের গতি ও স্থিতি, আমার প্রভুপালক অবশ্যই ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র)। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, জুহাক বলেছেন, হজরত নূহ্ তাঁর নৌকা চালাতে চাইলে বলতেন, বিসমিল্লাহ্ (আল্লাহ্র নামে)। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে শুরু করতো। থামাতে চাইলেও বলতেন, বিস্মিল্লাহ্। অমনি থেমে যেতো ।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে সেটি তাদেরকে নিয়ে বয়ে চললো।' এখানে 'মউজ' অর্থ তরঙ্গ। শব্দটি 'মউজাতুন' এর বহুবচন।

এরপর বলা হয়েছে— 'নুহ্ তার পুত্র, যে তাদের থেকে পৃথক ছিলো তাকে আহ্বান করে বললো, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গী হয়ো না।' হজরত নুহের এক পুত্র ছিলো কাফের। তার নাম ছিলো কিনান অথবা উবাইদ বিন উমাইর ইয়াম। আলোচ্য বাক্যে তার কথাই বলা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিবো যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে।' এ কথার অর্থ— কিনান বললো, প্লাবনের ভয় আমার নেই। যত প্লাবনই হোক সুউচ্চ পর্বত তো আর ডুববে না । আমি তেমনি একটি প্লাবন মুক্ত পাহাড়ে উঠে আত্মরক্ষা করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আজ আল্লাহ্র বিধান থেকে রক্ষা করবার কেউ নেই, রক্ষা পাবে সে যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন।' এ কথার অর্থ — হজরত নুহ্ বললেন, এ প্লাবন তো সেই প্লাবন নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র গজব। আজ এই বিধান জারী করা হয়েছে যে, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে আজ এই মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে মারা হবে । আজ আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন, সেই কেবল রক্ষা পাবে। সুতরাং হে আমার পুত্র! বাঁচতে যদি চাও, তবে আল্লাহ্র বিশেষ দয়ার প্রতীক এই নৌকায় আরোহণ করো। পাহাড়-পর্বত কোনো কিছুই আজ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।' একথার অর্থ— কথোপকথনের সময় পিতা ও পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো একটি বিশাল তরঙ্গ। ওই তরঙ্গ মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কিনান। হয়ে গেলো অন্যান্য নিমজ্জিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ডুবন্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো সেও ডুবে গেলো অথৈ পানির তলায়। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই মহাপ্লাবনের পানির উচ্চতা ছিলো সর্বোচ্চ পাহাড়ের চেয়েও দশ অথবা পনের হাত বেশী।

বাগবী লিখেছেন, বানের পানি বাড়তে থাকলে এক মাতা তার শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। সে শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আরোহণ করলো এক পাহাড়ে। কিন্তু পাহাড়ও ডুবতে শুরু করলো। মহিলাটি উঠে গেলো সর্বোচ্চ শিখরে। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ভয়াবহ বন্যা ডুবিয়ে দিলো শিখরটিকে। গলা পর্যন্ত ডুবে গেলো সে। দু'হাতে শিশুটিকে তুলে ধরলো উচ্চে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো

না। ভয়ংকর তরঙ্গমালা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তাকে। আল্লাহ্পাক তখন ছিলেন রোষতপ্ত। তাঁর করুণার বিন্দুবৎ প্রকাশও যদি তখন থাকতো তবে তিনি নিশ্চয় ওই শিশু ও তার মাতাকে রক্ষা করতেন।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মহাপ্লাবনের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই হজরত নুহের সম্প্রদায়ের রমণীরা বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায় প্লাবনের প্রাক্কালে কারো কোনো শিশু পুত্র ছিলো না। সুতরাং মা ও শিশুর নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাটি অসংগত বলে মেনে নিতে হয়।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৪৪

وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

❒ ইহার পর বলা হইল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল 'ধ্বংসই সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপ্লাবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ঘোষিত হলো, হে পৃথিবী! তোমার অভ্যন্তর থেকে যে পানি তুমি উদ্গীরণ করেছিলে তা শোষণ করে নাও। পৃথিবী নির্দেশ পালন করলো। রয়ে গেলো বৃষ্টির পানি। পুনরায় ঘোষিত হলো, হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। বন্ধ হয়ে গেলো বৃষ্টি। বানের পানি কমতে শুরু করলো। এভাবে প্রশমিত হলো আল্লাহ্র গজব। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্টি হলো অনেক স্রোতবতী নদী। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো কাফেরকুল। হজরত নুহের নৌকা ঠেকলো মোসেল শহরের সন্নিকটে অথবা সিরিয়ার জুদী পাহাড়ে। পুনঃঘোষিত হলো, আল্লাহ্র কৃপাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ধ্বংস হওয়াই সীমালজ্ঘনকারীদের পরিণাম।

বাগবী বলেছেন, কোথাও মৃত্তিকা জেগে উঠলো কি না, তা জানবার জন্য হজরত নুহ্ তাঁর নৌকা থেকে ছেড়ে দিলেন একটি কাক। কাকটি দেখলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সীমালজ্ঘনকারীদের গলিত মথিত মরদেহ। মৃতভক্ষণে মগ্ন হয়ে গেলো সে। নৌকায় ফিরে যাবার কথা ভুলে গেলো। হজরত নুহ্ এবার পাঠালেন একটি কবুতরকে। কিছুকাল পর ফিরে এলো কবুতরটি। হজরত নুহ্ দেখলেন, কবুতরটির পায়ে লেগে রয়েছে জয়তুনের ঝরা পাতা ও

কর্দম। হজরত নুহ্ বুঝলেন, বন্যার পানি আর নেই। শীঘ্রই অবতরণ করা যাবে। তিনি অবাধ্য কাকটির প্রতি অতুষ্ট হলেন। আর প্রসন্ন হলেন কবুতরটির প্রতি। কাককে বললেন, জনবসতিতে তোমার উপস্থিতি হবে তোমার জন্য ভীতিকর। তখন থেকে কাক মনুষ্য সমাজে বসবাস করতে পারে না। কিন্তু হজরত নুহের আশীর্বাদে কবুতর বাস করে মানুষের গৃহসীমানায়।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাতাদা আমাদেরকে বলেছেন, হজরত নুহ্ ও তাঁর সাথীদেরকে বহনকারী নৌকাটি প্রলয়ংকরী বন্যায় ভাসতে শুরু করেছিলো দশই রজবে। দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ দিন ধরে পানিতে ভেসে ভেসে চলার পর দশই মহররমে সেটি ঠেকে গিয়েছিলো জুদী পাহাড়ের গায়ে। যাত্রীরা সেখানেই নেমেছিলেন। খালেদ ইবনে যাইয়াত সূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে এই কথাটুকু— মাটিতে অবতরণের প্রাক্কালে হজরত নুহ্ তাঁর সহচরগণকে বলেছিলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আজ সকলে রোজা রাখো।

বাগবী লিখেছেন, দশই রজব নৌকাটি ভেসেছিলো। ভাসতে ভাসতে যখন কাবা শরীফের স্থানে পৌঁছলো তখন অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো সাতটি আওয়াজ। বন্যাগ্রস্ত হওয়ার আগেই কাবাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ্পাক। বানের পানি কমেছিলো দীর্ঘ ছয় মাস পর। মহাপ্লাবনের নবী তাঁর অনুচরবৃন্দসহ ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন দশই মহররম তারিখে। সেদিন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি রোজা রেখেছিলেন। অনুচরবৃন্দকেও রোজা রাখতে বলেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, কাফেরদের মধ্যে রক্ষা পেয়েছিলো কেবল উজ বিন উনুক। অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ উজের কটিদেশ পর্যন্ত ডুবেছিলো বানের পানিতে। হজরত নুহের নৌকা নির্মাণের জন্য সে বহন করে আনতো শাল কাঠের ভারী স্তূপ। কিছু কাঠ নাকি সে সিরিয়া থেকেও বয়ে নিয়ে এসেছিলো। সে কারণেই রক্ষা পেয়েছিলো সে।

আমি বলি, উজের বিবরণটি কোরআন মজীদের বর্ণনার বিরুদ্ধে। কোরআনে বলা হয়েছে 'নুহ্ বললো, হে আমার প্রভুপালক! ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কাফেরকে অব্যাহতি দিবেন না।' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সীমালংঘনকারীরা আল্লাহ্র রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।' আর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'সেদিন আল্লাহ্র আক্রোশ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি।' এরকম সুস্পষ্ট প্রমাণের পর উজের কল্পকাহিনীটিকে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবতঃ কিংবদন্তিটি পথভ্রষ্ট ইহুদী খৃষ্টানদের নিজস্ব রচনা।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

❒ নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

❒ তিনি বলিলেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে-বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত না হও।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে-বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কিনানের নিমজ্জিত হওয়ার প্রাক্কালে হজরত নূহ্ নিবেদন জানালেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমিতো অঙ্গীকার করেছো, আমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করবে। অতএব আমার পুত্রকে বাঁচাও। এরকমও বলা যেতে পারে যে, প্লাবন প্রশমিত হওয়ার পর হজরত নূহ্ তাঁর কাফের পুত্রের সলিল সমাধি হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমিতো বলেছিলে আমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাবে। কিনানও তো আমার পরিবার পরিজনভূত। সুতরাং দয়া করে আমাকে এই রহস্যটি অবগত করাও যে, তাকে তুমি বাঁচালে না কেনো? প্রভুপালয়িতা আমার! নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমিতো শ্রেষ্ঠতম ন্যায় বিচারক। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্তদাতা। সুতরাং তোমার প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করো।

পরের আয়াতের (৪৬) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে আমার নবী! প্রকৃত তত্ত্ব শোনো। ইমানদারের সঙ্গে কাফেরের অক্ষয় ও কল্যাণকর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি ইমানদার। আর সে কাফের। সুতরাং কিনান তোমার পুত্র হলেও তোমার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভূত নয়। সে অসৎ। আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিলো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি জলমগ্ন করে ধ্বংস করবো। বাঁচাবো কেবল তোমাকে, তোমার বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পরিবার পরিজন ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে। আমার এই সিদ্ধান্তই আমি কার্যকর করেছি। তুমি একথা বুঝতে পারোনি। তাই তাকে রক্ষার অনুরোধ করেছো। না জেনে এরকম অনুরোধ করা নির্বোধজনোচিত কর্ম। তুমি তো আমার নবী। আমার একান্ত প্রিয়ভাজন। সুতরাং এরকম অসমীচীন অনুরোধ জ্ঞাপন তোমার জন্য শোভনীয় নয়। আর কখনো এরকম কোরো না। এটাই আমার উপদেশ।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী ও মুজাহিদ বলেছেন, কিনান আসলে হজরত নুহের পুত্র ছিলো না। সে ছিলো ব্যভিচারজাত। ইমাম আবু জাফর বলেছেন, কিনান ছিলো তার মায়ের পূর্বতন স্বামীর সন্তান। এ কারণেই হজরত নুহ্ তাঁর আবেদনে বলেছিলেন 'মিন আহলী' (স্ত্রীর গর্ভজাত হিসেবে আমার পরিবারভূত)। 'মিন্নী' (আমার ঔরসজাত পুত্র) —এরকম বলেননি।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জুহাক প্রমুখ বিজ্ঞজনের অভিমত হচ্ছে, কিনান হজরত নুহের ঔরসজাত সন্তানই ছিলো। তাকে ব্যভিচারজাত বললে একজন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলতে হয়। কিন্তু এরকম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এখানে 'হে নুহ্! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়'— কথাটির অর্থ হবে, সে তোমার ধর্মমতানুসারী নয়। সে কাফের। আর কাফের কখনো ইমানদার পরিবারের প্রকৃত সদস্য নয়। আর 'তুমি যেনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' কথাটির অর্থ হবে এখানে এরকম— হে আমার নবী! শতাব্দীর পর শতাব্দী উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তুমি নিজেই তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের আবেদন জানিয়েছিলে। আবার নিজেই তাদের একজনের জীবন রক্ষার আবেদন জানাচ্ছো। এটা অজ্ঞজনোচিত কর্ম নয় কি?

শায়েখ আবু মনসুর বলেছেন, কিনান ছিলো মুনাফিক। অর্থাৎ প্রকাশ্যতঃ সে ছিলো বিশ্বাসী। কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাসী। হজরত নুহ্ তার প্রকাশ্য অবস্থা দেখেই বলেছিলেন 'আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত।' কিনানের অন্তর্গত অবস্থা তিনি জানতেন না। তার জীবন রক্ষার আকাংখাও করতেন না। কারণ ইতোপূর্বে তাঁকে জানানো হয়েছিলো, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সুপারিশ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, শায়েখ আবু মনসুরের এই অভিমতটি যথার্থ নয়। কারণ হজরত নুহ্ কিনানকে বলেছিলেন, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো। সত্যপ্রত্যাখ্যান-

কারীদের সঙ্গে থেকো না' (আয়াত ৪২)। আবার কিনান বলেছিলো, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিবো, যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে' (আয়াত ৪৩)। বর্ণিত উক্তি দু'টোর প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, কিনান ছিলো কাফের। আর হজরত নুহ্ তা অবগতও ছিলেন।

এরপরের আয়াতের (৪৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত নুহ্ বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমি পুনঃ আবেদন করা থেকে আপনার শরণ যাচ্‌ঞা করি। আমি বুদ্ধিগত ভুলের কারণে এরকম করেছিলাম। আমি জানি তোমার মার্জনা ও প্রশ্রয় ব্যতিরেকে ক্ষতি থেকে কারো মুক্তি নেই। তাই আমি মার্জনাপ্রার্থী। ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত হওয়া থেকে আমার পরিত্রাণকে নিশ্চিত করো।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

❑ বলা হইল, 'হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ ও তোমার প্রতি ও যে-সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণ সহ; অপর সম্প্রদায় সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে;

❑ 'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিণাম সাবধানীদিগেরই জন্য।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ক্বীলা ইয়া নুহুহ্‌বিত্ব বিসালামিম্ মিন্না ওয়া বারাকাতিন্ আ'লাইকা ওয়া আ'লা উমামিম্ মিম্মাম মায়াক।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক বললেন, হে নুহ্! আমার দেয়া শান্তি ও তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ অবতরণ করো। অর্থাৎ— জুদী পাহাড় থেকে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার পক্ষ থেকে বর্ষিত শান্তি ও কল্যাণসহ প্লাবনমুক্ত পৃথিবীতে নেমে এসো। 'আল উমাম' অর্থ দল। হজরত নুহের সহআরোহীবৃন্দের মাধ্যমেই ঘটেছে পরবর্তী মানুষের বংশবিস্তার। তাই

এখানে তাঁদেরকে বলা হয়েছে 'উমাম'। অথবা 'মিম্‌মান' শব্দটির মিন অব্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সূচনার্থে। অর্থাৎ তারা সহ তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও আল্লাহ্‌র দেয়া শান্তি ও কল্যাণের অধিকারী (যদি তারা হজরত নুহের সঙ্গীদের মতো ইমানদার হয়)। মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনরত সকল বিশ্বাসীই এই মর্যাদার আওতাভূত।

একটি জটিলতাঃ আয়াতের বিবরণভঙ্গি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নুহের বংশ থেকেই জন্ম লাভ করে চলেছে পরবর্তী মানবতা। অন্যান্য সহআরোহী থেকে নয়। প্রকৃত ঘটনা তাহলে কী?

জটিলতার নিরসনঃ হজরত নুহের তিন পুত্র ছিলেন তাঁর নৌকার সহআরোহী। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে 'মিম্‌মাম মায়াক'। এতে করে বুঝা যায়, তাঁদের বংশধরেরাই প্লাবনপরবর্তী পৃথিবীর বাসিন্দা। অন্যান্য আরোহীর বংশবিস্তার আর ঘটেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অপর সম্প্রদায় সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দিবো, পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।' একথার অর্থ— হজরত নুহের পরবর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে এই পৃথিবীর জীবন সম্ভোগ করার সুযোগ দান করবো। এরপর মৃত্যু-উত্তর জীবনে তাদেরকে দিবো কঠোর শাস্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'উমাম' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে হজরত হুদ, হজরত লুত ও হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি, যা তুমি ইতোপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানতো না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে অদৃশ্যলোক থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সুদূর অতীতের নুহ্‌ নবী ও তার সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আপনাকে জানালাম। এ সকল ঘটনা আপনি ও আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে কখনো শোনেনি। আপনি তো অক্ষরের অমুখাপেক্ষী। তাই বিগত যুগের আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই আপনাকে এসকল তথ্য জানানো হলো। আর আপনার মাধ্যমে জানানো হলো আপনার সমকালের ও ভবিষ্যতের সকল পাঠক ও শ্রোতাকে। এই অলৌকিকত্ব আপনার রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো, শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! নুহ্‌ নবীর ইতিবৃত্ত অনুধাবন করুন এবং এই উপদেশ গ্রহণ করুন যে, সত্যধর্ম প্রচারকদের জন্য ধৈর্যধারণ বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূঢ় আচরণে মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। নিশ্চয় জানবেন যে, শিরিক ও অবাধ্যতা থেকে যারা সাবধান (মুত্তাকী), তাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

❒ আদ্ জাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।'

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট শ্রমফল যাচ্ঞা করি না। আমার শ্রমফল আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরও শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না।'

এখান থেকে শুরু হয়েছে হজরত হুদের কাহিনী। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো প্রতিমাপূজারী। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত হুদ। প্রথমোক্ত আয়াতে সেকথাই বলা হয়েছে— আদ্ জাতির নিকট তাদের স্বগোত্রীয় ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'হে আমার স্বজাতি! এই আহ্বান কার্যের পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট শ্রমফল যাচ্ঞা করি না। আমার শ্রমফল রয়েছে

তাঁর নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?' একথার অর্থ— হে আমার দেশবাসী! সত্যের প্রতি আমার এই পথপ্রদর্শন স্বার্থবিমুক্ত। এরজন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিকপ্রত্যাশী নই। যে আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে এর শ্রমফল প্রদান করবেন। সুতরাং বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্ট করো। এই নিঃস্বার্থ আহ্বানকে উপেক্ষা কোরো না।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার জনপদবাসী স্বজন! বিগত জীবনের পাপাচরণের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হও। ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো। অংশীবাদিতাকে প্রত্যাখ্যান করো। গ্রহণ করো বিশ্বাসকে। উল্লেখ্য যে, এভাবে সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন পিছনের পাপচিহ্ন সমূহকে মুছে ফেলে। হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলাম অতীতের পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' একথার অর্থ— যদি তোমরা ঈমান আনো, তবে আল্লাহ্পাক তোমাদের খরাদগ্ধ জনপদে বারি বর্ষণ করবেন। শারীরিক শক্তিমত্তায় যে বৈশিষ্ট্য তোমাদের রয়েছে, তার চেয়েও তোমাদেরকে করা হবে আরো অধিক বীর্যবান। সুতরাং অবজ্ঞাভরে আমার এই সত্য আহ্বান থেকে তোমরা বিমুখ হয়ো না।

আমি সুরা আরাফে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। তিন বছরের অধিক সময় ধরে আদ্ সম্প্রদায় ছিলো দুর্ভিক্ষকবলিত। একটানা অনাবৃষ্টির কারণে রমণীকুল হয়ে পড়েছিলো গর্ভহীনা। উদ্ভিদকুল হয়ে পড়েছিলো পুষ্পহীন, ফল ও ফসলবিহীন। তখন হজরত হুদ তাদেরকে বলেছিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করো। অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করো বিশ্বাসকে। এরকম করলে আল্লাহ্ তোমাদের জনপদে ঘটাবেন সুপ্রচুর বৃষ্টিপাত। নিরর্গল করে দেবেন মানব শিশু ও ফল-ফসলের জন্মপ্রবাহ। তোমরা স্বচ্ছল হবে। ফিরে পাবে শারীরিক ও আর্থিক বল-বীর্যের বৈভব। এখানে উল্লেখিত 'কুওয়াত' শব্দটির অর্থ দৈহিক শক্তি।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ○ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ○ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ○ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ○

❒ উহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহ্দিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি।'

❒ 'আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহ্দিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহের শরীক কর।'

❒ 'আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না।'

❒ আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

❒ 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহা সহ তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করোনি।' একথার অর্থ— আদ্ সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, হে হুদ! তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করবো কি করে। তুমি নিজেকে নবী বলে দাবী করো। কিন্তু তোমার নবুয়তের পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ বা মোজেজা প্রদর্শন করো না। সুতরাং প্রমাণবিহীন কোনো দাবী তো আমরা মেনে নিতে পারি না। উল্লেখ্য যে, হজরত হুদ তাদের নিকট যথারীতি মোজেজা প্রদর্শন করেছিলেন। তবু তারা তাঁকে মেনে নেয়নি। কারণ তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের অনড় অপরিচ্ছন্নতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহ্দেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই।' এ কথার অর্থ— হে হুদ! তুমি যতো মোজেজা প্রদর্শনই করো না কেনো দীর্ঘদিন ধরে লালিত ও আচরিত ধর্মমত থেকে আমরা সরে দাঁড়াতে পারি না। যে সকল বিগ্রহের বন্দনা আমরা এতোদিন করে এসেছি তাদেরকে পরিত্যাগ করা আমাদের কর্ম নয়। আর আমরা তো তোমাকে বিশ্বাসই করি না।

পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে — 'আমরা তো একথাই বলি, আমাদের পূজিত দেব-দেবীগুলোর মধ্যে কেউ হয়তো তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।' একথার অর্থ— আদ্ জাতি বললো, হে হুদ! আমরা তো মনে করি তুমি কুপ্রভাবগ্রস্ত। তুমি আমাদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে কটূক্তি করো। তাদের পূজা অর্চনা করতে নিষেধ করো। তাই তো তারা তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। সে কারণে তোমার কথাবার্তায় ফুটে উঠেছে অসংলগ্নতা ও ধর্মদ্রোহিতা। এখানকার 'ইয়্তারা' শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'আ'রা' থেকে। আর 'সু' অর্থ এখানে জ্বিনের প্রভাব বা কুপ্রভাব। 'ইয়্তারা' শব্দটি অতীতকালবোধক হলেও এখানে এর অর্থ ভবিষ্যতকালবোধক। আদ্ জাতির বদ্ধমূল ধারণা ছিলো তাদের কোনো এক দেবতা নিশ্চয় হজরত হুদকে ধ্বংস করে দিবে। সে কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবোধক শব্দরূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি এবং তোমরা সাক্ষী হও যে আমি তা থেকে নির্লিপ্ত, যাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক করো।' অর্থাৎ হজরত হুদ তখন বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি তোমাদের দেব-দেবীদেরকে আমি স্বীকারই করি না। আমি তো এক আল্লাহ্র পূজারী। তোমরাও আমার এ কথার সাক্ষী হয়ে থাকো।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।' হজরত হুদ আরো বললেন, হে অংশীস্থাপকের দল! আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলে মিলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইলে করতে পারো, আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয় আমি করি না। উল্লেখ্য যে, হজরত হুদের সাহসিকতা ও আল্লাহ্নির্ভরতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে এ কথাটিতে। আদ্ জাতি ছিলো প্রচণ্ড প্রতাপশালী। ছিলো রক্ত পিপাসু, নিষ্ঠুর ও খুনী। কিন্তু আল্লাহ্র নবী হজরত হুদের বিরুদ্ধে কিছু করবার সাহস তাদের হতো না।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোনো জীব জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।' এ কথার অর্থ— হজরত হুদ বললেন, হে অংশীবাদিতানির্ভর জনগোষ্ঠী! শোনো, যে আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভুপালনকর্তা সেই আল্লাহ্র প্রতি আমি নির্ভরশীল। সকল প্রাণী তাঁর কর্তৃত্বকবলিত, সকলেই তাঁর অধীন।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'নাসিয়া' শব্দটির অর্থ— হেয় করা, লাঞ্ছিত করা অথবা আয়ত্তাধীন রাখা। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'আখিজুম্ বিনাসিয়াতিহা' কথাটির শাব্দিক অর্থ কারো মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে রাখা। আর অন্তর্নিহিত অর্থ— কাউকে কর্তৃত্বাধীন রাখা। জুহাক বলেছেন, 'মস্তকের অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে রাখা' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে সকল প্রাণীর জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্রই কর্তৃত্বাধীন। ফাররা বলেছেন, কথাটির অর্থ তিনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র পালনকর্তা এবং তাদের সকলের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগকারী। কুতাইবি বলেছেন, আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টিকে অক্ষম করতে সক্ষম। যাকে তিনি পাকড়াও করেন, সেই ধৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে তার ক্ষমতাহীনতার কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।' এ কথার অর্থ, আমার প্রভুপালক সত্য ও ন্যায়াধিষ্ঠিত। তাঁর শরণপ্রার্থীরা কখনো নিরাশ হয় না। তিনিই নির্ধারণ করেন পুণ্য ও পাপের যথাবিনিময়।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যে সত্যসহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়! আমি নবী। আমি অন্য সকল নবীর মতো সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্মের প্রচারক। আমি আমার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছি। পৌঁছে দিয়েছি সত্যের বাণী। এখন যদি তোমরা সত্যবিমুখ হও, তবে—

'এবং আমার প্রতিপালক অন্য কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে অবুঝেরা! সত্যের প্রতি তোমাদের এই বৈমুখ্য যদি অনড় হয়, তবে

আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, উপাসনাপ্রিয় ও অনুগত কোনো সম্প্রদায়কে। আর তোমরা ধ্বংস হলে একথা মনে কোরো না যে, এতে করে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি সাধিত হবে। তিনি তো সকল ক্ষতি ও বিনষ্টির অতীত।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' এ কথার অর্থ— এ কথাও শুনে নাও হে আমার স্বজাতি! তিনিই সকলের, সকল কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমাদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। তোমাদেরকে শাস্তিদান করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— সকল কিছুর উপর রয়েছে তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য। তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং তাঁর তিল পরিমাণ ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটানোর সাধ্য কারো নেই।

সুরা হূদঃ আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ
وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝

❏ এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সংগে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে।

❏ এই আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিত।

❏ এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার নির্দেশ এলো তখন আমি হূদ ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! শুনুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ জাতিকে দেয়া হলো দীর্ঘ অবকাশ। তবু তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলো না। তখন আমার পক্ষ থেকে

অবতারিত হলো ভয়াবহ শাস্তি। আর সে শাস্তি থেকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম নবী হুদ ও তার বিশ্বাসবান অনুচরবৃন্দকে। 'আমার অনুগ্রহ' কথাটি উল্লেখ করে এখানে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়, আল্লাহ্র অনুগ্রহেই কেবল তাঁর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। হজরত হুদ ও তাঁর অনুচরবৃন্দও আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন হওয়ার কারণে শাস্তিমুক্ত হতে পেরেছিলেন। রহমত শব্দটির অর্থ এখানে অনুগ্রহ না হয়ে ইমানও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্ অনুগ্রহবশতঃ তাদেরকে ইমান দান করেছিলেন। ওই ইমানের কারণেই তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। হজরত হুদের বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো ভয়ংকর এক ঝঞ্ঝাবাতের মাধ্যমে।

পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'এই আদ্ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিলো এবং অমান্য করেছিলো তাঁর রসুলগণকে এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করতো।' এ কথার অর্থ— সকল নবীর মৌল আদর্শ হচ্ছে তওহীদ (আল্লাহ্র এককত্ব)। এই তওহীদ প্রচার সূত্রে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। তাই এক নবীকে অমান্য করার অর্থ সকল নবীকে অমান্য করা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ সম্প্রদায় হজরত হুদকে অস্বীকার করেছিলো। সুতরাং তারা সকল নবী-রসুলকে অমান্যকারী। আল্লাহ্-পাকের নিদর্শনের প্রতিও তারা অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী। তারা ছিলো তাদের সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারী নেতাদের অনুসারী। 'আনীদ্' শব্দটির অর্থ এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী বা স্বেচ্ছাচারী। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'আনুদ্' থেকে। আবু উবাইদ বলেছেন, 'আনীদ্' শব্দটি এসেছে 'উনুদ্' থেকে। আর এর অর্থ বিরুদ্ধাচারী। এভাবে 'জাব্বারিন আ'নীদ্' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আদ্ জাতির উদ্ধত ও স্বৈরাচারী নেতৃবর্গ। তারা সকলেই ছিলো আত্মবিধ্বংসী স্বেচ্ছাচরণের শিকার।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিলো অভিশাপগ্রস্ত এবং তারা অভিশাপগ্রস্ত হবে কিয়ামতের দিনেও।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আদ্ জাতি পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে আল্লাহ্র অভিসম্পাত কবলিত। এখানে 'লা'নাত্' অর্থ অভিশপ্ত, অভিসম্পাতকবলিত, অনুকম্পাবিচ্যুত, বিতাড়িত।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো! আদ্ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রাখো! ধ্বংসই ছিলো হুদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! জেনে রাখুন, দুর্বিনীত আদ্ জাতি ছিলো নিশ্চিত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর ধ্বংসই ছিলো তাদের চূড়ান্ত পরিণাম। বাগবী লিখেছেন, কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'বু'দান' শব্দটির একটি অর্থ দূরবর্তী। আরেকটি অর্থ ধ্বংস। এখানে 'আলা বু'দান' কথাটি একটি

অপপ্রার্থনা বা বদ্‌দোয়া। অবাধ্য আদ্ সম্প্রদায় ছিলো শাস্তির উপযোগী। তাই তাদের উপরে আপতিত হয়েছিলো আযাব। উল্লেখ্য যে, 'আলা বু'দান' কথাটি প্রার্থনাবোধক হলেও এখানে অর্থ হবে বিবৃতিবোধক। আল্লাহ্‌পাক কারোর নিকট প্রার্থী হতে পারেন না। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে কথাটির মাধ্যমে এই বিবৃতিটি দেয়া হয়েছে যে, আদ্ জাতি ছিলো প্রকৃত অর্থেই শাস্তিযোগ্য। তাদের উপরে আপতিত শাস্তি ছিলো সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগ।

আরো উল্লেখ্য যে, আদ্ জাতির উদ্ধত চরিত্র ও দ্রোহী স্বভাবকে সুচিহ্নিত করার জন্য এখানে বার বার ব্যবহৃত হয়েছে তিরস্কারসূচক 'আলা' শব্দটি। আর 'ক্বওমি হুদ' (হুদের সম্প্রদায়) উল্লেখের মাধ্যমে এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজরত হুদের বিরোধীরাই ছিলো হতভাগ্য আদ্ সম্প্রদায়ের শাস্তি পাওয়ার একমাত্র কারণ। অর্থাৎ হজরত হুদের প্রতি দুর্ব্যবহারই তাদের শাস্তিকে করেছিলো ত্বরান্বিত। এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'ক্বওমি হুদ' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হজরত হুদের স্বজাতি আদ্‌কে। কারণ কেউ কেউ বলেছেন, আদ্ জাতি ছিলো আদ্ ও সামুদ এই দুইভাবে বিভক্ত। ভিন্ন একটি সম্প্রদায়ের নামও ছিলো আদ্। ওই সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন হজরত হুদ।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰىنَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

❒ সামূদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃষ্টি

করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।'

❒ তাহারা বলিল, 'হে সালিহ্! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদিগের আশাস্থল। তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদিগের যাহাদিগের ইবাদত করিত আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে-বিষয়ে যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।'

❒ সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন তবে আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করিতেছ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি ছামুদ জাতির নিকটে তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। আমার প্রত্যাদেশানুসারে নবী সালেহ্ তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং মৃত্তিকাপৃষ্ঠকেই নির্ধারণ করেছেন পৃথিবীর জীবনের নিবাস। সুতরাং বিগত জীবনের অবাধ্যতার জন্য তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। আমার প্রভুপালক অতি নিকটে। তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন।

এখানে উল্লেখিত 'ইস্‌তা'মারা' শব্দটি এসেছে 'উমর' থেকে। 'উমর' অর্থ জীবনকাল। জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— দীর্ঘ করা হয়েছে তোমাদের আয়ুষ্কাল। উল্লেখ্য যে, আদ্ ও ছামুদ জাতির আয়ুষ্কাল ছিলো তিনশত থেকে হাজার বছর।

মুজাহিদ বলেছেন, 'ইস্‌তা'মারা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'উমরা' থেকে— যার অর্থ জীবনব্যাপী। সারা জীবনের জন্য কোনো কিছু দেয়া হলে আরববাসীগণ এরকম শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকেন। মৃত্যুর পর এই দান দাতার নিকটেই ফিরে যায়। তাই এখানে বক্তব্যবিষয়টির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা মৃত্তিকাজাত। এই মৃত্তিকাই তোমাদের আবাস। অবশেষে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্‌র নিকটে। তখন তোমাদের পার্থিব আধিপত্য আর অবশিষ্ট থাকবে না। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— ভূপৃষ্ঠে তোমাদেরকে যাবজ্জীবন অবস্থানের সুযোগ দেয়া হয়। আর মৃত্যুর পরে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হয় অন্যেরা। সুতরাং তোমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও এবং ফিরে চলো আল্লাহ্‌র দিকে।

'আমার প্রভুপালক নিকটেই'— একথার অর্থ, আত্মিক দিক থেকে আমাদের প্রভুপালক আমাদের অতি নিকটে। এই নৈকট্যের ধরন আমাদের জ্ঞানের অতীত। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— তিনিই সকলকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কিংবা বলা যেতে পারে— তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণের সন্নিকটবর্তী।

পরের আয়াতের (৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— নবী সালেহের কথা শুনে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা বললো, হে সালেহ্! এতোদিন তুমিই তো ছিলে আমাদের আশা ভরসা। আমরা ভেবেছিলাম তুমি আমাদের নেতৃত্ব দিবে। উৎকর্ষ ঘটাবে আমাদের ধর্মের। আশা করেছিলাম তুমিই হবে আমাদের ধর্মের অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু আজ একি কথা বললে তুমি! হৃদয়ে জাগালে আশাভঙ্গের বেদনা। আমরা তো আমাদের স্বনামধন্য পিতৃপুরুষদের ধর্মের অনুসারী। তারা প্রতিমা পূজা করতো। আমরাও করি। অথচ আজ আমাদের সম্প্রদায়ভূত হয়েও তুমি বিদ্রোহী। তাই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি বিভ্রান্ত। যে আল্লাহ্র প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। এখানে 'মুরীব্' অর্থ সন্দেহ উদ্রেককারী। অথবা অশান্তি সৃষ্টিকারী।

এরপরের আয়াতের (৬৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ বললেন, হে আমার অবুঝ সম্প্রদায়! আমার প্রভুপালক আমাকে স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাকে দান করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ অনুগ্রহ। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তাঁর অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা তো দেখছি সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে কেবলই আমার ক্ষতি করতে চাও।

উল্লেখ্য যে, ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত সালেহের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যে বার বার 'ইন্' (যদি) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিশ্বাস নিশ্চয় এরকম 'যদি' কণ্টকিত ছিলো না। কারণ তিনি তো ছিলেন সত্য পয়গম্বর। এরকমও হতে পারে যে, 'ইন্' (যদি) শব্দটি যেমন সন্দেহসূচক, তেমনি শব্দটি 'ইন্না' (নিশ্চয়) শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপও হয়ে থাকতে পারে। এখানে 'রহমত' শব্দটির অর্থ হবে নবুয়ত ও হেকমত। 'মিনাল্লহ্' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। 'যদি তার অবাধ্যতা করি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— যদি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকটে প্রচার করতে গিয়ে শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেই। আর 'তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করছো' কথাটির অর্থ হবে এ রকম — আল্লাহ্পাক আমাকে নবুয়ত ও হেকমত দান করেছেন। তোমরা এই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে শাস্তির যোগ্য হচ্ছো। তোমরা আমার স্বজন। তোমাদের ক্ষতি প্রকারান্তরে আমারই ক্ষতি। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এভাবেই তোমরা আমার ক্ষতি বৃদ্ধি করে চলেছো।

হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, হজরত সালেহ্ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বরং আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'তাখসীর' শব্দটির অর্থ হবে— ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া। অতএব এক্ষেত্রে ক্ষতির বিষয়টি সম্পৃক্ত হবে অবাধ্য ছামুদ

সম্প্রদায়ের প্রতি। যেমন, 'তাকফীর' ও 'তাস্‌ফীক' শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে অপরের সঙ্গে কুফরী ও ফাসেকির সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে ছামুদ সম্প্রদায়! আমার প্রতি তোমরা অসত্য আরোপ করছো। তাই আমি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত করছি। হজরত ইবনে আব্বাস শব্দটির অর্থ করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত দেখা। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের অসত্য আরোপের ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের গহ্বরে।

হজরত সালেহের সম্প্রদায় বলেছিলো, হে সালেহ! তুমি যদি তোমার নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তর থেকে পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা একটি উষ্ট্রী বের করে আনতে পারো, তবেই কেবল আমরা তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করবো। হজরত সালেহ্ আল্লাহ্‌পাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা গৃহীত হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাথর ফেটে বেরিয়ে এলো একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। একটু পরেই উষ্ট্রীটি প্রসব করলো তার শাবক। তখন হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন—

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا
تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا
فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا
نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ
دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا۠ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا
بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ○

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের এই উষ্ট্রী তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহের জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

❒ কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল,'তোমরা তোমাদিগের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে।'

❒ এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ্ ও তাহার সংগে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

❒ অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহা নাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল,

❒ যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! সামূদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত সালেহ্ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! পাথর ফেটে বেরিয়ে আসা এই উষ্ট্রীটি আল্লাহ্তায়ালার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। এটা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ একে সৃষ্টি করেছেন প্রজনন-বিধান ব্যতিরেকেই। এই নিদর্শনের যথাসমাদর করা তোমাদের কর্তব্য। ভূপৃষ্ঠে একে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দাও। তাকে যথেচ্ছ আহার করতে দাও ধরণীর সবুজ লতাগুল্ম এবং পান করতে দাও প্রাকৃতিক পানি। এর লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনো দায়দায়িত্ব তোমাদের নেই। সাবধান! একে কখনো ক্লেশ দিয়ো না। ক্লেশ দিলে তোমাদের উপরে ত্বরিৎ শাস্তি অনিবার্য।

পরের আয়াতের (৬৫) মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হজরত সালেহের সতর্কবাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো। অলৌকিক ওই উটনীটির পা কেটে দিলো তারা। এভাবে বধ করলো সেটিকে। হজরত সালেহ্ তখন বললেন, তোমাদের আয়ু মাত্র তিনদিন। স্বগৃহে এই তিনদিন তোমরা জীবনোপভোগ করে নাও। এই অলৌকিক উটনীটির ক্ষতি করলে তিনদিন পরে অবতীর্ণ হবে শাস্তি। এটাই আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত বা অংগীকার। এই অংগীকার কখনো মিথ্যে হতে পারে না। বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র, এই তিনদিনই তোমাদের আয়ু। তার পরদিন শনিবারে সকালে তোমাদের মুখমণ্ডলের রঙ হয়ে যাবে হরিদ্রাভ। দ্বিতীয় দিবসে হয়ে যাবে রক্তিম। আর তৃতীয় দিবসে হবে কৃষ্ণাভ। তারপর তোমরা সকলে মারা পড়বে।

পরের আয়াতের (৬৬) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের ইতিকাহিনীটির ভয়াবহ পরিণতির কথা এবার শুনুন। তখন আমি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলাম ভয়ংকর শাস্তি। কিন্তু সেদিনের সে

শাস্তি ও লাঞ্ছনা থেকে আমি রক্ষা করলাম আমার প্রিয় নবী সালেহ্‌কে এবং তার একনিষ্ঠ অনুগামী বিশ্বাসীদেরকে। এটা ছিলো তাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ। নিশ্চয় জানবেন, আপনার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ও সকল ক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত।

এরপরের আয়াতের (৬৭) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর সীমালংঘনকারীদেরকে আঘাত করলো একটি বিকট আওয়াজ। ওই বিকট ও বীভৎস আওয়াজের আঘাতে ভোর না হতেই আপনাপন গৃহে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইলো তারা।

উল্লেখ্য যে, ওই বিকট আওয়াজ বা মহা নাদ উচ্চারিত হয়েছিলো হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে। অথবা তখন আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো জীবনহারক এক প্রলয়ংকরী বজ্রধ্বনি। একই সঙ্গে ধরাপৃষ্ঠ থেকেও উত্থিত হয়েছিলো প্রাণবিধ্বংসী এক নাদ। সেই ভীষণ নাদে প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিলো সীমা-লংঘনকারীদের ।

এরপরের আয়াতের (৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— ছামুদ জাতির বিরান জনপদ দেখে তখন মনে হচ্ছিলো, সেখানে যেনো কখনো মনুষ্য-বসবাস ছিলোই না। হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এই কথাটি স্মরণে রাখুন যে, ছামুদ সম্প্রদায় ছিলো অবাধ্য। তারা তাদের প্রভুপালককে অস্বীকার করেছিলো। একথাও আপনি জেনে রাখুন যে, ধ্বংসই ছিলো তাদের যথোপযুক্ত পরিণাম।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৬৯, ৭০

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۝

❒ আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদ লইয়া ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'সালাম'। সেও বলিল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাব-করা গো-বৎস আনিল।

❒ সে যখন দেখিল তাহারা উহার দিকে হাত বাড়াইতেছে না তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এবার শুনুন নবী ইব্রাহিমের ইতিবৃত্ত। একদিন আমার নির্দেশপ্রাপ্ত ফেরেশতারা শুভসংবাদ জানানোর জন্য তার কাছে গেলো। তারা ইব্রাহিমকে অভিবাদন

জানালো। ইব্রাহিমও জানালেন প্রত্যাভিবাদন। এভাবে সালাম বিনিময়ের পর অতিথি সৎকারার্থে ইব্রাহিম সত্বর তাদের সামনে উপস্থিত করলেন একটি কাবাব করা গো-বৎস।

শুভসংবাদটি ছিলো হজরত ইসহাক অথবা হজরত ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কিত। অথবা হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তি বিষয়ক। হজরত ইবনে আব্বাস এবং আতা খোরাসানীর বক্তব্যানুসারে ওই মেহমান ফেরেশতারা ছিলেন হজরত জিবরাইল, হজরত মিকাইল ও হজরত ইস্রাফিল। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, হজরত জিবরাইল ও তাঁর সহচর সাতজন ফেরেশতা গিয়েছিলেন মেহমান হিসেবে। জুহাক বলেছেন, হজরত জিবরাইলের সঙ্গে তখন ছিলেন নয় জন ফেরেশতা। মুকাতিল বলেছেন, বারোজন। সা'দী বলেছেন এগারো জন। ফেরেশতাগণ ছিলেন সুসজ্জিত ও সুন্দর। তাঁরা অভিবাদন জানিয়েছিলেন ক্রিয়া পদবাচ্যে (সালাম) যা ছিলো অস্থায়ী। আর হজরত ইব্রাহিম জবাব দিয়েছিলেন নাম পদবাচ্যে (সালামুন) —যা ছিলো ঘটমান, স্থায়ী। এরূপ সালামই সর্বোত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাগণ প্রদত্ত সালামের অর্থ ছিলো— আপনার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টিকারী আমরা নই। আমরা নিরাপত্তাবাহী। আমরা আপনার বন্ধু ।

এখানে উল্লেখিত 'হানিজ' কথাটির অর্থ— উত্তপ্ত প্রান্তরে ভুনা করা কোনো বস্তু। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে— ছাগলের গোশত ভুনার জন্য যাতে তপ্ত পাথর রেখে দেয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— চর্বিবিগলিত ছাগলের গোশত। কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সম্পদের অধিকাংশই ছিলো গরু। গো-পালনই ছিলো তাঁর সম্পদের প্রধান সূত্র।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অতিথিরা কিন্তু কাবাব করা গরুর গোশতের দিকে হাত বাড়ালো না। আহারের কোনো আগ্রহই ছিলো না তাদের । ইব্রাহিম তখন ভাবলেন, এরা কি তাহলে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে? ভীত হলেন তিনি। অতিথিরা বললো, ভীত হবেন না। আমরা নবী লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত।

এখানে উল্লেখিত 'নাকেরা' শব্দটির অর্থ , মেজাজ বিগড়ে যাওয়া। 'আওজাসা' অর্থ গুপ্ত অনুভূতি। কামুস গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। মুকাতিল বলেছেন, 'আওজাসা' অর্থ হজরত ইব্রাহিম মনে করলেন। বাগবী বলেছেন, 'আওজাসা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ওয়াজুস' থেকে— যার অর্থ প্রবেশ করা। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের অন্তরে ভীতির অনুপ্রবেশ ঘটলো। 'মিনহুম' কথাটির মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, অতিথিদের দিক থেকে হজরত ইব্রাহিমের অন্তরে সঞ্চারিত হলো ভীতি। উল্লেখ্য যে, মেজবানের বাড়ীতে মেহমানের আহার গ্রহণ না করা একটি অশুভ প্রতীক। এটাই ছিলো ওই সময়ের প্রথাগত ধারণা। বিশেষ করে নৈশ অতিথি এরকম করলে মনে করা হতো সে বা তারা অবশ্যই অপহারক অথবা লুণ্ঠনকারী। এরকম ক্ষেত্রে নির্ঘুম নিশীথ অতিবাহিত করতে হতো গৃহকর্তাকে। মেহমানেরা আহার না করায় হজরত ইব্রাহিমও তাই ভীত হয়ে

পড়েছিলেন। তবে অধিকতর শোভন মর্মার্থ হবে এরকম— আহারের প্রতি হস্ত প্রসারিত না করাতে হজরত ইব্রাহিম স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এরা ফেরেশতা। কিন্তু তিনি এই ভেবে শংকিত হলেন যে, তাহলে কী জন্য এসেছেন এঁরা। এঁরা কী পাপাচারী মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র গজব অবতীর্ণ করার নির্দেশপ্রাপ্ত!

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

❒ তখন তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

❒ সে বলিল, 'কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!'

❒ তাহারা বলিল, 'আল্লাহের কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে নবীর পরিবার! তোমাদিগের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহের অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী ইব্রাহিম ও অতিথিবৃন্দের কথোপকথনের সময় নবীজায়া পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মৃদু হাসলেন। আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের শুভসংবাদ দিলাম।

উল্লেখ্য যে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের পত্নী হজরত সারা বিনতে হারান বিন নাখুর। হজরত ইব্রাহিমের পিতৃব্যপুত্রী ছিলেন তিনি। এরকমও বর্ণনা এসেছে যে, হজরত ইব্রাহিম উপবিষ্ট ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন আপ্যায়নকারিণী হিসেবে।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, এখানে 'দ্বহিকাত' কথাটির অর্থ হবে— হজরত সারা ওই সময় ঋতুবতী হলেন। কারণ, আরববাসীরা বলেন, 'দ্বহিকাতুল আরনাবু' — যার অর্থ, খরগোশটি ঋতুবতী হলো। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দ্বহিকাতুস্ সামুরা' অর্থ বাবুলবৃক্ষের রসক্ষরণ শুরু হলো। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন 'দ্বহিকাত' অর্থ হাস্য করা। তাই এখানে অর্থ করা হয়েছে— 'এবং তিনি হাসলেন।' এই হাস্য করার কারণ সম্পর্কে আবার রয়েছে বিভিন্ন অভিমত। যেমন—

১. হজরত সারার ওই হাসি ছিলো পুলকের হাসি। 'ভয় করবেন না, আমরা প্রেরিত হয়েছি লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি'— অতিথি ফেরেশতাদের একথা শুনে শংকা দূরীভূত হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিমের ও তাঁর । তাই তিনি পুলক প্রকাশার্থে হেসেছিলেন।

২. নবীপত্নী তখন হেসেছিলেন বিস্মিত হয়ে। মহাসমাদরে মেহমানদের সামনে উপস্থিত করা হলো উপাদেয় আহার্য। কিন্তু মেহমানেরা নির্বিকার। তাঁরা আহার্য বস্তুর দিকে হাত বাড়ালেন না দেখে হজরত ইব্রাহিম শংকিত হলেন। বললেন, আপনারা আহারে অনাগ্রহী কেনো? তাঁরা বললেন, বিনা মূল্যে আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করি না। তিনি বললেন, বেশতো। মূল্য পরিশোধ করুন। তাঁরা বললেন, কীভাবে? তিনি বললেন, আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ ও পরে আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে। হজরত জিবরাইল তখন হজরত মিকাইলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ইনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র খলিল (বন্ধু) হওয়ার যোগ্য। এর পরেও কিন্তু মেহমানেরা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না। তাই অবাক হয়ে মৃদু হাসলেন হজরত সারা। বললেন, আমরা অতিথি সৎকারের এতো আয়োজন করলাম। অথচ আপনাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। তাজ্জব ব্যাপার যে!

৩. নবীজায়ার ওই হাসিটি ছিলো উৎকণ্ঠার হাসি। অতিথি ফেরেশতারা যখন জানালেন 'আমরা প্রেরিত হয়েছি লুতের সম্প্রদায়ের প্রতি' তখন হজরত বুঝলেন, এবার ওই অবাধ্যদের ধ্বংস অবধারিত। উৎকণ্ঠিত হলেন তিনি। আর তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠলো উৎকণ্ঠাজনিত হাসির রেখা।

৪. আত্মতৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন তখন হজরত সারা। ইতোপূর্বে তিনি হজরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী। লুতের কথা ভাবুন। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে। তাদের বাড়াবাড়ি পৌঁছেছে চরমে। এখন যেকোনো সময় তাদের উপরে এসে পড়বে গজব। সুতরাং লুতকে আপনার কাছে ডেকে নিন। সেতো আপনার ভাগিনেয়। এখন ফেরেশতাদের কথা শুনে হজরত সারা বুঝলেন, তাঁর ধারণাটি ছিলো যথার্থ। তাই তখন তাঁর বদনমণ্ডলে ফুটে উঠেছিলো আত্মতৃপ্তিজনিত হাসির আভা।

৫. নবী-সঙ্গিনী তখন হেসেছিলেন উপহাস প্রকাশার্থে। মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, হজরত সারা তখন ভাবলেন, আহারে নির্লিপ্ত অতিথি তো মাত্র তিনজন। আর হজরত ইব্রাহিমের পরিবারভূত ও পরিবারবহির্ভূত কর্মচারী, পরিচারক তো অনেক। ওই তিনজন তবে আমাদের ক্ষতি করতে পারবে কীভাবে? একথা ভেবেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা দিয়েছিলো তাঁর ওষ্ঠাধারে।

৬. সন্তান লাভের সংবাদ জানতে পেরে যারপরনাই উল্লসিত হয়ে পড়েছিলেন হজরত সারা। তাই তখন তাঁর হাসিতে জেগে উঠেছিলো আনন্দ ভরা উল্লাস।

৭. হর্ষ-বিষাদের হাসি হেসেছিলেন হজরত সারা। সন্তান লাভের সংবাদে তিনি হয়েছিলেন হৃষ্টচিত্ত। আর হজরত লুতের সম্প্রদায়ের উপর গজব নাজিলের সংবাদ জানতে পেরে হয়ে পড়েছিলেন বিমর্ষ। তাই তাঁর হাসিতে যুগপৎ জেগে উঠেছিলো হর্ষ ও বিষাদ।

এবার আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যাক। বিষয়টি হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করে হজরত সারাকে সন্তানলাভের সুসংবাদটি জানানো হলো কেনো? সুসংবাদটি তো এককভাবে নবী ইব্রাহিমকে জানানোই যথেষ্ট ছিলো। প্রত্যাদেশের রীতিও এই যে, সকল নির্দেশনা জানানো হয় নবী-রসুলগণকে। আর তাঁরা সেগুলো প্রচার করেন অন্যদের নিকটে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমটি করা হলো কেনো? জবাবে বলা যেতে পারে যে—

১. এখানে সুসংবাদটির মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইসহাক ও তৎপরবর্তী হজরত ইয়াকুবের বংশপ্রবাহের আদি মাতা হবেন তিনিই। হজরত ইব্রাহিমের অন্য কোনো স্ত্রী এই বংশলতিকার আদি জননী হবেন না। সুতরাং এই বংশের প্রথম জনয়িত্রী হিসেবে তিনিই তো সুসংবাদ লাভের অধিকারিণী।

২. সন্তানলাভের সংবাদ পুরুষদের চেয়ে রমণীদের নিকটে অধিক উপভোগ্য। তাই তাঁকেই এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে সুসংবাদ শ্রবণকারিণী হিসেবে।

৩. হজরত সারা ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। সন্তান জন্মদানের বয়স তিনি পেরিয়েছিলেন অনেক আগেই। অথচ আল্লাহ্পাকের নির্ধারণ এই যে, তিনি পুনরায় জননী হবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পুত্রের বংশও হবে দীর্ঘ, দীর্ঘতর। যাঁকে কেন্দ্র করে এই অলৌকিক কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন হবে, তিনিই তো সংরক্ষণ করবেন সুসংবাদ শ্রবণের অধিক অধিকার। তাই এখানে তাঁকে সুসংবাদটি জানানো হয়েছে সরাসরি।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'ক্বালাত্ ইয়া ওয়াইলাতাআ আলিদু ওয়া আনা আ'জুযুঁ ওয়া হাজা বা'লী শাইখা।' এখানে 'ইয়া ওয়াইলাতা' একটি বিস্ময়সূচক সম্বোধন। এর আভিধানিক অর্থ মর্সিয়া বা শোকগাঁথা। মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম বা বিলাপ কালে আরববাসীরা এই কথাটি ব্যবহার করে। বিপদাপদ ও অন্যান্য বিস্ময়কর কার্যের ক্ষেত্রেও শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে ওই সময় নবী-পত্নী হজরত সারার বয়স ছিলো নব্বই বছর। মুজাহিদের মতে নিরানব্বই বছর। 'বায়াল' অর্থ স্বামী। ওই সময় হজরত ইব্রাহিমের বয়স ছিলো একশ' বিশ বছর। সুসংবাদ লাভের এক বৎসর পরেই তিনি সন্তান লাভ করেছিলেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— হজরত সারা বললেন, কী আশ্চর্য! আমি জননী হবো। আমি তো বৃদ্ধা। আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এ যে দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার!

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— ক্বলু আতা'জাবীনা মিন আমরিল্লাহি (তারা বললো, আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো)। এ কথার অর্থ— ফেরেশতাগণ বললেন, হে নবীজায়া! আপনি বিস্মিত হচ্ছেন কেনো? আল্লাহ্ তো যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। সুতরাং তাঁর কাজে বিস্ময়ের তো কিছু নেই। এখানে 'আমর' শব্দটির অর্থ আদেশ, শক্তি, সমাধান, কার্য অথবা সিদ্ধান্ত।

একটি জটিলতাঃ অস্বাভাবিক ঘটনার কথা শুনলে বা দেখলে আপনাআপনি বিস্ময়বোধ জাগ্রত হয়। নবতিপর বৃদ্ধার সন্তান লাভের সংবাদ একটি বিস্ময়কর সংবাদই বটে, যদিও তা আল্লাহ্‌র শক্তিবহির্ভূত নয়। হজরত সারা বিস্ময়বোধ করেছিলেন সে কারণেই। তাহলে ফেরেশতারা তাঁর এই স্বাভাবিক বিস্ময়বোধকে অশোভন মনে করলেন কেনো?

জটিলতার নিরসনঃ হজরত সারা ছিলেন নবীপত্নী। ওহী, মোজেজা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ নন। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সুসংবাদ শ্রবণ করে বিস্ময়বোধ না করাই ছিলো হয়তো তাঁর জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু তবু তিনি বলে উঠেছিলেন, 'এযে দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার' সে কারণেই ফেরেশতারা বলেছিলেন,'আল্লাহ্‌র কাজে আপনি বিস্ময়বোধ করছেন কেনো?'

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহ্‌লাল বাইত (হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি প্রার্থনাসূচক। আবার কেউ কেউ বলেছেন বিবৃতিমূলক। এখানে 'রহমত' অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ। আর বরকত অর্থ অধিকতর কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রহমত অর্থ নবুয়ত । আর বরকত অর্থ বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র, যে গোত্রের নবী-রসুলগণের তিনি ছিলেন উর্ধ্বতন জননী। উল্লেখ্য যে, 'রহমাতুল্লহি' থেকে শুরু হয়েছে পৃথক একটি বাক্য। এভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এই বাক্যটি মিলিত হয়ে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— হে নবীর সহধর্মিণী! সন্তান প্রাপ্তির সুসংবাদে বিস্মিত হবেন না। আপনি তো এরকম রহমত, বরকত ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে অপরিচিত নন। 'আহলাল বাইত' কথাটির 'আহাল' শব্দটি বিধেয় সংযুক্ত হওয়ার কারণে এখানে একটি প্রশংসাসূচক ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। অথবা শব্দটি একটি আহ্বানসূচক অব্যয়।

শিয়া সম্প্রদায় মনে করে রসুলেপাক স. এর সহধর্মিণীগণ আহলে বাইত নন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণীকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে আহলে বাইত (হে নবীর পরিবার) বলে। ভাষাবিদগণও পরিবারের কর্ত্রীকে আহলে বাইত বলেন।

শেষে বলা হয়েছে— ইন্নাহু হামীদুম মাজীদ (তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ)। 'হামীদ' অর্থ প্রশংসার যোগ্য। 'মাজীদ' অর্থ সত্তাগতভাবে সম্মানের যোগ্য। অর্থাৎ মহিমা ও ক্ষমাপরায়ণতার ক্ষেত্রে সম্মানার্হ। আল্লাহ্পাকের আরেকটি গুণবাচক নাম হচ্ছে কারীম। এর অর্থ, মহানুভব ও নেয়ামতদাতা । যখন কোনো মানুষের চরিত্রে প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটে তখন তাকেও কারীম বলে অভিহিত করা যায়। বাগবী বলেছেন,'মাজীদ' অর্থ অত্যুচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। বায়যাবী বলেছেন, সুপ্রচুর কল্যাণদাতা। কামুস প্রণেতা বলেছেন, অধিক সম্মানের অধিকারী। আর কারীম হচ্ছে মহীয়ান, গরীয়ান।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৭৪, ৭৫, ৭৬

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝ يَا إِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهُ
قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

❐ অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

❐ ইব্‌রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ্-অভিমুখী।

❐ হে ইব্‌রাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; উহাদিগের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এরপর যখন হজরত ইব্রাহিমের শংকা দূরীভূত হলো, তখন তাঁকে দেয়া হলো আর একটি সংবাদ। সেই সংবাদটি ছিলো হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ। সংবাদটি শুনে হজরত ইব্রাহিম অতিথি ফেরেশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করেছিলেন। এখানে 'ইউজাদিলুনা' কথাটির শাব্দিক অর্থ আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলো। কিন্তু আল্লাহ্র সঙ্গে হজরত ইব্রাহিম খলিলের বাদানুবাদ একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই এখানে কথাটির মর্মার্থ হবে— হজরত ইব্রাহিম তখন তর্কবিতর্ক জুড়েছিলেন অতিথি ফেরেশতাদের সঙ্গে। তর্কবিতর্কটি ছিলো এরকম— হজরত ইব্রাহিম বললেন, লুতের স্বজাতির মধ্যে পঞ্চাশজন ইমানদার যদি থাকে, তবুও কি

আপনারা তাঁর স্বজাতির সকল লোককে ধ্বংস করবেন? ফেরেশতারা বললেন, না। হজরত ইব্রাহিম পুনরায় বললেন, যদি চল্লিশজন ইমানদার থাকে? তাঁরা বললেন, তবুও না। এরপর হজরত ইব্রাহিম ক্রমে ক্রমে ইমানদারদের সংখ্যা তিরিশ, বিশ— এভাবে পাঁচ পর্যন্ত কমিয়ে আনলেন। আর তাঁর মনোতুষ্টির জন্য প্রতিবারই তাঁরা জবাব দিলেন, না। তবুও না। শেষে তিনি বললেন, যদি একজন ইমানদারও সেখানে থাকে? ফেরেশতারা বললেন, তবুও তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। তখন তিনি বললেন, সেখানে তো লুত স্বয়ং বর্তমান। সুতরাং আপনারা তাঁর কওমকে ধ্বংস করবেন না। ফেরেশতারা বললেন, একথা আমরা জানি। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের ইমানদার সদস্যকে রক্ষা করা হবে। তবে তাঁর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী স্ত্রী হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ।

পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— ইন্না ইব্‌রহীমা লাহালীমুন আউওয়াহুম্ মুনীব (ইব্রাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী)। 'হালীম' শব্দের অর্থ অপরাধীর উপরে ত্বরিত প্রতিশোধ কার্যকর না করা। আরেকটি অর্থ ধৈর্যশীল, সংযমী। পাপীদের সংশোধন-চিন্তায় যারা অত্যধিক কাতর, তাদেরকে বলে আউওয়াহ্ । অর্থাৎ যারা সংবেদনশীল অন্তরবিশিষ্ট তারাই আউওয়াহ্ । আর মুনীব বলে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তিকে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সংকল্পবদ্ধদেরকে বলা হয় আউওয়াহ্। বিনয়াবনত, দয়ার্দ্রচিত্ত ও বিচক্ষণ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাফ্রী ভাষায় আউওয়াহ্ অর্থ বিশ্বাসী (মুমিন)।

হজরত ইব্রাহিমের চরিত্রে প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন— ১. বিনম্রচিত্ত ২. কোমলহৃদয় ৩. অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে নমনীয়। এসকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণেই তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে প্রতর্কের অবতারণা করেছিলেন। আর ফেরেশতারা প্রতর্ক-পর্বটির অবসান ঘটিয়েছিলেন এভাবে—

এর পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'হে ইব্রাহিম! এ থেকে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; তাদের প্রতি তো আসবে শাস্তি যা অনিবার্য।' একথার অর্থ— হে আল্লাহ্‌র খলিল! এবার বিতর্কের ইতি টানুন। আপনার প্রভুপালকের নির্দেশ সমাগত । নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আপতিত হবেই। বাদানুবাদ, আবেদন-নিবেদন, কোনো কিছুতেই এই অনিবার্য আযাবকে আর ফেরানো যাবে না।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ○ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ○

❒ এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল,'ইহা নিদারুণ দিন।'

❒ তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা, তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অতিথিদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে হেয় করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?'

❒ তাহারা বলিল 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কী চাই তাহা তো তুমি জানই।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের নিকটে এলো, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো এবং বললো, এটা নিদারুণ দিন।' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে ফেরেশতারা উপস্থিত হলেন হজরত লুতের গৃহে। তাঁরা তখন আকৃতি ধারণ করেছিলেন গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন চিত্তাকর্ষক কিশোরের। সুদর্শন কিশোরদেরকে দেখে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন হজরত লুত। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো উগ্র সমকামী। তিনি ভাবলেন, কিশোর অতিথিদেরকে দেখলেই তারা কামার্ত হয়ে উঠবে। বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ তিনি একা। কীভাবে সম্মান রক্ষা করবেন সম্মানিত অতিথিদের। এ কথা ভেবেই বিষণ্ন-চিত্ত নবী বলে উঠলেন, হায়! আজ আমার বড়ই দুর্দিন।

'জারআ'ন' অর্থ অন্তঃকরণ। বাগবী এরকম বলেছেন। বায়যাবী বলেছেন, মেহমানদের দেখে হজরত লুত হয়ে পড়লেন দ্বিধান্বিত। ভাবলেন, পাপিষ্ঠদেরকে প্রতিহত করবার বুদ্ধি ও সামর্থ্য কোনোটাই তাঁর নেই। তাঁর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে 'জারআ'ন' শব্দটির মাধ্যমে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কনুই থেকে হাতের নিচের অথবা উপরের অংশ। রূপক অর্থ হচ্ছে শক্তি-সামর্থ্য। হাত হচ্ছে শক্তি সামর্থ্যের প্রতীক। তাই এখানে 'জারআ'ন' শব্দটির মাধ্যমে দুর্ধর্ষ সমকামীদের তুলনায় তাঁর সামর্থ্যবিবর্জিত অবস্থাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

কাহিনীটি আল্লামা সুদ্দী ও কাতাদার বিবরণে এসেছে এভাবে— তখন দ্বিপ্রহর। হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে ফেরেশতারা রওনা দিলেন হজরত লুতের জনপদ অভিমুখে। হজরত লুত তখন কর্মরত ছিলেন তাঁর কৃষিক্ষেত্রে। অথবা সংগ্রহ করছিলেন জ্বালানি কাঠ। ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ছিলো— নবী লুত তাঁর সম্প্রদায়ের পাপাচার সম্পর্কে চারবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না। ফেরেশতারা ধারণ করলেন চিত্তহারক বালকের রূপ। নবী লুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমরা আপনার অতিথি । হজরত লুত তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন গৃহাভিমুখে। চলতে চলতে বললেন, আমার প্রতিবেশীদের স্বভাব- চরিত্র সম্পর্কে আপনারা কি কিছু জানেন? অতিথিরা বললেন, না তো। তিনি বললেন, এই জনপদটি পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট একটি জনপদ। কথাচ্ছলে এই বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন চার বার। এভাবে কথা বলতে বলতে ফিরলেন স্বগৃহে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত লুত কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আগে আগে চললেন। পিছনে পিছনে চললো অতিথিবৃন্দ। পথচারীরা অশ্লীল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো অতিথি বালকদের প্রতি। পথ চলতে চলতে হজরত লুত অতিথিদেরকে বললেন, এখানকার লোকগুলো এরকমই। এরকম জঘন্য লোক আর কোথাও নেই। চলন্ত পথে একথা তিনি উচ্চারণ করলেন চার বার। অতিথিরা পরস্পর পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বললেন, শুনলে তো, সাক্ষ্যদানের সংখ্যা চার এবার পূর্ণ হলো। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জনচক্ষুর অন্তরালে হজরত লুতের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন অতিথিরা। নবীগৃহের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ তাঁদের আগমন সংবাদ জানতে পারেনি। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী নবী-পত্নীই সংবাদটি রটিয়ে দিয়েছিলো পাড়ার যুবকদের মধ্যে। বলেছিলো, এমন সুন্দর মেহমান আমি আর কখনো দেখিনি।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ইউহ্‌রাউ'না' অর্থ দ্রুততার সঙ্গে আগমন করা। মুজাহিদ বলেছেন, শ্লথ ও স্বাভাবিক গতিতে আগমন করা। শাম্মার বিন আতিয়া বলেছেন, শ্লথ ও ত্বরিৎ কোনোটাই নয়, বরং এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ সমকামীরা তাদের স্বভাবের টানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হলো হজরত লুতের গৃহে। কামুস প্রণেতা বলেছেন, এ ধরনের চলনকে বলে 'হারা', যে গতি বিক্ষিপ্ত ও বেগবান।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিলো।' একথার অর্থ ওই লোকগুলো আগে থেকেই লিপ্ত ছিলো সমকামীতায়। বেহায়াপনা ছিলো তাদের সত্তাগত স্বভাব। এছাড়া আরো অনেক অপরাধে অভ্যস্ত ছিলো তারা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা।' একথার অর্থ— হে আমার স্বজাতি! আমার কন্যারা তো রয়েছে। তোমরা তাদের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ সম্পর্ক গড়ে তোল। এক বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে হজরত লুত ওই সকল যুবকের সঙ্গে তাঁর কন্যাদের বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জঘন্য স্বভাবের কারণে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হননি। তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সে কারণেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে চাননি, একথা ঠিক নয়। কারণ রসুলেপাক স. এর নবুয়ত লাভের পূর্বে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ ছিলো। তাই নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি স. তাঁর দুই কন্যাকে আবু লাহাবের পুত্র উকবা এবং রবীয়ার পুত্র আবুল আসের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তারা দু'জনেই ছিলো কাফের।

হোসাইন বিন ফজল বলেছেন, হজরত লুত তাঁর কন্যাগণের বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপনকালে যুবকদের উপর ইমান গ্রহণের শর্ত আরোপ করেছিলেন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'বানাতী' (আমার কন্যা) কথাটির অর্থ হবে আমার সম্প্রদায়ের কন্যাসকল। নবীগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য। তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের বিবাহযোগ্য কুমারী ও বিধবাদেরকে 'আমার কন্যা' বলে উল্লেখ করেছেন। কোরআন মজীদে উল্লেখিত একটি আয়াতে বলা হয়েছে — 'বিশ্বাসীগণের মধ্যে নবী হলেন সর্বোত্তম, আর তাঁর সহধর্মিণীগণ বিশ্বাসীদের মাতা।'এরপর হজরত উবাই বিন কা'বের ক্বেরাতে রয়েছে, ওয়াহুয়া আবুল লাহুম (আর তিনি হলেন তাদের পিতা)। অর্থাৎ রসুলে পাক স. হচ্ছেন সকল মুমিনের পিতা (আধ্যাত্মিক জনক)।

উল্লেখ্য যে, হজরত লুতের ঔরসজাত কন্যা ছিলো দু'জন। তাঁর সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক যুবকের জন্য দুই কন্যা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়। তাই এখানে 'আমার কন্যা' কথাটির অর্থ আমার স্বজাতির কন্যা সকল হওয়াই সমীচীন। একদল আলেম বলেন, এখানে 'আমার কন্যা' বলে হজরত লুত তাঁর আপন কন্যাদ্বয়কেই বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের মতে হজরত লুতের সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলো দু'জন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নেতা। ওই নেতৃদ্বয়ের সঙ্গেই তিনি বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর দুই কন্যাকে। ভেবেছিলেন, অত্যন্ত প্রতাপশালী দুই নেতা প্রশমিত হলে অন্যদেরকেও কুকর্ম থেকে ফেরানো হয়তো সম্ভব। কেউ কেউ আবার বলেছেন, হজরত লুত প্রদত্ত বিবাহের প্রস্তাবটি প্রকৃত প্রস্তাব ছিলো না। ছিলো অতিথিদেরকে অসম্মান থেকে বাঁচানোর একটি কৌশল।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদের জন্য এরা পবিত্র।' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, পুংমৈথুন পবিত্র, আর অযথার্থ স্ত্রীমৈথুন পবিত্রতর। বরং কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে, নির্লজ্জতার দিক দিয়ে নারীমৈথুন পুংমৈথুন থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঘৃণ্য। বৈবাহিক সূত্রে স্ত্রীমৈথুন অবশ্য পবিত্র। একথা বুঝাতেই 'তোমাদের জন্য এরা পবিত্র'— এরকম বলা হয়ে থাকতে পারে। বক্তব্য বিষয়টি আসলে এ রকম— ছিনতাই করা সম্পদের চেয়ে মৃত জন্তু ভক্ষণ পবিত্র। একথার অর্থ—লুণ্ঠন লব্ধ সম্পদ ও মৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ, দু'টোই অপবিত্র। তবে লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদ অধিকতর অপবিত্র ও নিষিদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?' একথার অর্থ— হে আমার উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায়? আল্লাহ্‌র কথা ভেবে শংকিত হও । পাপের জন্য তিনি শাস্তি প্রদান করবেনই। সুতরাং তোমরা সংযত হও। আমার সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে অপমান করে তোমরা আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। কী হলো তোমাদের! তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে সদুপদেশের মাধ্যমে তোমাদেরকে সংযত করতে পারে?

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, তুমি তো জানো, তোমাদের কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কী চাই তাতো তুমি জানোই।' একথার অর্থ— পাপিষ্ঠরা বললো, হে লুত! আমরা তো রমণী বিলাসী নই। সুতরাং তোমার কন্যাদেরকে নিয়ে আমরা কি করবো? আমরা কী পছন্দ করি তাতো তুমি জানোই। এই মুহূর্তে আমরা চাই তোমার অতিথি বালকদের।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ○ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○

❒ সে বলিল, 'তোমাদিগের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি আশ্রয় লইতে পারিতাম কোন শক্তিশালী দলের।'

❒ তাহারা বলিল,'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ পিছন দিকে চাহিও না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাইবে না। উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

❒ অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি নগরগুলিকে উল্‌টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম কংকর

❒ যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এই স্থান সীমালংঘন-কারীদিগ হইতে দূরে নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দুরাচারদের দাপট ও আস্ফালন দেখে হজরত লূত অসহায় বোধ করলেন । বললেন, তোমাদের উপর যদি আমি শক্তি প্রয়োগ করতে পারতাম অথবা এই মুহূর্তে যদি কোনো শক্তিশালী দলের সাহায্য পেতাম। অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ একটি পারিবারিক অথবা সামাজিক সংঘবদ্ধ দল যদি আমার থাকতো, তবে আজ আমার পরিবার ও অতিথিবৃন্দকে নিরাপদ রাখতে পারতাম। 'রুক্‌নিন্ শাদীদ' কথাটির মাধ্যমে এখানে পারিবারিক সংঘবদ্ধতাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'রুকন্' অর্থ শক্তিশালী বাহু, শক্তির সকল উৎস । যেমন, সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী, প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা লুতের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করুন; তিনি রুক্নিন্ শাদীদের শরণপ্রার্থী হয়েছিলেন। ভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় 'করুণা করুন' কথাটির স্থলে রয়েছে 'মার্জনা করুন'।

জুহাক সুত্রে জারীর ও মুকাতিলের পদ্ধতিতে ইবনে আসাকের ও ইসহাকের বর্ণনায় এবং বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— হজরত লুত তখন হয়ে পড়েছিলেন গৃহবন্দী। অতিথিবৃন্দও হয়েছিলেন অবরুদ্ধ। গৃহাভ্যন্তর থেকেই তিনি দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিকৃত রুচির লোকগুলোকে কিছুতেই প্রশমিত করতে পারছিলেন না তিনি। শেষে পাষণ্ডরা তাঁর গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবীকে দেখে অতিথিরা তখন বললেন—

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে লুত! আমরা তোমার পালনকর্তা প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে নবীপ্রবর! আমরা আপনার প্রভুপালক কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং আমাদের কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তাদের নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে এবার প্রাচীরের দরজা খুলে দিতে পারেন। হজরত লুত বহির্বাটির দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। পঙ্গপালের মতো গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করলো দুর্বৃত্তরা। আল্লাহ্পাকের অনুমতি নিয়ে হজরত জিবরাইল তখন আবির্ভূত হলেন স্বরূপে। সামান্য সঞ্চালন করলেন তাঁর ডানা। তাতেই তারা হয়ে গেলো অন্ধ। আর অগ্রসর হতে পারলো না। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করলো। চিৎকার করে একে অপরকে বলতে লাগলো, পালাও, পালাও। লুতের বাড়ীতে এসেছে মস্ত যাদুকর। তারা আমাদেরকে যাদু করেছে। আরো বলতে লাগলো, দাঁড়াও ভোর হতে দাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আমরা শেষ বুঝাপড়া করবো। হজরত লুত দুর্বৃত্তদের কথায় এবার ভয় পেলেন না মোটেও। ফেরেশতাদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আযাব শুরু হবে কখন? ফেরেশতারা বললেন, ভোর বেলা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন ফিরে চেয়ো না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না ।' 'ক্বিত্বই'ম্ মিনাল লাইল' অর্থ রাতের এক অংশে। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, রাতের অবশিষ্ট অংশে। কাতাদা বলেছেন, নিশীথের প্রথমার্ধ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। কেউ কেউ বলেছেন, সুবহে কাজেবের সময়। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরেশতারা বললেন, হে নবীপ্রবর! আপনি রাত্রির শেষ ভাগে পরিবার-পরিজনসহ গৃহ থেকে

নিষ্ক্রান্ত হবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেনো পশ্চাতে দৃষ্টি না ফেরায়। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ রাতে বের হওয়ার নির্দেশটি সরাসরি ছিলো হজরত লুতের প্রতি। আর পেছনে না তাকানোর নির্দেশটি ছিলো তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি।

'কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না' কথাটির অর্থ, হে লুত! শেষ রাতের ওই যাত্রায় তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পত্নীকে সঙ্গে নিতে পারবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই যাত্রায় তোমার পত্নী ব্যতীত অন্য কেউ পশ্চাতে ফিরে তাকাবে না। বাগবী বলেছেন, নির্দেশটি ছিলো এ রকম— স্ত্রীকে না নিয়েই আপনি রাতের শেষ ভাগে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন। তাকে সঙ্গিনী করা যাবেই না। কারণ তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে অবাধ্যদের সঙ্গে। এই মর্মার্থটির পোষকতা লক্ষ্য করা যায় হজরত ইবনে মাসউদের উচ্চারণ রীতিতে। তিনি 'ফা আসরি বি আহ্‌লিকা' এর পরে পড়েছেন 'ইল্লাম রাআতাকা'। এ সম্পর্কে আবার রয়েছে দু'টি বিবরণ। একটিতে হজরত লুত তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় যাত্রা পথে পদবিক্ষেপকালে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা তাঁর স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের প্রতি নিষিদ্ধ ছিলো। তাঁর স্ত্রীর মনের টান ছিলো কাফেরদের সঙ্গে। তাই সে পিছনে না তাকিয়ে পারেনি। অবাধ্যদের প্রতি ভয়ংকর আযাব দেখে সে বলে উঠেছিলো, হায়! আমার স্বজাতি যে ধ্বংস হয়ে গেলো। অন্য বিবরণটিতে এসেছে— হজরত লুতের প্রতি নির্দেশ ছিলো স্ত্রীকে ছাড়াই যাত্রা করতে হবে। কারণ সে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দলভূত। বিবরণ দু'টো পরস্পর বিরুদ্ধ। যে কোনো একটিকে গ্রহণ করলে অবশ্য সমস্যা আর থাকে না। তবে সেটাও দুর্বোধ্য। আল্লাহ্‌ই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল।' একথার অর্থ— হে লুত! অবাধ্যদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত হবে, তোমার স্ত্রীকেও স্পর্শ করবে সেই শাস্তি। বলা বাহুল্য যে, হজরত লুতের স্ত্রী ছিলো কাফের। কিন্তু সে নবীর পরিবারভুক্ত ছিলো কিনা সে সম্পর্কে কোরআন ব্যাখ্যাদাতাগণ একমত নন। যে অর্থে হজরত নুহের পুত্র কিনান প্লাবন পূর্ব সময়ে নবী-পরিবারভুক্ত বলা যায়, সেই অর্থেই আযাব আপতিত হওয়ার পূর্বে হজরত লুতের ওই কাফের স্ত্রীকে নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ও স্থায়ী অর্থে কিনান ও হজরত লুতের স্ত্রী কেউই নবী-পরিবারভূত নয়। তাই হজরত নুহের পুত্র কিনান সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। আর আলোচ্য আয়াতে হজরত লুতের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো............কিন্তু তোমার স্ত্রী যাবে না। ভিন্ন পাঠ অনুসারে— তোমার স্ত্রী ব্যতীত কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না বা

পিছনে ফিরে তাকাবে না। অর্থাৎ হে লুত! তোমার ওই স্ত্রী পিছনে পড়ে থাকুক অথবা পিছনে ফিরে দেখুক, তাতে করে তোমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। অন্যান্য অবাধ্যদের মতো তার জন্যও নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি। এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবতঃ হজরত লুত তাকে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছিলেন অথবা সে নিজেই পিছনে পড়ে থেকে কিংবা পিছনে তাকিয়ে শাস্তি অবলোকন করেছিলো এবং নিজেও হয়েছিলো শাস্তির শিকার।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?' একথার অর্থ— অতি প্রত্যুষে শাস্তি আপতিত হবে, এটাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ। একথা জানতে পেরে হজরত লুত নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি কামনা করলেন প্রত্যুষের আগেই যদি শাস্তি আপতিত হতো। তাঁর এমতো মনোভাব লক্ষ্য করে ফেরেশতাবর্গ বললেন, আর এক প্রহর মাত্র। প্রত্যুষতো নিকটেই। নয় কি?

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে—'অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম কংকর।' একথার অর্থ— প্রেরিত ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমার আদেশ কার্যকর হলো। তাদের মাধ্যমে আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি। প্রস্তর বর্ষণ ও নগরগুলোকে উল্টিয়ে দেয়ার কাজ করেছিলেন ফেরেশতারা। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে 'উল্টিয়ে দিলাম' ও 'বর্ষণ করলাম'। অর্থাৎ ফেরেশতাদের কর্মকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের কর্ম বলে প্রকাশ করেছেন। নির্দেশদাতা তিনিই। তাই এখানে এ রকম বাকভঙ্গি সন্নিবেশিত হয়েছে। আর এতে করে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র হুকুমই সর্বোচ্চ।

বাগবী লিখেছেন, পাঁচটি পৃথক শহরে বসবাস করতো হজরত লুতের সম্প্রদায়। হজরত জিবরাইল ওই জনপদগুলোর নিম্নে প্রবেশ করালেন তাঁর একটি ডানা। তারপর শহরসহ শহরের অধিবাসীদেরকে উত্তোলন করলেন অনেক উপরে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তখন ওই শহরগুলোর মোরগ ও কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। গৃহবাসীরা তখন ছিলো ঘুমন্ত। হজরত জিবরাইল শহরগুলোকে আকাশে উঠিয়ে দিলেন এমনভাবে যে, কোনো গৃহের তৈজসপত্রও সামান্য স্থানচ্যুত হয়নি। নিদ্রাভঙ্গও হয়নি গৃহবাসীদের। এভাবে শহরগুলোকে তিনি উল্টিয়ে পুনরায় সজোরে প্রোথিত করলেন মৃত্তিকায়। শহরগুলোর মোট জনসংখ্যা ছিলো পাঁচ লাখ। মতান্তরে পাঁচ কোটি। এখনও চিহ্ন রয়েছে সেগুলোর। সেই স্থানটিকে এখনও বলা হয় মু'তাফিকাত (উল্টানো জনপদ)। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

'হিজারাতাম মিন সিজ্জীল' অর্থ—বর্ষণ করলাম কংকর। উল্লেখ্য যে, ওল্টানো অবস্থায় ওই পাঁচটি জনপদ মৃত্তিকায় প্রোথিত করার পর সেগুলোর উপর বর্ষণ করা হয়েছিলো প্রস্তর লোষ্ট্র। এ রকমও হতে পারে যে, যে সকল দুরাচার জনপদগুলোর বাইরে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলো, প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিলো তাদের উপরে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'সিজ্জীল' হচ্ছে এক ধরনের কঠিন শিলা। কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ গলিত মাটি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— লি নুরসিলা আ'লাইহিম হিজারাতাম্ মিন্ত্বীন। মুজাহিদ বলেছেন, প্রথমে বর্ষিত হয়েছিলো প্রস্তর এবং পরে শুষ্ক মৃত্তিকা। প্রস্তর যাঁরা বলেছেন, তাঁরা যথার্থই বলেছেন। কারণ পলিমাটি থেকেই গঠিত হয় পাললিক শিলা। জুহাক বলেছেন, 'সিজ্জীল' হচ্ছে পাকা ইট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নিক্ষেপ করা হয়েছে 'এমন' প্রস্তর। অথবা বলা যেতে পারে খোদিত পাষাণ। ওই পাষাণের টুকরোগুলোর উপর খোদিত ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর নাম। কেউ কেউ বলেছেন, 'সিজজীল শব্দটি এসেছে'সিজ্জীন' থেকে। 'সিজ্জীল' একটি দোজখের নাম। এখানে 'নুন' অক্ষরটির বদলে 'লাম' বসেছে মাত্র। কেউ কেউ আবার বলেছেন, আকাশের একটি পাহাড়ের নাম 'সিজ্জীল'। আর 'মান্‌দুদ্' শব্দটির অর্থ এখানে স্তরিভূত অবস্থায় বা স্তরে স্তরে সাজানো অবস্থায় অথবা ক্রমাগত।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে—'যা তোমার প্রতিপালকের নিকটে চিহ্নিত ছিলো।' ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ওই পাথরগুলো ছিলো পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সেগুলো ধরাপৃষ্ঠের পাথরের মতো ছিলো না। কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন পাথরগুলো ছিলো রক্তিম রেখাবিশিষ্ট। হাসান এবং সুদ্দী বলেছেন, সীলমোহর অঙ্কিত। অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্তব্যদের নাম নির্দিষ্ট করে লিপিবদ্ধ ছিলো প্রতিটি পাথরে।

শেষে বলা হয়েছে—'এই স্থান সীমালংঘনকারীদের থেকে দূরে নয়।' এখানে সীমালংঘনকারী বা জালেম বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও ইকরামার মতানুসারে এখানে জালেম বলে বুঝানো হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত দুরাচারদেরকে। কাতাদার এই মতকে সমর্থন করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ। অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছেন, এখানে এই হুঁশিয়ারীটি নিহিত রয়েছে যে, এই উম্মতের অন্তর্ভূত জালেমদের উপরেও অনুরূপ প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। অর্থাৎ এরাও হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মতো শাস্তিযোগ্য।

কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্পাক সেদিন কোনো জালেমকেই বাঁচিয়ে রাখেননি। বাগবী লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের কতিপয় উদ্ধৃতিতে এ রকমই বলা হয়েছে যে, সেদিন কোনো জালেমই প্রস্তরখণ্ডগুলোর লক্ষ্যস্থলের বাইরে ছিলো না। সুনির্দিষ্ট সময়ে পাথরগুলো তাদেরকে আঘাত করেছিলো। রসুল স.

একবার আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জালেম সম্পর্কে হজরত জিবরাইলের নিকটে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা জালেম তারাই এই আয়াতের লক্ষ্য। আর এমন কোনো জালেম নেই যে ওই পাথরের লক্ষ্যবস্তু নয়। যে কোনো মুহূর্তে তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হতে পারে। দুর্‌রে মনসুর গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপটে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, রবী বিন আনাস বলেছেন, এ সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তা হচ্ছে, প্রতিটি জালেমের দিকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে একটি করে পাথর। ওই পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশের জন্য সতত প্রতীক্ষ্যমাণ। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'হিয়া' (এই স্থান) সর্বনামটি ওই জনপদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে জনপদটি মক্কার মুশরিকদের সিরিয়ায় গমন পথের এপাশে অথবা ওপাশে অবস্থিত। 'হিয়া' সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক হওয়া সত্ত্বেও এখানে পুংলিঙ্গবাচক 'বায়িদ' ব্যবহৃত হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে পাথর ও স্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهٗ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

❐ মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করিতেছি শাস্তি এক সর্বগ্রাসী দিবসের।'

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না'

❒ 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্-অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম; আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।'

❒ উহারা বলিল, 'হে শোয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদিগকে তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা খুশি করিতে পারিব না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।'

হজরত ইব্রাহিমের এক পুত্রের নাম ছিলো মাদ্ইয়ান। মাদিয়ান জনপদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাঁরই নামানুসারে। মাদিয়ানবাসীরা ছিলো আল্লাহ্র অবাধ্য। বেচাকেনার সময় ওজনে কম দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তারা। এই ভয়াবহ অপরাধ থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন তাদের স্বগোত্রীয় হজরত শোয়াইবকে। মাদিয়ানবাসী অথবা মাদ্ইয়ানের বংশভূতদেরকে লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলো। সত্য ধর্মের মূল কথা তওহীদ (আল্লাহ্র এককত্বের উপরে বিশ্বাস)। তাই এখানে নবী শোয়াইব প্রথমে তাঁর সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন তওহীদের প্রতি। তারপর সচেতন করে দিয়েছেন ওজনে কম দেয়ার মতো গর্হিত অপরাধ সম্পর্কে। প্রথমোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে—'মাদিয়ানবাসীদের নিকটে তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই, মাপে ও ওজনে কম কোরো না'

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি শাস্তি এক সর্বগ্রাসী দিবসের।' একথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বললেন, তোমরা তো ধনবান। কিন্তু এভাবে মাপে ও ওজনে কম দিয়ে মানুষ ঠকাও কেনো? এরকমও বলা যেতে পারে যে— আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছেন। সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হও ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায্য পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত কোরো না। যদি এই অপরাধ থেকে তওবা না করো, তবে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রদত্ত ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিবেন। আর তোমরা পতিত হবে ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত শোয়াইব তাঁর সম্প্রদায়কে এইমর্মে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন যে, যদি তোমরা এ অপকর্ম পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ্পাক তাঁর সকল নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবেন। তখন প্রাত্যহিক দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য হয়ে

পড়বে মহার্ঘ। এভাবে আল্লাহ্র আক্রোশ আপতিত হবে তোমাদের উপর। 'এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আমার আশংকা হচ্ছে নেপথ্যের শাস্তি তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা এসে পড়েছো ধ্বংসের তটভূমিতে। 'মুহীত্ব' শব্দটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন— ধ্বংসকারী। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— মহাপ্রলয়ের তুর্য-নিনাদ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপ দিবে ও ওজন করবে।' পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে মাপে ও ওজনে কম দেয়ার নিষিদ্ধতা। আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ন্যায়সংগতভাবে মাপ ও ওজনের আদেশ। এভাবে একবার নিষেধ ও আরেকবার আদেশের মাধ্যমে বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। এতে করে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাপে ও ওজনে কম দেয়া যেমন ক্ষতিকর, তেমনি যথাযথরূপে মাপ ও ওজন করা একটি কর্তব্য। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোনো ব্যবসায়ী বিশুদ্ধ মাপে পণ্য ক্রয় করার পর বিক্রয়ের সময় পুনরায় মাপ ও ওজন সহকারে বিক্রয় না করলে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এরকম মাপ ও ওজনহীন সামগ্রী সে নিজে ব্যবহারও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না। রসুলেপাক স. পরিমাপহীন কোনো খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেননি। তাঁর সময়ে 'সা', 'ওসক' ইত্যাদি পরিমাপের প্রচলন ছিলো। তখনও অনুমান-ভিত্তিক কোনো ক্রয় বিক্রয় হতো না। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা, ইসহাক ও ইবনে আবী শায়বা। তবে হাদিসটির এক বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। হাদিসটি আবার ভিন্ন সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাস এবং হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে ওই বর্ণনাসূত্রগুলোও শিথিল। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটি বহু সূত্রসম্বলিত ও হাদিসের ইমামগণ কর্তৃক অনুমোদিত। তাই হাদিসটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এর অনুমোদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ।

রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, ওজন করার সময় পাল্লা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ো। নবী-সমাজ এভাবেই পরিমাপ করে থাকেন। সুয়াইদ বিন কয়েস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকেম ও ইবনে হাব্বান। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে—'লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না।' একথার অর্থ— মানুষের প্রাপ্য অধিকার খর্ব করবে না। এতে করে বুঝা যায়, সঠিক মাপ ও ওজন ক্রেতার প্রাপ্য। সেই প্রাপ্য আত্মসাৎ করাকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।' এখানে উল্লেখিত 'তা'ছাও' শব্দটি ক্রিয়ামূল (মাসদার)। শব্দটির মাধ্যমে কারো অধিকার হরণসহ সব ধরনের অপকর্মকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিদ্বানগণ বলেছেন, 'বখছ' শব্দটির অর্থ— কর ইত্যাদি ব্যবহারিক জীবনের অধিকার হরণ। আর 'তা'ছাও' অর্থ— লুণ্ঠন, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি ব্যক্তিগত অধিকার হরণ।

একটি জটিলতাঃ 'তা'ছাও' অর্থ যদি অপকর্ম, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা বা ফাসাদ হয়ে থাকে তবে, এখানে 'মুফ্‌সিদীন' শব্দটির উল্লেখ করা হলো কেনো?

জটিলতার জবাবঃ কোনো কোনো বিষয় দৃশ্যতঃ ফাসাদ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা ফাসাদ নাও হতে পারে। যেমন হজরত খিজিরের বালক হত্যা, নৌকা নষ্ট করা ইত্যাদি। এ ধরনের ফাসাদ বর্ণিত বিধানের আওতামুক্ত। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে 'মুফ্‌সিদীন' (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) কথাটির অর্থ হবে ধর্মীয় বিধি-বিধান লংঘনকারী, জাগতিক রীতি-নীতি ভঙ্গকারী, অনাসৃষ্টির উপস্থাপক।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লহ্-অনুমোদিত যা থাকবে তোমাদের জন্য তা উত্তম।' একথার অর্থ— মাপ ও ওজনে কম দিয়ে হারাম পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পদ অপেক্ষা সঠিক মাপ ও ওজনের মাধ্যমে অর্জিত হালাল উপার্জন তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা মুমিন হও। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ বলেছেন,'আল্লাহ্-অনুমোদিত যা থাকবে' কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানানুসারে ব্যবসা করলে যে উদ্বৃত্ত বা লাভ থাকবে । যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল বাকিয়াতুস্ সলিহাতু খইর। 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' কথাটির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য ফলপ্রসূ হবে তখনই, যখন তোমরা হবে মুমিন। ফলকথা পুণ্যকর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইমান শর্ত। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— যদি তোমরা প্রকৃতই আমার নির্দেশ মান্য করো, তবে মাপ-পরিমাপ সম্পর্কে যে বিধান দেয়া হলো তা কার্যকর করে দেখাও।

শেষে বলা হয়েছে—'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।' একথার অর্থ হজরত শোয়াইব বললেন, স্বজাতি আমার! একথা যেনো কিছুতেই ভেবে বোসো না যে আমি তোমাদেরকে তোমাদের অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবো। তারপর তোমাদের এই পুণ্যের জন্য তোমাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবো। আমি তো কেবল সদুপদেশদানকারী প্রচারক। আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করাই আমার কর্তব্য। বিধান পালন করা না করা তোমাদের ব্যাপার। অথবা বাক্যটির মর্ম দাঁড়াবে এরকম— আমি কি এ কথা বলে তোমাদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবো যে,

অপকর্ম পরিত্যাগ না করলেও আল্লাহ্‌র করুণারাশি তোমাদের প্রতি প্রবহমান থাকবে? একথা বলে তোমাদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা আমার পক্ষে তো সম্ভবই নয়।

এরপরের আয়াতে(৮৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে শোয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার উপাসনা করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা খুশী তা করতে পারবো না?' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত শোয়াইব অত্যধিক নামাজ পাঠ করতেন। তাই তাঁর সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের কথাবার্তায় 'তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয়'— বলে নামাজের প্রসঙ্গ টেনে আনতো। আ'মাশ বলেছেন, এখানে 'সালাত' অর্থ নামাজ আদায় করা। হজরত শোয়াইব তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন তওহীদের প্রতি। অথচ তারা তাঁর নামাজ আদায়কে বানিয়েছিলো উপহাসের অনুষঙ্গ। ইঙ্গিতে তারা বলতে চাইতো, তোমার আহ্বান কার্যের উদ্দেশ্য তো ওই একটিই— নামাজী বানিয়ে দেয়া। এই কাজটিই তোমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়েছে। এটা নিশ্চয় সুস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট লোকের কাজ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অহমিকাবশতঃ হজরত শোয়াইবকে বলেছিলো, হালীম (সহিষ্ণু) ও 'রশীদ' (সদাচারী)। তাদের বক্তব্য ছিলো আসলে এরকম— তুমি তো বাপু সাদাসিধে গোবেচারা। এভাবে উদ্দেশ্যের বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করা আরবীভাষীদের একটি রীতি। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হজরত শোয়াইবকে সহিষ্ণু ও সদাচারী বলেছিলো উপহাসার্থে। এভাবে তাঁকে বিদ্রূপবানে জর্জরিত করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। কেউ কেউ আবার বলেছেন, বিষয়টি এরকম নয়। হজরত শোয়াইবের সহিষ্ণুতা ও সদাচার সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই জানতো। তাঁকে সহিষ্ণু ও সদাচারী বলে মানতোও । সুতরাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম, হে শোয়াইব! তুমি তো অতি বিচক্ষণ ও সজ্জন। তোমার সহনশীলতা ও উত্তম আচরণ সম্পর্কেও আমরা জানি। তাই তোমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তুমি আমাদেরকে পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলবে কেনো? আর কেনোই বা বলবে, আমাদের ধনসম্পদ আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবো না? উল্লেখ্য যে, হজরত সালেহের স্বগোত্রীয়রাও বলেছিলো এরকম। তারা বলেছিলো— 'ক্বদ্ কুনতু ফিনা মারজু ক্বলু হাজা' (ইতোপূর্বে আমরা এরূপ আশা করেছিলাম)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অবাধ্যদের বক্তব্যবিষয় হবে এখানে এরকম— হে শোয়াইব! তোমার ধারণামতে তুমি সহিষ্ণু ও সদাচারী। কাজেই এমন কথা তুমি বলো কেনো?

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ
اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ
مِّثْلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ
مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব, আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করিতে চাহি। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহেরই সাহায্যে; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী;

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত মতানৈক্য যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন আচরণ না করায় যাহাতে তোমাদিগের উপর তাহার অনুরূপ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।'

❒ 'তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।'

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আমাকে বলো, আমি যদি আমার প্রভুপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর নিকট থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবো? 'বাইয়্যেনাত'

অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, দলিল বা নিদর্শন। 'মির্‌রব্বী' অর্থ আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ আমার প্রভুপালকের পক্ষ থেকে ওহী ও নবুয়তের মাধ্যমে। 'রাজাক্বানী মিনহু' অর্থ বিনা শ্রমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত রিজিক বা জীবনোপকরণ। 'রিজক্বান্‌ হাসানা' অর্থ হালাল রিজিক। শোনা যায় হজরত শোয়াইব ছিলেন বিত্তশালী। তবে কথাটির কোনো ভিত্তি নেই। 'ইন্‌কুনতু' কথাটির 'ইন্‌' হচ্ছে শর্তসূচক অব্যয়। কিন্তু ফলাফল এখানে অনুল্লেখিত। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার দেশবাসী! আল্লাহ্‌পাক যখন আমাকে প্রত্যাদেশ ও নবুয়তের মাধ্যমে দূরদর্শীতা দান করেছেন, আরো দান করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে শ্রমহীন হালাল রিজিক, তখন কি করে এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে যে, আমি তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে চলবো, ওহীর অবমাননা করবো এবং তাঁর বাণী প্রচার না করবো? এটা যে আমার কর্তব্য।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না।' একথার অর্থ হজরত শোয়াইব আরো বললেন, কী ভেবেছো তোমরা? আমি কি তাই করবো, যা তোমাদেরকে নিষেধ করে থাকি। তোমাদের কর্মকাণ্ড যদি শুদ্ধ হতো, তবে আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করবো কেনো? আমিই বা তা থেকে বিরত থাকবো কেনো? বরং আমি তোমাদের জন্য যা শুভ মনে করি, আমার নিকটও তা শুভ। আর তোমাদের জন্য যা অশুভ মনে করি, আমার জন্যও তা অশুভ। আমিই তো তোমাদের একান্ত সুহৃদ।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই।' একথার অর্থ— হে মাদিয়ানবাসী! আমি তো আল্লাহ্‌র নবী। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ। আমি যে তাঁর বার্তাবাহক। তাই আমি আহ্বান জানাই তওহীদের প্রতি। আহ্বান জানাই বিশুদ্ধ জীবনের প্রতি। তাই তো তোমাদেরকে বলি, মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। এ রকম অপকর্মের পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। এভাবে আমি তোমাদের বিশ্বাসগত এবং কর্মগত স্খলনের সংশোধন করতে চাই। সুসজ্জিত করে দিতে চাই তোমাদের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর জীবনকে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌র সাহায্যে।' একথার অর্থ—আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্‌র সমর্থনধন্য না হলে আমার এই শুভ প্রচেষ্টা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। এখানে 'তওফীক' শব্দটির অর্থ অভীষ্ট লাভের উপকরণসমূহ, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে যথাসামর্থ্য লাভ।

শেষে বলা হয়েছে—'আমি তাঁর উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।' একথার অর্থ আমি জানি আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টি তারই মুখাপেক্ষী। সেকারণেই আমি তো কেবল তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর অভিমুখী হয়েই জীবন কাটাতে চাই। ভালো ও মন্দ সব কিছুই সোপর্দ করি তাঁর প্রতি। এখানে 'ইলাইহি উনীব্' কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে—পৃথিবীর জীবন শেষে আমি তো তাঁর নিকটেই ফিরে যাবো। 'ইনাবাত্' শব্দটির অর্থ প্রতিটি কর্মে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রতীতি ও সামর্থ্য কামনা করা। সকল কামনা বাসনা তাঁরই প্রতি নিবেদিত করা। মূল কথা এই যে, হজরত শোয়াইব তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের পরোয়া আমি করি না। তোমাদের বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী আমি নই। আমি তো আল্লাহ্তে সমর্পিত। আমি তো তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকামী। হজরত শোয়াইবের এই কথাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে তওহীদের এক অমোঘ দৃঢ়তা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাঁর এই কথাটি একটি তির্যক তিরস্কার।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে মতানৈক্য যেনো কিছুতেই তোমাদেরকে এমন আচরণ না করায় যাতে তোমাদের উপর অনুরূপ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিলো নুহের সম্প্রদায়ের উপর, হুদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালেহের সম্প্রদায়ের উপর।' একথার অর্থ, হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার গোত্র! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করে চলেছি সত্যের দিকে। আর তোমরা করে চলেছো ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ। আমি তাই বলি, ক্ষান্ত হও এবার। সংযত হও। বিরুদ্ধাচরণকে প্রকট অথবা প্রলম্বিত করে হজরত নুহ, হজরত হুদ ও হজরত সালেহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মতো প্লাবন, ঝঞ্ঝাবায়ু ও ভূমিকম্পের মতো আযাব ডেকে এনো না। এখানে 'শিক্বাক্ব' শব্দটির অর্থ শত্রুতা, মতানৈক্য, জেদ।

শেষে বলা হয়েছে—'আর লুতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।' একথার অর্থ— হে মাদিয়ানবাসী। হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ঘটনা তো বেশী দিনের নয়। তাই তাদের পরিণতির কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারো। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— হে মাদিয়ানবাসী! হজরত লুতের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয় তো তোমাদের জনপদ থেকে বেশী দূরে নয়। ওই বিরান স্থানটি চাক্ষুষ করেও তো তোমরা তোমাদের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারো। কথাটির মর্ম এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— হে মাদিয়ানের লোকেরা! অপকর্ম ও অবিশ্বাসের দিক থেকে তোমাদের ও হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য তো বেশী নয়। উল্লেখ্য যে, আয়াতের শেষ শব্দটি একবচনবোধক। এর বহুবচনবোধক শব্দরূপও একই রকম। ক্বরীব-বায়ীদ, ক্বলীল, কাছীর— এই শব্দগুলোরও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ এক।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করো; আমার প্রতিপালক

পরম দয়ালু। প্রেমময়।' একথার অর্থ—হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের বিগত জীবনের অপকর্মসমূহের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হও। লজ্জা ও অনুতাপজর্জরিত অন্তরে প্রত্যাবর্তন করো তাঁর দিকে। একান্ত তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার প্রভুপালক প্রভূত করুণাপরবশ ও প্রেমময়। এখানে উল্লেখিত 'ওয়াদুদ' শব্দটি কর্তৃ ও কর্ম উভয় কারকের অর্থ প্রকাশক। আল্লাহ্পাক যেমন বিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন, তেমনি বিশ্বাসী বান্দারাও ভালোবাসেন তাঁকে। এভাবে তিনি কখনো প্রেমিক, কখনো প্রেমাস্পদ।

পূর্ববর্তী আয়াতে (৮৯) প্রদর্শিত হয়েছিলো আল্লাহ্র আযাবের ভয়। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে ক্ষমা ও ভালোবাসার কথা। হজরত শোয়াইব তাঁর বক্তব্যের শেষপাদে বলেছেন, আমার প্রভুপালক পরম দয়ার্দ্র ও প্রেমময়। এভাবে ভীতিপ্রদর্শনের পর আশার সঞ্চার করাই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষগণের রীতি।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ
اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ○ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○

❑ উহারা বলিল, 'হে শোয়াইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, আমাদিগের উপর তুমি শক্তিশালী নহ।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী?' তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিবেষ্টন করিয়াছেন;

❒ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক; আমিও আমার কাজ করিতেছি; তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❒ যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শোয়াইব ও তাহার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম, অতঃপর তাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহা নাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল;

❒ যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানবাসীদিগের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্প্রদায়।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে শোয়াইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না'। একথার অর্থ— মাদিয়ানবাসীরা বললো, হে শোয়াইব! তুমি কি বলো না বলো আমরা তো বুঝতেই পারি না। আমাদেরকে পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে কেনো, মাপ ও ওজনই বা ঠিক করতে হবে কেনো? তোমার যুক্তি প্রমাণ শুনেই বা আমাদের কী লাভ? উল্লেখ্য যে, মাদিয়ানবাসীদের মেধা ও চেতনা শক্তি ছিলো অস্বচ্ছ। তাই তারা নবীর হৃদয়স্পর্শী বচন সম্পর্কে এ রকম বলতে পেরেছিলো। অথবা হজরত শোয়াইবের পৌত্তলিকতাবিরোধী ও সততপূর্ণ কথার প্রতি ছিলো তাদের আন্তরিক ঘৃণা। খোলা মন নিয়ে তারা তাঁর কথা শুনতো না। তাই অধিকাংশ উপদেশই তাদের বুঝে আসতো না।

আমি বলি, প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্তায়ালা মাদিয়ানবাসীদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। তাই তারা হজরত শোয়াইবের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো না। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষের হৃদয় আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যহীন করতলে। তিনি যে দিকে ইচ্ছা তাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে দেন।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখছি।' একথার অর্থ— তোমার তো আত্মরক্ষার মতো শক্তিও নেই। এখানে 'দ্বয়ীফা' অর্থ হীন, প্রতাপ-প্রতিপত্তিহীন, ঘৃণ্য। বাগবী বলেছেন, দৃষ্টিশক্তিহীন। অর্থাৎ হজরত শোয়াইব ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন। আরবী প্রচলিত অর্থানুসারে এ রকমই বলতে হয়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'ফীনা' (আমাদের মধ্যে)। সুতরাং হজরত শোয়াইব অন্ধ ছিলেন, এরকম বলা যায় না। তাই 'দ্বয়ীফা' অর্থ হবে এখানে অদূরদর্শী অথবা দুর্বল।

দ্রষ্টব্যঃ মোতাজিলারা বলে অন্ধ ব্যক্তি যেহেতু সাক্ষ্যদাতা ও বিচারক হতে পারে না, তাই তারা নবুয়তের অযোগ্য। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ সাক্ষ্যদান ও বিচারকার্যের জন্য চক্ষুষ্মান হওয়া জরুরী। কিন্তু নবুয়ত ও রেসালতের দায়িত্বটি সে রকম নয়। হজরত ইয়াকুব ছিলেন সত্য পয়গম্বর। পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নবীই ছিলেন। কোরআন মজীদে ঘটনাটির উল্লেখও রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম।' বাগবী লিখেছেন, হজরত শোয়াইবের নিকটজনেরা ছিলো প্রতাপশালী। তারাই তাঁকে নিরাপদ রাখতো। বায়যাবী বলেছেন, মাদিয়ানবাসীরা বলতো, হে শোয়াইব! তোমার স্বজনেরা আমাদের স্ব-ধর্মভূত। তারা আমাদের সম্মানের পাত্র। যদি তা না হতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তারা প্রতাপশালী ছিলো না। কারণ স্বজনবর্গ বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাহাত'। রাহাত বলে তিন থেকে দশজন পুরুষের সমষ্টিকে। আর এই নগণ্যসংখ্যক লোককে প্রতাপশালী বলা যায় না।

আমি বলি, প্রথমোক্ত বক্তব্যটির সমর্থনে 'তিস্‌য়াতু রাহাত' (নয় রাহাত) আয়াতটি ধর্তব্য। জুহুরী লিখেছেন, দশের কম লোকের দলকে বলে রাহাত। কেউ কেউ বলছেন, চল্লিশ জনের দলকে বলা হয় রাহাত। নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, রাহাত বলা হয় নারীবর্জিত দশজনের নিম্নসংখ্যার দলকে। শব্দটির এক বচন নেই। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বাগবীর বক্তব্য কামুস রচয়িতার বক্তব্য সদৃশ।

এরপর বলা হয়েছে—'আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।' একথার অর্থ—তারা বললো, হে শোয়াইব! তুমি এমতো ক্ষমতা রাখো না, যাতে করে আমাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারো। উল্লেখ্য যে, মূর্খেরা যথার্থ যুক্তি প্রমাণের মোকাবিলা না করতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়। আশ্রয় নেয় গালাগালির। মাদিয়ানবাসীদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো। হজরত শোয়াইবের সুললিত বাণী ও প্রমাণসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে তারা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অসংলগ্ন ও অসমীচীন কথাগুলো বলেছিলো। কিন্তু হজরত শোয়াইবের বংশ মর্যাদা ছিলো সর্বোচ্চ। বংশমর্যাদার প্রতি সমীহবোধের কারণে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা তাঁকে অপদস্থ করতে পারতো না।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছো।' একথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বললেন, হে আমার নির্বোধ সম্প্রদায়! তোমরা আমার বংশের প্রভাবে আমাকে হত্যা করছো

না। অথচ আল্লাহ্পাক নবুয়তের মতো যে অমূল্য সম্পদ আমাকে দান করেছেন, তার মর্যাদার প্রতি তোমাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। তোমরা তো বোধ ও বুদ্ধিহীন, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত। তোমাদের দ্বিধা-সংকোচ, ভয়-ডর বলে কিছু নেই। নয়তো মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্র নবীর প্রতি তোমরা এভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারতে না। কী মনে করো তোমরা? আমার স্বজনবর্গ কি মহাবিশ্বের একক অধীশ্বর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? এখানে 'আরাহত্বী' শব্দের 'হামযা' অক্ষরটির কারণে উদ্ধৃত বাক্যটি হয়েছে একটা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইসতেফ্হামে ইনকারী)। এ ধরনের বাক্য তিরস্কারপ্রকাশক। 'ইত্তিখাজ্ তুমুহূ ওয়ারাআকুম জিহ্রিয়্যা' কথাটির শাব্দিক অর্থ তাকে তোমরা তোমাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছো। আর মর্মার্থ হচ্ছে— তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছো। আয়াতের অনুবাদে এ কথাই লেখা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা ও তোমাদের সকল কার্যকলাপ রয়েছে আল্লাহ্র জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিবেষ্টনীতে। যথাসময়ে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেমন করছো, করতে থাকো; আমিও আমার কাজ করছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী।' এখানে 'মাকানাতিকুম' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে—স্বীয় শত্রুতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। 'মান' শব্দটি এখানে প্রশ্নবোধক (ইসতিফামিয়া)। অর্থাৎ কার উপর শাস্তি আসবে? অথবা সংযোজক (মাওসুলা)। অর্থাৎ যার উপর শাস্তি আসবে। অর্থাৎ দু'ভাবেই কথাটির অর্থ করা যায়। এখানে 'মানহুয়া কাজিব' (কে মিথ্যাবাদী) কথাটি সম্পৃক্ত হবে 'মাঁই ইয়াতী' (কার উপর) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম—অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি? আমার উপর, না তোমাদের উপর? একথাও অচিরে জানতে পারবে যে, মিথ্যাবাদী কে? আমি, না তোমরা?

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এখানে 'রক্বীব্' শব্দটির অর্থ 'রাক্বেব্' (প্রতীক্ষাকারী), অথবা 'মুরাক্বিব' (যৌথভাবে প্রতীক্ষাকারী)।

এর পরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে—'যখন আমার নির্দেশ এলো, তখন আমি শোয়াইব ও তার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছিলো তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত আদ্ জাতির কাহিনীতে ও আলোচ্য আয়াতে শাস্তির কথা পূর্বে আলোচিত হয়নি। তাই সেখানে ও এখানে বাক্যের সূচনা হয়েছে 'ওয়াও' সহযোগে। আর হজরত লুত ও হজরত সালেহের সম্প্রদায়ের কাহিনীতে শাস্তি দানের পূর্বেই শাস্তির অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই এ দু'টো স্থানে বাক্য সূচিত হয়েছে 'ফা' সহযোগে। সম্ভবতঃ 'ফা' দ্বারা এ দু'টো ক্ষেত্রে পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যারা সীমালংঘন করেছিলো, মহা নাদ তাদেরকে আঘাত করলো, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে অধোমুখো অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।' উল্লেখ্য যে, এক বিকট আওয়াজের মাধ্যমে শেষ করে দেয়া হয়েছিলো হজরত শোয়াইবের অবাধ্য সম্প্রদায়কে। ওই বিকট হুংকার দিয়েছিলেন হজরত জিবরাইল। অথবা ওই ভয়ংকর আওয়াজটি নির্গত হয়েছিলো আকাশ থেকে। ওই আওয়াজ শুনে বুক ফেটে মরে গিয়েছিলো কাফেরেরা এবং মুখ থুবড়ে মরে পড়েছিলো নিজ নিজ গৃহে। এখানে 'জাছুম' অর্থ মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকা।

এর পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে—'যেনো তারা সেথায় কখনো বসবাস করেনি।' একথার অর্থ— ওই বিরান জনপদটি দেখে মনে হচ্ছিলো সেখানে ইতোপূর্বে কোনো জনবসতি ছিলোই না।

শেষে বলা হয়েছে— জেনে রাখো! ধ্বংসই ছিলো মাদিয়ানবাসীদের পরিণাম। যেভাবে ধ্বংস হয়েছিলো ছামুদ সম্প্রদায়। উল্লেখ্য যে, ছামুদ সম্প্রদায়কেও এ রকম বিকট আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাই আলোচ্য বাক্যে মাদিয়ানবাসীদের ধ্বংসপর্বকে ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপর্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পার্থক্য ছিলো এতটুকু— ছামুদ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিলো ভূগর্ভ থেকে উত্থিত ভয়াবহ আওয়াজের মাধ্যমে। আর মাদিয়ানের অধিবাসী-দেরকে মেরে ফেলা হয়েছিলো আকাশজাত ভীষণ আওয়াজ দ্বারা।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ

❒ আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম

❒ ফিরাউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট। কিন্তু উহারা ফিরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরাউনের কার্য-কলাপ সাধু ছিল না।

❒ সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নিকটে। ওই সভাসদেরা ছিলো ফেরাউনের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর ফেরাউনের কার্যকলাপ

উত্তম ছিলো না। এখানে উল্লেখিত 'আয়াত' অর্থ তওরাত শরীফের আয়াত নয়। কারণ তওরাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিলো ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সলিল সমাধিলাভের পর। সুতরাং এখানে আয়াত শব্দটির অর্থ হবে হজরত মুসার মোজেজাসমূহ বা নিদর্শনাবলী। 'সুলত্বানিম্ মুবীন' কথাটির অর্থ এখানে হজরত মুসার অলৌকিক যষ্টি। ওই যষ্টির অলৌকিকত্বের কারণেই ফেরাউন ও তার যাদুকরের দল তাঁর নিকট পরাস্ত হয়েছিলো। তাই পৃথকভাবে ওই অলৌকিক লাঠিটিকে 'সুলত্বানিম্ মুবীন' অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে 'সুলত্বানিম্ মুবীন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত মুসার সকল অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে। ওই নিদর্শনগুলোই ছিলো হজরত মুসার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ফেরাউন ছিলো আল্লাহ্দ্রোহী, সীমালংঘনকারী ও অত্যাচারী, যা সম্পূর্ণতই মানব-কল্যাণের অননুকূল। তাই এখানে বলা হয়েছে 'ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না' (ওয়ামা আমরু ফিরআ'উনা বিরশীদ)। সকল প্রশংসনীয় বিষয় হচ্ছে 'রুশ্দ' আর সকল নিন্দনীয় বিষয় 'গই'।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদগণের নির্বুদ্ধিতার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবী করতো। আর তার পারিষদবর্গও নির্বিবাদে তা মেনে নিতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো ঘৃণ্য অংশীবাদিতা ও মিথ্যাচার। অপরদিকে হজরত মুসা ছিলেন সত্য পয়গম্বর। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনেক নিদর্শনাবলী দ্বারা শোভিত ও সাহায্যমণ্ডিত। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডই ছিলো মানব কল্যাণে নিবেদিত। অথচ তাঁর শুভ-আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা। তাই অত্যন্ত মন্দ পরিণতি ছিলো তাদের জন্য অবধারিত। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯৮)।

বলা হয়েছে— 'সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে দোজখে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে পথভ্রষ্টদের নেতা হিসেবে ফেরাউন যেমন সর্বাগ্রে ছিলো, আখেরাতেও থাকবে তেমনি। বিষয়টি সুনিশ্চিত। অর্থাৎ যেনো তা ঘটেই গিয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের শব্দরূপ (আওরাদাহুম)। 'ওয়ারূদ' অর্থ গহ্বরে অবতরণ করা। দোজখে প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে এখানে জলাশয়ে অবতরণ করা রূপে বিবৃত করা হয়েছে। যেনো দোজখ একটি জলময় গহ্বর বা জলাশয়। ফেরাউন তার পশ্চাদ্ভাগে অনুসারী কাফেরদেরকে নিয়ে পিপাসা নিবারণের জন্য জন্তুদের মতো সেখানে অবতরণ করবে।

জলাশয়ে অবতরণের উদ্দেশ্য থাকে পিপাসা-নিবৃত্তি। কিন্তু সেখানে থাকবে আগুন আর আগুন। ওই আগুনেই দগ্ধীভূত হতে থাকবে ফেরাউনেরা। স্থানটি অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট। তাই শেষে বলা হয়েছে— যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কতো নিকৃষ্ট স্থান।

আগের আয়াতের 'ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না'— কথাটি ছিলো একটি দাবী। আর আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ দোজখ যাত্রায় যে পুরোভাগে থাকবে, তার কর্মকাণ্ড যে ভুল সে কথা প্রমাণ করা জরুরী। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, যা রশীদ (সাধু) তার পরিণাম শুভ। কিন্তু ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিলো না। একথা প্রথমে (৯৭ আয়াতে) বলে নিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ○ ذَٰلِكَ
مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ○ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ○ وَكَذَٰلِكَ
أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ○

❒ এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে!

❒ ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি; উহাদিগের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।

❒ আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন উহাদিগের ইলাহ্সমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগের ইবাদত উহারা করিত তাহারা, উহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ধ্বংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইল না।

❒ এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত! তিনি আঘাত করেন জনপদ-সমূহকে যখন উহারা সীমালংঘন করিয়া থাকে। তাঁহার আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার অনুসারীরা পৃথিবীতে যেমন অভিশপ্ত ছিলো, তেমনি অভিসম্পাতগ্রস্ত হবে আখেরাতে। যে প্রতিফল তারা লাভ করবে, তা কতোই না নিকৃষ্ট। এখানে 'রিফদ্' অর্থ সাহায্য। 'মারফুদ'

অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত। অথবা 'রিফ্‌দ্' অর্থ দান। আর 'মারফুদ' অর্থ দান প্রাপ্ত (পুরস্কার বা প্রতিফলন প্রাপ্ত)। কামুস গ্রন্থে লেখা হয়েছে 'ইরফাদ' অর্থ সাহায্য ও দান।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে—'এই জনপদসমূহের কতক সংবাদ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হয়েছে।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর কিছু কিছু বিবরণ শোনালাম। ওই জনপদগুলোর কোনো কোনোটি এখনও পরিদৃশ্যমান। আর কোনো কোনোটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ক্বইমুন্' অর্থ যার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। আর 'হাসীদ' অর্থ চিহ্নহীন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ক্বইমুন' অর্থ লোকালয়। আর 'হাসীদ' অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো। যখন তোমার পালনকর্তার বিধান এলো, তখন তাদের উপাস্যসমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের উপাসনা তারা করতো তারা, তাদের কোনো কাজে এলো না। ধ্বংস ব্যতীত তাদের অন্য আর কিছুই বৃদ্ধি পেলো না।' এখানে 'আমরু রব্বিকা' কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌র শাস্তি। 'তাত্‌বীব' অর্থ ধ্বংস।

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'এইরূপই তোমার প্রতিপালকের আঘাত! তিনি আঘাত করেন জনপদসমূহকে যখন তারা সীমালংঘন করে থাকে। তাঁর আঘাত মর্মন্তুদ, কঠিন।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! শুনুন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আল্লাহ্ এভাবেই দীর্ঘ অবকাশ দানের পর তাঁর গজব নাজিল করেন। তওবার জন্য অনেক সুযোগ ও সময় দেয়া সত্ত্বেও যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়ে (প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসে) ফিরে আসে না, তাই গজব তো তাদের জন্য অনিবার্য হবেই। আর আল্লাহ্‌র গজব অত্যন্ত মর্মন্তুদ, সুকঠিন। তাই গজবকবলিতদের পরিত্রাণ অসম্ভব। হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে অবকাশ দিতেই থাকেন। শেষে এক সময় এসে পড়ে শাস্তি। তখন তাদের রেহাই পাওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকে না। একথা বলার পর তিনি স. পাঠ করলেন, 'ওয়া কাজালিকা আখজু রব্বিকা ইজা আখাজাল ক্বুরা ওয়া হিয়া জলিমাতুন' (আর আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও হয় এরকমই। যখন তিনি পাকড়াও করেন কোনো জনপদ যে জনপদবাসীরা হয় অত্যাচারী)। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ○ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ○ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ○ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ○

❒ যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেইদিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে;

❒ এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব।

❒ যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কেহ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান।

❒ অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ,

---

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যে পরলোকের শাস্তিকে ভয় করে এতে তো তার জন্য নিদর্শন আছে।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিনাশ সাধনের যে ইতি কাহিনীগুলো এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হলো, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাটি এ রকম— এতে করে তাদের জন্য পারলৌকিক জীবন হয়ে পড়বে অধিকতর গুরুত্ববহ। তারা বুঝতে পারবে, অবিশ্বাসীদের এ সকল শাস্তি আখেরাতের শাস্তির প্রকৃত উদাহরণ বা নিদর্শন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ইতিবৃত্তগুলো শুনে ইমানদারেরা হয়ে যাবে অধিকতর সতর্ক। তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তারা অবাধ্যদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ভীত হবে এই ভেবে যে, আল্লাহ্‌পাক সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যাকে খুশী করতে পারেন অনুগ্রহভাজন। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মনোভাব এর বিপরীত। তাদের না আছে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে গভীরতর ভাবনা, না আছে দূরদৃষ্টি। তারা এ সকল ঘটনাকে মনে করে থাকে দৈবদুর্বিপাক অথবা আপনাআপনি সংঘটিত কোনো বিপর্যয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা সেই দিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্র করা হবে; এটা সেই দিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।' একথার অর্থ— আখেরাতে সকল মানুষকে একত্র করে উপস্থিত করা হবে হাশরের ময়দানে। শুরু হবে পাপ-পুণ্যের বিচার। দেয়া হবে শাস্তি অথবা স্বস্তি।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য তা স্থগিত রাখবো।' (ওয়ামা নুওয়াখ্‌খিরুহু ইল্লা লি আজালিম্‌ মা'দূদ্‌)। এখানে 'আজাল' অর্থ জীবনের সম্পূর্ণ পরিসর। অর্থাৎ আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি বিলম্বিত করি। পৃথিবীর যে আয়ু আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছি, সেই আয়ুষ্কালের মধ্যে গজব অবতীর্ণ করি না।

এর পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— ওই মহা বিচারের দিবসে বিস্ময়ে ও ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে সকলে। কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। এমন কোনো বাক্যও উচ্চারণ করতে পারবে না, যাতে করে কারো কিছু উপকার হয়। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সে দিন কেউ কোনো কথাই বলতে পারবে না; পরম করুণাময়ের অনুমতি ব্যতিরেকে।'

'ইয়াওমা ইয়াতি' অর্থ প্রতিফল দিবস। অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার দিবস। অথবা সেদিন হবে আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ আবির্ভাবের দিন। যেমন এক আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্‌র আগমনের প্রতীক্ষা করছে? বস্তুতঃ এসেই গিয়েছেন তোমাদের মহান প্রতিপালক।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে অনেকে হবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান।' একথার অর্থ— অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে যাদেরকে হতভাগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে হতভাগ্য। আর যাদের অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে সৌভাগ্যশালী বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে ভাগ্যবান।

হজরত আলী বলেছেন, আমি একদিন এক জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হতেই দেখলাম, আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন প্রাণপ্রিয় রসুল। তাঁর হাতে ছিলো একটি ছড়ি। আমার কাছাকাছি এসে মাটিতে উপবেশন করলেন তিনি। তারপর ছড়িটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, এমন কোনো জনমানব নেই যার জান্নাত অথবা জাহান্নাম পূর্বনির্ধারিত নয়। একজন বললেন, হে প্রিয়তম রসুল! যদি তাই হয়, তবে আমরা তকদিরের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেনো? তিনি স. বললেন, ব্যাপারটি সে রকম নয়। কাজ করতে থাকো। তকদির অনুসারেই সময় এগিয়ে আসবে। যারা

হতভাগ্য তারা উদ্দীপিত হবে দুর্ভাগ্যের দিকে। আর যারা সৌভাগ্যশীল তারা সামর্থ্য লাভ করবে পুণ্যকর্মের। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'অনন্তর যারা দান করে, সংযত হয় এবং এ সকল বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে; ফলতঃ সুনিশ্চিত যে, আমি তার জন্য সহজতর করবো তার সরল পথকে।' বাগবী, বোখারী, মুসলিম।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যারা হতভাগ্য তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উচ্চস্বরে চিৎকারকে বলে জাফীর এবং অনুচ্চস্বরের আর্তনাদকে বলে শাহীক্ব। জুহাক ও মুকাতিল বলেছেন, গাধার প্রারম্ভিক বিকট চিৎকারকে বলে জাফীর, আর শেষের ক্লান্ত অনুচ্চ স্বরকে বলে শাহীক্ব। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, গর্দভের বক্ষ ও উদর থেকে উচ্চারিত আর্তচিৎকারই শাহীক্ব। আবুল আলিয়া বলেছেন, কণ্ঠমিশ্রিত ধ্বনি হচ্ছে জাফীর, আর বক্ষ-উৎসারিত কেঁপে কেঁপে উঠা আওয়াজকে বলে শাহীক্ব। আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত বহির্মুখী ধ্বনির নাম জাফীর। আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উত্থিত অন্তর্মুখী ধ্বনির নাম শাহীক্ব। তবে গর্দভের প্রাথমিক বীভৎস চিৎকারের নাম জাফীর, আর শেষ দিকের নিস্তেজ আওয়াজের নাম শাহীক্ব — এই অর্থটিই বহুল ব্যবহৃত। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে প্রশ্বাস উদ্গীরণের সঙ্গে 'আহ্' 'উহ্' ধ্বনিকে বলে জাফীর।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১০৭

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

❐ সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

এখানে 'যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'— উক্তিটি সম্পর্কে জুহাক বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী বলে এখানে বেহেশতের আকাশ ও মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেখানকার উর্ধ্বদেশ হচ্ছে আকাশ এবং পদতলের ভূমি হচ্ছে পৃথিবী। এটা নিশ্চিত যে, হাশরের দিবসে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে একটি স্থানে। ওই স্থানের উপরের দিক হচ্ছে সেখানকার আকাশ এবং ওই স্থানটিই হচ্ছে সেখানকার পৃথিবী। ভাষা বিশারদগণ বলেছেন, আরবীভাষীরা

আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে যখনই কোনো কর্ম সম্পন্ন করা না করার শর্ত সংযুক্ত করে, তখনই তারা এর মর্মার্থ গ্রহণ করে— চিরস্থায়ী।

'যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন'— কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, দোজখবাসীরা দোজখে অবস্থান করবে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। তারপর তারা নিষ্কৃতি পাবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসেও এই ধারণাটির পোষকতা বিদ্যমান। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে, যখন দেখা যাবে দোজখে আর কেউ নেই। শতাব্দির পর শতাব্দি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই সময়টির আগমন ঘটবে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাও অনুরূপ। সুফী দার্শনিক শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবীও এই অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু অভিমতটি কোরআন ও সুন্নাহ্র অননুকূল। কোরআন মজীদে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' রসুল স. বলেছেন, যদি নরকবাসীদেরকে বলা হয় এখানকার অগণিত পাথরের সংখ্যা যত, ততদিন তোমরা থাকবে নরকে, তবে তারা হবে মহা আনন্দিত। আর স্বর্গবাসীদেরকে যদি বলা হয়, এখানকার এই বিপুল পরিমাণ প্রস্তরগুলোর সংখ্যা যত, তোমাদের স্বর্গবাসের মেয়াদ হবে তত দিবস, তবে তারা হবে ভয়ানক অপ্রসন্ন। কিন্তু এ রকম হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিবরানী ও আবু নাঈম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। আল্লামা তিবরানী তাঁর আল কবির গ্রন্থেও এ রকম লিখেছেন। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে হাকেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বলেছেন, রসুল স. আমাকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে প্রেরণ করলেন। সেখানে এক জনসমাবেশে আমি বললাম, হে জনতা! আমি আল্লাহ্র রসুল কর্তৃক প্রেরিত দূত। তিনি আমাকে একথা জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্পাকের দিকেই ফিরে যেতে হবে সকলকে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত, অথবা জাহান্নাম। দু'টোর যে কোনো একটিতে আমাদের বসবাস হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তরের কোনো সুযোগ। সেখানে আমরা হবো অক্ষয় ও অমর।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে ও জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জাহান্নামবাসী তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতবাসী তোমরাও অমর। তোমাদের সকলের বসবাস চিরস্থায়ী। তিনি স. বলেছেন, তখন বলা হবে, হে জান্নাতী জনতা! তোমরা এখন মৃত্যুহীন ও চিরস্থায়ী। আর হে জাহান্নামী জনতা! তোমরাও মৃত্যু বিবর্জিত ও চিরন্তন। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে। বলা হবে, এবার মৃত্যুর

মৃত্যু ঘটলো। আরো ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীবৃন্দ! মৃত্যু আর নেই। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে,'এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে, যখন দেখা যাবে দোজখে আর কেউ নেই।' হাদিসটিকে হাকেম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হাদিসটি যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়, তবে তার ব্যাখ্যা হবে এরকম, এমন সময় আসবে যখন দেখা যাবে, মহাপাপের কারণে যে সকল ইমানদার দোজখবাসী হয়েছিলো, তারা আর কেউ সেখানে নেই। সেখানে কেবল থাকবে কাফেরেরা।

'সেখানে তারা স্থায়ী হবে' একথাটির ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে আমি বলি, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। অবশ্য অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এখানে 'স্থায়ী' কথাটির অর্থ হবে 'সীমাহীন সময়'। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, কাফেরকুল জাহান্নামে অবস্থান করবে অনন্তকাল। যদি তাই হয়, তবে এই আয়াত ও আয়াতে উল্লেখিত ইস্‌তিস্‌না (ব্যতিক্রম) দু'টির মর্ম কি হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণ মতপ্রভেদ করেছেন। আমার মতে সর্বোত্তম মর্মার্থটি হবে এরকম, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নাম বাস হবে চিরস্থায়ী। আর তারা সেখানে স্থানান্তরিত হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে ফুটন্ত পানিতে। অর্থাৎ 'জাহীম' থেকে 'হামীমে'। আবার 'হামীম থেকে 'জাহীমে'। ওই দু'টো স্থানের যে কোনো একটিতে তারা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকবে না। 'তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে হামীম আর জাহীমের চতুষ্পার্শ্বে'— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বাগবী লিখেছেন, কাফেরেরা নরকের হামীম ও জাহীম নামক স্থানে চক্রাকারে আবর্তিত হবে। লেলিহান আগুনের প্রাণান্তকর দহনে পিপাসিত নরকবাসীরা যখন পানি প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে অত্যুষ্ণ পানি যা হবে তেল ও তরল তাম্র সদৃশ।

এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আবর্তিত হতে থাকবে কল্পনাতীত উষ্ণতা ও ধারণাতীত শৈত্যের মধ্যে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জাহান্নাম তার পালনকর্তার নিকটে আবেদন জানিয়েছিলো, হে পরোয়ারদিগার! সুতীব্র উত্তপ্ততার কারণে আমার এক অংশ অপর অংশকে বিলোপ করে দিচ্ছে। ওই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ্‌পাক তাকে বৎসরে দু'বার নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গ্রীষ্মকালে। আরেকবার শীতকালে। তাই গ্রীষ্মকালে অনুভূত হয় প্রখর উত্তাপ। আর শীতকালে অনুভূত হয় প্রচণ্ড শৈত্য। বায়যার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ থেকে। আর তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

কতিপয় বিচক্ষণ ভাষ্যকার মনে করেন 'ফা আম্মাল্লাজীনা শাক্কু' (অতঃপর যারা হতভাগ্য) —এই আয়াতের উদ্দেশ্য গোনাহ্গার মুমিনেরা। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। প্রায়শ্চিত্তের মেয়াদ শেষে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কিছু সংখ্যক পাপী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলেও এক সময় নিষ্কৃতি লাভ করবে। তারপর প্রবেশ করবে জান্নাতে। জান্নাতবাসীরা তাদেরকে বলবে তোমরা তো ছিলে জাহান্নামী। বোখারী। হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার শাফায়াতে কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামী। হজরত মুগীরা বিন শো'বা থেকে তিবরানীও অনুরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজনটি এরকম—ওই লোকগুলো তাদের জাহান্নামী নাম মুছে দেয়ার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে আবেদন জানাবে। আল্লাহ্পাক তখন তাদের জাহান্নামী নাম বিলুপ্ত করে দিবেন।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক জাহান্নামী হবে। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই তারা অবস্থান করবে জাহান্নামে। কাফেরেরা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলবে, তোমরা না ইমানদার। কী লাভ হলো ইমানদার হয়ে? এখন তোমরাও তো জাহান্নামী। তখন আল্লাহ্ সকল পাপী ইমানদারকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন, মাঝে মাঝেই কাফেরেরা মনে করবে, 'যদি আমরা ইমানদার হতাম।' হজরত আবু মুসা থেকে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। উল্লেখ্য যে, পাপী ইমানদারদের জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়া এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্পর্কিত হাদিসগুলো সর্বজনবিদিত পর্যায়ের।

বায়যাবী লিখেছেন, গোনাহ্গার মুমিনদেরকে নরক থেকে বের করা হবে—এতটুকু বলাই যথেষ্ট। বিষয়টি সেখানকার চিরস্থায়ী নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। 'চিরস্থায়ী' কথাটি তাদের প্রতি পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা শাস্তির সময়ে থাকবে দোজখে। আবার শাস্তিমুক্ত হওয়ার পর থাকবে বেহেশতে। সুতরাং তাদের দোজখ এবং বেহেশতবাস খাঁটি কাফের এবং খাঁটি ইমানদারের মতো চিরস্থায়ী নয়। একারণেই তাদেরকে পাপের কারণে হতভাগ্য এবং ইমানের কারণে সৌভাগ্যবান বলা যায়।

একটি জটিলতাঃ আখেরাতে মানুষ বিভক্ত হবে দু'টি দলে। একদল হবে সৌভাগ্যবান এবং আরেক দল হবে দুর্ভাগা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দল হবে আরো একটি— যারা প্রথমে দুর্ভাগা এবং পরে সৌভাগ্যশালী। বিষয়টি পরস্পর বিরোধী নয় কি ?

জটিলতার জবাবঃ পরস্পরবিরোধী দু'টি বিষয়ের সমাধান করা যেতে পারে এভাবে— ১. দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তুর একই সঙ্গে উপস্থিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় বস্তু দু'টির যুগপৎ বিলুপ্তিও। এমতাবস্থায় একটি থাকলে অপরটি থাকবে না। যেমন— অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, হাঁ ও না। ২. দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তু এক হতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে বস্তু দু'টো অবলুপ্ত হলে তৃতীয় একটি বস্তুর উপস্থিতি সেখানে ঘটতে পারে। যেমন একই সঙ্গে একটি বস্তু সাদা ও কালো হতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে তা সবুজ বা লাল হতে পারে। ৩. এরকমও সম্ভব নয় যে, পরস্পরবিরোধী বস্তু দু'টি একই সঙ্গে অনুপস্থিত। বরং সে দু'টোর একত্র হওয়া সম্ভব। যেমন, হাশরের দিন সৌভাগ্যশালী ও হতভাগ্য কোনোটাই নয়— এরকম হওয়া সম্ভব নয়। তবে এরকম হওয়া সম্ভব যে, একই সঙ্গে সে হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান। এ ধরনের ব্যক্তি হতভাগ্য বলে কিছুকাল নরকে বাস করবে। আর সৌভাগ্যবান বলে এক সময় নিষ্কৃতি লাভের পর প্রবেশ করবে বেহেশ্‌তে।

আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মাশাআ' শব্দটির মূলরূপ হবে 'মানশাআ'। আর মানশাআর উদ্দেশ্য হবে পাপিষ্ঠ মুমিন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, বিচার দিবসে হাশরের মাঠে উপস্থিতির সময় অথবা আলমে বারযাখে (কবরের জগতে) অবস্থানের সময়টি এর ব্যতিক্রম। হাশরের হিসাব-নিকাশ শেষে চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় চিরকালীন নয়। এই দুই অবস্থায় মানুষ জান্নাতবাসী যেমন নয়, তেমনি জাহান্নামবাসীও নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ও বায়যাবীর বক্তব্যানুসারে চিরস্থায়ী কথাটি ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় বাদে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে এখানে 'ইসতিসনা' (ব্যতিক্রম) সম্পৃক্ত হবে জাফীর ও শাহীক্ব শব্দদ্বয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের মনোনীত সময়সীমার মধ্যে শোনা যাবে না তাদের বিকট চিৎকার ও গাধার মতো নিস্তেজ আওয়াজ।

আল্লামা সুয়ূতি তাঁর বুদুরুস্ সাফিরাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'ইল্লা' শব্দটি 'লা' (না সূচক) অর্থে ব্যবহৃত। তাই এর অর্থ 'ব্যতিক্রমী' না হয়ে হবে 'ব্যতীত'। যেমন আরবীভাষীরা বলে থাকে— 'লাকা আলাইয়্যা আলফু দারাহিমা ইল্লাল আলফানিল ক্বাদিমানি' (আগের দুই হাজার ব্যতীত আমাকে তোমার একহাজার দিরহাম দেয়া কর্তব্য)। এর অর্থ— তুমি আমাকে সর্বসাকুল্যে তিনহাজার দিরহাম দিবে। এই ব্যাখ্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে— হাশরের মাঠের অবস্থানকাল হবে আকাশ ও ভূমণ্ডলের স্থিতিকালের সমান। আর অনন্তকালের অবস্থিতি হবে আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায়ানুরূপ। ওই অবস্থিতিই চিরকালীন অবস্থিতি। তবে ভেবে দেখতে হবে,

এ রকম অসার যুক্তি-তর্ক ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমাদের কি লাভ। আর 'ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'— আল্লাহ্পাকের এই উক্তির সার্থকতাই বা কোথায়? প্রকৃত কথা হচ্ছে, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন গভীরতর প্রজ্ঞার। এখানে প্রথমতঃ সুদীর্ঘ সময় বুঝাতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতিকালের সময়সীমাকে উল্লেখ করা হয়েছে— যে বিষয়ে মানুষ ধারণা রাখে। অতঃপর ইঙ্গিত করা হয়েছে অনন্ত ও অগম্য সময়ের প্রতি— যাতে মানুষ অনন্তকাল সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা' শব্দটি 'ওয়াও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— লিআল্লা ইয়াকুনা লিন্নাসি আলাইকুম হুজ্জাতুন্ ইল্লাল্লাজীনা জলামু (তোমাদের বিরুদ্ধে যেন, কোনো প্রমাণ না থাকে, না মানবকুলের না অত্যাচারীদের)। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— যতদিন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থান ছিলো এবং সেখানে অবস্থান করবে ততদিন। এছাড়াও ততদিন, যতদিন আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করবেন। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামবাস হবে সার্বক্ষণিক।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ ফাররা বলেছেন, এটা এমন এক ধরনের ইসতিস্না (ব্যতিক্রম) — যা কার্যতঃ কখনো প্রকাশ পাবে না। যেমন, কাউকে প্রহার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বলা হলো, আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে প্রহার করবো। তবে হ্যাঁ প্রহার না করাই যদি আমার নিকটে ভালো মনে হয়, তবে তো ভালোই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তারা সেখানে ততকাল অবস্থান করবে, যতকাল বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা। আর আল্লাহ্পাক এর বিপরীত ইচ্ছা করলেই কেবল তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলেই তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। তবে তিনি এ রকম করবেন না।

কাতাদা বলেছেন, আমাদের জ্ঞান আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ধারণ করতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আপনার প্রভুপালক তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের বিষয়ে চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন। সুতরাং কেউ যেনো মনে না করে যে, নরকবাসীদেরকে চিরকাল নরকে রাখতে তিনি বাধ্য। অতএব বিশ্বাস করুন যে, তিনি ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পবিত্র। ইচ্ছে করলে তিনি তাদেরকে নিষ্কৃতিও দিতে সক্ষম (যদিও তিনি এরকম করবেন না)। এদিক থেকে ইস্তিস্না (ব্যতিক্রম) সঠিক।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاۤءَ رَبُّكَ ؕ عَطَاۤءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰۤؤُلَاۤءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

❒ এবং যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

❒ সুতরাং উহারা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইও না, পূর্বে উহাদিগের পিতৃপুরুষেরা যাহাদিগের ইবাদত করিত উহারা তাহাদিগের ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব— কিছুমাত্র কম করিব না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) অনুরূপ। তবে এখানকার শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাক্যটি হচ্ছে 'এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ।' এই নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত ও আল্লাহ্‌পাকের দর্শন (দীদার)। তবে আল্লাহ্‌পাকের দীদারই শ্রেষ্ঠতম। আমি বলি, এখানে নিরবচ্ছিন্ন কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— কখনো কখনো জান্নাতবাসী-দেরকে জান্নাত অপেক্ষাও উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। সেই স্তর হচ্ছে দীদারের স্তর। আর ওই দীদার বর্ণনাতীত একটি বিষয়। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'উজুহুঁই ইয়ামাযিজিন নাদ্বিরাতুন ইলা রব্বিহা নাজিরাহ। অর্থাৎ ওই পবিত্র দর্শনে জান্নাতীরা এমনই নিমগ্ন হবেন যে, জান্নাতের অনাবিল সুখ-সম্ভোগের কথা আর তাদের মনেই পড়বে না।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের আনন্দে মগ্ন জান্নাতীরা সহসা দেখতে পাবে উর্ধ্বদেশ থেকে বিচ্ছুরিত আল্লাহ্‌র জ্যোতিসম্পাত। আনুরূপ্যবিহীন দর্শন দান করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং। নেপথ্যের এক ঘোষক উচ্চারণ করবে 'সালামুন ক্বওলাম মির রব্বির রহীম'(মহান প্রভুপালকের পক্ষ থেকে সালাম)। তখন

জান্নাতের সুখস্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে আল্লাহ্প্রেমিকেরা। এক সময় তিনি নিজেকে আড়াল করবেন। হুঁশ ফিরে পাবে তারা। কিন্তু তাদের অন্তর ও বাহিরে জেগে থাকবে দীদারের অক্ষয় প্রভাব। ইবনে মাজা, দারাকুতনী, ইবনে আবিদ্দুনিয়া।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহঃ তাঁর মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ১০০ সংখ্যক মকতুবে হজরত ইয়াকুব আ. ও হজরত ইউসুফ আ. এর প্রেমবন্ধন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাদানের পরেই লিখেছেন আল্লাহ্পাকের এক একটি নাম এক এক ব্যক্তির সূচনা স্থল (মাবদায়ে তায়ুন)। ওই নাম সমূহের জ্যোতিচ্ছটার সন্নিপাত ঘটবে জান্নাতীদের আপনাপন জান্নাতে। এভাবে স্ব স্ব মাবদায়ে তায়ুন অনুসারে প্রত্যেকের জান্নাতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে বৃক্ষলতা, নির্ঝর, অট্টালিকা, হুর ও গেলেমান। রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের জল সুমিষ্ট। মৃত্তিকা পবিত্র। সেখানে রয়েছে সুবিশাল প্রান্তর। ওই প্রান্তরের ফসল হবে সুবহানাল্লহ (আল্লাহ্ পবিত্র), আলহামদু লিল্লাহ্ (সমূহ প্রশংসা আল্লাহর) এবং আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, সেখানকার উদ্ভিদরাজি, স্রোতস্বিনী হবে স্বচ্ছ দর্পন সদৃশ। ওই স্বচ্ছতাই আল্লাহপাকের উদাহরণরহিত দর্শনের উপলক্ষ। জান্নাতীরা পুনঃ পুনঃ দর্শনধন্য হয়ে ফিরে আসবে তাদের স্বর্গের স্বচ্ছতায়। তাদের ওই সৌভাগ্য হবে নিরবচ্ছিন্ন। সুরা কিয়ামতের দর্শন সংক্রান্ত আলোচনায় এই বিষয়টির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র মিলন ও দর্শন হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উপহার। ওই দর্শনের পুনঃপৌনিকতা রুদ্ধ হবে না কিছুতেই। বেহেশতের বৈভবরাজিও চিরন্তন ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু তা প্রতিবিম্বপ্রসূত। আর আল্লাহ্র দীদার হলো মূল— যা আল্লাহ্র সত্তাসম্ভূত। দীদারের তুলনায় অন্য সকল নেয়ামত যেনো কিছুই নয়। আল্লাহ্তায়ালা স্বাধিষ্ঠ। আর অন্য সকল কিছুর অধিষ্ঠান স্থল তিনিই। যেমন ভিক্ষার বস্ত্র দাতার, গ্রহিতার নয়। তেমনি সকল সৃষ্টি তাঁর। সৃষ্টির নয়। তাই দীদার-তুল্য আর কিছুই নেই। সুতরাং আল্লাহ্র দীদারকেই এখানে অভিহিত করা হয়েছে 'নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার' বলে।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক বেহেশতবাসীদেরকে 'নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার' দানের কথা বলেছেন। কিন্তু দোজখবাসীদের সম্পর্কে এরকম বলেননি যে, তাদের শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন হবে, না করা হবে লাঘব। তাদের সম্পর্কে কেবল বলেছেন, 'নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক যা ইচ্ছা তাই করেন।'

পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যাদের ইবাদত করে, তাদের সম্পর্কে সংশয়যুক্ত হয়ো না, পূর্বে তাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের ইবাদত করতো, তারা তাদের ইবাদত করে।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এতক্ষণ ধরে আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জির মাধ্যমে তাদের অংশীবাদিতার স্পষ্ট পরিচয় আপনাকে প্রদান করলাম। এখন আপনি দেখুন, আপনার সমসাময়িক মুশরিকেরাও তাদের মতো। পূর্বসুরীদের মতো এরাও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনায় মগ্ন। সুতরাং আপনি নিশ্চিত থাকুন, পূর্বসুরীদেরকে যেমন শিরিকের শাস্তি দেয়া হয়েছিলো, তেমনি উত্তরসুরীদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে যথাসময়ে। এরকমও বলা যেতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এদের দেব-দেবীগুলো এদের কোনো উপকারেই আসবে না, যেমন উপকারে আসেনি তাদের পূর্বপুরুষদের। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে এখানে 'মিম্মা' শব্দটির 'মা' হচ্ছে মায়ে মাছদারী এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে মায়ে মাউসুল।

'ইল্লা কামা ইয়াবুদু' বাক্যটি এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে ব্যক্ত। অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষদের নিয়মেই এরা উপাসনা করে। অথবা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো পরিণাম হবে এদেরও। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি যেহেতু পূর্বসুরীদের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন এদের পরিণাম সম্পর্কেও নিশ্চয় ধারণা করতে পারবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দিবো— কিছুমাত্র কম দিবো না।' এখানে 'নাসিবাহুম' কথাটির অংশ প্রাপ্য অংশ (নসব)। অর্থাৎ শাস্তির অংশ। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— শাস্তির যে অংশ এদের পূর্ববর্তীরা পেয়েছিলো, তেমনি এরাও পাবে। একটুও কম পাবে না। 'নাসিবাহুম' কথাটির মাধ্যমে এখানে 'রিজিকের অংশ'ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যবিষয়টির অর্থ দাঁড়াবে— নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ থাকার কারণেই এখানকার অংশীবাদীদের শাস্তি বিলম্বিত হচ্ছে। অর্থাৎ এদেরকেও এদের মুশরিক পূর্বপুরুষদের মতো অবশ্যই যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সে শাস্তি শুরু হবে তাদের নির্ধারিত জীবনোপকরণ নিঃশেষ হবার পর।

'গইরি মানকুস' অর্থ— কিছু মাত্র কম করা হবে না। কথাটির মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়টিকে (শাস্তি দানের সংবাদটিকে) এখানে করে তোলা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

❒ আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

❒ যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদিগের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি সে-বিষয়ে সবিশেষ অবহিত;

মক্কার মুশরিকেরা রসুল স. এর আহ্বানকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে চললো, বিভিন্নভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে লাগলো কোরআনের প্রতি। রসুল স. মনোক্ষুণ্ন হলেন। তাই তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেন — 'আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিলো। তোমার পালনকর্তার পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো। তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের পুনঃপুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে ব্যথিত হবেন না। এটাই তাদের চিরন্তন স্বভাব। স্মরণ করুন রসুল মুসার কথা। তার উপরে আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, যেমন আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি কোরআন। কিন্তু তার সম্প্রদায় সর্বসম্মতিক্রমে তওরাতকে গ্রহণ করেনি। ঘটিয়েছে প্রচণ্ড মতভেদ। একদল স্বীকার করেছে, আর একদল করেছে অস্বীকার। আপনার সম্প্রদায়ের অবস্থাও তেমনি। কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করেছে, আবার কেউ কেউ করে চলেছে প্রত্যাখ্যান। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত এই যে, দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে তওবার (প্রত্যাবর্তনের) সুযোগ দেয়া হবে। ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু পর্যন্ত, আর সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা লাভ করবে এই অবকাশ। এই পূর্ব সিদ্ধান্তটি না থাকলে বিষয়টি আমি মীমাংসা করেই ফেলতাম। আপতিত করতাম তাৎক্ষণিক শাস্তি। তবে এটা নিশ্চিত যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীরা বিভ্রান্ত ও দোলায়িতচিত্ত।

পরের আয়াতে (১১১)বলা হয়েছে— 'যখন সময় আসবে, তখন অবশ্যই তোমার প্রভুপ্রতিপালক তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। তারা যা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এখানে 'ইন্না' শব্দটি স্বীকৃতিসূচক।

ক্বারী নাফে বিন কাসীর এবং ক্বারী আবু বকরের মতে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্' মূলতঃ ইন্না (অবশ্যই) অর্থে। তাই 'তাদের প্রতেককে' কথাটির মর্মার্থ হবে 'অবশ্যই মতভেদ সৃষ্টিকারী সকল মুমিন ও কাফেরকে'। আর এখানকার 'লাম্মা' শব্দটির মূল রূপ হচ্ছে 'লামান্ মা'। শব্দটি সংক্ষিপ্তকরণের কারণে 'নুন্' অক্ষরটি এখানে হয়েছে অবলুপ্ত। এভাবে আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম— 'হে আমার রসুল! একথাটিও জেনে রাখুন যে, আখেরাতে চূড়ান্ত বিচারের সময় যখন হবে, তখন আপনার প্রভুপালক অবশ্যই মতভেদ সৃষ্টিকারী সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

❒ সুতরাং তুমি ও তোমার সহিত যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারা তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ তাহাতে স্থির থাক এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

❒ যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না; পড়িলে, অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগের সাহায্য করা হইবে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি ও তোমার সঙ্গে যারা বিশ্বাস করেছে তারা, তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো তাতে স্থির থাকো।' এখানে আল্লাহ্পাক রসুল স. এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুচরবর্গকে সত্যের প্রতি দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এই স্থিরতা বা দৃঢ়তা নিম্নরূপ—

১. বিশ্বাসগত দৃঢ়তা। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার প্রতি দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি সকল পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার সমষ্টি । কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সৃষ্টির অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মতো নয়। সৃষ্টিকুলের মতো তিনি অসহায় যেমন নন, তেমনি নন স্বেচ্ছাচারীও। তবে তিনি সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যা ইচ্ছা তাই করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। সৃজন ও লালন-পালন সম্পূর্ণত তাঁরই করুণা নির্ভর। সুতরাং তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ নেই ইত্যাদি।

২. কর্মগত দৃঢ়তা। অর্থাৎ পালন করতে হবে সত্যধর্ম প্রচারের গুরু দায়িত্ব। প্রত্যাদেশিত শরিয়তকে রাখতে হবে অক্ষুণ্ন। শরিয়তের বিধানে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো চলবে না।

৩. ইবাদত ও ব্যবহারিক জীবনে দৃঢ়তা। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রেও অতিআগ্রহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। যেমন, সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ইবাদত হচ্ছে নামাজ। নামাজ ফরজ করা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত। কিন্তু কল্যাণ লাভের আশায় নামাজকে ছয় অথবা সাত ওয়াক্ত বানানো যাবে না। নামাজের নির্ধারিত রাকাতও বাড়ানো যাবে না কোনোক্রমে। আর পারিবারিক, সামাজিক ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা।

হজরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সাক্বাফী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দয়া করে আমাকে এমন উপদেশ দান করুন, যাতে আপনার মহাপ্রয়াণের পর আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। তিনি স. বললেন, বলো 'আমানতু বিল্লাহ্' (আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্‌র প্রতি) এবং এই কথার উপরেই দৃঢ় থাকো । মুসলিম।

হজরত ইবনে খাত্তাব বলেছেন, 'ইস্তেক্বামাত' (দৃঢ়তা) অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের যথামান্যতার উপরে সুস্থির থাকা। শৃগালের মতো এদিক ওদিক বিচরণ না করা। মুসলিম।

ইস্তেক্বামাত বা দৃঢ়তার নির্দেশটি একটি কঠিন নির্দেশ। নির্দেশটির বাস্তবায়ন ততোধিক কঠিন। তাই সুফী সাধকগণ বলেন, ইস্তেক্বামাত কারামত (অলৌকিকত্ব প্রদর্শন) অপেক্ষা উন্নত। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে এর চেয়ে গুরুভার কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি স. বলেছেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস 'সুরা হুদ' বলে বিশেষভাবে আলোচ্য আয়াতটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তবে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গেলে বলতে হয়, রসুল স. স্বভাবগতভাবেই দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। আর তাঁর সকল কিছুই ছিলো দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসী সহচরগণকে ভালোবাসতেন অত্যধিক। তাঁরা দৃঢ়তার উপরে সতত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন কিনা, সেটাই ছিলো তাঁর দুশ্চিন্তার বিষয়। আর এই দুঃসহ চিন্তার কারণেই তিনি ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। আর একথা বলে তিনি স. ইঙ্গিত করেছিলেন এই আয়াতটির দিকে। অবশ্য তিনি একথা বলে সম্পূর্ণ সুরা হুদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন— এরকম বলাতেও কোনো দোষ নেই। কারণ এই সুরায় বিধৃত রয়েছে অতীতের অনেক উম্মতের সত্যপ্রত্যাখ্যানজনিত বিবরণ ও তাদের মর্মান্তিক পরিণতির ভয়াবহ আলেখ্য। এ সকল বিষয় অবগত হয়ে স্বভাবতই তিনি

তাঁর আপন উম্মতের ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, হায়! আমার উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য তাদের কি হবে। আর যারা বিশ্বাসী, তারাই বা প্রদর্শন করতে পারবে কতটুকু একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং সীমালংঘন কোরো না। তোমরা যা করো তিনি তার দ্রষ্টা।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সীমালংঘন কোরো না' কথাটির অর্থ নির্দেশ ও নিষেধাবলীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম কোরো না। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ধর্ম একটি সহজসাধ্য বিষয়। যারা একে কঠোর মনে করবে, তারা হয়ে পড়বে কঠোরতার হাতে বন্দী। তারাই অকারণে হারাবে শক্তি ও সামর্থ্য। সুতরাং তোমরা সহজ সরল হও। মধ্যবর্তী পথে চলো। এ পথে যারা সফল তাদের জন্য শুভসংবাদ। সাহায্য কামনা করো সকাল সন্ধ্যার উপাসনায় ও রাত্রি জাগরণে। বোখারী, নাসায়ী।

আমি বলি, রসুল স. দুশ্চিন্তার ভারে বৃদ্ধ হয়েছিলেন সকল মানুষের কথা ভেবে। তিনি জানতেন, মানুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অসতর্ক। সুতরাং তারা দৃঢ়তা রক্ষা করবে কী ভাবে। কী করে রক্ষা পাবে আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থেকে।

পরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তারকানু ইলাল্ লাজীনা জলামু' (যারা সীমালংঘন করেছে তাদের দিকে ঝুঁকে পোড়ো না)। এখানে 'রুকুন' শব্দটির অর্থ অনুরাগ বা আকর্ষণ। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— জালেমদের অনুরাগী হয়ো না। আবুল আলীয়া বলেছেন, তাদের কাজকর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হবে না। সুদ্দী বলেছেন, সীমালংঘনকারীদের অনুগামী হবে না। ইকরামা বলেছেন, তাদের কথা মানবে না। বায়যাবী বলেছেন, তাদের সম্পর্কে সামান্যতম আগ্রহ প্রদর্শন করবে না। উল্লেখ্য যে, জালেমদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদেরকে স্মরণ করা অসমীচীন ।

এরপরে বলা হয়েছে— 'ফাতামাস্‌সাকুমুন্ নার (নতুবা অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে)। বায়যাবী লিখেছেন, জালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়া বা আগ্রহান্বিত হওয়ার শাস্তি যদি জাহান্নাম হয়, তবে বুঝে নেয়া উচিত যে, জুলুম করা এবং জুলুমে নিমগ্ন থাকার পরিণাম হবে কী। মূলতঃ জুলুম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করার জন্য এসেছে আলোচ্য নির্দেশটি। সতর্কবাণীকে গুরুত্ববহ করে তোলা হয় এভাবেই। এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক জামাতে নামাজ পাঠ করছিলো। ইমাম যখন এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এভাবে অজ্ঞান হলে কেনো? সে বললো, জালেমদের প্রতি আগ্রহান্বিতরা যদি জাহান্নামী হয়, তবে জালেমদের পরিণাম কী হবে— একথা ভাবতে গিয়েই আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

হাসান বসরী বলেছেন, বিশুদ্ধ ধর্মের অবস্থান দু'টি 'লা' (না) এর মধ্যে। একটি হচ্ছে 'লা তাত্গাও' (নিজে সীমাতিক্রম কোরো না)। আর একটি হচ্ছে 'লা তারকানু' (জালেমদের প্রতি আগ্রহী হয়ো না)। ইমাম আওজায়ী বলেছেন, যে আলেম জালেমদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়, সে সর্বনিকৃষ্ট।

হজরত আউস বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে জালেমদের সহায়তা কামনা করে, সে বের হয়ে যায় ইসলাম থেকে।

এক লোক একবার বললো, প্রকৃতপক্ষে জালেম ক্ষতি করে নিজের, অন্যের নয়। হজরত আবু হোরায়রা বললেন, অন্যেরাও তার ক্ষতির শিকার। তার অত্যাচারে পক্ষীকুলও অনাহারে মৃত্যুবরণ করে আপন নীড়ে।

বায়যাবী বলেছেন, এখানে রসুলপাক স.কেও সম্বোধন করা হয়েছে সম্মিলিতভাবে। বলা হয়েছে, 'নতুবা অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।' তিনি স. সকল জুলুম থেকে সতত পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও এভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা। পূর্বের আয়াতে (১১২) উল্লেখিত দৃঢ়তাকে পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যেই সেখানকার নির্দেশের মতো এখানকার নির্দেশটিতেও অবলম্বিত হয়েছে সম্মিলিত সম্বোধন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এই অবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।' 'আউলিয়া' অর্থ বন্ধু, অভিভাবক যে বিপদাপদে সাহায্য করতে সক্ষম। 'ছুম্মা লা তুনসারূন' অর্থ, তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অর্থাৎ জুলুমবাজদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চিরকালীন শাস্তি। কারণ তারা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে অনেক দূরে। 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই 'দূরত্বব্যঞ্জক' অর্থে।

বাগবী বলেছেন, তিরমিজি ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবুল ইয়াসির আমর বিন আরীয়া আনসারী উল্লেখ করেছেন, একবার এক রমণী আটা ক্রয়ের জন্য আমার নিকটে আগমন করলো। আমি বললাম ঘরে এসো। ভালো আটা আছে। রমণীটি ঘরে এলে আমি তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে চুম্বন করলাম। কিন্তু হুঁশ ফিরে পেলাম পরক্ষণেই। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। আবু বকরকে কথাটি না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তিনি বললেন, তওবা করো। গোপন পাপ গোপনই থাক। কাউকে জানিয়ো না। আমার ভিতরে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে অনুশোচনার আগুন। স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। ওমরকে বলে ফেললাম কথাটা। তিনিও বললেন, বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করো। যা বলেছো বলেছো, আর কাউকে বোলো না। কিন্তু আমার দগ্ধমান অন্তর শান্ত হলো না কিছুতেই। শেষে কথাটা জানালাম প্রিয়তম রসুল স.কে। তিনি বললেন, তার স্বামী গিয়েছে জেহাদে। আর তার স্ত্রীর প্রতি তুমি এহেন আচরণ করলে। একথা শুনে আমার মনে হলো, আমি নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ্র রসুল মস্তক অবনত করে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তখন অবতীর্ণ হলো—

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

❒ সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ।

❒ তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সালাত কায়েম করবে দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে।' এই আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই নির্দেশটি কেবল আপনার জন্য, না আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি স. বললেন, সবার জন্য। 'লুবাবুন নুকুল' প্রণেতা লিখেছেন, হজরত ইয়াসার ছাড়াও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু উমামা, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত বুরাইদা থেকে।

'দিবসের দুই প্রান্তভাগে' অর্থ সকালে ও সন্ধ্যায়। আর 'রজনীর প্রথমাংশে' অর্থ রাতের ওই অংশ যা দিনের সঙ্গে জড়িত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'দিবসের দুই প্রান্তভাগে অর্থ জোহর ও মাগরিব। আর 'রজনীর প্রথমাংশে' অর্থ ইশার সময়। হাসান বসরী বলেছেন, 'দিবসের দুই প্রান্তের নামাজ হচ্ছে ফজর ও আসর। আর রাতের প্রথমাংশের নামাজ হচ্ছে মাগরিব ও ইশা। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনানুসারে জোহর, আসর এবং মাগরিব, ইশা একই নামাজ। এই সূত্রানুসারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেন, আসরের শেষ দিকে কেউ মুসলমান হলে অথবা কোনো ঋতুবতী নারী ঋতু থেকে পবিত্র হলে কিংবা কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বয়োপ্রাপ্ত হলে তার উপর জোহর ও আসর উভয় ওয়াক্তের নামাজ পাঠ হবে ওয়াজিব। ইশার নামাজের শেষ দিকে এরকম ঘটলেও ওয়াজিব হবে মাগরিব ও ইশা। ইমাম আবু হানিফার অভিমত কিন্তু এরকম নয়। তিনি বলেন, এমতোক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে কেবল আসর অথবা ইশা। আমি সুরা নিসার 'ইন্নাস সলাতা .....কিতাবাম্ মাওকুতা' আয়াতটির ব্যাখ্যায় একথা প্রমাণ করেছি যে, প্রতিটি নামাজের সময় পৃথক পৃথক। একারণেই ইমাম আবু হানিফা বলেন, সফর, অসুস্থতা কিংবা ঝড়বাদলের সময়েও জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা একসময়ে

পড়া যাবে না। আর বিনা প্রয়োজনে (ওজরে) দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্র করা কোনো ইমামের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের মতে ভ্রমণের সময় দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্র করা সিদ্ধ। আর অতি বৃষ্টির সময় একত্র পাঠ সিদ্ধ কেবল মাগরিব-ইশা— এরকম বলেছেন ইমাম আহমদ। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ঝড় বৃষ্টির সময় জোহর-আসরের সম্মিলিত পাঠ সিদ্ধ। ইমাম আহমদের মতে পীড়িত ব্যক্তির জন্য জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা এক সময়ে পাঠ করা সিদ্ধ।

জমহুর তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেন হজরত হামনা বিনতে জাহাশের হাদিসটি। তখন হজরত হামনা ছিলেন ইস্তেহাজার রোগিণী (অনবরত ঋতুস্রাবজনিত রোগকে বলে ইস্তেহাজা)। রসুলপাক স. তাঁকে এক নামাজের শেষভাগে ও অপর নামাজের প্রথম ভাগে দুই নামাজকে একই সময়ে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং নামাজ পাঠের পূর্বে দিয়েছিলেন গোসলের নির্দেশ। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. ভ্রমণাবস্থায় জোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে ইশার সাথে পাঠ করতেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দ্বিপ্রহরের পূর্বে কোথাও যাত্রা করলে আসরের পূর্বক্ষণে থামতেন এবং একসঙ্গে পাঠ করতেন জোহর ও আসর। আর দ্বিপ্রহরের পরে রওনা হতে চাইলে যাত্রা শুরু করতেন জোহর পাঠের পর।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের সময় জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা একসঙ্গে পড়তেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এভাবে নামাজ পাঠ করছেন কেনো? তিনি স. বলেছিলেন, উম্মতের কষ্ট যেনো না হয়।

বর্ণিত হাদিসসমূহ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এক সঙ্গে নামাজ আদায়ের অর্থ একই ওয়াক্তে নামাজ আদায় নয়। রসুল স. প্রতিটি নামাজ তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই পাঠ করেছিলেন। জোহর পড়েছিলেন জোহরের শেষ সময়ে, আর আসর পড়েছিলেন আসরের সূচনালগ্নে। তেমনি তিনি মাগরিবের অন্তিম লগ্নে মাগরিব সমাপনের পর ইশার সূচনাকালে পড়েছিলেন ইশা। তাই দৃশ্যতঃ দুই নামাজ সম্মিলিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে পঠিত হতো পৃথক পৃথক সময়ে, নির্ধারিত ওয়াক্তে। হজরত হামনার হাদিসের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট। এভাবে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদিসগুলোও পরীক্ষা করা যেতে পারে। তাঁদের অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. মদীনায় ভীতিপ্রদ অবস্থা অথবা ভ্রমণকালীন অবস্থা ছাড়াই দুই ওয়াক্তের নামাজকে মিলিয়েছিলেন এভাবে— এক নামাজ ওয়াক্তের শেষভাগে, আর এক নামাজ ওয়াক্তের প্রথম

ভাগে। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, ভয়ার্ত অবস্থা ও ঝড়বাদল ব্যতিরেকেই রসুল স. জোহরকে আসরের সাথে এবং মাগরিবকে ইশার সাথে পাঠ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাসের নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, উম্মতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যেই তিনি স. এরকম করেছিলেন। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, কোনো কারণ ব্যতিরেকেই রসুল স. মদীনায় দুই নামাজকে একত্র করেছিলেন। হেতু জানতে চাইলে তিনি স. বলেছিলেন, উম্মতের যেনো কষ্ট না হয়। এতদসত্ত্বেও ঐকমত্য এই যে, বিনা কারণে দুই নামাজের একত্র পাঠ অসিদ্ধ। বোখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে দীনার একবার তাঁর এক সতীর্থকে বললেন, হে আবু শায়বা! আমার ধারণা মিলিতভাবে পাঠ করলেও রসুল স. প্রতিটি নামাজ পাঠ করেছিলেন যথাসময়ে— জোহরের অন্তিমে জোহর এবং আসরের সূচনায় আসর এবং মাগরিবের শেষ ভাগে মাগরিব এবং ইশার প্রথম ভাগে ইশা। আবু শায়বা জবাব দিলেন, আমারও তাই মনে হয়।

একটি পর্যবেক্ষণ ঃ এক নামাজকে নির্ধারিত সময়ের শেষে নিয়ে পরের নামাজকে ওয়াক্তের শুরুতে এনে একত্রে পাঠ করলে যথাসময়ে নামাজ পড়া হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় এক নামাজকে ওয়াক্তের প্রথমে বা মধ্যবর্তীতে রেখে পরের নামাজকে এগিয়ে এনে পাঠ করার কথা এসেছে। এভাবে পাঠ করলে পরের ওয়াক্তের নামাজ যথাসময়ে পঠিত হয়েছে বলা যাবে না। যেমন হোসাইন বিন ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইকরামা ও কুরাইবের মাধ্যমে আহমদ, বায়হাকী ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো মনজিলে অবস্থানকালে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রসুল স. যাত্রারম্ভের পূর্বে জোহরের সঙ্গে আসরও আদায় করে নিতেন। আর সূর্য ঢলে পড়ার আগে রওনা দিলে জোহর না পড়েই যাত্রা করতেন। যাত্রা স্থগিত করতেন আসরের সময়। তারপর জোহর ও আসর আদায় করতেন এক সাথে। আবার কোনো সেনাশিবিরে অবস্থানকালে মাগরিবের সময় মাগরিব পড়ার পরক্ষণেই আদায় করতেন ইশা। আর মাগরিবের পূর্বে যাত্রা শুরু করলে থামতেন ইশার সময় এবং মাগরিব সমাধা করতেন ইশার সঙ্গে। হজরত আনাস থেকে ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. প্রবাসকালে সূর্য ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করতেন জোহর ও আসর। তারপর যাত্রা শুরু করতেন। ইমাম নববী বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা বিশুদ্ধ। হজরত মুয়াজ থেকে আবু তোফায়েল— ইয়াজিদ বিন হাবীব— লাইস— কুতাইবা সূত্রে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের দিনগুলোতে যাত্রার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে জোহর ও আসর একসঙ্গে সমাধার পর যাত্রা শুরু করতেন রসুল স.। আর সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে রওনা হলে জোহরকে করতেন বিলম্বিত। আসরের সময় থেমে জোহর ও আসর পড়তেন

একসাথে। পুনরায় যাত্রা করতেন এবং ইশার সময় থেমে এক সাথে পড়তেন মাগরিব ও ইশা।

পর্যালোচনাঃ বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরে বর্ণিত হোসাইন বিন আবাদুল্লাহ্র বর্ণনাটি দুর্বল। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি নিজেও দুর্বল। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে মুঈন। আর নাসায়ী তাকে বলেছেন পরিত্যক্ত। হজরত আনাসের হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন ইমাম নববী। জাহাবীর বর্ণনা পরম্পরাভূত ইসহাক বিন রহ্ওয়াইহ্কে বাতিল আখ্যা দিয়েছেন আবু দাউদ। তবে তার বর্ণনা সদৃশ একটি বর্ণনা এসেছে ইমাম হাকেমের 'আল আরবাইন' গ্রন্থে এভাবে— সূর্য ঢলে পড়লে জোহর-আসর এক সঙ্গে সম্পন্ন করে যাত্রা শুরু করতেন রসুল স.। বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য হলেও বিশুদ্ধ। তিবরানীর 'আল আওসাত' গ্রন্থে এসেছে, রসুল স. ভ্রমণরত অবস্থায় সূর্য ঢলে পড়লে জোহর-আসর একসঙ্গে পড়ে নিয়ে রওয়ানা হতেন। আর নামাজ না পড়ে যাত্রা শুরু করলে আসরের সময় থেমে একসঙ্গে সম্পন্ন করতেন জোহর ও আসর। মাগরিবকেও ইশার সঙ্গে মেলাতেন এভাবে। তিবরানী বলেছেন, ইয়াকুব বিন মোহাম্মদ জুহুরী এই হাদিসটির একক বর্ণনাকারী। আবার ইমাম তিরমিজির মতে হজরত মুয়াজের হাদিসের একক বর্ণনাকারী কুতাইবা। তবে মুসলিমের বর্ণনাটি সুবিদিত। আবু দাউদ বলেছেন, হাদিসটি যথাসমর্থনপুষ্ট নয়। ওয়াক্তের নামাজ পড়া সম্পর্কিত কোনো বিশুদ্ধ হাদিস আসলে নেই। আবু সাঈদ বিন ইউনুস বলেছেন, কুতাইবা ছাড়া আর কেউ এরকম বর্ণনা করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, তার বর্ণনা প্রমাদমুক্ত নয়। আবী হাতেম বলেছেন, বর্ণনাটি ভ্রান্তিময়। বর্ণনাটিকে সমালোচনাহত করেছেন হাকেম। বোখারী ও ইবনে হাজামও তাকে করে তুলেছেন প্রতর্কিত। আর দারাকুতনী পরিবেশিত বর্ণনাটিতে রয়েছে একাধিক অপরিচিত বর্ণনাকারী। একজনের নাম মানজার কাবুসী। সে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনা। বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে বোখারী ও মুসলিমে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি মুজদালিফা ব্যতীত অন্য কোথাও রসুল স.কে নির্ধারিত ওয়াক্তের বাইরে নামাজ পড়তে দেখিনি। হজের সময় তিনি স. মাগরিব আদায় করেছিলেন ইশার ওয়াক্তে, ইশার সঙ্গে। ফজর পড়েছিলেন অতি প্রত্যুষে। ফজরের সাধারণ সময়ের কিছু আগে। আরাফা প্রান্তরে দুই নামাজ একত্র করার কথা তিনি বলেননি। বিষয়টি সুবিদিত বলেই হয়তো তিনি এরকম করেছেন।

আর একটি ঘটনা ইমাম আবু হানিফার মতামতকে পরিপুষ্ট করেছে। ঘটনাটি ঘটেছিলো 'লাইলাতুত্ তা'রীসে'। কথাটির অর্থ শিবিরের শেষ রজনী। গভীর রাতে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন রসুল স.। শিবির স্থাপন করলেন সেখানে। হজরত বেলালকে পাহারা ও ফজরের আজানের দায়িত্ব অর্পণ করে নিদ্রাভিভূত হলেন তিনি। কিন্তু হজরত বেলাল ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। সকলের ঘুম ভাঙলো সূর্যোদয়ের পর। নামাজ কাজা হলো সকলের। তখন রসুল স. যে বক্তব্য প্রদান করলেন তাতে এই কথাগুলোও ছিলো— নিদ্রার কারণে নামাজ কাজা হলে অপরাধ নেই। অপরাধ হবে তখন যখন জাগ্রত অবস্থায় নামাজকে নিয়ে যাওয়া হবে পরবর্তী নামাজের সময়ে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যটির ব্যাখ্যাসূত্রে এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হলো। এবার আলোচিত হবে পরের বাক্যটি। পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মকে মিটিয়ে দেয়।' এ কথার অর্থ— পুণ্য মুছে ফেলে পাপকে। শিথিল সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নতুন পুণ্য পুরাতন পাপকে অতি দ্রুত সুচারুরূপে বিলোপ করে। এতো দ্রুত বিলোপ করে যে, তার দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে প্রিয়তম রসুল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি স. বললেন, পাপ সংঘটিত হলে পরক্ষণেই পুণ্য করবে। কারণ পুণ্য পাপকে মুছে দেয়। আমি বললাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ও কি পুণ্য কর্ম? তিনি স. বললেন, এটাতো পুণ্য সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক পরস্ত্রীকে চুম্বন করেছিলো। পরক্ষণে অনুতপ্ত হয় সে। রসুল স.কে ঘটনাটি জানায়। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। লোকটি বলে, হে দয়ার রসুল! সুসংবাদটি কি কেবল আমার জন্য? তিনি স. বললেন, না। তামাম উম্মতের জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'আমার ওই সকল উম্মতের জন্য যারা পুণ্য কর্ম করে।' বোখারী, মুসলিম। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন লোকটিকে বলেছিলেন, যদি তুমি তোমার পাপের কথা প্রকাশ না করতে তবে আল্লাহ্ও তা গোপন রাখতেন।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, জুমআর নামাজ ও রমজান মাস মধ্যবর্তী সময়ের পাপরাশিকে অপসারণ করে। মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের গৃহের সম্মুখে যদি একটি প্রবহমান নদী থাকে, আর তোমরা যদি ওই নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার স্নান করো, তবে বলো, তোমাদের শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তিনি স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তটি এরকম। আল্লাহ্ এর মাধ্যমে পাপ-সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। বোখারী, মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।' এ কথার অর্থ— ইতোপূর্বে বর্ণিত 'ইস্তেক্বামাত' (স্থিরতা) যারা অবলম্বন করবে অথবা পালন করবে ধর্মীয় বিধানসমূহ কিংবা চলবে কোরআন নির্দেশিত পথে, তাদের জন্য এই কোরআন এক অনন্য উপদেশ।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— 'তুমি ধৈর্য ধারণ করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আল্লাহ্র আনুগত্যে অবিচল থাকুন। অথবা দুঃখ-বিপদে থাকুন অচঞ্চল। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্ম হবে— হে রসুল! আপনি একাগ্রচিত্তে নামাজে নিমগ্ন থাকুন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আপনার পরিবারবর্গকে নামাজ পাঠের আদেশ দিন, আর ধৈর্য ধারণ করুন।' উল্লেখ্য যে, এখানে নামাজ ও ধৈর্য সমার্থক। অথবা অবিচ্ছিন্ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কারণ আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' একথার অর্থ— যারা নামাজী ও সৎকর্মপ্রবণ, তাদের শ্রমের প্রতিফলকে আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট করেন না।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১১৬, ১১৭

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

❑ তোমাদিগের পূর্ব যুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

❑ অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নহে যখন উহার অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী।

'বাক্বিয়্যাতুন' অর্থ যা অবশিষ্ট রাখা হয়। অথবা যা অবশিষ্ট থাকে। কিংবা কথাটির অর্থ হবে জ্ঞান, বিবেক বা মর্যাদাধারী সজ্জন। তাঁরাই মানবতার জন্য অবশিষ্ট রেখে যান উত্তম কথা ও কর্মের শুভনির্দেশনা। কেউ কেউ আবার

'বাক্বিয়্য' বলেছেন আনুগত্যকে অথবা অনুগতকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'বাক্বিয়্যাতুল্লহি খইর'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল বাক্বিয়্যাতুস্ সলিহাতু।' এভাবে আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি ও আপনার যুগের পূর্বে আমি রক্ষা করেছিলাম কেবল তাদেরকে যারা আমার নবীগণকে মান্য করতো।' তারা ছিলো সজ্জন ও সংখ্যালঘু। তারা মানুষকে সদুপদেশ দিতো। নিষেধ করতো পৃথিবীতে বিপর্যয় না ঘটাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতো তারই অনুসরণ করতো এবং তারা ছিলো অপরাধী।' এখানে 'আল্লাজীনা জলামু' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— ওই সকল অবাধ্যরা অসৎকর্ম পরিত্যাগ করেনি। তোয়াক্কা করেনি আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের। ভোগ বিলাসই ছিলো তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মুকাতিল বিন হাব্বান এখানকার 'মা উৎরিফু' কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— ওই সকল লালসার বস্তু যেগুলোর পেছনে তারা আবর্তিত হতো। ফাররা বলেছেন, তারা যে সকল সুখের উপকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, অনুসারী হয়ে পড়েছিলো সেগুলোরই।

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়, যখন তার অধিবাসীরা থাকে শুদ্ধাচারী।' এখানে 'লি ইউহ্‌লিকা' কথাটির 'লাম' না সূচকতার শক্তিবর্ধক। এখানে একটি 'আন' মুসদারিয়া (ধাতুমূল 'আন') অনুক্ত রয়েছে। 'আহলুহা' অর্থ জনপদের অধিবাসীরা। 'মুসলিহুন' অর্থ শুদ্ধাচারী। এভাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্‌পাক এমতো অন্যায় কর্ম করেন না যে, কোনো জনপদের অধিবাসী সৎ, অথচ তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অর্থাৎ কেবল শিরিকের কারণে তিনি কোনো স্থানের লোককে ধ্বংস করেন না, ধ্বংস করেন সামাজিক বিভিন্ন অপকর্মের কারণে। মানুষ যখন অন্যের অধিকার খর্ব করে, বিস্তার ঘটে শঠতা, প্রবঞ্চনা,ব্যভিচার, খুন রাহাজানি ইত্যাদির— অথবা প্রসার ঘটে ওজনে কম দেয়া অভ্যাসের, তখনই এসে পড়ে আল্লাহ্‌র গজব।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ্ থেকে তিবরানী ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. 'মুসলিহুন' শব্দটির ব্যাখ্যা সূত্রে বলেছেন, পরস্পরের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হও, আল্লাহ্‌র গজব থেকে রক্ষা পাবে। শুধু শিরিকের কারণে তিনি কাউকে ধ্বংস করেন না। কারণ তিনি পরম করুণাপরবশ। তাঁর অধিকার তিনি উপেক্ষা করেন। কিন্তু মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে ক্ষমা করেন না। ফেকাহ্‌বিদগণ সব সময় আল্লাহ্‌র অধিকারের তুলনায় বান্দার অধিকারকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, শিরিকের রাজত্ব তবু টিকে যায়, কিন্তু জুলুমের রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পায় না।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

❒ তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

❒ তবে উহারা নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এই জন্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই' তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবেই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎকর্মশীল মুসলমান বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরকম ইচ্ছা করেন না। যদিও তাঁর নির্দেশ এরকম। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও নির্দেশ এক নয়। নির্দেশের রীতি একটি, আর ইচ্ছার গতি আরেকটি। তাই মানুষ তাঁর নির্দেশ লংঘন করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।' একথার অর্থ, মানুষের মতৈক্য কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিভিন্ন পন্থায় তারা ঝুঁকে পড়বে অন্যায় ও মিথ্যাচারের দিকে। কেউ হবে ইহুদী, কেউ খৃষ্টান। কেউ কেউ হবে অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী। আবার কেউ কেউ হবে রাফেজী, খারেজী, জবরী, কদরী ইত্যাদি। কদরিয়ারা বলে, মানুষ তার আপন কর্মের স্রষ্টা। আর জবরিয়ারা বলে, মানুষ জড়পদার্থ তুল্য। এভাবে বিভিন্ন পন্থায় মতভেদকারীরা প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন দল।

পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে— 'তবে তারা নয় যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন।' একথার অর্থ— তবে ওই সকল লোক মতানৈক্য সৃষ্টি করে বিভ্রান্তিকে স্বাগত জানাবে না যাদেরকে আল্লাহ্পাক দয়া করে সফলতার পথ

প্রদর্শন করেছেন। বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও উত্তম কর্মসমূহকে আশ্রয় করে তারা থাকবে ঐক্যবদ্ধ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার রসুল স. মাটিতে একটি সরলরেখা আঁকলেন; বললেন, এটাই আল্লাহ্র পথ। এরপর এদিকে ওদিকে আরো কিছু রেখা টেনে বললেন, এগুলো হচ্ছে ভ্রান্ত পথ। এই পথগুলোর প্রতিটিতে শয়তান বসে থাকে এবং মানুষকে আহ্বান জানায়। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন— 'আর এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসারী হও। অন্য পথের অনুসরণ কোরো না।' আহমদ, নাসায়ী, দারেমী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি এদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— তিনি এ সকল লোককে সত্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই তারা সত্যাধিষ্ঠিত। এখানে 'জালিকা' (ওই) কথাটির লক্ষ্যস্থল হচ্ছে রহমত (দয়া)। আর 'হুম' (যাদেরকে) সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে 'মার্ রহিমা' (যাকে দয়া করেন) কথাটির সঙ্গে। হাসান ও আতা বলেছেন, পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত মতানৈক্য সৃষ্টিকারীরাই 'জালিকা' কথাটির লক্ষ্যস্থল এবং 'হুম' সর্বনামটি তাদের সাথেই জড়িত। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাদেরকে মতানৈক্য করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আশহাব বলেছেন, আমি একবার মালেককে জিজ্ঞেস করলাম এই আয়াতটির মর্মার্থ কি ? সে বললো, একদল মানুষ যাবে জান্নাতে, আরেকদল যাবে জাহান্নামে— এটাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আবু উবাইদা বলেছেন, আমিও বলি, এক দলের উপর বর্ষিত হবে রহমত, আরেকদলের উপরে আপতিত হবে আযাব। এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে। ফার্রা বলেছেন, রহমতের অধিকারীদেরকে রহমতের উদ্দেশ্যে এবং শাস্তির অধিকারী-দেরকে শাস্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা শাস্তির যোগ্য, তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই।'

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১২০, ১২১, ১২২

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۝ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

❐ রসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত, যদ্দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।

❐ যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল 'তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ করিতেছি।'

❐ 'এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আপনার পূর্ববর্তী রসুলগণের বৃত্তান্ত এতক্ষণ ধরে আমি আপনাকে জানালাম। আপনার চিত্তকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই আমি এরকম করলাম। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বিবৃত এ সকল বৃত্তান্তে আপনার সম্মুখে তুলে ধরলাম সত্যের স্বরূপ এবং আপনাকে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদেরকে প্রদান করলাম উপদেশ ও সতর্কবাণী। সুতরাং আপনি সত্যধর্ম প্রচারে অবিচল থাকুন। সহ্য করুন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

পরের আয়াতের (১২১) মর্মার্থ হচ্ছে— আর যারা আপনার কথা বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে। তোমরা যখন ফিরবেই না, তখন তোমরা তোমাদের কাজেই ব্যপৃত থাকো। আমরাও নিমগ্ন থাকি আমাদের কাজে।

এর পরের আয়াতের(১২২) মর্মার্থ হচ্ছে— আর তোমরা প্রতীক্ষারত থাকো অশুভ পরিণতির জন্য। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকি শুভ পরিণতির।

সুরা হূদ ঃ আয়াত ১২৩

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহেরই এবং তাঁহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান কেবলই আল্লাহ্‌র । কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁরই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি এবং আপনার স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। আমিই সকলকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল দান করবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর উপর নির্ভর করো।' একথার অর্থ— অতএব হে আমার রসুল! কেবল আমার ইবাদতকে শিরোধার্য্য করুন এবং অন্যদেরকে এরকম করতে বলুন। আর নির্ভর করুন কেবল আমার উপর। উল্লেখ্য যে, ইবাদতসহ আল্লাহ্‌নির্ভরশীলতা ফলপ্রসূ। ইবাদতশূন্য আল্লাহ্‌নির্ভরশীলতা জন্ম দেয় অহংকারের। আর তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্ নির্ভরতাবিহীন ইবাদত দৃষ্টি বিবর্জিত চোখের মতো। এরকম ইবাদতকারীর কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা বলে কিছু নেই।

শেষ বাক্যটি দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি একথাও জেনে রাখুন যে, আপনার সম্পর্কে এবং আপনার অনুগামী ও বিরোধীদের সম্পর্কে আমি মোটেও উদাসীন বা অমনোযোগী নই।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, তওরাত শরীফ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সুরা হুদ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বার্ধক্য আপনার উপর প্রবল হয়ে পড়েছে। তিনি স. বললেন, আমাকে বৃদ্ধ করেছে সুরা হুদ, সুরা ওয়াকেয়া, সুরা মুরসালাত, আম্মা ইয়া তাসাআলুন এবং ইজাশ্ শামসু কুয়্যিরাত। তিরমিজি, হাকেম। হাকেম ও বাগবী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু বকর থেকে এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ থেকে।

হজরত আবু বকর থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অকাল বার্ধ্যক্য এনে দিয়েছে সুরা হুদ ও তার সমগোত্রীয় সুরাগুলো।

শিথিল সূত্রে হজরত আনাস থেকে আবু ইয়া'লী এবং হজরত ইমরান থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে সুরা হুদ ও সুরা মুফাস্‌সিলাত।

হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া এরকমও বর্ণনা এনেছেন যে, রসুল স.এরশাদ করেছেন, আমাকে বৃদ্ধের মতো ভারাক্রান্ত করেছে সুরা হুদ ও তার সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আলক্বারিয়া, আল হাক্কা, ইজাস শামসু কুয়্যিরাত ও সাআলা সায়িল।

তিবরানী তাঁর আল কবীর গ্রন্থে হজরত উকবা বিন আমের ও হজরত হুজায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে সুরা হুদ ও তার সাথী সুরাগুলো বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে। শিথিল সূত্রে হজরত সুহাইল ইবনে সা'দ থেকে তিবরানীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আলহাক্কা এবং ইজাস্ শামসু কুয়্যিরাতের কথা। মোহাম্মদ ইবনে আলীর মাধ্যমে মুরসালরূপে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সুরা হুদ ও হুদের সতীর্থ সুরাগুলোতে বিবৃত অবাধ্যদের শাস্তিদানের ইতিবৃত্তসমূহ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

জাওযাইহুজ্ জুহুদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, আপন তাফসীরে আবু শায়েখ এবং মুরসাল পদ্ধতিতে ইমরান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. উল্লেখ করেছেন, সুরা হুদ ও হুদের সমগোত্রীয় সুরাগুলোর কিয়ামত ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বিবরণসমূহ আমাকে বার্ধ্যক্যে উপনীত করিয়েছে।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ ছিলো কিয়ামত ও অবাধ্যদের ধ্বংসের বিবরণসমূহ, ইস্তেকামাতের (দৃঢ়তা অবলম্বনের) আয়াত নয়। কারণ হুদ ছাড়া বর্ণিত সুরাগুলোতে ইস্তেকামাতের প্রসঙ্গ নেই। আল্লাহ্পাক অধিক অবগত।

সুরা ইউসুফ

১১১ আয়াত ও ১২ রুকু সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সপ্তম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হুদের পরে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

❐ আলিফ-লাম-রা; এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

❐ কুরআন, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

❐ আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; ইহার পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— আলিফ লাম রা; তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবীন (আলিফ লাম রা; এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত)। 'আলিফ লাম রা' হচ্ছে হরূফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। এ সকল রহস্যাচ্ছন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র এবং তাঁর প্রিয়তম রসুলের। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দয়া ও রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসরণের কারণে যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন), তাঁরাও এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জ্ঞান লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ওই আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআনের দিকে। 'আয়াত' ও 'কিতাব' হচ্ছে সম্বন্ধ পদ। শব্দ দু'টোর মধ্যে 'মিন' অব্যয়টি এখানে উহ্য। 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। অর্থাৎ আয়াতগুলো ওই কোরআনের যা অবশ্য

মাননীয়। অথবা আয়াতগুলো ওই কোরআনের, যে কোরআন হালাল-হারাম ও অন্যান্য সুস্পষ্ট বিধানাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কাতাদা বলেছেন, এই সুস্পষ্ট গ্রন্থের বরকত, হেদায়েত ও দিক নির্দেশনা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। জুজায বলেছেন, কোরআন হচ্ছে সত্য-মিথ্যা ও সিদ্ধ-নিষিদ্ধের প্রোজ্জ্বল বা সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা।

কেউ কেউ বলেছেন, 'তিলকা' দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই সুরার আয়াতগুলোর দিকে। তাই এখানে 'কিতাব' অর্থ হবে সুরা। অর্থাৎ এই সুরার আয়াতসমূহ নিয়ে কেউ পর্যালোচনা ও গবেষণা করলে বুঝতে পারবে, এগুলো আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, কোনো মানুষ এগুলোর রচয়িতা নয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'সুস্পষ্ট' কথাটি প্রযোজ্য হবে ইহুদীদের প্রতি। বায়যাবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদী পণ্ডিতেরা পৌত্তলিকদের বলতো, তোমরা মোহাম্মদের কাছে জানতে চাও— ইয়াকুব নবীর সন্তানেরা সিরিয়া ছেড়ে মিসরে গিয়েছিলো কেনো? ইউসুফ নবীরই বা কী পরিণতি ঘটেছিলো? তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা ইউসুফ। 'বাবুন্ নুজুল' প্রণেতা অবশ্য এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেননি।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'কোরআন, এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি আপনার নিজের ভাষায় যাতে এর শব্দগত ও অর্থগত ব্যঞ্জনা অতি সহজে আপনার হৃদয়ঙ্গম হয়। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরাও যেনো সহজে বুঝতে পারে এর মর্ম। এভাবে আকৃষ্ট হয় সত্য ধর্মের প্রতি।

জ্ঞাতব্যঃ মালেক ইবনে আরফুজা বর্ণনা করেছেন, আমি বসেছিলাম হজরত ওমরের পাশে। আব্দুল কায়েস বংশীয় এক জনকে তাঁর সামনে আনা হলো। হজরত ওমর তাকে বললেন, তুমি আব্দুল কায়েস বংশের অমুক? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি তখন তার হাতের ছড়ি দিয়ে লোকটিকে প্রহার করলেন। তারপর বললেন, বসো। সে বসলো। হজরত ওমর পাঠ করলেন 'আলিফ লাম রা' থেকে 'তা'ক্বিলুন' পর্যন্ত (১-২)। তারপর পুনরায় প্রহার করলেন তাকে। সে বললো, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি? তিনি বললেন, তুমি নাকি নবী দানিয়েলের কিতাবকে বেশী পছন্দ করো? সে বললো, তাহলে কী করবো? তিনি বললেন, বাড়ি যাও। কয়লা ও পশমী কাপড় দিয়ে ঘসে ঘসে মুছে ফেলো ওই কিতাবের লিপিসমূহ। এরপর তুমিতো পাঠ করবেই না, অপরকেও পাঠ করতে দিবে না। হজরত ওমর আরো বললেন, আমি একবার ইহুদীদের কিতাবের কিছু কিছু বক্তব্যের অনুলিপি চামড়ায় জড়িয়ে নিয়ে হাজির হলাম রসুল স.এর নিকটে। তিনি স. বললেন, তোমার হাতে কি ? আমি বললাম, একটি কিতাবের অনুলিপি,

জ্ঞানার্জনের জন্য সংগ্রহ করেছি। একথা শোনামাত্র রোষান্বিত হলেন তিনি। পবিত্র মুখমণ্ডল হয়ে গেলো রক্তিমাভ। জনৈক আনসার ঘোষণা করলেন, আসসালাতু জামিয়াহ (অস্ত্রসজ্জিত হও)। এরপর ঘোষণাকারী সশস্ত্র প্রহরীরূপে দাঁড়ালো মিম্বারের পাশে। মিম্বরে দণ্ডায়মান হলেন রসুল স.। বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমাকে দেয়া হয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট ও চিরন্তন বাণীবৈভব। উন্মোচিত করে দেয়া হয়েছে প্রাচীন ইতিবৃত্তসমূহ। আমি তোমাদের নিকট সেগুলো ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে চলেছি সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায়। সুতরাং দ্বিধাসংশয়ের অবকাশ আর নেই। সাবধান! যারা সংশয়ান্বিত, তাদের দ্বারা তোমরা প্রতারিত যেনো না হও।' আমি বলে উঠলাম, আল্লাহ্‌কে প্রভুপালক হিসেবে, আপনাকে নবী হিসেবে এবং কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে পেয়ে আমি চিরপ্রসন্ন। রসুল স. প্রসন্ন হলেন। নেমে এলেন মিম্বর থেকে। ইব্রাহিম নাখয়ী, ইজালাতুল খাফা।

হাকেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একে একে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়ে চললো রসুলুল্লাহ্‌র প্রতি। তিনি সেগুলো মানুষকে পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরাম একবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দয়া করে আপনি যদি আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তসমূহ শোনাতেন। তখন অবতীর্ণ হলো— আল্লাহু নায্‌যালা আহসানাল হাদিস.....(আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন অত্যুত্তম বাণী...)। ইবনে আবী হাতেম এই বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন কিছু বর্ধিত আকারে। ওই বর্ধিত অংশটুকু এরকম— সাহাবায়ে কেরাম আরো নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! যদি আমাদেরকে কিছু সদুপদেশ দিতেন। তখন অবতীর্ণ হলো— আলাম ইয়ানি লিল্লাজীনা আমানু আন তাখ্‌শাআ কুলুবুহুম লি জিকরিল্লাহ্ (যারা বিশ্বাসী তাদেরকে কি আমি এরকম করিনি যে, তাদের অন্তরগুলো ভীত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে?)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস অথবা হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সাহাবীগণ আবেদন জানালেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! অতীতের একটি কাহিনী আমাদেরকে শোনান। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতটি (৩)।

বলা হলো— 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কোরআন প্রেরণ করে; এর পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এই কোরআনের সুরা ইউসুফ এবার অবতীর্ণ করছি আপনার প্রতি। সুরা ইউসুফের এই কাহিনীটি অতি উত্তম কাহিনী। এই কাহিনীটি সম্পর্কে আপনি তো ইতোপূর্বে ছিলেন অনবহিত।

এখানে 'আলকাসাস' অর্থ কাহিনী। শব্দটি হয়তো বা শব্দমূল। সেক্ষেত্রে কর্মকারকরূপে শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান, যা বর্ণিত হয়েছে অনুপম ভঙ্গিতে। অথবা 'আলকাসাস' অর্থ কেবলই 'কাহিনী', যে কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে হজরত ইউসুফের বৈচিত্রময় জীবনের কথা। আরো বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শনরাজি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। প্রজ্ঞার বিচিত্র বিচ্ছুরণ। পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সফল ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা। আরো রয়েছে রমণী চরিত্রের রহস্যময় উন্মোচন। রাজানুজ্ঞা ও প্রজাপালনের দূরদৃষ্টি সঞ্জাত জ্ঞান। শত্রুশংকুল জীবনে সম্পাদ্য কর্তব্যনিচয়। বিজয় ও বিজয় পরবর্তী ঔদার্য ও মহানুভবতা ইত্যাদি।

খালেদ বিন মা'দান বলেছেন, বেহেশতবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহভরে পাঠ করবেন সুরা ইউসুফ ও সুরা মারইয়াম। ইবনে আতা বলেছেন, দুঃখভারাক্রান্ত ব্যক্তি সুরা ইউসুফ পাঠ করে সান্ত্বনা লাভ করে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ ○ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى
إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○
وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلٰٓى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

❒ স্মরণ কর, ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল,'হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি— দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজ্দাবনত অবস্থায়।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

❒ এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'আহসানুল কাসাস' (উত্তম কাহিনী) কথাটিকে যদি মাফউলে বিহি (কর্মপদ) ধরা হয়, তবে এখানকার ইজ ক্বলা ইউসুফ (ইউসুফ বললো) কথাটি হবে 'বদলে ইশতেমাল' (সামগ্রিকরূপে প্রতিস্থাপন)। নতুবা এর পূর্বে 'উজ্‌কুর' (স্মরণ করো) কথাটি অনুক্ত রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। বঙ্গানুবাদে অবশ্য এরকমই করা হয়েছে। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন নবী ইউসুফ তাঁর পিতা নবী ইয়াকুবকে বললেন, হে আমার পিতা! অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখেছি সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে।

'ইউসুফ' শব্দটি হিব্রু। তাই শব্দটি গায়ের মুনসারেফ (অপরিবর্তনশীল)। হজরত ইউসুফের পিতা ছিলেন হজরত ইয়াকুব। তাঁর পিতা হজরত ইসহাক। আর হজরত ইসহাকের পিতা হজরত ইব্রাহিম। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহামান্য নবী। হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ ও বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ইউসুফের পিতা ইয়াকুব। ইয়াকুবের পিতা ইসহাক। আর ইসহাকের পিতা ইব্রাহিম। তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান নবী।

এখানে 'রআইতু' কথাটির অর্থ স্বপ্নে দেখেছি। শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে'রুয়ত' ধাতুমূল থেকে। এর অর্থ— স্বপ্ন। সা'দ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে, বায্‌যার ও আবু ইয়ালী তাঁদের মসনদে, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া ও আবু শায়েখ তাঁদের আপনাপন তাফসীরে, উকাইলি ও ইবনে হাব্বান জুয়াফাতে, হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং আবু নাঈম ও বায়হাকী দালায়েলুন নবুয়তে হজরত জাবের থেকে একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। মুসলিমের শর্তানুসারে বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন হাকেম। বর্ণনাটি এই— এক ইহুদী (বায়হাকীর মতে তার নাম বুস্তান) একবার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, মোহাম্মদ! নবী ইউসুফ স্বপ্নে যে নক্ষত্রগুলোকে দেখেছিলেন, সেগুলোর নাম বলুন। রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। ইত্যবসরে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে রসুল স.কে নক্ষত্রগুলোর নাম জানিয়ে দিলেন। তিনি স. বললেন, যদি আমি নক্ষত্রগুলোর নাম বলতে পারি, তবে তুমি কি তা মানবে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, ওই এগারোটি নক্ষত্রের নাম — ১. জিরছান ২.

তারিক ৩. জুবার ৪. কাবিস ৫. আমুদান ৬. আল ফালিক ৭. আলমিসবাহ ৮. জরুহ ৯. আল ফরগ ১০. ওছাব এবং ১১. জুল কাফাতাইন। ইহুদী বললো, আল্লাহর কসম আপনি ঠিকই বলেছেন।

সেজদা করা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এখানে নক্ষত্রের মতো বিবেকবর্জিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বিবেকসম্পন্নদের সর্বনাম 'হুম' । এতে করে বুঝা যায়, ওই এগারোটি নক্ষত্র ছিলো হজরত ইউসুফের এগারোজন ভ্রাতার প্রতীক। পিতার প্রতীক সূর্য, আর মাতার প্রতীক চন্দ্র।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইউসুফের মাতা ছিলেন রাহীল। তিনি তখন পরলোকগতা। তাই চন্দ্র ছিলো তাঁর খালার প্রতীক। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আরবী ভাষায় 'শামস'(সূর্য) ব্যবহৃত হয় স্ত্রীলিঙ্গে। আর 'ক্বমার'(চন্দ্র) ব্যবহৃত হয় পুংলিঙ্গে। সুতরাং এখানে সূর্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মাতার প্রতি এবং পিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে চন্দ্রের মাধ্যমে। কিন্তু বক্তব্যটি প্রমাদপূর্ণ। অভিধানে শব্দ দু'টোকে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ সাব্যস্ত করলেও বাস্তবে সূর্য ও চন্দ্র কোনোটিরই লিঙ্গ নেই। সূর্য চন্দ্রাপেক্ষা উজ্জ্বল। তাই সূর্যকে পিতার এবং চন্দ্রকে মাতার প্রতীক ধরা হয়েছে। এটাই যুক্তিসঙ্গত। হজরত ইউসুফের স্বপ্ন দর্শনের রাতটি ছিলো শুক্রবারের রাত। ওই দিন ছিলো শবে কদরও। কোনো কোনো বিদ্বান্ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত স্বপ্ন দর্শনের পরেই মহামর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন হজরত ইউসুফ।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা কোরো না; করলে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব স্নেহসিক্ত স্বরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইউসুফকে বললেন, বৎস! সাবধান! তোমার অগ্রজদেরকে তোমার স্বপ্নের কথা জানিয়ো না। জানালে তারা তোমাকে হিংসা করবে এবং ষড়যন্ত্র উপস্থিত করবে তোমার বিরুদ্ধে। সুতরাং শয়তানকে এমতো সুযোগ দিয়ো না। কারণ সে মানুষের নিশ্চিত শত্রু। এখানে 'বুনাইয়া' অর্থ বৎস। স্নেহের আতিশয্যবশতঃ বয়োকনিষ্ঠদেরকে 'বুনাইয়া' বলে সম্বোধন করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, তখন হজরত ইউসুফ ছিলেন বারো বছরের বালক।

'রুইয়া' অর্থ নিদ্রা। আর 'রুইয়াত' অর্থ স্বপ্ন। নিদ্রা অথবা তন্দ্রাজাত দর্শনকে বলে স্বপ্ন। বায়যাবী লিখেছেন, ধারণার গণ্ডি অতিক্রম করে অনুভূতির একটি বিশেষ অবস্থানে লীন হওয়াকে স্বপ্ন বলা হয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে একটি গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে ফেরেশতা জগতের। নিদ্রা বা অন্য কোনো উপায়ে দৈহিক সম্পর্কের প্রভাব স্তিমিত হলে মানবাত্মা হয়ে পড়ে ফেরেশতামুখী। কারণ

ফেরেশতাজগতে রয়েছে সত্তার কায়াহীনতা ও মূল তত্ত্ব। আত্মা সেখান থেকেই লাভ করে তার অস্তিত্বের নিগূঢ় অভিজ্ঞান। ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞান উপস্থাপন করে বিবেকের সামনে। তখন উদঘাটিত হয় স্বপ্নের স্বরূপ। সত্য স্বপ্ন দর্শনের এটাই নিয়ম। সাকার ও নিরাকার সত্তার মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক থাকলে বিষয়টি হয় অধিকতর সহজ। তখন স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন আর থাকে না।

আমি বলি, ধারণার জগতে বোধ ও বুদ্ধির অবলোপন ঘটলে জেগে ওঠে আত্মা। শুরু হয় তার সংগুপ্ত পর্যালোচনা। এরকম ঘটতে পারে কেবল নিদ্রা অথবা আত্মসমাহিত অবস্থায়। এ সময় আত্মা অবস্থান করে দৈহিক নিয়ম-নিগড়ের বাইরে। তিনটি রূপ রয়েছে এ অবস্থায়, তন্মধ্যে দু'টি প্রমাদপূর্ণ, আর একটি প্রমাদবিমুক্ত। প্রমাদমুক্তটিও আবার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এ অবস্থায় তাবীর বা ব্যাখ্যা কখনো ভুল হয়ে যায়, আবার কখনো হয় শুদ্ধ। স্বপ্নরূপের প্রকার তিনটি এরকম—

১. জাগ্রত অবস্থায় দর্শিত দৃশ্যাবলীই প্রতিভাত হয় স্বপ্নে। অথবা স্বপ্নে পরিদৃশ্যমান হয় মস্তিষ্কজাত ধারণার বিভিন্ন আকার। এ ধরনের স্বপ্নকে বলা যেতে পারে কুপ্রবৃত্তিজাত স্বপ্ন।
২. শয়তান চলাচল করে মানুষের শিরা উপশিরায়। এভাবে সে নিদ্রাবস্থায় মানুষের ধারণা প্রবাহে সঞ্চালন করে ভীতি অথবা উল্লাস। এ ধরনের স্বপ্নকে বলে শয়তানী স্বপ্ন।
৩. আল্লাহ্র অদৃশ্যভাণ্ডার থেকে বা তাঁর কোনো গোপন গুণবত্তা থেকে স্বপ্নে দেয়া হয় সুসংবাদরূপী বিশেষ অনুগ্রহ। এই বিশেষ অনুগ্রহই স্বপ্নে প্রদত্ত ইলহাম বা ইলক্বা। হজরত উবাদা ইবনে সামেতের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের সঙ্গে স্বপ্নে আলাপন করেন। বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।— এ ধরনের স্বপ্নই হচ্ছে বিশুদ্ধ স্বপ্ন।

স্বপ্ন সম্পর্কে সুফী দার্শনিকগণের ধারণা এরকম— জগত দু'টি, বৃহৎ জগত ও ক্ষুদ্র জগত (আলমে কবীর ও আলমে সগীর)। সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে বৃহৎ জগত। আর এক এক জন মানুষ হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র জগত। বৃহৎ জগতের সকল উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত ও সংক্ষিপ্ত সমাহার ঘটেছে ক্ষুদ্র জগতে। তাই এই দুই জগতের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক ও সুনিপুণ সাদৃশ্য। এ বিশাল সৃষ্টির রহস্যে মানুষের সত্তাও রহস্যাচ্ছাদিত। অনুভূতি ও অনুভূতির অতীত বিষয়াবলীও তাই দুই জগতেই বিদ্যমান। যেমন রোগ-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু, সময়-অসময় ইত্যাদি। দৃশ্যতঃ বৃহৎ জগত জড় বস্তু তুল্য মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আর যার আকার নেই, তার আকারও প্রতিভাসিত হতে পারে অন্তর্দৃষ্টিতে।

যেমন রসুল স. জ্বরকে স্বপ্নে দেখেছিলেন কৃষ্ণমুখী রমণীরূপে। আর ইউসুফ সুদিন ও দুর্দিনকে দেখেছিলেন যথাক্রমে স্থূলকায় ও কৃশকায় গাভীরূপে। তবে এ কথাটি ঠিক নয় যে, বৃহৎজগতে প্রতিভাত রূপ ও ক্ষুদ্রজগতে প্রতিভাত রূপ সব সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এমনও হতে পারে যে, স্বপ্নে দর্শিত ঘটনা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথবা স্বপ্নে ধরা পড়েছে প্রতীকি দৃশ্য— যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এধরনের প্রতীকি বা উপমাময় স্বপ্ন বাহ্যতঃ বাস্তবতাবিরোধী মনে হলেও অন্তর্গত দিক থেকে সম্পূর্ণতই সাদৃশ্যশোভিত। এ ধরনের স্বপ্নই দেখেছিলেন হজরত ইউসুফ। পিতা, মাতা ও তাঁর এগারোজন অগ্রজের উপমারূপে সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্রকে দেখেছিলেন তাঁকে সেজদা করতে।

রসুল স. বলেছেন, ছয়টি স্বপ্নের তাবীর এরকম— ১. স্বপ্নে রমণী দর্শনের তাৎপর্য শুভ, ২. উট দেখলে যুদ্ধ অনিবার্য, ৩. দুধ দেখলে বুঝতে হবে লাভ হবে শুদ্ধাচারী জীবন, ৪. শাক-সব্জী দেখলে লাভ হবে জান্নাত, ৫. নৌকা দেখলে পরিত্রাণ লাভ হবে, আর ৬. শীষ দেখলে বাড়বে রিজিক। হাদিসটি মুয়াজ্জম গ্রন্থে শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু ইয়ালী।

আলমে কবীরের এই খেয়ালী জগতকে বলে আলমে মেছাল বা উপমার জগত। ইমাম গায্যালী ও শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এই জগতকে বলেছেন আলমে ইশবাহ। ইন্দ্রিয়জ প্রভাব থেকে মানবাত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন সে মনোযোগী হয় এই জগতের প্রতি। আর তখনই আলমে মেছালের কিছু কিছু দৃশ্য ছায়া ফেলে আত্মার আয়নায়। এই দর্শনের নাম শুভস্বপ্ন।

নবী রসুলগণের অন্তরাত্মা সতত পবিত্র। শয়তান ও রিপুর প্রভাব থেকে তাঁরা সুরক্ষিত। তাঁদের নিদ্রা চোখ ও দেহকে বিবশ করে মাত্র। কিন্তু তাঁদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে সদা জাগ্রত। তাঁদের স্বপ্নে বিচ্যুতির প্রবেশাধিকার মাত্র নেই। তাই তাঁদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহী বা প্রত্যাদেশ, যা সম্পূর্ণ নির্ভুল। হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি তাঁর পবিত্র পুত্রকে কোরবানী করছেন। স্বপ্নদর্শনের পর প্রিয় পুত্রকে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! স্বপ্নে দেখলাম, আমি তোমাকে কোরবানী করছি। পুত্র প্রত্যুত্তরে বললেন, হে আমার মহান জনয়িতা! যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা করে ফেলুন। পিতার মতো তিনিও ছিলেন নবী। তাই তিনি জানতেন পিতার স্বপ্ন হচ্ছে প্রত্যাদেশ, যা অবশ্যই পালনীয়।

আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দয়ায় ও কঠোর সাধনার ফলে আউলিয়া সম্প্রদায়ও অর্জন করেন আত্মার পবিত্রতা। আপনাপন নবীর একনিষ্ঠ অনুসরণের ফলে তাঁদের অন্তরাত্মাও হয় স্বচ্ছ দর্পণ বা অনাবিল সলিলের মতো। তাই তাঁদের অধিকাংশ স্বপ্নই সত্য ও শুভ। নবীগণের মতো তাঁরা সতত সুরক্ষিত নন বলেই তাঁদের কোনো কোনো স্বপ্নে থাকে ভুলের মিশ্রণ। পার্থিব জীবন বড়ই জটিল ও

আবিল। তাই তাঁদেরকে অনবধানতাবশতঃ কখনো কখনো ভক্ষণ করতে হয় সন্দিগ্ধ আহার্য। ফলে অন্তর্দর্পনে পড়ে মলিনতার ছাপ। ওই সময়ের দর্শিত স্বপ্ন তাই জটিলতা ও আবিলতামুক্ত নয়। নির্ভুলও নয়। নবী রসুলগণ নিষ্পাপ। আর আউলিয়া কেরাম সুরক্ষিত। তাই তাঁদের দর্শিত স্বপ্নে তারতম্য তো থাকবেই। নবী রসুলগণ প্রত্যাদেশের অবতরণ স্থল। আর আউলিয়াগণ প্রত্যাদেশের অনুসারী। পাপাচারী জনতা ও সমাজের প্রবল প্রভাব তাঁদেরকে কখনো কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই তাঁদের স্বপ্ন নবীগণের স্বপ্নের মতো নির্ভুল, অকাট্য ও অনুসরণীয় নয়। রসুল স. এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে তাই তাদের স্বপ্নের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে এভাবে— মুমিনদের শুভ স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর এক হাদিসে এসেছে—চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। হজরত আনাস, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। আহমদ, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, কেবল হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে। হজরত আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী। আর কেবল হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম। হজরত আবু রজীন থেকে বর্ণনা করেছেন আহমদ ও ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাগুলো ছাড়া অন্য বর্ণনাগুলোতে স্বপ্ন(রুইয়াত) এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'রুইয়াতে সালেহা' (সত্য দর্শন)।

ইবনে মাজা ও আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একজন আল্লাহ্‌ভীরু মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়তের সত্তর ভাগের একভাগ। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রজীন বলেছেন, মুমিনগণের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ অংশের এক অংশ। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন, একজন পুণ্যবান মুসলমানের স্বপ্ন আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে তার প্রতি সুসংবাদ এবং তার নবুয়তের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। ইবনে নাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, বিশ্বাসীদের স্বপ্ন নবুয়তের পঁচিশ অংশের এক অংশ।

একটি জিজ্ঞাসাঃ স্বপ্ন নবুয়তের একটি অংশ— একথার অর্থ কী? উপরের আলোচনায় বিবৃত হয়েছে, অংশের সংখ্যাগত তারতম্য। এর সমাধানই বা কী?

জবাবঃ রসুল স. এর উপরে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো তেইশ বছর ধরে। প্রথমদিকের ছয়মাস ছিলো সত্য স্বপ্ন দর্শনের সময়। তখন যে সকল স্বপ্ন তিনি দেখতেন, বাস্তবে তাই প্রতিফলিত হতো প্রভাতের আলোর মতো।

স্বপ্ন দর্শনের ওই ছয়মাস তেইশ বৎসরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই হয়। তাই বলা হয়েছে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ। চল্লিশ-পঞ্চাশ

ভাগের বর্ণনাগুলো সম্ভবতঃ অনুমান নির্ভর। আর সত্তর ভাগের বর্ণনা দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য আপনি সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও।' একথার অর্থ— তাদের জন্য আপনি অসংখ্যবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও। এভাবে 'সত্তর অংশের এক অংশ' কথাটির অর্থ হবে 'অসংখ্য অংশের এক অংশ।' আর পঁচিশ অংশের এক অংশ বর্ণনাটি একটি বিরল বর্ণনা।

উল্লেখ্য যে, সর্বসাধারণের স্বপ্ন কিন্তু নবীগণের স্বপ্নের মতো নয়। তাদের স্বপ্নও উপমার জগতের প্রতিবিম্বজাত। কিন্তু পাপ ও প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তাই তাদের অধিকাংশ স্বপ্ন প্রমাদপূর্ণ ও অসত্য। প্রতিবিম্ব ধারণের প্রকৃতি ও উপমার জগতের আকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত না হলে স্বপ্নের তাৎপর্য হবে ভ্রমাত্মক। স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে। তাই এরশাদ হয়েছে— 'আল্লাহ্ স্বপ্নের তাৎপর্য তোমাদেরকে ইলহামরূপে শিক্ষা দেন।' পুণ্যবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাগ্যেই জোটে ইলহাম। আর সেই ইলহামের স্বরূপ নির্ণীত হয় বিশুদ্ধ বোধের মাধ্যমে। হজরত আবু রজীন থেকে যথাসূত্রে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীগণের স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশভাগের একভাগ। বর্ণনা করার পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ঝুলতে থাকে পাখির ডানায়। বর্ণনা করার পর তা ডানা থেকে খসে পড়ে। অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্নের কথা কাউকে বোলো না। কোনো কোনো বর্ণনায় 'অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া' কথাটির স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'যাকে ভালো মনে করো তাকে ছাড়া'। আবু দাউদ ও ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, পাখির পাখায় ঝুলন্ত থাকে তোমাদের স্বপ্নগুলো। বিবৃত করার সাথে সাথে তা পাখা থেকে ঝরে যায়। বিচক্ষণ ও সুহৃদ ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে স্বপ্নের বিবরণ দিয়ো না।

আমার মতে হাদিসে উল্লেখিত 'তাইব' শব্দটির অর্থ নিয়তি বা ভাগ্যলিপি। প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপি সুনির্ধারিত। কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— 'প্রত্যেকের স্কন্ধে আমি অবধারিত করে দিয়েছি তার নিয়তি।' এভাবে হাদিসের মর্ম হবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্বাসীর স্বপ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নিয়তির বিধানের উপর। স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ না করা পর্যন্ত ওই নিয়তি থাকে অজ্ঞাত। যখন কোনো ইলহাম প্রভাবিত ব্যক্তি, বিবেচক ও বিজ্ঞজন কর্তৃক এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা খসে যায় পাখির পালক থেকে। অর্থাৎ স্বপ্নের উদ্দেশ্য তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিচক্ষণ ও সজ্জন ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নের কথা বলা যায় না। বলা যায় কেবল তাদেরকেই, যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসে। 'মান তুহিব্বু' কথাটির মর্ম এটাই। সজ্জন ও বিচক্ষণজনেরাই কেবল বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করতে পারে স্বপ্নের।

হজরত আউফ বিন মালেক থেকে যথাসূত্রে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের— ১. শয়তানের পক্ষ থেকে শংকাসঞ্চারক স্বপ্ন, ২. জাগ্রত অবস্থায় কথোপকথন ও কল্পনারঞ্জিত স্বপ্ন, ৩. ওই স্বপ্ন, যা নবুয়তের ছয়চল্লিশ অংশের একটি অংশ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার — ১. আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রদত্ত শুভসংবাদ ২. অপপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ৩. শয়তানের প্ররোচনা। শুভ স্বপ্ন প্রকাশ করা যেতে পারে। আবার তা গোপনও রাখা যায়। কিন্তু অশুভ স্বপ্ন প্রকাশ করা যায় না। তাই অশুভ স্বপ্ন দেখলে শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করবে এবং নামাজ পাঠ করবে। আমি স্বপ্নে গলার মালা দেখাকে অশুভ মনে করি। আর শুভ মনে করি বরই (কুল) দেখাকে।

হজরত কাতাদা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, শুভ স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং অশুভ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। অশুভ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠার সাথে সাথে বাম পাশে থুথু নিক্ষেপ করবে। শয়তানের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর স্বপ্নের কথা কারো কাছে বলবে না। এরকম করলে ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আর শুভ স্বপ্ন দেখলে পুলকিত হবে। প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত উন্মোচন করবে না। বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে, আবু দাউদ তাঁর সুনানে এবং তিরমিজি তাঁর 'জামে' গ্রন্থে লিখেছেন, সুন্দর স্বপ্ন আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে । আর শয়তানের পক্ষ থেকে আসে অশুভ স্বপ্ন। স্বপ্নে অশুভ কোনো কিছু দর্শন করলে জাগ্রত হয়ে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। যাচ্‌ঞা করবে আল্লাহ্র শরণ। তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না।

উল্লেখ্য যে, শয়তানের প্ররোচনাজনিত অশুভ স্বপ্ন দর্শনের পর আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হলে অশুভ প্রভাব লুপ্ত হয়ে যায়। আর উপমার জগতের প্রতিচ্ছবিরূপী স্বপ্নের ফলাফল থাকে ঝুলন্ত। আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হলে ওই ঝুলন্ত পরিণাম শূন্যেই বিলীন হয়ে যেতে পারে। অশুভ স্বপ্নদৃষ্টে নামাজ পাঠ করতে বলা হয়েছে, অযথা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা নামাজ পাঠ অবশ্যই শ্রেয়। নামাজের মাধ্যমে অশুভ পরিণতি প্রতিহত হওয়াও সম্ভব। কারণ নামাজ হচ্ছে দোয়া। হজরত সালমান ফারসী থেকে বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত সাওবান থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, ঝুলন্ত নিয়তিকে দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না।

স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ না করার নিষেধাজ্ঞাটি হারামসুলভ (তাহরীমি) নয়, হালালসুলভ (তানজিহি)ও নয়। এই নিষেধাজ্ঞাটি উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বেগ প্রশমনার্থে। রসুল স. উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর জুলফিকার তরবারিটির ধার ভেঙে গিয়েছে। এটা ছিলো বিপদের আলামত। আরো দেখেছিলেন, গাভী জবাই করার দৃশ্য। এটাও ছিলো মুসিবতের আগাম সংকেত। সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। রসুল স. আর একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন, বনী উমাইয়া আরোহণ করেছে তাঁর পবিত্র মিম্বরে। স্বপ্নটি দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি। হৃদয়ের উদ্বেগ প্রশমনকল্পে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্তটি প্রকাশও করে দিয়েছিলেন। সুরা ক্বদরের তাফসীরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্তায়ালা।

কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার সংবাদ স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। জনসমক্ষে তিনি তা প্রকাশও করে দিয়েছিলেন।

আমি বলি, অশুভ বার্তা শত্রুকুলকে উল্লসিত করে। আর শুভ স্বপ্ন তাদের অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় হিংসার আগুন। তাই স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। হজরত ইয়াকুবও তাই তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইউসুফকে তাঁর স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকটে প্রকাশ কোরো না। যদি করো তবে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন।' হজরত ইউসুফকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে কথাটি। কথাটির অর্থ— হে ইউসুফ! আমিই তোমাকে সুসংবাদবাহী স্বপ্ন দেখিয়েছি। এখন তুমি বালক। কিন্তু আগামীতে তুমিই হবে আমার মনোনীত নবী, রাষ্ট্রনায়ক এবং আরো অনেক মহৎ কর্মকাণ্ডের আয়োজক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন।' স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বলে তা'বীর। শব্দটি স্বপ্ন-সংশ্লিষ্ট। তাই একে তা'বীলও বলে। প্রকৃত পক্ষে তা'বীল বলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পবিত্র বাণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যভেদ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের প্রতি।' এখানে নেয়ামত বা অনুগ্রহ অর্থ নবুয়ত। আর 'ইয়াকুবের পরিবার পরিজন'— কথাটির অর্থ, ইসরাইল বংশীয় নবীগণ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইয়াকুবের ঔরসজাত সন্তানগণ— যেহেতু তাঁর সকল সন্তানই ছিলেন নবী। উক্তিটি কিন্তু দুর্বল। এখানে 'আবাওয়াইকা' শব্দটির অর্থ পিতামহ ও প্রপিতামহ। অর্থাৎ পিতৃপুরুষ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় বলেই তাঁর নির্বাচন নির্ভুল। তাই তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই নবী নির্বাচন করেন।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ○ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ○ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ○

❒ ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদিগের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

❒ স্মরণ কর, উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই আমাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী; আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।

❒ 'ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদিগের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদিগতেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।'

❒ উহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং তোমরা যদি কিছু করিতেই চাহ তাহাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নবী ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে ঘটনার বহু বিচিত্র কল্লোল। রয়েছে মানব চরিত্র ও মানব সমাজের বহুমাত্রিক উন্মোচন। তাই অনুসন্ধিৎসুরা এই কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না।

হজরত ইয়াকুবের প্রথম পত্নী ছিলেন তাঁর মাতুল-তনয়া লিয়া বিনতে লিয়াম। ছয় পুত্র ও এক কন্যার জননী ছিলেন তিনি। বয়োক্রমানুসারে ছয় পুত্রের নাম — রুবেল, শামউন, লাদী, ইয়াহুদ, রাইয়ান ও ইয়াশহার। আর কন্যার নাম ছিলো

দীনা। জুলফা ও ইয়ালহামা নাম্নী দুই দাসীর গর্ভে জন্মেছিলো চারটি পুত্র সন্তান। তাদের নাম— দানা, তাদ্তালী, জাদা ও আশার। বর্ণনা করেছেন বাগবী। তিনি একথাও লিখেছেন যে, প্রথমার পরলোকগমনের পর তাঁর ছোট বোন রাহীলকে বিবাহ করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। এই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন অগ্রজ হজরত ইউসুফ এবং অনুজ বিনইয়ামিন। এভাবে হজরত ইউসুফেরা হয়ে যান দ্বাদশ ভ্রাতা।

বায়যাবী লিখেছেন, ইসরাইলী শরিয়তে একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহবন্ধ করা যেতো। তাই লিয়া এবং রাহীল সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও একই সময়ে হজরত ইয়াকুবের সহধর্মিণী ছিলেন।

কতিপয় ইহুদী রসুল স. এর নিকটে হজরত ইউসুফের কাহিনী শুনতে চেয়েছিলো। ওই সকল ইহুদীকেই আলোচ্য আয়াতে জিজ্ঞাসু বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের জন্যই এই কাহিনীতে রয়েছে নিদর্শন। বাগবী এরকম বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের কেনান থেকে মিসর গমণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। রসুল স. কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন প্রত্যাদেশানুসারে। তওরাত শরীফের পূর্ণ অনুকূল ছিলো বলে ইহুদীরাও কাহিনীটিকে মেনে নিয়েছিলো। আর কাহিনীটি শুনতে চেয়েছিলো তারাই। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'জিজ্ঞাসুদের' বলে কেবল ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়নি, বুঝানো হয়েছে সকল অনুসন্ধিৎসুকে। কারণ এতে রয়েছে তওহীদ ও নবুয়তের অনেক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। কারো কারো মতে দৃষ্টান্তস্থাপন ও সতর্কীকরণই এই কাহিনীটির উদ্দেশ্য। হজরত ইউসুফের ভ্রাতৃবর্গ ছিলো ঈর্ষাপরায়ণ। কূপে নিক্ষিপ্ত হজরত ইউসুফ দাসরূপে গমন করেছিলেন মিসরে। কাম ও ক্ষোভের অগ্নিতে দগ্ধিভূত হয়েছিলো আজিজ-গৃহিনী জুলায়খা। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অনুপ্রবেশ করেছিলেন কারাগারে। সেখানে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন স্বপ্ন সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর হয়েছিলেন মিসরের অধীশ্বর। এভাবে তিনি ইতিহাসে অঙ্কিত হয়েছেন সত্য, সংগ্রাম ও সফলতার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে। আর এভাবেই তাঁর কাহিনীর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে ঈর্ষাপ্রবণ, কামান্ধ ও অংশীবাদীদেরকে। এই কাহিনীটি আবার শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর নবুয়তের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রসুল স. এই কাহিনীটি কোনো গ্রন্থ পাঠ করে কিংবা কারো নিকটে শুনে বলেননি। বলেছেন প্রত্যাদেশানুসারে। প্রত্যাদেশই হচ্ছে নবুয়তের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তারা বলেছিলো, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ ও তার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যদিও আমরা দলে ভারী। এ কথার অর্থ— হজরত ইউসুফ ও তাঁর সহোদর অনুজ বিন

ইয়ামিনকে হিংসা করতে লাগলো তাদের বৈমাত্রেয় দশ ভাই। বললো , ইউসুফ ও তার ছোট ভাইটাই পিতৃমহোদয়ের অধিক প্রিয়। আমাদের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই, যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'নাহ্নু উস্বাতুন' অর্থ আমরা দলে ভারী। ফাররা বলেছেন, দশ অথবা তদুর্ধ সংখ্যক লোকের দলকে বলে উস্বাহ্ । কেউ কেউ বলেছেন, এক থেকে দশ জন পর্যন্ত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিন থেকে দশ। কারো কারো মতে দশ থেকে চল্লিশ। মুজাহিদের মতে দশ থেকে পনের । কামুস অভিধানে রয়েছে মানুষ, ঘোড়া ও পাখি গণনার ক্ষেত্রে দশ থেকে চল্লিশ সংখ্যার দলকে বলে উস্বাহ্। জামারী বলেছেন, উস্বাহ্ কথাটি প্রযোজ্য হবে কেবল মানুষের বেলায়। শব্দটির বহুবচন 'উসাব'। কেউ কেউ বলেছেন, সংহত ও সংঘবদ্ধ দলকে বলে উস্বাহ্। সুতরাং এখানে 'নাহ্নু উস্বাতুন' কথাটির অর্থ হবে— আমাদের এই দশ জনের দলটি একটি সুসংহত দল।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন।' এখানে 'দ্বলাল' শব্দটির অর্থ সাংসারিক বিভ্রান্তি, ধর্মীয় বিভ্রান্তি নয়। অর্থাৎ হজরত ইউসুফের বিদ্রোহী ভ্রাতারা হজরত ইয়াকুবকে ধর্মভ্রষ্ট মনে করতো না। করলে তারা হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাদের ধারণাটি ছিলো এরকম— আমাদের পিতা ইউসুফ ও তার অনুজের প্রতি স্নেহান্ধ। তাই তিনি তাদেরকে বেশী ভালোবাসেন। অথচ কৃষিকাজ, পশুপালন সবকিছুই আমরা করি। আর ওরা দু'জন থাকে পিতার একান্ত সান্নিধ্যে। আমরা কর্মব্যস্ত। আর ওরা নিষ্কর্মা।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে—'ইউসুফকে হত্যা করো।' ওয়াহাব বলেছেন, এই উক্তিটি করেছিলো শামউন। কা'ব বলেছেন, কথাটি উচ্চারণ করেছিলো দানা। মুকাতিল বলেছেন, 'ইউসুফকে হত্যা করো' কথাটি বলেছিলো রুবেল। মোট কথা, তাদের দশ জনের মধ্যে যে কোনো একজন এরকম বলেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা তাকে কোনো স্থানে নির্বাসন দাও, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে।' এখানে 'আরদ্বান্' শব্দটিতে 'তানভিন' ব্যবহারের কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— নির্বাসন দিতে হবে ধুসর, দুর্গম ও অচেনা কোনো স্থানে । অর্থাৎ এরকম স্থানে ইউসুফকে নির্বাসন দিলে পিতা কোনো দিনই আর তাকে খুঁজে পাবেন না। ফলে তাঁর সকল স্নেহের ভাগীদার হবো কেবল আমরা।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।' একথার অর্থ— ইউসুফকে হত্যা অথবা নির্বাসনদানের পর আল্লাহ্পাকের নিকটে মার্জনা চেয়ে নিলেই চলবে। তিনি তো পরম ক্ষমাপরবশ। তাই তিনি আমাদেরকে

মার্জনা করবেনই। আর আমরাও তখন হয়ে যাবো শুদ্ধাচারী। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমরা তখন নানাবিধ ওজর আপত্তি দেখিয়ে এবং আন্তরিক সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করে পিতাকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করবো। তিনিও প্রসন্ন হবেন। কারণ তিনিতো আমাদের পিতা। আর আমরাও তখন হয়ে যাবো সাধু। এরকম বলেছেন মুকাতিল। এরকম বলাও অসংগত হবে না যে— আমরা তখন সত্যিসত্যিই সংশোধিত হবো। ফলে পিতার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হবে কেবল আমাদের প্রতি।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে একজন বললো, ইউসুফকে হত্যা কোরো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনো গভীর কূপে নিক্ষেপ করো, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।' কাতাদা বলেছেন, এই উক্তিটি করেছিলো রুবেল। বাগবী লিখেছেন, ইয়াহুদা। এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ। হত্যা একটি মহা অপরাধ। তাই তারা শেষ পর্যন্ত হজরত ইউসুফকে বিজন প্রান্তরের কোনো অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। এখানে 'গাইয়াবাত' অর্থ কূপ বা গর্ত। প্রকৃতপক্ষে শব্দটির দ্বারা ওই স্থানকে বুঝানো হয় যেখানে প্রবেশ করলে হতে হয় নিরুদ্দেশ।

বাগবী লিখেছেন, অতল কূপকে বলে জুব্। কামুস অভিধানে রয়েছে, জুব্ বলে গভীরতম কূপকে, যে কূপে থাকে অগাধ জলরাশি। অথবা ওই কূপকে, যা প্রবহমান থাকে কোনো উত্তম স্থানে বা কৃষিক্ষেত্রে। অথবা কথাটির অর্থ অতল কোনো প্রাকৃতিক কূপ । এখানে 'ইয়াল্তাক্বিত' শব্দটির অর্থ সহজলভ্য, অযাচিত প্রাপ্তি।

মোহাম্মদ বিন ইসাহাক লিখেছেন, হজরত ইউসুফকে কূপে নিক্ষিপ্ত করার পাপটি ছিলো অনেক পাপের সমাহার। যেমন— স্বজন-বন্ধন-ছেদন, পিতৃ-আজ্ঞা লংঘন, নিরপরাধ বালকের উপর উৎপীড়ন, নির্মমতা, বিশ্বাসভঙ্গ, অঙ্গীকার লংঘন, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। আল্লাহ্পাক অবশেষে তাদেরকে মার্জনা করে দিয়েছিলেন। কারণ মার্জনাপ্রার্থীরা কখনো বিফল হয় না। আমি বলি, তাদের পিতৃভক্তি ছিলো অসাধারণ। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। পিতৃভক্তির আতিশয্যই তাদেরকে করে তুলেছিলো ঈর্ষাকাতর। পিতার ভালোবাসা আকর্ষণ করাই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিদ্রোহী ভ্রাতারা হজরত ইউসুফকে হত্যা করার ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলো। আল্লাহ্পাকই কৃপাপরবশ হয়ে তাদেরকে ওই মহাপাপ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুবা তাদের ধ্বংস ছিলো অনিবার্য।

আবু আমর বলেছেন, তারা নবুয়ত না পাওয়ার কারণেই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ মনে করেন, হজরত ইয়াকুবের দ্বাদশ পুত্রই ছিলেন নবী। সুতরাং যারা নবী হন, তাদের নবুয়তপূর্ব জীবনেও এমতো মহাপাপ থেকে মুক্ত

থাকেন। তবে অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইউসুফের অন্যান্য ভাইয়েরা নবী ছিলেন না। অবশ্য কোরআন মজীদে নবীগণের আলোচনা প্রসংগে 'আসবাতে ইয়াকুব' কথাটির অর্থ ইসরাইলী নবীবর্গ, যারা আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত ইয়াকুবের বংশপ্রবাহ থেকে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

قَالُوْا يَٰٓاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

❒ উহারা বলিল,'হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছ না কেন, যদিও আমরা তাহার শুভাকাংক্ষী?

❒ 'তুমি আগামীকল্য তাহাকে আমাদিগের সংগে প্রেরণ কর, সে ফলমূল খাইবে ও খেলাধুলা করিবে। আমরা তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।'

❒ সে বলিল, 'ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে।'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, হজরত ইউসুফকে বিজন কোনো প্রান্তরের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে হবে। এদিকে আবার হজরত ইয়াকুব তাকে চোখের আড়াল হতে দেন না। কিন্তু পিতার নিকট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে উদ্দেশ্য সাধনও অসম্ভব। তাই তারা প্রস্তাব করলো, ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। আমরা এতোগুলো ভাইতো তার সঙ্গেই থাকবো। আল্লাহ্‌র সত্য নবী হজরত ইয়াকুব তাদের প্রস্তাব শুনে শঙ্কিত হলেন। একটি অশুভ ছায়া বার বার আচ্ছন্ন করতে লাগলো তাঁর স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়কে। তাঁর এমতো অবস্থা দেখে তারা বললো, হে আমাদের পিতা! ইউসুফ তো আমাদেরই ভাই। তবু আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেনো? আমরা তো তার শুভ কামনাই করি।

মুকাতিল বলেছেন, পরের আয়াতের (১২) প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই হজরত ইয়াকুবের আশঙ্কার কারণটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে বলা হয়েছে— তুমি আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করো, সে ফল-মূল খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। এর প্রত্যুত্তরে হজরত ইয়াকুবের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে— ইন্নি লাইয়াহ্‌জুনুনি। তাঁর ওই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা বলেছিলো, 'ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছো না কেনো?'

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, ইউসুফের বিরহে আমি ব্যথিত হবো। পশুপাল নিয়ে যে জঙ্গলের দিকে তোমরা যেতে চাও সেদিকে নেকড়ে ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে খুব। না জানি তোমরা কখন অমনোযোগী হও। আর সেই সুযোগে এই নিরীহ বালক নেকড়ের শিকার হয়। সুতরাং বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয়টি এখানে প্রধান বিষয় নয়।

বাগবী লিখেছেন, এ ঘটনার কিছুদিন পূর্বে হজরত ইয়াকুব স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইউসুফকে আক্রমণ করেছে একটি হিংস্র বাঘ। ওই স্বপ্ন দেখার পর তিনি হজরত ইউসুফের ব্যাপারে সদা শঙ্কিত থাকতেন। আমার মতে বর্ণনাটি সুসংগত নয়। কারণ নবীগণের স্বপ্নের বাস্তবায়ন অপরিহার্য । তিনি এমন স্বপ্ন দেখে থাকলে হজরত ইউসুফ ব্যাঘ্র কবলিত হতেনই। কিন্তু বাস্তবে তো সেরকম কিছু ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে — 'তারা বললো, আমরা এক ভারী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।' একথার অর্থ— তারা বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আমরা তো একটি সুসংহত দল। আমাদের পশুপালকে আমরাই তো হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে সব সময় রক্ষা করে এসেছি। সুতরাং ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করতে পারবো। না পারলে পৃথিবীতে আমাদের মতো এমন হতভাগ্য হবে কে? আমরা কি অসমর্থ? না অযোগ্য?

হজরত ইউসুফকে তাঁর ভাইদের সঙ্গে যেতে দিতে না চাওয়ার দু'টি কারণ উপস্থাপন করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। একটি হচ্ছে, প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদ যাতনা, অপরটি হচ্ছে তার নিরাপত্তাজনিত দুশ্চিন্তা। হজরত ইউসুফের ভায়েরা কেবল নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই দিয়েছিলো। বিচ্ছেদ যাতনা সম্পর্কে তারা কোনো কিছু বলেনি। তারা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলো বলেই এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। পিতা ইউসুফকে বেশী ভালোবাসেন, একথা ভাবতে না চাওয়াই ছিলো তাদের নিকটে স্বস্তিদায়ক।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

❒ অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত করিল তখন উহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল এবং আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম 'তুমি উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে যখন উহারা তোমাকে চিনিবে না।'

❒ উহারা রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিগের পিতার নিকটে আসিল।

❒ উহারা বলিল,'হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদিগের মাল-পত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।'

❒ উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, 'না, তোমরা এক মন-গড়া কথা লইয়া আসিয়াছ, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করবার সিদ্ধান্ত করলো তখন তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করলো।' ওয়াহাব প্রমুখের উক্তি উল্লেখপূর্বক বাগবী লিখেছেন, বালক ইউসুফকে মহাসমাদরে বাহনে উঠিয়ে নিয়ে বিজন প্রান্তরের দিকে যাত্রা করলো তার ভায়েরা। কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে যাওয়ার পর তারা প্রকাশ করলো তাদের স্বরূপ। ইউসুফকে টেনে নামালো বাহন থেকে। তাঁকে নির্যাতন করতে লাগলো

বিভিন্নভাবে। চলতে লাগলো প্রহারের পর প্রহার । একজন ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তো আরেকজন। এভাবে পালাক্রমে অনেকক্ষণ ধরে নির্যাতন চালালো তারা। হজরত ইউসুফ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে আমার মহান পিতা! দেখুন আপনার প্রিয় ইউসুফের কী হাল করেছে ক্রীতদাসীর সন্তানেরা। ইয়াহুদ বললো, দ্যাখো, তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে ইউসুফকে তোমরা হত্যা করবে না। তাই বলছি, এবার ক্ষান্ত হও। নির্যাতন বন্ধ করো। এবার একে ফেলে দাও কোনো গভীর কূপের মধ্যে। সকলে ক্ষান্ত হলো। খুঁজে খুঁজে বের করলো একটি গভীর কূপ। অরণ্য-পথের পাশের ওই কূপটির মুখ ছিলো সংকীর্ণ। কিন্তু তার অভ্যন্তরভাগ ছিলো প্রশস্ত। হজরত ইয়াকুবের বসতবাটী থেকে কূপটির দূরত্ব ছিলো ছয় মাইল।

কা'ব বলেছেন, কূপটি ছিলো মিসর ও মাদিয়ানের মধ্যবর্তী একটি স্থানে। কাতাদা বলেছেন,বায়তুল মাকদিসে। আর সে সময় হজরত ইউসুফের বয়স ছিলো বারো বছর অথবা আঠারো বছর। কূপে নিক্ষেপের আগে তাঁর গায়ের জামা খুলে নিয়েছিলো তারা। জামাটি তিনি ফেরত চাইলেন। ভায়েরা বললো, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে ডাকো। তারাই তোমাকে সাহায্য করবে। একথা বলেই তারা ইউসুফকে ফেলে দিলো কুয়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে একটি বালতিতে বসিয়ে বালতির রশি ধরে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো কুয়ার অভ্যন্তরে। মাঝামাঝি স্থানে নামানোর পর তারা রশিটি দিয়েছিলো ছেড়ে। মনে করেছিলো, ইউসুফের মৃত্যু নির্ঘাত। অত্যন্ত গভীর ওই কূপটিতে ছিলো অনেক পানি। অন্ধকার ওই পানিতে আছড়ে পড়লেন হজরত ইউসুফ। ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ পায়ের নিচে লাগলো একটি পাথর। ওই পাথরের উপরেই অর্ধ ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো ক্রন্দনরত অবস্থায়। কূপে পতিত হওয়ার পর উপর থেকে ভায়েরা তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। ইউসুফ ভাবলেন, ভাইদের মনে হয়তো করুণার উদ্রেক হয়েছে। অন্ধকার গহ্বর থেকে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁর আওয়াজ শুনতে পেয়ে আবারও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তারা। প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্যোগ নিলো । কিন্তু ইয়াহুদ বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে নিরস্ত্র করলো তাদেরকে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক উপস্থাপিত সুদ্দীর বর্ণনাটি বেশ দীর্ঘ। ওই দীর্ঘ আলোচনার এক অংশে তিনি লিখেছেন, হজরত ইয়াকুব ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনের স্নেহে তিনি ছিলেন অন্ধ। তাই অন্য দশ ভাই তাঁদেরকে হিংসা করতো। তারা ইউসুফকে পিতার

নিকট থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করতে চাইলো। গোপন পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করলো একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। বিভিন্ন কথা বলে পিতার মন যুগিয়ে ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে তারা চললো অনেক দূরের অরণ্যসংকুল চারণভূমিতে। সেখানে সকলে মিলে ইউসুফকে একটি বালতিতে বসিয়ে বালতিসমেত তাঁকে নামিয়ে দিলো একটি গভীর গহ্বরে। গহ্বরটির মাঝামাঝি যেতে না যেতেই তারা ছেড়ে দিলো বালতির রশি। ভাবলো হাড়গোড় ভেঙে ওই কূপেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তারা যা কামনা করেছিলো তা হলো না। কূপে ছিলো অনেক পানি। ফলে ইউসুফ তেমন একটা আঘাত পেলেন না। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন একটি পাথর। দাঁড়াতে পারলেন ওই পাথরের উপর। অনতিবিলম্বে সেখানে প্রত্যাদেশসহ উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। পরবর্তী বাক্যে সেকথাই বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে — 'এবং আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।' এই ওহী বা প্রত্যাদেশটি নবুয়তের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত প্রত্যাদেশ নয়। এটা ছিলো ইলহাম প্রকৃতির একটি জ্ঞাতব্য মাত্র। হজরত মুসার মাতার প্রতিও এরকম ইলহাম হয়েছিলো। হজরত ইউসুফ ছিলেন তখন বালক মাত্র। নবুয়তের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিলো পরিণত বয়সে এভাবে— ওয়ালাম্মা বালাগা আশুদ্দাহু আতাইনাহু হুকমাওঁ ওয়া ই'লমা (আর যখন তিনি উপনীত হলেন পরিণত বয়সে, আমি তাকে দান করলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান)। কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, এখানকার প্রত্যাদেশটি নবুয়তেরই প্রত্যাদেশ। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'আওহাইনা ইলাইহি'। ওহী শব্দটির উল্লেখ এখানে স্পষ্ট। অনেকের মতে এখানকার সম্পূর্ণ বক্তব্যটিই ওহী বা প্রত্যাদেশ। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে হজরত ইউসুফকে এখানে এইমর্মে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, হে আমার নবী! বিচলিত হবেন না। আল্লাহ্পাকই আপনার পরিত্রাতা । এমন দিন আসবে যখন এরা হবে আপনার করুণার মুখাপেক্ষী। তখন আপনি তাদেরকে চিনবেন। কিন্তু তারা আপনাকে চিনতে পারবে না। তখন তাদের আজকার এই অপকর্মের কথা আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। পরবর্তীতে এরকমই ঘটেছিলো। হজরত ইউসুফ তখন মিসরের রাজা। দুর্ভিক্ষকবলিত ভায়েরা রাজদরবারে গিয়েছিলো সাহায্যের আশায়। অন্য আয়াতে ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'যখন তারা প্রবেশ করলো, তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা চিনতে পারলো না তাঁকে।'

বাগবী লিখেছেন, ইয়াহুদ ছিলো কোমল হৃদয়। সে প্রতিদিন অন্তরীণ ইউসুফকে আহার্য পৌঁছে দিতে শুরু করলো। এভাবে তিনদিন গত হওয়ার পর সেখানে প্রত্যাদেশ নিয়ে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল।

ইমাম আহমদ তাঁর জুহুদ গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল হাকাম তাঁর ফত্হে মিসর গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়ার মাধ্যমে হাসান বসরীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্তিটি এই— তখন হজরত ইউসুফের বয়স ছিলো সতের বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তখন ছিলো তাঁর যৌবনের উন্মেষকাল । তাই বলতে হয় তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন যুবক হওয়ার আগেই। হজরত ঈসা ও হজরত ইয়াহ্ইয়ার ক্ষেত্রেও এরকম যৌবনপূর্ব প্রত্যাদেশ লাভের ঘটনা ঘটেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, ইউসুফকে কূপে ফেলে দেয়ার পর তারা জবাই করলো একটি ছাগল ছানা। তাঁর গাত্রাবরণটি রঞ্জিত করলো ছাগলের রক্তে। সবাই মিলে ঠিকঠাক করলো, কী বলতে হবে এবার পিতাকে গিয়ে। হজরত ইউসুফের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রটি নিয়ে তারা এবার বাড়ীর পথ ধরলো।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকটে এলো।' তাদের অন্তর ছিলো অপরাধী। তাই তারা পছন্দ করলো নিশীথের প্রত্যাবর্তনকে। ইশার সময়। চরাচরে নেমে এসেছে ঘন ঘোর অন্ধকার। দশ ভাই একসাথে উপস্থিত হলো বহির্বাটিতে। এক বর্ণনায় এসেছে, বহির্বাটিতে তারা পৌঁছলো আর্তনাদ করতে করতে। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে হজরত ইয়াকুব বললেন, কী হয়েছে? তোমাদের উপর কি কোনো নেকড়ে আক্রমণ করেছিলো? তারা জবাব দিলো না। নবী ইয়াকুব বললেন, ইউসুফ কোথায়?

'তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী।' কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ওয়ামা আনতা বিমু'মিনিল লানা' (তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না) — কথাটির মাধ্যমে হজরত ইউসুফের দশ ভাই একথাই বলতে চেয়েছিলো যে, হে আমাদের পিতা! আপনি তো ইউসুফের মোহে মগ্ন। সুতরাং আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কীরূপে? আমরা সত্যকথা বললেও তো আপনার প্রতীতি আনয়ন করতে সক্ষম হবো না । অথচ আমরা সত্য কথাই বলছি। এখানে 'নাস্তাবিক্ব' কথাটির অর্থ প্রতিযোগিতা। কারো কারো মতে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা। আর 'মাতায়্' অর্থ বস্ত্র, দ্রব্য সামগ্রী।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিলো।' এখানে 'কাজিব্' শব্দটির অর্থ মিথ্যা। শব্দটি ধাতুমূল।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন হজরত ইয়াকুব। তাঁর রক্তরঞ্জিত পরিধেয়টি দেখে আঁচ করতে পারলেন প্রকৃত ঘটনা কী। বললেন, ব্যাঘ্রটি বড়ই দূরদর্শী। আমার সন্তানকে সে ভক্ষণ করলো, অথচ অক্ষতরূপে ফেরত দিলো তার পরিধেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, না। তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছো।' এ কথার অর্থ— এখানে 'সাওয়ালাত লাকুম' কথাটির অর্থ তোমাদের প্রবৃত্তি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অতি তুচ্ছ করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফকে হত্যা করা অথবা গুম করা তোমাদের কাছে মনে হয়েছে একটি সাধারণ ব্যাপার। তাইতো তোমরা এরকম মনগড়া কথা বলতে পারলে। 'সাওয়ালাত' শব্দটি এসেছে সুয়াল থেকে, যার অর্থ ঝুলে পড়া বা অবনমিত হওয়া। শব্দের পরিমাপানুসারে (বাবে তাফয়ীলের সূত্রানুসারে) কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— অনুত্তম কোনো কিছুকে উত্তমরূপে প্রদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যা করেছো, তাতো করেই ফেলেছো। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নেই। আমি এই অসহনীয় বিপদে ধৈর্যকেই আশ্রয় করে রইলাম। এটাই আমার পক্ষে উত্তম। বাগবী লিখেছেন, 'সবরে জামীল' অর্থ ওই ধৈর্য, যার মধ্যে কোনো সৃষ্টির বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে না। থাকে না কোনো চাঞ্চল্য অথবা বিলাপ। তিবরানীর মাধ্যমে হাব্বান বিন হুমাইয়ার মুরসাল(অবিন্যস্ত) বর্ণনায় এসেছে,'সবরে জামীল' হচ্ছে অনুযোগ-অভিযোগ বিবর্জিত ধৈর্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব আরো বললেন, হে বৎসবর্গ! তোমাদের বক্তব্যের প্রতিকূলে আমি আমার নিজস্ব কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই না। আমি কেবল চাই আল্লাহ্র আশ্রয় ও সহায়তা। চাই নীরব ধৈর্যধারণের যথোপযুক্ত শক্তি ও সাহস।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফের কাহিনীতে এ কথাগুলোও এসেছে— হজরত ইউসুফের বিরোধী ভ্রাতারা জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ধরে এনেছিলো। বলেছিলো, হে মহান পিতা! এই বাঘটিই আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ইউসুফকে ভক্ষণ করেছে। হজরত ইয়াকুব বাঘটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তুমি বলো ঘটনাটি কি সত্যি? বাঘ বললো, না। আমি তো তাকে চোখেও কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি এ অঞ্চলে এসেছো কেনো? সে বললো, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। আপনার এ সন্তানেরা আমাকে এখানে জোর করে ধরে এনেছে।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ○

❒ এক যাত্রীদল আসিল, ইহারা উহাদিগের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল; সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল, 'কি সুখবর! এ যে এক কিশোর!' অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল; উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

❒ এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্পমূল্যে— মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ।

প্রথমোক্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি এরকম— তিনদিন পর মিসর অভিমুখী একটি বাণিজ্য কাফেলা পথ ভুলে এসে পড়লো ওই কূপটির কাছে। কূপটি ছিলো প্রায় পরিত্যক্ত ও লোকালয় থেকে অনেক দূরে। কচিৎ কখনো কোনো বিপথগামী পথিক অথবা কোনো পশুপালের রাখাল কূপটি থেকে পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতো। কূপটির পানি ছিলো লবনাক্ত। তাই তা সুপেয় ছিলো না। কিন্তু হজরত ইউসুফ সেখানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর থেকে সেখানকার পানি হয়ে গেলো সুপেয়। মিসরগামী দলটি তাদের একজনকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালো কূপটির কাছে। পানি সংগ্রাহকের নাম ছিলো মালিক বিন দোবার। সে ছিলো মাদিয়ানের অধিবাসী। আয়াতে তাকে 'ওয়ারিদ' বলা হয়েছে। পানির সন্ধানে কাফেলার আগে আগে যে চলে তাকেই বলে ওয়ারিদ বা পানি সংগ্রাহক। যাহোক পানি সংগ্রাহক মালিক বিন দোবার পানির ডোল বা বালতি রশিতে বেঁধে নামিয়ে দিলো কূপটির ভিতরে। হজরত ইউসুফ ওই বালতির রশিটি শক্ত করে ধরে বসলেন। মালিক বিন দোবার পানি তোলার সময় টের পেলো বালতিটি বেশ ভারী। কষ্টে-সৃষ্টে বালতিটি উপরে তুলতেই সে বিস্মিত হয়ে বললো, এযে দেখছি অপরূপ এক কিশোর। কাফেলার লোকেরাও বিস্মিত হলো তাঁকে দেখে। ভাবলো, এই সুন্দর কিশোরকে ক্রীতদাসরূপে চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। মিসরের বাজারে ক্রীতদাস ক্রেতারা একে নিয়ে শুরু করবে কাড়াকাড়ি। এ কথা ভেবে তারা লুকিয়ে রাখলো হজরত ইউসুফকে। এ তো গেলো ঘটনার বাইরের দিক। কিন্তু এ ঘটনার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্। তিনি এসকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে হজরত ইউসুফের কী পরিণতি ঘটাবেন তা কেবল তিনিই জানেন।

হজরত ইউসুফ ছিলেন সৌন্দর্যের খনি। রসুল স. বলেছেন, সকল মানুষকে যে সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে, তার অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে নবী ইউসুফকে। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, আবু ইয়া'লী ও হাকেম।

বাগবী লিখেছেন, মহিমান্বিতা পিতামহী হজরত সারার রূপমঞ্জুসার এক ষষ্ঠাংশ পেয়েছিলেন হজরত ইউসুফ। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত ইউসুফ ও তাঁর মহাসম্মানিতা জননীর রূপমাধুরী ছিলো সমগ্র সৃষ্টির রূপ-সৌন্দর্যের দুই তৃতীয়াংশ।

'বুশরা' শব্দটির অর্থ সুসংবাদ। মালিক বিন দোবার হজরত ইউসুফকে দেখেই চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, 'ইয়া বুশরা হাজা গুলাম' (কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!) এ কথার অর্থ— হে আমার সঙ্গী সাথীরা! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। এরকমও হতে পারে যে, যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে সে 'সুসংবাদ' 'সুসংবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, বুশরা ছিলো তাদের দলের একজনের নাম। তাকেই সম্বোধন করে আনন্দধ্বনি দিয়ে উঠেছিলো সে। অথবা ডেকেছিলো সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে। মুজাহিদ তাঁর পিতার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, কূপ থেকে হজরত ইউসুফকে উত্তোলন করলে কূপটি তাঁর বিরহে ক্রন্দন শুরু করেছিলো।

'তারা তাঁকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখলো'— কথাটির অর্থ, মালিক বিন দোবার ও তার সঙ্গীসাথীরা মিসর যাত্রার সারা পথে তাঁকে আগলে রাখলো। তারা আশঙ্কা করছিলো অন্য কেউ হয়তো জোর পূর্বক এই অপরূপ কিশোরের মালিকানা দাবি করে বসতে পারে। তাই তারা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখলো তাঁকে। মিসরের বাজারে গিয়ে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে এই রূপবান কিশোরকে বিক্রয়ের লোভ পেয়ে বসেছিলো তাদেরকে। পথে কেউ অকস্মাৎ হজরত ইউসুফকে দেখে ফেললে তারা বলতো, এই সুন্দর গোলামটি আমরা উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফের কোমল হৃদয় ভ্রাতা ইয়াহুদ প্রতিদিন তাঁর জন্য আহার্যদ্রব্য নিয়ে হাজির হতো কূপটির পাশে। তৃতীয় দিবসে যেয়ে সে দেখলো ইউসুফ নেই। সে তৎক্ষণাৎ একথা গিয়ে জানালো তার অন্য ভাইদেরকে। তারা হন্যে হয়ে ইউসুফকে খুঁজতে খুঁজতে সাক্ষাত পেলো মালিক বিন দোবারের। ইউসুফকে দেখিয়ে বললো, এতো আমাদের পলাতক ক্রীতদাস। কিন্তু মালিক বিন দোবারের দল তাঁকে কিছুতেই হস্তান্তর করতে সম্মত হলো না। শেষে বিশ দিরহাম মূল্যে তাঁকে বিক্রয় করে দিলো তাঁর ভাইয়েরা। পরের আয়াতে (২০) সেকথা বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'এবং তারা তাঁকে বিক্রয় করলো স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'শারওহ্' শব্দটির দ্বারা ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি বুঝানো হয়ে থাকে। তাই আলোচ্য

আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে এরকম— যাত্রীদলের লোকেরা হজরত ইউসুফকে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছিলো। জুহাক, মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, 'বাখ্‌স্‌' শব্দের অর্থ হারাম। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয় মূল্য হারাম। আবার বাখ্‌স্‌ অর্থ মূল্য পড়ে যাওয়া বা মূল্য হ্রাস হওয়া। হারাম সম্পদের বরকত হ্রাস পেতে থাকে। সে কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বাখ্‌স্‌ (স্বল্পমূল্যে) শব্দটি। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'বাখ্‌স্‌' অর্থ অচল মুদ্রা। ইকরামা ও শা'বী বলেছেন, স্বল্পমুদ্রা। কারণ উকিয়া সমতুল্য মুদ্রা হলে বেচাকেনা হতো পরিমাপের মাধ্যমে। আর উকিয়ার নিম্নতম পরিমাণের বিনিময় হতো গুণতি হিসেবে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে মাসউদ ও কাতাদা বলেছেন, তাঁকে বিক্রয় করা হয়েছিলো কুড়ি দিরহামের বিনিময়ে। অর্থাৎ হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা মালিক ইবনে দোবারের নিকট কুড়ি দিরহাম নিয়ে তাদের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলো। এভাবে দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে পেয়েছিলো দুই দিরহাম করে। ইকরামা বলেছেন, তারা বিক্রয় করেছিলো চল্লিশ দিরহাম মূল্যে। মুজাহিদ বলেছেন, বাইশ দিরহামের কথা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা ছিলো এতে নির্লোভ।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা তাঁর প্রতি ছিলো নিরাসক্ত বা উপেক্ষাপ্রবণ। তারা এটা জানতো না যে হজরত ইউসুফ তাঁর পিতার দৃষ্টিতে কতো প্রিয়, কতো মূল্যবান। তারা চাইতো যেভাবেই হোক ইউসুফ দেশান্তরে গমন করুক। এটাই ছিলো তাদের আসল উদ্দেশ্য। তাই তাঁর মূল্য তাদের কাছে বড় কিছু ছিলো না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, মূল্যের প্রতি একেবারেই আসক্তি ছিলো না তাদের। যাত্রীদলের সঙ্গে ইউসুফ দূরদেশে চলে যাবে, একথা জানতে পেরে তারা হয়েছিলো মহা আনন্দিত। এটাই তো ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'কানু' শব্দস্থিত সর্বনামটি যদি যাত্রীদলের সঙ্গে সম্বোধিত হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে দু'রকম— ১. ক্রেতা হিসেবে যাত্রীরাও ছিলো ইউসুফের প্রতি অনাগ্রহী। কারণ বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে তিনি ছিলেন পলাতক দাস। ২. তারা ছিলো পণ্য বিক্রেতা। কেনা বেচাই তাদের কাজ। আর স্বল্প মূল্যে ক্রয় করার কারণেই হজরত ইউসুফ ছিলেন তাদের নিকটে উপেক্ষার পাত্র। এমতো আশংকাও তাদের ছিলো যে, আবার হয়তো কোনো দাবিদার এসে পড়বে। তাই তারা তাঁকে সত্বর বিক্রি করে ঝামেলা মুক্ত হতে চাইলো। দ্রুত পথ চলতে লাগলো মিসর অভিমুখে। হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা কিছুদূর তাদের সাথে সাথে গেলো। এই বলে বার বার সতর্ক করে দিলো যে, একে সাবধানে রেখো। পালিয়ে যায় না যেনো। মিসরে পৌঁছে সোজা বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলো যাত্রীদল। হজরত ইউসুফকে ক্রয় করলেন কিত্‌ফীর অথবা ইত্‌ফীর। এরকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস।

কিত্ফীর অথবা ইত্ফীর ছিলো মিসর রাজের একজন মহামান্য সভাসদ। তার উপনাম ছিলো আজিজ বা প্রতাপশালী। রাজকোষ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। তৎকালীন মিসর রাজের নাম ছিলো রাইয়ান বিন ওয়ালিদ বিন ছারওয়ান। তিনি ছিলেন আমালিকা সম্প্রদায়ভূত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, পরবর্তী সময়ে রাজা রাইয়ান মুসলমান হয়েছিলেন। হজরত ইউসুফকে করেছিলেন রাজা। আর তাঁর জীবদ্দশাতেই গমন করেছিলেন পরলোকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মিসর গমনের পর মালিক ইবনে দোবার হজরত ইউসুফকে বাজারজাত করলো। কুড়ি দিনার মূল্যে তাঁকে ক্রয় করলেন কিত্ফীর। ক্রয়মূল্য হিসেবে সঙ্গে আরো দিলেন একজোড়া পাদুকা ও এক জোড়া সাদা ধবধবে বস্ত্র। ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ বলেছেন, তাঁকে বাজারে নেয়ার পর তাঁর মূল্যমান ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি হতে লাগলো। শেষে ঠিক হলো তাঁর ওজনের সমপরিমাণ সোনা, চাঁদি, রেশমী বস্ত্র ও কস্তুরী দিতে হবে। হজরত ইউসুফের বয়স তখন ছিলো তেরো বছর এবং ওজন ছিলো চারশ' রত্ল। কিত্ফীর ওই উচ্চ মূল্যেই ক্রয় করে নিলেন তাঁকে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২১, ২২

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

❒ মিশরের যে ব্যক্তি উহাকে ক্রয় করিয়াছিল সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদিগের উপকারে আসিবে অথবা আমরা উহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য। আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

❒ সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম। এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'মিসরের যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিলো, সে তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা করো।' একথার অর্থ— বালক ইউসুফকে ক্রয় করে আজিজ ফিরে এলেন স্বগৃহে। স্ত্রীকে বললেন, সম্মান ও যত্নের সঙ্গে এই বালকটির থাকবার ব্যবস্থা করো। এখানে 'মাছওয়াহ্' অর্থ— সম্মানজনকভাবে। কাতাদা এরকম বলেছেন। ইবনে জুরাইজেরও বক্তব্য অনুরূপ। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, আজিজের স্ত্রীর নাম রায়ীল অথবা জুলায়খা। এরপর বলা হয়েছে— 'সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি।' একথার অর্থ, আজিজ তার সহধর্মিণীকে বললেন, এই বালকটি আমাদের উপকারে আসবে। একে বেচে দিলে মুনাফা হবে অনেক। আর ঘরে রাখলেও সে আমাদের অনেক কাজে সাহায্য করবে। অথবা একে তো আমরা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উল্লেখ্য যে, আজিজ ছিলেন নিঃসন্তান। আর সুদর্শন ইউসুফের মধ্যেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আভিজাত্য ও সুন্দর স্বভাবের আভাস। তাই তাঁকে পালিত পুত্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন আজিজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার জন্য।' একথার অর্থ— এভাবেই আমি অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ইউসুফকে এনে দিলাম সম্মানজনক অবস্থায়। প্রতিষ্ঠিত করলাম রাজধানী শহর মিসরে। আজিজকে করে দিলাম তার প্রতি বিশেষ করুণাপরবশ। তাকে দান করলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক অনন্যসাধারণ জ্ঞান।

এখানে 'তায়্বীলিল আহাদীছ্' কথাটির মর্ম হবে দু'রকম— ১. আল্লাহ্র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। ২. স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান দান। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্মুখ জীবনেও রয়েছে অনেক ঘাত প্রতিঘাত। আর ওই ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। হজরত ইউসুফ সে সকল ঘাত প্রতিঘাত যথার্থরূপে মোকাবিলা করেছিলেনও। যেমন— মিসর রাজ স্বপ্নে দুর্ভিক্ষকে দেখেছিলেন সাতটি কৃশকায় গাভীরূপে। হজরত ইউসুফ ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষ আসন্ন। সুতরাং এখন থেকে খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে হবে। তাই করা হয়েছিলো। আর এভাবেই মোকাবিলা করা হয়েছিলো দুর্ভিক্ষের।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর কার্যসম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' একথার অর্থ— মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ যেমন অভিপ্রায় করেন, তেমনি করেন। তাঁর বিধান প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। ইউসুফের ভ্রাতারা চেয়েছিলো এক রকম, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন অন্যরকম। শেষে আল্লাহ্র ইচ্ছাই তো বাস্তবায়িত হলো। আল্লাহ্র ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারলো কী? প্রকৃত কথা হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র গোপন অনুগ্রহ সম্পর্কে অনবহিত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।' যৌবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তিকে বলে 'আশুদ্‌দাহ্'। যৌবনে উপনীত হওয়ার বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন তেত্রিশ বছর। সুদ্দী বলেছেন ত্রিশ বছর। জুহাক বলেছেন বিশ বছর। আবার কালাবী বলেছেন আঠারো থেকে তিরিশ বছর। একবার 'আশুদ্‌দাহ্' শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

এখানে 'হুক্‌মা' অর্থ নবুয়ত। কেউ কেউ বলেছেন, বিশুদ্ধ বাক্যাবলী। আর 'ই'ল্‌মা' অর্থ ধর্মীয় জ্ঞান অথবা স্বপ্নবৃত্তান্তের তাৎপর্য। কেউ কেউ বলেছেন, হাকিম ও আ'লীমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— যারা জ্ঞান অর্জন করেন তারা আ'লীম। আর যারা অর্জিত জ্ঞানানুসারে আমল করেন তারা হাকীম।

'মুহ্‌সিনীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা মুমিন, তারাই মুহ্‌সিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যারা সৎপথ প্রাপ্ত তারাই মুহ্‌সিন। জুহাক বলেছেন, বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে, মুহ্‌সিন তারাই। বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কাররূপে বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। আর হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্যিকারের সৎকর্মপরায়ণ। তাই তিনি লাভ করেছিলেন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর পুরস্কার। বাক্যটির মধ্যে এই উপদেশ নিহিত রয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক পুরস্কৃত হতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে সতত সৎকর্মপরায়ণ।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৩, ২৪

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ
هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝

❒ সে যে মহিলার গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, 'আইস'। সে বলিল, 'আমি আল্লাহের শরণ লইতেছি, তোমার স্বামী আমার প্রভু; তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকিতে দিয়াছেন, সীমা লংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না।

❒ সেই মহিলা তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সে-ও উহার আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। তাহাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ-চিত্ত দাসদিগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে যে মহিলার গৃহে ছিলো সে তার নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করলো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো ও বললো, এসো।' এখানকার 'রাওয়াদাত্' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'মুরাদিয়াত' থেকে, যার ক্রিয়ামূল 'রাওদুন্'। এর অর্থ কোনো কিছু পাওয়ার অভিলাষে গমনাগমন করা। তাই যাত্রীদল অথবা সেনাদলের আহার্য ও পানির সন্ধানে যে অগ্রভাগে চলে তাকে বলে 'রায়েদ'। কেউ কেউ বলেন, বিনয়ের সঙ্গে কোনো কিছু যাচ্ঞা করাকে 'রাওদ' বলে। এ থেকে পরিগঠিত হয়েছে 'রুয়াইদা'। এখানে তাই বলা হয়েছে, আজিজ-ভার্যা জুলায়খা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য হজরত ইউসুফের প্রতি আহ্বান জানালো। বন্ধ করে দিলো ঘরের সকল দরজা। বললো, এসো।

এখানে 'হাইতা' শব্দটির অর্থ— এসো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. কথাটি আমাকে শিখিয়েছেন এভাবে— 'হাইতালাকা'। কাসায়ী বলেছেন, শব্দটি মূলতঃ হাওরানের একটি পরিভাষা। কিন্তু শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো হেজাজ ভূখণ্ডে। কাসায়ীর এই উক্তিটি উল্লেখ করেছেন আবু উবায়দা। শব্দটির অর্থ— এসো। মুজাহিদ বলেছেন, কোনোকিছুর প্রতি অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কামুস অভিধানে রয়েছে 'হাইতা', 'হাইতি', 'হাইতু' সব ক'টির অর্থ— এসো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ করছি। তোমার স্বামী আমার প্রভু; তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন।' এখানে 'ইন্নাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি একটি অভিজাত সর্বনাম (জমীরে শান)। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, আমি তোমার অপবিত্র আহ্বান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার স্বামী আমাকে ক্রয় করে এনেছেন। সম্মানজনকভাবে এখানে থাকতে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমার করুণাপরবশ প্রভু। তিনি আমাকে সসম্মানে রাখার জন্য তোমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারি না। এখানে 'ইন্নাহু' শব্দের 'হু' সর্বনামটি আজিজের সঙ্গে সম্বোধিত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনি সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্বোধিত হওয়ার । যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমার স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের এখানে

আমার উত্তম বাসস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমার স্বামীকে আমার প্রতি করে দিয়েছেন করুণাপরায়ণ। তাই আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ। যে আল্লাহ্ আমাকে এভাবে অনুগৃহীত করেছেন, সেই পবিত্র সত্তার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করা আমার কাজ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'সীমালংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না।' উপকার পেয়ে উপকার দাতার অনিষ্ট যে করে, তাকেই এখানে বলা হয়েছে সীমালংঘনকারী। কেউ কেউ বলেছেন, ব্যভিচারীরাই জালেম বা সীমালংঘনকারী। তারা নিজের উপরে যেমন জুলুম করে, তেমনি অন্যের প্রতি জুলুম করে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের মাধ্যমে।

সুদ্দী, ইবনে ইসহাক প্রমুখ কোরআন ব্যাখ্যাতা বর্ণনা করেছেন, জুলায়খা একদিন হজরত ইউসুফকে নির্জনে পেয়ে তাঁর অতুলনীয় রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলো। বললো, কী অপরূপ তুমি! তোমার কৃষ্ণ কেশপাশ দৃষ্টিকে মোহিত করে। হরণ করে হৃদয়কে। হজরত ইউসুফ বললেন, মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম এই কেশ আমার শরীর থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে। জুলায়খা বললো, তোমার আঁখিযুগল কতই না সুন্দর, দৃষ্টিকে বিবশ করে দেয়। হজরত ইউসুফ বললেন, একদিন মৃত্যু এসে আমার চোখ দু'টোকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিবে। জুলায়খা বললো, এমন পূর্ণশশী সদৃশ মুখাবয়ব আর তো কখনো দেখিনি। তুমি তো রূপের রাজা। হজরত ইউসুফ বললেন, একদিন এসকল কিছু হবে মৃত্তিকার আহার্য।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— জুলায়খা বললো, প্রাণাধিক আমার ! ওঠো। পূরণ করো আমার অভিলাষ। হজরত ইউসুফ বললেন, জান্নাতে আমার ঠাঁই হবে না, যদি আমি এরূপ করি। জুলায়খার প্রণয়ার্তির তরঙ্গ বার বার আছড়ে পড়তে লাগলো হজরত ইউসুফের যৌবনের তটভূমিতে। সে আহ্বান রোধ করা ছিলো অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তাকে বিশেষভাবে হেফাজত করলেন। পরের আয়াতে (২৪) সেই হেফাজতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলো এবং সে-ও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো।' মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। কিন্তু সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। হজরত ইউসুফ ছিলেন তখন পরিপূর্ণ যুবক। তাই যৌবনের স্বভাবধর্ম অনুসারে জুলায়খার আহ্বানে তাঁর মধ্যে বাসনার বহ্নি জ্বলে উঠা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তিনি সেই বাসনা বা ইচ্ছাকে দমন করেছিলেন। আর প্রবৃত্তির অবদমন ছিলো তাঁর আয়ত্তভূত। কারণ তিনি ছিলেন নবী। ছিলেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ । ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশেষ হেফাজত দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত । প্রবৃত্তির এই অবদমনের

সুযোগ রয়েছে কেবল মানুষের। ফেরেশতাদের এমতো প্রতিকূলতা নেই। তাই তারা নিষ্পাপ হলেও মানুষের মতো মর্যাদামণ্ডিত নয়। বিজয়, সাফল্য ও মর্যাদা তো প্রতিকূলতাকে জয় করলেই অর্জিত হয়। ইচ্ছার উন্মেষের মধ্যে কোনো পাপ নেই। পাপ রয়েছে ইচ্ছাকে প্রশ্রয়দান ও ইচ্ছাপূরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যে। তাই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র যারা, তারা কখনো অসৎ ইচ্ছাকে হৃদয়ে লালন করেন না। বরং তা অবলোপন করেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন।

শায়েখ আবু মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, জুলায়খার কামনার বিপরীতে হজরত ইউসুফের হৃদয়ে অকস্মাৎ উদিত হয়েছিলো কামনার একটি ঝলক। এ ধরনের অতি অস্থায়ী কল্পনায় কোনো পাপ নেই। তাই এর জন্য আল্লাহ্পাক তাঁকে কোনো প্রকার ভর্ৎসনাই করেননি। দেখিয়েছেন তাঁর বিশেষ নিদর্শন। এভাবে তাঁকে নিষ্কলুষ রেখে করেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। বলেছেন, 'সে তো ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণের অন্তর্ভুক্ত।'

কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন, ইচ্ছাশক্তি দু'ধরনের ১. দৃঢ় সংকল্প। এরকম সংকল্প করেছিলো জুলায়খা। তাই সে ছিলো অপরাধিনী। ২. অতি অস্থির কল্পনা, যা নিজের অজান্তেই জেগে ওঠে হৃদয়ে। এ ধরনের অতি তাৎক্ষণিক ইচ্ছাই জেগে ওঠেছিলো হজরত ইউসুফের অন্তরে। আর এ ধরনের কল্পনা অপরাধের আওতায় পড়ে না। এমতো কল্পনাকে দীর্ঘায়িত করে কথা ও কর্মের মাধ্যমে তাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট হলেই কেবল তা বিবেচিত হয় অপরাধরূপে।

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, আমার কোনো বান্দা সৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলেই আমি তার আমলনামায় দান করি দশটি পুণ্য। আর অসৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে আমি তা মার্জনা করি। যদি সে তার ওই ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ ঘটায়, তবে তার আমলনামায় পাপ প্রদান করি কেবল একটি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী। হাদিসটি বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে— আমার বান্দার সৎকর্ম বাস্তবায়নের পূর্বেই আমি তাকে দান করি একটি সওয়াব। কার্যকর করলে দান করি দশটি। আর অসৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে তার কোনো গোনাহ্ই লেখা হয় না। আর কার্যকর করলে লেখা হয় মাত্র একটি গোনাহ্।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের প্রমুখ বলেছেন, জুলায়খা হজরত ইউসুফের কটিদেশের বন্ধনী খুলে ফেলেছিলো। অথবা ছিঁড়ে ফেলেছিলো তাঁর পাজামার ফিতা। এখানে 'হাম্মা' (আসক্ত হয়েছিলো) কথাটি একারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি ভুল। কারণ তা আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণীভঙ্গির প্রতিকূল । কারণ পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখবার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম' (লি নাস্‌রিফা আ'নহুস্ সুআ ওয়াল ফাহ্শাআ)। 'সু' অর্থ সগীরা গোনাহ্। সুতরাং বুঝতে হবে সগীরা

গোনাহ্ থেকেও আল্লাহ্ তাকে মুক্ত রেখেছিলেন। অতএব কবীরা তো অসম্ভব, সগীরা ভুলও তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি। যদি হতো, তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমাপ্রার্থনা (ইস্তেগফার) করতে বলতেন। যেমন বলেছিলেন হজরত আদম, হজরত নুহ, হজরত দাউদ ও হজরত ইউনুসকে। সকল নবীর মতো তাঁরাও ছিলেন নিষ্পাপ। কিন্তু তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো অনিচ্ছাকৃত ভুল। উল্লেখ্য যে, ভুল এবং গোনাহ্ কখনো এক নয়। অন্য আয়াতে তাই হজরত ইউসুফের বক্তব্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে— সে (জুলায়খা) নিজেই আমাকে প্ররোচিত করেছে। আর এক আয়াতে হজরত ইউসুফের বক্তব্য এসেছে এভাবে— 'এটা একারণে যে, নিশ্চয় আমি অগোচরেও বিশ্বাসভঙ্গ করিনি।' এক স্থানে আল্লাহ্ তাঁর নিজের বক্তব্যরূপে বলেছেন— 'তাহলো, যারা ভয় করে, ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।' এই আয়াতের শেষাংশে হজরত ইউসুফের প্রশংসা করেছেন এভাবে— 'নিশ্চয় সে ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণের একজন।'

'যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো' কথাটির অর্থ, আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করলে হজরত ইউসুফ জুলায়খার চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না। কেউ কেউ বলেছেন, এই বাক্যটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী একটি বাক্যের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়ায়— তাহলে তিনি জুলায়খার চক্রান্তজালে পড়তেন। কিন্তু এরকম অর্থ ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— বুরহান বা নিদর্শন কি? আর হজরত ইউসুফই বা কি দেখেছিলেন? এ প্রশ্নের বিভিন্ন প্রকার জবাব পরিলক্ষিত হয়। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, ওই বুরহান ছিলো নবুয়তের পদমর্যাদা (শানে নবুয়ত)— যা অর্পণ করা হয়েছিলো হজরত ইয়াকুবের বক্ষে। ওই নবুয়তের নূরই অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করেছিলো হজরত ইউসুফকে। এভাবে আল্লাহ্পাকই তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি অশ্লীলতা মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে হজরত ইউসুফ তখন দেখেছিলেন হজরত ইয়াকুবের জ্যোতির্ময় অবয়ব। ওই জ্যোতির্ময় আকৃতি তখন বলেছিলো, ইউসুফ! তোমার নাম লিখিত রয়েছে নবুয়তের দপ্তরে। সুতরাং সাবধান! হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হামাস, মুজাহিদ, ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, ছাদের একটি খিলানে হজরত ইউসুফ তখন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর মহান পিতার প্রতিচ্ছবি। দেখেছিলেন মহান পিতা আক্ষেপের সঙ্গে তাঁর হাতের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে দংশন করছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইয়াকুব তখন সশরীরে হাজির হয়েছিলেন সেখানে। বক্ষে আঘাত করেছিলেন প্রিয় পুত্রের। ফলে তাঁর প্রাণপাখি বহির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, দাঁতে আঙ্গুল কর্তন অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব। বলেছিলেন, হে ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্! তুমি নবী। সুতরাং অবুঝ হয়ো না।

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন নেপথ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন, ইউসুফ! ওই রমণীর ফাঁদে ধরা না পড়া পর্যন্ত তুমি আকাশে উড়ন্ত মুক্ত বিহঙ্গের মতো , যাকে ধরার সাধ্য কারো হয় না। আর ধরা পড়লে তুমি হবে ওই প্রাণহীন পাখি যা লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। হে ইউসুফ! উপগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি ওই উন্মত্ত ষাঁড়, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর উপগত হওয়ার পর তুমি হবে ওই ভূলুণ্ঠিত মৃত ষাঁড়, যার শিঙে কিলবিল করতে থাকে অসংখ্য কীট।

ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাসেম ইবনে আবী বায্যার বলেছেন, তখন অদৃশ্য থেকে ধ্বনিত হলো, হে ইয়াকুব তনয়! তুমি তো ওই সুস্থ সবল আকাশ-বিহারী পক্ষীর মতো। সাবধান! ব্যভিচার তোমাকে করে দিবে পক্ষহীন। নেপথ্যের ওই আওয়াজ শুনে হজরত ইউসুফ অপ্রস্তুত হলেন না মোটেও। উপরের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন হজরত ইয়াকুবকে। দাঁতে আঙ্গুল কাটছিলেন তিনি। পিতাকে এভাবে দেখতে পেয়ে তিনি লজ্জায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত জিবরাইল। অনভিপ্রেত দৃশ্য দেখে তিনি দাঁতে আঙ্গুল কাটতে শুরু করলেন। আক্ষেপের স্বরে বললেন, হায়! নবুয়তের দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে যার নাম, তার পক্ষে এমতো অসুন্দর কর্ম সম্পাদন কি প্রকারে সম্ভব? এরপর তিনি হজরত ইউসুফকে স্পর্শ করলেন। ফলে হজরত ইউসুফ হয়ে গেলেন সুস্থ ও সুদৃঢ়।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে এই আয়াত— লা তাক্বরাবুয্ যিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাহ্ (ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, অবশ্যই ব্যভিচার একটি গর্হিত কর্ম)।

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের বুরহান বা নিদর্শন দর্শনের মর্ম হচ্ছে ফেরেশতা দর্শন।

হজরত ইমাম হাসানের পুত্র হজরত আলী বলেছেন, জুলায়খার ঘরে ছিলো একটি প্রতিমা। সে ওই প্রতিমাটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে উদ্যত হলো। হজরত ইউসুফ বললেন, এরকম করছেন কেনো? জুলায়খা বললো, এ বিগ্রহটি তো আমাদের মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। লজ্জিত হবো আমি। হজরত ইউসুফ বললেন, তুমি একটা জড় পদার্থকে ভয় করছো। তোমার তো ভয় থাকা উচিত ওই আল্লাহ্‌র, যিনি তোমার ও আমার প্রভুপালক এবং যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখবার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিলো আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'সূ' অর্থ সগীরা গোনাহ্ এবং 'ফাহ্শা' অর্থ কবীরা গোনাহ্ বা

ব্যভিচার। 'মুখলাসীন' অর্থ বিশুদ্ধচিত্ত। অন্য এক উচ্চারণ রীতিতে এসেছে 'মুখ্‌লিসীন।' যারা আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের যথাবাস্তবায়ন ঘটান তাঁরাই 'মুখলিস'। আর আল্লাহ্‌ স্বয়ং যাদেরকে বিশুদ্ধচিত্ত করে নেন তাঁরা 'মুখলাস'। নিঃসন্দেহে হজরত ইউসুফ সেরকমই ছিলেন।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ○ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ○ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ○ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِينَ ○

❒ উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হইতে পারে?

❒ ইউসুফ বলিল, 'সে-ই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল।' স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী;

❒ কিন্তু উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।'

❒ গৃহস্বামী যখন দেখিল যে তাহার জামা পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, 'ইহা তোমাদের নারীদিগের ছলনা! ভীষণ তোমাদিগের ছলনা!

❒ 'হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে করিও না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; তুমিই অপরাধী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কামার্ত নারীর অপবিত্র আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত ইউসুফ দৌড় দিলেন দরজার দিকে। পিছনে পিছনে জুলায়খাও দৌড়াতে লাগলো তাঁকে ধরবার জন্য। পিছন দিক থেকে টেনে ধরলো তাঁর জামা। জামা ছিঁড়ে গেলো। হজরত ইউসুফ অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেন। দরজা উন্মুক্ত হলো অলৌকিকভাবে। দু'জনেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং আজিজ। জুলায়খা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, স্বচক্ষে দেখো তোমার এই গুণধর গোলামের কীর্তি। তুমি তার আশ্রয়দাতা, প্রতিপালনকারী। অথচ সে তোমার স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। এখনই তোমাকে বলতে হবে এই অপরাধীকে তুমি কারাগারে পাঠাবে না অন্য কোনো দণ্ড দান করবে। এখানে 'আলবাব' শব্দটির অর্থ বহির্গমনের দরজা। 'ক্বাদ্‌দাত' অর্থ ছিঁড়ে ফেলা। লম্বালম্বি ছিঁড়ে ফেলাকে 'ক্বাদ্‌দাত' আর পাশাপাশি ছিঁড়ে ফেলাকে বলে 'ক্বাত্‌তু।' বাগবী লিখেছেন, তখন দরজার সামনে দণ্ডায়মান হয়েছিলো জুলায়খার চাচাতো ভাইসহ আজিজ।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, সে-ই আমার দ্বারা অসৎকর্ম কামনা করেছিলো।' একথার অর্থ— জুলায়খার অপবাদ প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন হজরত ইউসুফ। বললেন, আপনার স্ত্রী-ই আমাকে অসৎকর্মে প্ররোচিত করেছিলো। আমি নির্দোষ।

হজরত ইউসুফ ছিলেন স্বল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির। জুলায়খা মিথ্যার আশ্রয় না নিলে তিনি হয়তো বা এ সম্পর্কে কোনো কথা উত্থাপন করতেন না। কেবল অপবাদ নিরসনার্থেই তিনি মুখ খুলেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো, যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী।' কেউ কেউ বলেছেন, ওই সাক্ষী ছিলো জুলায়খার পিতৃব্যপুত্র। কেউ বলেছেন, মাতুলপুত্র। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও জুহাক বলেছেন, সে ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফি সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি শিশু দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলো— ১. ফেরাউনের স্ত্রীর কেশ পরিচর্যাকারিণীর শিশু সন্তান। ২. হজরত ইউসুফ সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা শিশু। ৩. বনী ইসরাইলের অভিযুক্ত জুরাইজকে নির্দোষ প্রমাণকারী সাক্ষ্যদাতা শিশু। ৪. হজরত মরিয়মের শিশু সন্তান হজরত ঈসা। মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ সাআফ তাঁর তাখ্‌রীজুল বায়যাবী গ্রন্থে লিখেছেন, বর্ণিত হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম

আহমদের মসনদে, ইবনে হাব্বানের সহীহ্ গ্রন্থে এবং হাকেমের মুসতাদরাকে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। তিনি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা তিব্বীর নিকট এর বিশুদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে তিনি উল্লেখ করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি এই— দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় কথা বলেছিলো তিনটি শিশু— ১. হজরত মরিয়মের পুত্র হজরত ঈসা। ২. জুরাইজের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিশু। ৩. ওই শিশু যার দুগ্ধপানের সময়ে এক সুদর্শন যুবককে দেখে তার মা বলেছিলো, হে আল্লাহ্! আমার এই শিশু সন্তানটিকে ওই যুবকের মতো করে দাও। শিশুটি তখন বলেছিলো, না ওরকম নয়। বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে দুগ্ধপোষ্য সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচজন।

আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, শিশু সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা এর চেয়েও বেশী। মুসলিম শরীফে রয়েছে— ইয়েমেনের এক প্রতাপশালী রাজা একবার একটা গর্ত খনন করে তার মধ্যে সৃষ্টি করলো অগ্নিকুণ্ড। তারপর ইমানদারদেরকে ধরে ধরে নিক্ষেপ করতে লাগলো ওই অগ্নিকুণ্ডে। মাতৃক্রোড় থেকে একটি শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকেও নিক্ষেপ করলো আগুনে। ডুকরে কেঁদে উঠলো তার মা। মায়ের বিলাপ শুনে শিশুটি অগ্নিগহ্বর থেকে বলে উঠলো, কেঁদোনা মা কেঁদোনা। এটা অগ্নিকুণ্ড নয়, পুষ্প কানন। আল্লামা সুয়ূতি তাঁর এক কবিতায় এরকম শিশুর সংখ্যা এগারো জন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত মোহাম্মদ স. এর মা ২. হজরত ইয়াহ্ইয়া ৩. হজরত ইসহাক ৪. হজরত ইব্রাহিম খলিল ৫. হজরত মরিয়ম ৬. জুরাইজের সাক্ষ্যদাতা ৭. হজরত ইউসুফের সাক্ষ্যদাতা ৮. অগ্নিগহ্বরে নিক্ষিপ্ত শিশু ৯. মায়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্যদাতা শিশু ১০. ফেরাউনের যুগের এক অধিক সন্তানধারীর শিশু ১১. যে শিশু সাক্ষ্যদান করবে ইমাম মেহেদীর যুগে।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী।' আগের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে এই আয়াতেও। এভাবে সাক্ষ্যদাতা শিশুর বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— ইউসুফ ও জুলায়খার মধ্যে কে সত্য কথা বলেছে তা প্রমাণ করা অতি সহজ। যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছিঁড়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে ইউসুফ বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলো জুলায়খাকে। আর জুলায়খা বাধা দিতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে তাঁর জামার সম্মুখভাগ। আর যদি জামা পিছনের দিক ছেঁড়া থাকে, তবে বুঝতে হবে জুলায়খা তাঁকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলো। আর ইউসুফ পালিয়েছিলো দরজার দিকে। তখন পিছন থেকে তাঁকে ধরতে যেয়ে জুলায়খা ছিঁড়ে ফেলেছে তাঁর জামা। ব্যাপারটি অবশ্য সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াও অনুধাবন করা যায়। কিন্তু এ কথা যেহেতু উচ্চারণ করেছে এক শিশু তাই তাকে এখানে সাক্ষ্যদাতা বলা হয়েছে।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'গৃহস্বামী যখন দেখলো যে তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বললো, এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, ভীষণ তোমাদের ছলনা।' একথার অর্থ— আজিজ দেখতে পেলেন হজরত ইউসুফের জামার পশ্চাৎভাগ ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন প্রকৃত ঘটনা কি? স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি ছলনাময়ী। নারীরা এভাবে ছলনা করে থাকে। উহ্! কী ভীষণ তোমাদের ছলনা।

রমণীকুল সাধারণতঃ দুর্বল ও কোমল হৃদয়া। কিন্তু কুটিলতা, জটিলতা ও ছলনায় তারা পারদর্শিনী। তাই আজিজ এখানে জুলায়খাকে লক্ষ্য করে সাধারণভাবে রমণীকুলকে অভিযুক্ত করে বলেছেন, 'কী ভীষণ তোমাদের ছলনা।'

ললনাকুলকে সৃষ্টি করা হয়েছে বক্ষদেশের বক্র অস্থি থেকে। তাই তাদের স্বভাব বঙ্কিম। শয়তান সহজেই ললনাকুলকে বশ করতে পারে। তাই শয়তান প্রভাবিত নারী পুরুষের সম্মুখে আবির্ভূত হয় ছলনাময়ীরূপে। পুরুষেরাও অধিকাংশ সময় সে ছলনার জাল ছিন্ন করতে পারে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, নারী জাতি হচ্ছে শয়তানের জাল। তিনি স. আরো বলেছেন, বিবেকহীন ব্যক্তি কোনো বিবেকবান ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। অথচ বিবেকহীনা নারী তা পারে। কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, চক্রান্তপ্রবণা নারী কুচক্রিশ্রেষ্ঠ শয়তানের চেয়েও ভয়ংকর। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এরকম বলেছেন। এক স্থানে বলেছেন— 'শয়তানের চক্রান্ত ছিলো দুর্বল।' আরেক স্থানে নারীদের চক্রান্ত সম্বন্ধে বলেছেন— 'তোমাদের চক্রান্ত ভয়ংকর।'

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়ে কিছু মনে কোরো না এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।' একথার অর্থ— আজিজ বললেন, হে ইউসুফ! যা ঘটেছে ঘটেছে। তুমি বিষয়টি ভুলে যাও। এ সম্পর্কে কাউকে কোনো কিছু বোলো না। এর পর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, জুলায়খা! তুমি অপরাধিনী। অতএব অনুতপ্ত হও ও তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এখানে 'আলখত্বিয়ীন্' শব্দটি এসেছে 'আল খাত্বা' ক্রিয়ামূলের কর্তৃকারকরূপে। জুলায়খা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অপরাধ করেছিলো। শব্দটির মাধ্যমে সে কথাই বুঝানো হয়েছে। এখানে জুলায়খা একা অপরাধিনী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক শব্দ 'আল খত্বিয়ীন্।' এভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে রমণীকুলের উপরে পুরুষকুলের প্রাধান্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়া কানাত্ মিনাল ক্বনিতীনা ওয়া ইন্নাহা কানাত্ মিন ক্বওমিল কাফিরীন। উল্লেখ্য যে, আজিজ ছিলেন অতিশয় ভদ্র। তাই তিনি জুলায়খার ভুলের জন্য এভাবে তিরস্কার করাকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। কঠিন কোনো শাস্তির দিকে আর অগ্রসর হননি।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ
اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ
اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا
هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ○ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ
اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○
فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ثُمَّ
بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ○

❒ নগরের কিছু নারী বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাস হইতে অসৎকর্ম কামনা করিতেছে; প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'

❒ সে যখন উহাদিগের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল, উহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদিগের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, 'উহাদিগের সম্মুখে বাহির হও।' অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার গরিমায় অভিভূত হইল এবং নিজদিগের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহের মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা।'

❒ সে বলিল, 'এ-ই সে যাহার সমন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ; আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে;

আমি তাহাকে যাহা আদেশ করি সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং নীচদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

❒ ইউসুফ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদিগের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❒ অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাকে উহাদিগের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইল যে তাহাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জুলায়খার প্রেম নিবেদন ও হজরত ইউসুফের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি চাপা রইলো না। একান ওকান করতে করতে রটে গেলো সারা শহরে। গৃহে গৃহে উঠলো নিন্দার ঝড়। কয়েকজন গৃহিনী ছিলো এর পুরোভাগে। তারা বলতে লাগলো শুনেছো, আজিজের বৌ কী কীর্তি করেছে। ফষ্টিনষ্টি বাঁধিয়েছে তার যুবক ক্রীতদাসের সঙ্গে। সে এখন প্রেমোন্মাদিনী। ছিঃ ছিঃ এতো নিচে কেউ নামে? আমরা তো স্পষ্ট দেখছি, সে বিপথগামিনী।

মুকাতিল বলেছেন, ওই রটনাকারিণীরা ছিলো পাঁচজন। তারা বলেছিলো 'প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'শিগাফ' শব্দটির অর্থ হৃদয়তন্ত্রী। কালাবী বলেছেন, জুলায়খার হৃদয় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়েছিলো ইউসুফের প্রেমে। ফলে তার বিবেক হয়ে পড়েছিলো নিষ্ক্রিয়। তাই রটনাকারিণীরা বলেছিলো 'আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।'

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'সে যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো, তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করলো, তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো এবং ইউসুফকে বললো, ওদের সম্মুখে বের হও।'

এখানে 'মকর' অর্থ কানাঘুষা, পরচর্চা, ষড়যন্ত্র। 'গীবত' শব্দটির অর্থও এ রকম। দু'টো শব্দই দ্ব্যর্থবোধক। ইবনে ইসহাক বলেছেন, 'মকর' অর্থ চক্রান্ত। ঘটনাটি ঘটেছিলো এরকম— রটনাকারিণীরা ছিলো জুলায়খার সহচরী। মাঝে মাঝেই সে তার সহচরীদের সম্মুখে হজরত ইউসুফের অনন্যসাধারণ রূপলাবন্যের প্রশংসা করতো প্রেমজ্বালা সহ্য করতে না পেরে। সেদিনের গোপন কাহিনীটিও সে তাদেরকে জানালো। সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও তাদেরকে জানিয়ে দিলো যে, খবরদার! ঘটনাটি যেনো জানাজানি না হয়। কিন্তু তারা বিষয়টি আর চাপা রাখতে পারেনি। রটিয়ে দিয়েছিলো শহরময়। তাদের ওই রটনাকেই এখানে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

'আরসালাত্' (ডেকে পাঠালো) ক্রিয়াটির কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে জুলায়খা নিমন্ত্রণ করলো রটনাকারিণীদেরকে।

ওয়াহাব বলেছেন, জুলায়খা তার ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো চল্লিশজন মহিলাকে। যে পাঁচজন তাকে প্রেমোন্মাদিনী ও বিভ্রান্তিনী বলেছিলো, তারাও আমন্ত্রিতা হয়েছিলো ওই ভোজসভায়।

'মুত্তাকাআন' অর্থ ভোজাসন। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান বসরী, কাতাদা ও মুজাহিদ শব্দটির অর্থ করেছেন ভোজসভা। ভোজসভায় অভ্যাগতদের জন্য আরামদায়ক আসনের ব্যবস্থা থাকে। এখানে ভোজের জন্য আসন প্রস্তুত করলো— কথাটির মাধ্যমে ভোজসভাকেই বুঝানো হয়েছে। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আহার করা বিত্তশালীদের অভ্যাস। রসুল স. তাই হেলান দিয়ে আহার করতে বারণ করেছেন। ইবনে আবী শায়বা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন হজরত জাবের থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, কাঁটা চামুচের মাধ্যমে আহার করাকে বলে 'মুত্তাকাআন'। আবার কেউ বলেছেন হিব্রু ভাষায় 'মুত্তাকাআন' অর্থ লেবু। ইকরামা এবং আবু জায়েদ আনসারী বলেছেন, ছুরি দ্বারা কর্তিত বস্তুকে আরবী ভাষায় বলে 'মুত্তাকী'। বাগবী বলেছেন, আজিজ-পত্নী ভোজসভা বসিয়েছিলেন একটি বৃহৎ কামরায়। সেখানে অতিথিদের জন্য ছিলো বর্ণাঢ্য আয়োজন। ছিলো সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত আসন। আর সে আসনগুলোর সম্মুখে রাখা হয়েছিলো বিভিন্ন রকমের ফলমূল। আর প্রত্যেকের জন্য সেখানে রাখা ছিলো একটি করে ছুরি। ফলমূল, গোশত ইত্যাদি খাদ্য বস্তু ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাওয়া ছিলো মিসরবাসীদের অভ্যাস।

যথাসময়ে শুরু হলো ভোজন পর্ব। জুলায়খা বললো, ইউসুফ এবার বেরিয়ে এসো। অতিথিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। ইকরামা বলেছেন, সমগ্র মানব জাতির তুলনায় হজরত ইউসুফের সৌন্দর্যবিভা যেনো নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে জারীর, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মেরাজের রাত্রে আকাশে পরিভ্রমণকালে আমি নবী ইউসুফকে দেখেছি । তিনি ছিলেন পূর্ণতিথির শশী সদৃশ।

আবু শায়েখ তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ইবনে ইসহাক বিন আবদুল্লাহ্ আবী ফারাদাহ্ বলেছেন, হজরত ইউসুফ যখন মিসর নগরীর অলিগলিতে পথ চলতেন তখন তাঁর রূপের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো প্রাচীরগাত্র, যে ভাবে সূর্য রশ্মি-সম্পাতে পানিতে প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয় দেয়াল গাত্রে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন তাঁকে দেখলো তখন তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা। আবুল আলীয়া বলেছেন, ইউসুফকে দেখে রমণীকুল হয়ে গেলো হতভম্ব। হতভম্ব অবস্থা বা অভিভূতি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আকবার্না' শব্দটি। কোনো কোনো

আলেম বলেছেন,'আকবারনা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, হজরত ইউসুফের ভূবন ভুলানো রূপ দেখে অস্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিলো অতিথিনীদের। শুরু হয়ে গিয়েছিলো রজঃস্রাব। আরববাসীরা যুবতী নারীকে বলে 'আকবাবাতিল্ মারআতু'। কথাটির অর্থ— মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে। অর্থাৎ সে এখন ঋতুবতী।

অতিথি রমণীরা তাদের ছুরি দিয়ে ফল কাটতে শুরু করেছিলো। হঠাৎ হজরত ইউসুফকে সামনে দেখে মোহিত হয়ে গেলো তারা। ফল কাটতে গিয়ে কেটে ফেললো নিজেদের হাত। কিন্তু রক্তরঞ্জিত হাতের দিকে তাদের খেয়ালই হলো না। জখমের অনুভূতিও লোপ পেয়ে গেলো তাদের। মুজাহিদ বলেছেন, তখন রক্তক্ষরণের অনুভূতিও তাদের বিলুপ্ত হয়েছিলো। কাতাদা বলেছেন, ছুরির আঘাতে তাদের হাত কেটে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। নিজেদের হাত তারা কেটে ফেলেছিলো ঠিকই, কিন্তু কারো হাত কর্তিত হয়ে খসে পড়েনি। ওয়াহাব বলেছেন, হস্ত কর্তনের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তখন কয়েকজন পুরনারী ঢলে পড়েছিলো মৃত্যুর কোলে।

দিশেহারা নারীরা তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলো, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা। এখানে 'বাশার' শব্দটি যবরযুক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মা' এবং 'লাইসা' শব্দদ্বয় বর্তমান কালের না সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একারণেই ভাষাবিদগণ 'লাইসা' ও 'মা' শব্দ দু'টোর বিধেয়কে যবর সংযুক্ত করেন। বাগবী লিখেছেন, মূলতঃ এই বিধেয়টি ছিলো যেরযুক্ত। অর্থাৎ 'মা হাজা বি বাশারিন্ '। কিন্তু এখানে হরূফে জর (যের) উঠিয়ে দিয়ে বিধেয়ের উপর নসব দেয়া হয়েছে (যবরযুক্ত করা হয়েছে)।

হজরত ইউসুফের অভূতপূর্ব সৌন্দর্য দেখে রমণীকুল তাঁকে ফেরেশতা বলে অভিহিত করেছিলো। কারণ ইতোপূর্বে তারা এমতো রূপবান আর কাউকে দেখেনি। তারা একথাও জানতো যে, এই ভুবনজয়ী রূপবান পুরুষ জুলায়খার কামনার আগুনে কিছুতেই আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয়নি। এরকম মহিমান্বিত চরিত্রের মানুষ অতি বিরল। তাই তারা অকুণ্ঠচিত্তে বলে উঠেছিলো, 'এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।'

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'সে বললো, এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছো । আমি তো তার নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।' এ কথার অর্থ— জুলায়খার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো। সে তার সখী ও অন্যান্য নারীদেরকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছিলো যে, ইউসুফের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে আত্মসংবরণ করা কোনো নারীর পক্ষে সম্ভব

নয়। যে তাকে দেখবে সে অবশ্যই তাঁর রূপের আগুনে জ্বলে পুড়ে দগ্ধিভূত হতে থাকবে। একথা প্রমাণের পর জুলায়খা আত্মপ্রসাদ লাভ করলো। দিশেহারা রমণীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, দেখলে তো, ইউসুফের দিকে তাকালে কী অবস্থা হয়। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, ইউসুফের রূপের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং হে সখীকুল! তোমরাই বলো, একই বাড়ীতে ইউসুফকে রেখে আমি আত্মরক্ষা করি কীরূপে? আমি তো তাকে চাই । কিন্তু সে আমাকে চায় না। আমি কামোন্মাদিনী। কিন্তু সে পবিত্র ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাকে যা আদেশ করি সে যদি তা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং নিচদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' একথার অর্থ— জুলায়খা ভেবেছিলো এক সময় হয়তো ইউসুফের মন গলবে, কিন্তু তা হলো না। দিশেহারা রমণীরাও তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। বললো, শোনো ইউসুফ। তুমি তো এ বাড়ীর গোলাম। নির্দেশ পালন করাই তোমার কাজ। সুতরাং তোমার প্রভুপত্নী যেমন চান, তেমনি করো। কিন্তু হজরত ইউসুফ অটল, অবিচল। তিনি তো নবী। পবিত্রতার অত্যুচ্চ পর্বত। তাই কামাতুরা নারীর অপবিত্র আহ্বান তাঁকে টলাবে কীভাবে? কিন্তু জুলায়খাও পশ্চাদপসরণের পাত্রী নয়। ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান তাকে করে তুললো ভয়ংকরী, নির্মমা, নিষ্ঠুরা । সমব্যথিনীদের নিকটে সে চূড়ান্ত ঘোষণা দিলো এভাবে— এবার আমি আর তাকে ক্ষমা করবো না। আমাকে প্রশমিত না করলে আমি তাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করবোই। হেয় প্রতিপন্ন করবোই।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলেন। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! জুলায়খা ও তার সহচরীরা বলপূর্বক আমাকে পাপের আগুনে পোড়াতে চায়। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি চাই পবিত্র জীবন। চাই তোমার সন্তোষ । আমাকে রক্ষা করো। আশ্রয় দাও। তোমার বিধান-বিরোধী উপায়ে কাম চরিতার্থ করা অপেক্ষা কারাগারই আমার কাম্য।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়'— এরকম না বললে আল্লাহ্পাক অন্য কোনো উপায়ে হজরত ইউসুফকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি প্রকারান্তরে স্বেচ্ছায় কারাগারকে নির্বাচন করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন মাত্র। হজরত মুয়াজ থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোককে আল্লাহ্র দরবারে ধৈর্যধারণের আবেদন করতে দেখে রসুল স. বললেন, তুমি তো আল্লাহ্র কাছে বিপদাপদ কামনা করছো। ধৈর্যধারণ করতে হয় তো বিপদাপদের সময়েই। এরকম কোরো না। কেবল মার্জনাপ্রার্থী হও। তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার আবেদন জানালাম, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমাকে

প্রার্থনার ভাষা শিক্ষা দিন। তিনি স. বললেন, কেবল ইসতেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকো। কিছুদিন পর আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করতে পারি। তিনি স. বললেন, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর জন্য কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো।

এরপর বলা হয়েছে— আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, 'তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' এখানে 'সাবুয়াতুন' কথাটির অর্থ অপপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়া। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থটি এরকম— হজরত ইউসুফ আরো বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমিই আমার ও সকলের একমাত্র রক্ষাকর্তা। সুতরাং আমাকে রক্ষা করো। যদি রক্ষা না করো তবে তো আমি শেষ পর্যন্ত স্বভাবগত আকর্ষণকে রোধ করতে পারবো না। ঝুঁকে পড়বো অপপ্রবৃত্তির দিকে। অবশেষে হয়ে যাবো অজ্ঞদের দলভূত।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা অজ্ঞ ও মূর্খ, পাপ কর্ম করে কেবল তারাই। বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা অপকর্ম সাধিত হলে বুঝতে হবে সে হয়ে পড়েছে অজ্ঞতার অধীন। অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশতঃ বিশ্বাসীরাও কখনো কখনো পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে নিদর্শনাবলী দেখবার পর তাদের মনে হলো যে, তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।' একথার অর্থ— অবস্থা হয়ে পড়লো আরো সঙ্গিন। বার বার প্রত্যাখ্যাতা হয়ে জুলায়খা হয়ে গেলো উম্মাদিনীপ্রায়। আজিজ হয়ে পড়লো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইউসুফের মতো সুদর্শন, পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট পুরুষের এহেন বিপদ দেখে তিনি তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন। শেষে ঠিক করলেন, এ বাড়িতে ইউসুফকে রাখা কিছুতেই সমীচীন নয়। পবিত্রতা রক্ষার যুদ্ধে এখন সে বিধ্বস্ত প্রায়। সুতরাং কিছুদিন তাকে কারাভ্যন্তরে রাখাই উত্তম। তাছাড়া জুলায়খাও বার বার এমতো পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। পত্নী-প্রভাবিত আজিজ শেষে তাই করলো। ইউসুফকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কারাগারে। জুলায়খা ভাবলো কারাগারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ইউসুফ নিশ্চয় অবনমিত হবে। শেষে হয়তো গ্রহণ করবে তার প্রণয় নিবেদন। ইতোমধ্যে তার নিন্দা ও কুৎসার আগুনও হয়ে পড়বে স্তিমিত। এরকমও হতে পারে যে— আজিজের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর তিনি ইউসুফের সঙ্গে জুলায়খার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিরহবিধুরা জুলায়খা তখন ক্ষোভে দুঃখে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পুনঃপুনঃ আজিজের কাছে হজরত ইউসুফকে কারারুদ্ধ করার কথা বলতে লাগলো। ছলনাময়ী নারীর ছলনা বিচিত্র। সে কথাটি আজিজকে বুঝাতে লাগলো এভাবে— দ্যাখো, ইউসুফের

জন্যই আমাদের এতো দুর্নাম। সারা শহরে বয়ে চলেছে নিন্দার তুফান। তুমিও আমাকে ঘর থেকে বের হতে দাও না। এখন তোমাকে দু'টি কাজের একটি করতে হবে। আমাকে অনুমতি দাও, আমি বাইরে গিয়ে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিন্দার তুফান প্রশমিত করার চেষ্টা করি। নয়তো ইউসুফকে এক্ষুণি জেলে ঢোকাও। তাহলে আপনাআপনি নিভে যাবে নিন্দার আগুন। তখন তোমাকে আমাকে নয়, ইউসুফকেই অপরাধী মনে করবে লোকেরা।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের তিনটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিলো জেলখানার জীবন। ১. এক মুহূর্তের জন্য হলেও তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছিলো কামনার বহ্নি। ২. তিনি তাঁর এক সহবন্দীকে বলেছিলেন, তোমার মনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার (মুক্তির) কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ৩. পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর ভাইকে বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা অপহারক। তারা বলেছিলো, 'বিন্‌ইয়ামিন' হয়তো অপহরণ করতে পারে। ওর অগ্রজ ইউসুফও এরকম করেছিলো।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ
قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا
بِتَاْوِيْلِهٖ ؕ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ
رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ
نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ
خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً

سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

❒ তাহার সহিত দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করিল। উহাদিগের এক জন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি' এবং অপর জন বলিল,'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখী উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও, আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি।'

❒ ইউসুফ বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি তাহাদিগের মতবাদ বর্জন করিয়াছি;

❒ 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইস্হাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহের সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদিগের কাজ নহে। ইহা আমাদিগের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহের অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'

❒ 'হে কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্?'

❒ 'তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কতগুলি নামের ইবাদত করিতেছ— যাহা তোমাদিগের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহেরই। তিনি আদেশ দিয়াছেন— অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে কেবল তিনি ব্যতীত; ইহাই সরল দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি এরকম— হজরত ইউসুফকে যখন কারাগারে প্রবেশ করানো হলো, তার একটু আগে পরে, অথবা সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে ঢোকানো হলো দু'জন যুবককে। তারা ছিলো মিসর রাজ রাইয়ানের ক্রীতদাস। একজন ছিলো রন্ধনশালার প্রধান, আরেকজন ছিলো পানশালার মদ্য পরিবেশনকারী।

বাগবী লিখেছেন, মিসররাজকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পড়েছিলো যুবকদ্বয়। শত্রুপক্ষ তাদেরকে উৎকোচ দিয়ে বলেছিলো, কাজটা ততো কঠিন নয়। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে খুব সঙ্গোপনে মেশাতে হবে বিষ। কাক-পক্ষীটিও যেনো টের না পায়। শত্রু পক্ষের এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হলো রন্ধনশালার প্রধান। কিন্তু পানশালার প্রধান এতে রাজী হলো না। আহারের সময় উপস্থিত হলো। পরিবেশিত হলো রাজকীয় আহার্য ও পানীয়। রাজার কানে কানে মদ্য পরিবেশনকারী যুবক বললো, খাদ্যে বিষ মেশানো হয়েছে। রাজা রন্ধনশালার প্রধানকে কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি প্রথমে পান করো। সে সঙ্গে সঙ্গে সামনে রক্ষিত পানীয় পান করলো। রাজা বললেন, এবার তুমি প্রথমে আহার করো। রন্ধনশালার প্রধান আহার করতে অস্বীকৃত হলো। রাজা কিছু খাদ্য খাওয়াতে বললেন একটি পশুকে। খাওয়ানোর সাথে সাথে পশুটি অক্কা পেলো। রাজা বুঝলেন, এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। তিনি দু'জনের একজনকেও আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন, এ দু'জনকে এক্ষুণি কারারুদ্ধ করা হোক।

হজরত ইউসুফের রূপ ও গুণের কথা জুলায়খা ও তার সখীদের কারণে সারা মিসরে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিলো। জেলখানার বন্দীদের কানেও পৌঁছে গিয়েছিলো তাঁর মহান বৈশিষ্ট্যাবলীর বিভিন্ন বিবরণ। তিনি একজন স্বপ্নবিশারদ সে কথাও তাদের জানতে আর বাকী রইলো না। তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিলো দু'জন যুবক। প্রথমে তারা বর্ণনা করলো মনগড়া স্বপ্ন। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ। কেউ কেউ বলেছেন, তারা সত্য স্বপ্নই বিবৃত করেছিলো। হজরত ইউসুফ তাদেরকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন বিমর্ষ কেনো? তারা বললো, আমরা দু'জনে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন, আমার কাছে খুলে বলো।

একজন বললো, আমি দেখলাম, রাজার জন্য মদ্য প্রস্তুত করছি । এখানে উল্লেখিত 'খামার' শব্দটির অর্থ আঙ্গুর। আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত করা হয় উৎকৃষ্ট মদ্য। তাই এখানে 'খামার' কেই মদ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আম্মানের অধিবাসীরা আঙ্গুরকে বলে খামার। স্বপ্নবৃত্তান্ত দানকারী যুবকটি বললো, আমি রাজার পানপাত্র নিয়ে বাগানে গেলাম। দেখলাম একটি দ্রাক্ষাকুঞ্জে ঝুলে রয়েছে তিনটি গুচ্ছ। আমি ওই তিন গুচ্ছ আঙ্গুর নিষিক্ত করে শরাব প্রস্তুত করলাম। পরিবেশন করলাম রাজার সামনে। রাজা হৃষ্টচিত্তে সেই শরাব পান করলেন।

অপরজন বললেন, আমি দেখলাম, তিন টুকরী রুটি ও গোশত মাথায় নিয়ে আমি পথ চলছি। আর শিকারী পাখিরা ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে টুকরির রুটি ও গোশত।

স্বপ্নের বিবরণ শেষ হলে দু'জনেই বললো, আমাদেরকে এবার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিন। আমরা জানি আপনি সজ্জন, সৎকর্মপরায়ণ, মহানুভব অথবা স্বপ্নসহ অন্যান্য ব্যাপারে বিজ্ঞ।

এখানকার 'আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি' কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে জুহাক বিন মাজহীমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, হজরত ইউসুফ ছিলেন মহানুভব। জেলখানায় কোনো কয়েদী পীড়িত হলে তিনি তার সেবা যত্ন করতেন। কারো থাকার কষ্ট হলে তার কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। সকলের প্রয়োজন মেটাতেন। এভাবে সবার হৃদয় জয় করে তিনি আহ্বান জানাতেন এক আল্লাহর উপাসনার দিকে। সারা রাত কাটিয়ে দিতেন নামাজ পাঠ করে।

এক বর্ণনায় এসেছে— কারাগারে প্রবেশ করেই হজরত ইউসুফ দেখলেন বন্দীরা বিমর্ষ ও চিন্তাগ্রস্ত। বন্দীজীবনের অভিশাপের ছাপ ফুটে রয়েছে সকলের চোখেমুখে। তিনি সান্ত্বনার বাণী শোনালেন সকলকে। বললেন, হে বন্দী জনতা! বিপদে মুষড়ে পোড়ো না । ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধৈর্যের বিনিময় দান করবেন। বন্দীরা বললো, হে যুবক! আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি সুন্দর। তোমার আচরণও সুন্দর। আমরা তোমাকে দেখে মুগ্ধ, আনন্দিত। আমরা নিশ্চিত, তোমার প্রেমময় সান্নিধ্য আমাদের জীবনকে করবে কল্যাণময়। এবার বলো, কী তোমার পরিচয়? হজরত ইউসুফ বললেন, আমি ইউসুফ বিন ইয়াকুব সফিউল্লাহ বিন ইসহাক জবিহুল্লাহ বিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্।

কারারক্ষক বললেন, হে যুবক! আমার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। তবে আমি তোমাকে উত্তম সঙ্গ দিতে চাই। তোমার প্রতি প্রদর্শন করতে চাই যথোপযুক্ত সৌজন্য ও সম্মান। কারাগারের যে প্রকোষ্ঠ তোমার পছন্দ সেই প্রকোষ্ঠেই তুমি নির্বাচন করতে পারো তোমার বসবাস।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে— যে যুবকদ্বয় তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলো তারা বললো, ইউসুফ! প্রথম দর্শনেই আমরা তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তিনি বললেন, না। আমাকে তোমরা ভালোবেসো না। আল্লাহর শপথ! কেউ যখন আমাকে ভালোবাসে তখনই আমি হই বিপদগ্রস্ত। আমার ফুফু আম্মা আমাকে ভালোবেসেছিলেন। তাই আমি হয়েছিলাম সকলের চক্ষুঃশূল। মহান পিতা আমাকে স্নেহ করতেন অত্যধিক। তার পরিণামে আমাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অন্ধকার গহ্বরে। এরপর আজিজপত্নী আমাকে ভালোবেসেছে। সে কারণেই আমি আজ বন্দী। সুতরাং হে আমার সহবন্দীদ্বয় ! ভালোবাসার কথা আমাকে আর তোমরা বোলো না।

যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজনের স্বপ্নের পরিণাম ছিলো অশুভ। তাই তিনি আর সরাসরি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গেলেন না। বক্তব্যের অবতারণা করলেন অন্যভাবে। সে কথা বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ বললো, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দিবো। একথার অর্থ— হে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু যুবকদ্বয়! একটু অপেক্ষা করো। আহারের সময় উপস্থিত প্রায়। আহার্য আগমনের পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের বিষয়ে বলবো। কেউ কেউ হজরত ইউসুফের এই বক্তব্যটির মর্মার্থ এনেছেন এভাবে— লঙ্গরখানা থেকে তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে বলে দিবো ওই আহার্যের রঙ, প্রকার, প্রকৃতি ও পরিমাণ। ঠিক কখন খাবার আসবে তার সুনির্দিষ্ট সময়ও আমি বলে দিতে পারি। উল্লেখ্য যে, হজরত ঈসার মাধ্যমেও এরকম মোজেজার প্রকাশ ঘটেছিলো। তিনি বলেছিলেন— 'আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি যা তোমরা আহার করো, আরো বলতে পারি যা তোমরা স্বগৃহে সঞ্চয় করো।' যাহোক, হজরত ইউসুফের এরকম কথা শুনে যুবকদ্বয় বলতে লাগলো, এ বিদ্যা তুমি কোত্থেকে শিখেছো? ভবিষ্যৎ-বক্তা ও গণৎকারেরা সাধারণত এরকম বলে থাকে। পরবর্তী বাক্যে যুবকদ্বয়ের মন্তব্যের জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে—

'আমি যা তোমাদেরকে বলবো, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বলবো।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ বললেন, হে সঙ্গীদ্বয়! ভবিষ্যৎ-বক্তা বা গণৎকার আমি নই। আমি নবী। আমি জ্ঞান আহরণ করি আল্লাহ্‌র জ্ঞান থেকে— প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। এ জ্ঞান অর্জিত নয়— প্রদত্ত। সেই প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই আমি তোমাদেরকে তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করবো।

বায়যাবী লিখেছেন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পূর্বে হজরত ইউসুফ ওই যুবকদ্বয়কে আল্লাহ্‌র এককত্বের দিকে আহবান জানিয়েছিলেন। প্রেরিত পুরুষগণের আহবানের প্রকৃতি এরকমই। প্রথমে তাঁরা মোজেজা বা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে মানুষকে আকৃষ্ট করেন। তারপর জানান তৌহিদের আহবান।

সে কারণেই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না ও পরলোকে যারা অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।' একথার অর্থ— শোনো হে যুবকদ্বয়! আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি যারা অবিশ্বাসী, তাদের বিভ্রান্ত মতবাদ আমি পরিত্যাগ করেছি। কারণ আমি নবী। সত্যের দিশারী। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতবাদ বর্জন করার কারণে মহান আল্লাহ্‌ দয়াপরবশ হয়ে আমাকে দান করেছেন স্বপ্ন সম্পর্কিত বিশেষ প্রজ্ঞা।

এর পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসাহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি।' পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত সত্যের প্রতি আহ্বানের ধারা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতেও। এখানে তিনি তাঁর মহাসম্মানিত পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের কথা। তাঁরা সকলেই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। সাথীদ্বয়কে অধিকতর আগ্রহী করে তোলার জন্য হজরত ইউসুফ এভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর নবী বংশজাত পরিচিতি। একথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স. এর প্রকৃত প্রতিনিধি কোনো আলেম অপরিচিত কোনো স্থানে গমন করলে এরকম পরিচিতি প্রদান করা সিদ্ধ। এতে করে মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য অধিকতর গুরুত্ববহ হতে পারে। এরকম আত্মপরিচিতি আত্মম্ভরিতার পর্যায়ভূত নয়। উদ্দেশ্যের সাধুতার উপরেই নির্ভর করে সফলতা। নবী রসুলগণের ক্ষেত্রে আত্মপরিচিতি প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। কারণ তাঁরা আত্মপ্রচারক নন। তাঁদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের প্রচারক। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস্' (আপনাকে প্রদত্ত অনুগ্রহ সমূহ প্রচার করুন)।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়া তাঁদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও সফলতার কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। যেমন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী ও শায়েখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী। আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয়, মূর্খতা ও হিংসার কারণে কেউ কেউ এ ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনা করেছে। কিন্তু তারা জানে না যে, এসকল আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির বিবরণ তারা আত্মপ্রচারার্থে করেননি। করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়ামত প্রচারার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।' একথার অর্থ— আমরা নবী। আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর সঙ্গে কাউকে শরীক করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ একত্ববাদ হচ্ছে আমাদের স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে বিশেষভাবে হেফাজত করে থাকেন। তাই আমরা শিরক বা অংশীবাদিতা থেকে সতত সুরক্ষিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' একথার অর্থ— আমাদেরকে প্রদত্ত এই নবুয়ত আমাদের জন্য ও সকল মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র এক সুবিপুল অনুগ্রহ। আমাদেরকে পরিচালনা করা হয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আর অন্যদেরকে পরিচালিত হতে বলা হয় আমাদের মাধ্যমে। এভাবে আমরা

এবং আমাদের অনুসারীরা লাভ করি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তোষ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই বিধানটি মানে না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আল্লাহ্‌র এই অপার অনুগ্রহের। উল্লেখ্য যে, আমাদের মহান রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. এর উম্মতও এভাবে দ্বিধাবিভক্ত। তাঁর একদল উম্মত তাঁর অনুসরণকে আশ্রয় করে হয়েছেন উম্মতে ইজাবত (স্বীকৃত উম্মত)। আর একদল উদাসীনতাকে অবলম্বন করে হয়ে আছে উম্মতে দাওয়াত (আমন্ত্রিত উম্মত)।

আলোচ্য বাক্যটির মর্ম এরকমও হতে পারে যে— এই অনন্য একত্ববাদ ও প্রজ্ঞা সকল নবীর মতো আমিও পেয়েছি নিছক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে। আর আল্লাহ্ আমাদের অনুসরণের মাধ্যমে এই অনুগ্রহের অংশীদার হবার সুযোগ দিয়েছেন সকল মানুষকে । আমাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অনেক অলৌকিক নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। এভাবে সকলকে দিয়েছেন উম্মত হবার সুযোগ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। তারা প্রত্যাখ্যানপ্রবণ, অকৃতজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— হে কারাসঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক, পরাক্রমশালী আল্লাহ্? এখানে 'মুতাফার্‌রিক্বুনা' অর্থ বহু, অসংখ্য। অংশীবাদীরা বহু দেব-দেবীর উপাসক। ওই সকল বাতিল উপাস্যদেরকে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে এই শব্দটির মাধ্যমে। 'আল্ ওয়াহিদ' অর্থ সত্তাগত ও গুণগত দিক থেকে যিনি এক, অবিনশ্বর ও উপমাবিহীন। 'আল্‌ক্বাহ্‌হার' অর্থ মহা-পরাক্রমশালী, যার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার কারাসহচরদ্বয়! বুঝতে চেষ্টা করো। অংশীবাদীরা কতোই না অজ্ঞ। তারা উপাসনা করে বৃক্ষের, প্রস্তরের, বিগ্রহের, কল্পিত দেব-দেবীর। এরা সকলেই ধ্বংসশীল, অবক্ষয়প্রবণ, অক্ষম। আর আল্লাহ্ আনুরূপ্যহীনরূপে এক, সর্বশক্তিধর, অসমকক্ষ। এবার তবে বলো, কোন প্রভুপালক শ্রেয়ঃ— বহুধাদীর্ণ মিথ্যা উপাস্যসমূহ, না প্রবল পরাক্রান্ত ও অতুলনীয় আল্লাহ্?

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলো নামের ইবাদত করছো— যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো; এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি।' এখানে 'আসমা' অর্থ ওই সকল উপাস্যের নাম যেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকম— হে বন্দীদ্বয়! দ্যাখো, তোমাদের মতো লোকেরা আল্লাহ্‌কে কীভাবে পরিত্যাগ করেছে। উপাসনা করে চলেছে কতগুলো নামের, যেগুলোর কোনো

অস্তিত্বই নেই। আর এসকল নাম নির্বাচন করেছে তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা। এই বিশাল সৃষ্টির সকল কিছুই সেই এক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এগুলো কিছুতেই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এগুলোর উপাস্য হওয়ার কোনো প্রমাণও আল্লাহ্তায়ালা প্রেরণ করেননি।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্র। তিনি আদেশ দিয়েছেন— অন্য কারো ইবাদত না করতে কেবল তিনি ব্যতীত।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক স্বাধিষ্ঠ, চিরঞ্জীব ও চিরবিদ্যমান। সকল সৃষ্টির তিনি একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক। দাতা তিনি। চিরবিজয়ী তিনি। তিনিই সকল ভালো ও ক্ষতির চূড়ান্ত নির্ধারক। তাই সত্তাগতভাবে তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনিই বিধানদাতা। তিনিই বিধান দিয়েছেন, কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। অন্য কারো ইবাদত যদি সিদ্ধ হতো, তবে তা সিদ্ধ হতো তাঁরই বিধানানুসারে। কিন্তু সেরকম বিধান তিনি দেননি। নবী ও রসুলগণের মাধ্যমে তাই তিনি যুগে যুগে এই বিধানটি প্রচার করেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।' একথার অর্থ— তওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। এই ধর্মই সরল, সহজ ও সুপ্রমাণিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করতে অক্ষম।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ এভাবে তাঁর সত্যধর্মের প্রতি আহ্বানকে সুপরিণতি দান করেছেন। সহবন্দীদ্বয়কে প্রথমে বলেছেন, আল্লাহ্ ও পরকালে যারা অবিশ্বাসী তাদের মতবাদ পরিত্যাজ্য। তারপর তাঁর মহান পূর্ব পুরুষগণের পরিচিতি দিয়ে বলেছেন, আমিও তাঁদের মতো নবী। তারপর তাদের সামনে একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অপেক্ষা এক আল্লাহ্র উপাসনা শ্রেয়ঃ। আরো বলেছেন, অংশীবাদিতা তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের একটি অসার ও প্রমাণবিহীন কল্পনা মাত্র। আল্লাহ্পাক এরকম করতে বলেননি। এভাবে শেষে এসে চূড়ান্ত ঘোষণা দিলেন এভাবে যে, এতোক্ষণ ধরে যে ধর্মের বিবরণ আমি দিলাম এটাই প্রকৃত ধর্ম। বিবেক ও প্রজ্ঞাও একথা বলে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একথা বুঝে না। নবী রসুলগণের মূল কর্ম হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রচার। হজরত ইউসুফ তাই এভাবে প্রথমে ধর্ম প্রচারের মহান কর্তব্য সম্পাদন করলেন। তারপর অগ্রসর হলেন স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনার দিকে।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۚ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۞ وَقَالَ
لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ
رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۞

❑ 'হে কারা সংগীদ্বয়! তোমাদিগের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূল বিদ্ধ হইবে; অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখী আহার করিবে— যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।'

❑ ইউসুফ, উহাদিগের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল তাহাকে বলিল, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও' কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল; সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে সহবন্দীদ্বয়! এবার শোনো তোমাদের স্বপ্নের তাবীর। প্রথম জনকে বললেন, শীঘ্রই তুমি মুক্তি পাবে। বহাল হবে পূর্ব পদে। রাজা পুনরায় তোমাকে দান করবেন মদ্য পরিবেশনার দায়িত্ব। স্বপ্নে তিনটি আঙ্গুর গুচ্ছ দেখেছিলে তুমি । এর অর্থ— তুমি কারা মুক্ত হবে তিনদিন পর। দ্বিতীয় জনকে বললেন, তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে, রুটি ও গোশতের তিনটি টুকরি রয়েছে তোমার মাথায়। আর শিকারী পাখিরা সেগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ওই তিনটি টুকরি দেখার অর্থ তোমাকেও তিনদিন পর জেলখানা থেকে বের করা হবে। তারপর শূলবিদ্ধ করা হবে তোমাকে। পাখিরা তখন ঠুকরে ঠুকরে খাবে তোমার মাথার মগজ। হে আমার সঙ্গীদ্বয়! এই হচ্ছে তোমাদের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

আমি বলি, স্বপ্নের এমতো ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রন্ধনশালার প্রধান সত্যিসত্যিই খাদ্যে বিষ মিশিয়েছিলো। আর মদ্য পরিবেশনকারী ছিলো নিরপরাধ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইউসুফের স্বপ্ন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা শুনে তাঁর সহবন্দীদ্বয় বলে উঠলো, আমরা তো এরকম স্বপ্ন দেখিইনি। স্বপ্নগুলো বানানো। আপনাকে খুশি করার জন্য আমরা এরকম করলাম। হজরত ইউসুফ

তখন বললেন, এরকম স্বপ্ন তোমরা দেখে থাকো আর না থাকো, আমি যা বললাম তাই হবে। এটাই আল্লাহ্র নির্ধারণ। পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলো তাকে বললো, 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বোলো' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিলো, সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইলো।' এখানে 'জন্না' (মনে করলো) ক্রিয়ার কর্ম যদি হজরত ইউসুফ হন, তবে কথাটির অর্থ হবে দৃঢ়প্রত্যয়। আগের আয়াতে উল্লেখিত 'যে বিষয়ে তোমরা জানতে পেরেছিলে তার সিদ্ধান্ত হয়েই গিয়েছে'— কথাটিই এর প্রমাণ। আর যদি 'জন্না' ক্রিয়ার সর্বনাম সম্পর্কিত হয় পানশালার প্রধানের সঙ্গে, তবে 'মনে করলো' কথাটির অর্থ হবে— যে লোকটির সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মালো।

এখানে 'রব' শব্দটির অর্থ হবে রাজা। পানশালাধ্যক্ষের নিকটে হজরত ইউসুফ বলেছিলেন, পূর্ব পদে বহাল হয়েই তুমি রাজাকে আমার সংবাদ জানাবে। বলবে, এক নিরপরাধ অভিজাত যুবক বিনা দোষে বন্দী। কিন্তু সে রাজাকে একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলো। শয়তানই তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। ফলে হজরত ইউসুফের কারাবাস প্রলম্বিত হলো।

হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য ব্যাখ্যাতা বলেছেন, শয়তান ইউসুফকে অসতর্ক করে দিয়েছিলো। তাই তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। নবী রসুলগণের জন্য এরকম বিস্মরণ অশোভন। এই অসতর্কতার কারণেই বিলম্বিত হয়েছিলো হজরত ইউসুফের মুক্তি।

রসুল স. এরশাদ করেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফের প্রতি আল্লাহ্ করুণা করুন। তিনি 'তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বোলো'— এরকম না বললে তাঁর বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত হতো না। ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া।

'ফালাবিছা ফিস্সিজ্নি বিদ্ব্আ' সিনীন' কথাটির অর্থ 'ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রইলো'। তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'বিদ্ব্আ' শব্দটি। 'বিদ্ব্আ' বা 'বিদ্ব্উন' অর্থ কর্তন করা। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটি ব্যবহৃত হয় তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে। অধিকাংশ কোরআন ভাষ্যকার বলেছেন, হজরত ইউসুফ জেলখানায় কাটিয়েছিলেন সাত বৎসর। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'উজ্কুর ইন্দা রব্বিক' (তোমার প্রভুকে আমার কথা বোলো)। তারপর অতিবাহিত হয়েছিলো আরো সাত বৎসর। এভাবে সর্বসাকুল্যে বারো বৎসর বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিলো তাঁকে।

আমি বলি, হজরত ইউসুফ এবং রন্ধনশালা ও পানশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত যুবক রাজকর্মচারীদ্বয় একই সঙ্গে প্রবেশ করেছিলো জেলখানায়। যুবকদ্বয় সেখানে ছিলো মাত্র তিনদিন। ওই সময় হজরত ইউসুফ তাদের একজনকে বলেছিলেন 'তোমার প্রভুকে আমার কথা বোলো' এটাই প্রকৃত ঘটনা। যদি তাই হয় তবে এর পূর্বে হজরত ইউসুফ পাঁচ বৎসর জেলখানায় কাটিয়েছিলেন— এরকম বলা যায় কীভাবে? তাই বলতে হয়, মাননীয় তাফসীরকারের এই অভিমতটি একটি অসতর্কতা প্রভাবিত অভিমত।

মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হজরত ইউসুফ যখন রাজার মদ্য পরিবেশনকারীকে রাজার নিকট সুপারিশ করতে বললেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়েছো। ঠিক আছে, আমি তোমার বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত করলাম। হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার পরোয়ারদিগার। বন্দী জীবনের গ্লানি আমাকে অতিষ্ঠ করেছিলো। আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনুতপ্ত। এমন কথা আর আমি কখনো বলবো না।

হাসান বসরী বলেছেন, তখন হাজির হলেন হজরত জিবরাইল। হজরত ইউসুফ তাঁকে চিনতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকারী মহাসম্মানিত দূত! এই বন্দীশালায় আপনার দর্শন লাভ ঘটলো। কী সৌভাগ্য! হজরত জিবরাইল বললেন, হে মহান পিতৃপুরুষের মহান সন্তান! আল্লাহ্পাক আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন। আরো বলেছেন, আমি সকল স্থানে ও স্থানাতীতে সতত বিদ্যমান— একথা জেনেও ইউসুফ সাহায্য কামনা করলো আমার এক সৃষ্টির কাছে। এমতো কর্ম করতে কী সে লজ্জা পেলো না! আমার মর্যাদার শপথ! আমি আরো কিছুদিন তাকে রেখে দেবো জেলখানায়। হজরত ইউসুফ বললেন, তবু কি আমার আল্লাহ্ আমার প্রতি প্রসন্ন থাকবেন। হজরত জিবরাইল বললেন, হ্যাঁ। হজরত ইউসুফ বললেন, তবে বন্দী জীবনের কষ্ট আমার নিকটে অতি তুচ্ছ।

কা'ব বলেছেন, তখন হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার সৃজনকর্তা কে? হজরত ইউসুফ বললেন, আল্লাহ্। পুনরায় বললেন, আপনার প্রিয়তম জন কে? হজরত ইউসুফ বললেন, আল্লাহ্ । তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কে আপনাকে করেছেন আপনার মহান পিতার নয়নমনি? হজরত ইউসুফ জবাব দিলেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল আবারো জিজ্ঞেস করলেন, অন্ধ কূপ থেকে রক্ষাকারী কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল আবার প্রশ্ন করলেন, আপনাকে

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনার ভুলসমূহ উপেক্ষা করেছেন কে? হজরত ইউসুফ জবাব দিলেন, আল্লাহ্। হজরত জিবরাইল বললেন, তাহলে আপনি আপনার মতো একজন মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন কেনো ?

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফ মানুষের কাছে সাহায্য কামনা না করলে সুদীর্ঘ দিবস ধরে তাঁকে বন্দী জীবন কাটাতে হতো না।

কেটে গেলো দীর্ঘ সাতটি বছর। মিসর রাজ একরাতে দেখলেন একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন। দেখলেন, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী উঠে এলো সাগর থেকে। পরক্ষণেই উঠে এলো আরো সাতটি কৃশকায় গাভী। কৃশকায় গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো। এরপর দেখলেন সাতটি শ্যামল শস্যময় শীষ। পরক্ষণেই দেখলেন, শুকনো সাতটি শীষ এসে পেঁচিয়ে ধরলো শ্যামল শীষ-গুলোকে। সবুজ শীষগুলো আর্তনাদ করে উঠলো। রাজা ঘাবড়ে গেলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন তিনি। একত্রিত করলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অতিন্দ্রিয়বাদী, গণৎকার ও জ্যোতিষদেরকে । পরবর্তী আয়াতে এ কথারই বিবরণ এসেছে। বলা হয়েছে—

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْٓ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰٓاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ○ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ ○ وَقَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ○

❐ রাজা বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে বিধান দাও।'

❒ উহারা বলিল, 'ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা অর্থহীন স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নহি।'

❒ দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যাহার স্মরণ হইল ইউসুফের কথা সে বলিল,'আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে যাইতে দাও।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মিসররাজ সমবেত গণৎকার, জ্যোতিষ ও অতিন্দ্রিয়বাদীদেরকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে ভক্ষণ করছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী। আর সাতটি সবুজ শীষকে গিলে ফেলছে সাতটি শুষ্ক শীষ। এবার তোমরা বলো আমার এই স্বপ্নের অর্থ কী? এখানে উল্লেখিত 'ইজাফা' শব্দটির বহুবচন হচ্ছে 'উজাফ'। আর 'তাবীর' অর্থ অতীত হওয়া। মূল শব্দটি 'উবুর'। তাবীর শব্দটির মূল মর্ম হচ্ছে— উপমার জগতে বিদ্যমান অবস্থার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— গণৎকার, জ্যোতিষ ও অতিন্দ্রিয়বাদীরা বললো, মহারাজ! আপনার দেখা স্বপ্নটির কোনো অর্থই নেই। আর এরকম নিরর্থক স্বপ্নের অর্থ উদ্ধারের বিদ্যা আমরা জানি না। এখানে 'আদ্বগাছু আহলাম' কথাটির অর্থ— কাল্পনিক স্বপ্ন বা অর্থহীন স্বপ্ন। 'আদ্বগাছু' শব্দটি বহুবচনবোধক। একবচন হচ্ছে 'দ্বাগছুন' । এর শাব্দিক অর্থ ঘাস-পাতার স্তূপ। আর রূপক অর্থ নিরর্থক বা অমূলক স্বপ্ন।

পরের আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সভায় রাজার মদ্য পরিবেশনকারীও ছিলো। দীর্ঘ সাত বছর পর হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো হজরত ইউসুফের কথা। সে বললো, মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এক স্বপ্নবিশারদকে চিনি। তাঁর নিকট থেকে আমি আপনার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা এনে দিতে পারবো। 'উম্মাত' অর্থ দল বা জামাত। এখানে শব্দটির অর্থ হবে দীর্ঘকাল পর বা দীর্ঘ সাত বছর পর।

বাগবী লিখেছেন, তখন ওই মদ্যপরিবেশনকারী মিসরাধিপতির সামনে নতজানু হয়ে বললো, আমাকে বন্দীশালায় যেতে দেয়া হোক। সেখানে রয়েছে ইউসুফ নামক এক বন্দী। সে-ই যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারবে আপনার স্বপ্নের । রাজা অনুমতি দিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বন্দীশালাটি ছিলো নগরীর বাইরে।

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○ ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○ ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○

❒ সে বলিল, 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে বিধান দাও, যাহাতে আমি রাজা ও সভাসদদিগের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।'

❒ ইউসুফ বলিল, 'তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করিবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রাখিয়া দিবে;

❒ 'এবং ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, এই সাত বৎসর যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, লোকে তাহা খাইবে; কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা রাখিয়া দিবে, তাহা ব্যতীত।

❒ এবং ইহার পর আসিবে এক বৎসর, 'সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ভোগ-বিলাস করিবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মদ্য পরিবেশনকারী উপস্থিত হলো বন্দীশালায়। হজরত ইউসুফকে দেখে সসম্মানে বলে উঠলো, হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী! আমাদের রাজা এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছেন। আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এসেছি। তাড়াতাড়ি আমাকে ব্যাখ্যাটি জানিয়ে দাও। রাজা ও তাঁর সভাসদেরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানবার জন্য উদগ্রীব। তাই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। স্বপ্নটি এই—রাজা দেখেছেন, সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী সাতটি হৃষ্টপুষ্ট

গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আরো দেখেছেন সাতটি সবুজ শীষকে আক্রমণ করছে সাতটি শুষ্ক শীষ। ইতোপূর্বে মদ্য পরিবেশনকারী দেখেছিলো, হজরত ইউসুফ প্রদত্ত স্বপ্ন-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাস্তব। তাই সে তাঁকে সম্বোধন করেছিলো 'সত্যবাদী' বলে। এখানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ। এরকম শব্দের মাধ্যমে মদ্য পরিবেশনকারীর বক্তব্য প্রদানের কারণ ছিলো স্বপ্নটি উদ্ভট, অলীক। জ্যোতিষী-গণকেরা অথবা সভাসদেরা কেউই স্বপ্নের মর্মোদ্ধার করতে পারছিলো না। রাজাও ছিলেন ভাবনা-ভারাক্রান্ত। আসলে মদ্য পরিবেশনকারী তখন ছিলো নানা ভাবনায় দোদুল্যমান। সে ভাবছিলো, কী জানি ইউসুফের ব্যাখ্যাকে রাজা ও অমাত্যবর্গ কী দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ, বিশিষ্ট মন্ত্রী আজিজ তাঁর শুভ্র ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েও তাঁকে জেলখানায় ঢুকিয়েছে। অবহেলা করেছে তাঁকে। তেমনি যদি এবারও রাজা ও অমাত্যরা তাঁর স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন। আবার একথাও তার বার বার মনে হচ্ছিলো যে, হয়তো এবার তিনি যথাসমাদর পাবেনই। রাজা তাঁর স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। মেনে নিবেন এই পুষ্প-সদৃশ্য চরিত্রের অধিকারী নবীকুলোদ্ভব বন্দীর মর্যাদা। শেষ হবে তাঁর সুদীর্ঘ বন্দী জীবন। এসকল পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনার কারণেই মদ্যপরিবেশনকারী তার বক্তব্যে ব্যবহার করেছিলো 'লাআ'ল্লা' শব্দটি।

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৪৭, ৪৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ বললেন, রাজার দেখা স্বপ্নের তাৎপর্য এই— একটানা সাত বছর দেশে প্রচুর ফসল হবে। আর পরের সাত বছর হবে প্রচণ্ড খরা। সুতরাং প্রথম সাত বছর ব্যাপক ভাবে চাষবাস করতে হবে। উদ্বৃত্ত ফসল শীষসমেত গুদামজাত করতে হবে। ওই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কাজে লাগবে পরের সাত বছর, যখন দেখা দেবে প্রচণ্ড অজন্মা। এভাবে আগাম সঞ্চয় করে রাখলে দেশবাসী বেঁচে যেতে পারবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ থেকে।

এখানে 'দাবুন' অর্থ চিরাচরিত নিয়ম। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেন, শব্দটি আদেশসূচক। অর্থাৎ হজরত ইউসুফ আদেশের সুরে বললেন, 'তোমরা চিরাচরিত নিয়মে সাত বছর একটানা চাষবাস করবে।' উল্লেখ্য যে, শীষসমেত ফসল রাখলে খাদ্যশস্য নষ্ট হয় না। হজরত ইউসুফ তাই শীষসমেত ফসল মওজুদ করার কথা বলেছিলেন। এই পরামর্শটি তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচায়ক। খাদ্যঘাটতির বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সঞ্চয়ের পরামর্শের মধ্যেও রয়েছে তাঁর নবীসুলভ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এবং এরপর আসবে এক বৎসর, সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।' এখানকার 'ইউগাছ' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'গাইছ' থেকে— যার অর্থ মেঘমালা, প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'গউছ' থেকেও শব্দটি গঠিত হয়ে থাকতে পারে। এর অর্থ প্রার্থনা। 'ইয়াসিরুন' কথাটির শাব্দিক অর্থ শস্যদানা থেকে তেল নিঃসরণ করা অথবা ফল নিংড়িয়ে রস বের করা। অর্থাৎ সুদিন ফিরে আসা।

আবু উবায়দা বলেছেন, শব্দটির অর্থ পরিত্রাণ পাওয়া। অর্থাৎ খরা ও অজন্মা থেকে রক্ষা পাওয়া। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে, দুর্ভিক্ষের সাত বৎসর গত হলে আল্লাহ্ মানুষের প্রার্থনা কবুল করবেন। ফিরে আসবে সুদিন। তখন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে। ফলে ঘটবে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। মানুষের জীবনে ফিরে আসবে স্বস্তি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি স্বপ্ন-ব্যাখ্যা-বর্হিভূত। হজরত ইউসুফের এ কথাটি ছিলো প্রত্যাদেশ। অথবা 'দুঃখের পরে সুখ' এই রীতি অনুসারে তিনি নিজেই একথা বলেছিলেন। বায়যাবী লিখেছেন, এ কথাটি ছিলো হজরত ইউসুফের নবীসুলভ প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

❒ রাজা বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস।' যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞেসা কর যে-নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদিগের অবস্থা কী। আমার প্রতিপালক তাহাদিগের ছলনা সম্যক অবগত।'

❒ রাজা নারীগণকে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, 'অদ্ভুত আল্লাহের মাহাত্ম্য! আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।'

❐ সে বলিল, 'আমি ইহা বলিলাম, যাহাতে সে জানিতে পারে যে, তাহার অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তাদিগের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'রাজা বললো, তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' এ কথার অর্থ— স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে রাজা অভিভূত হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো, ব্যাখ্যাটি নির্ভুল। আর এরকম ব্যাখ্যা যিনি করতে পারেন তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁকে যথামর্যাদা প্রদান করা উচিত। একথা ভেবে রাজা এক বিশেষ দূত পাঠালেন হজরত ইউসুফের নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে বললো, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিলো তাদের অবস্থা কী?' একথার অর্থ— রাজদূত হজরত ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, শীঘ্র চলুন। মহারাজ আপনার জন্য প্রতীক্ষ্যমাণ। হজরত ইউসুফ বললেন, না। এভাবে আমি মুক্ত হতে চাই না। আমাকে অপবাদ দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে। সুতরাং আমার বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক। জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ওই রমণীদেরকে যারা আমার সম্মানহানি ঘটিয়েছে। হ্যাঁ, ওই রমণীদেরকে যারা আমাকে দেখে তাদের হাত কেটে ফেলেছিলো।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অপবাদ অপনোদনের চেষ্টা একটি জরুরী কর্তব্য। বিশেষ করে অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য। হজরত ইউসুফ তাই মুক্ত হওয়ার আগেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মূল অপরাধিনী ছিলো জুলায়খা। কিন্তু তিনি এখানে তার নাম উল্লেখ করেননি। এটা ছিলো তার আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধের প্রকাশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।' একথার মাধ্যমে জুলায়খার সহচরীদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে হজরত ইউসুফের বিশেষ উষ্মা। কারণ তারাই বিষয়টিকে করে তুলেছিলো অধিকতর জটিল। অপ-পরামর্শ দিয়েছিলো এই বলে যে, প্রভুপত্নীর নির্দেশ পালন করো। কারণ তুমি গোলাম। তারা নিজেরাও জ্বালিয়েছিলো কামনার নিন্দিত বহ্নি। এভাবে তারা সকলেই বিস্তার করেছিলো ছলনা ও ষড়যন্ত্রের জাল। তাই নিরুপায় নবী এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মেনে ছিলেন। এতে করে তাঁর পবিত্রতার বিষয়টি হয়েছে অধিকতর পরিস্ফুট। একই সঙ্গে সাবধান করে দেয়া হয়েছে ওই সকল ছলনাময়ী সহ পৃথিবীর সকল ছলনাময়ীকে।

ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্ তাঁর মসনদে, তিবরানী তাঁর মুয়াজ্জামে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি বিস্ময় মানি আমার ভ্রাতা ইউসুফের মহত্ব ও সহনশীলতা দর্শনে। আল্লাহ্

তাঁকে মার্জনা করুন। কারাগারে তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এলো রাজার লোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন। আমি হলে কারামুক্ত হওয়ার আগে কিছুতেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যা প্রকাশ করতাম না। আমি অবাক হই তাঁর মহানুভবতা ও নম্রতা দেখে। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। রাজদূত এলো মুক্তির পরওয়ানা নিয়ে। তিনি আপত্তি উত্থাপন করলেন। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিতাম প্রধান ফটকের দিকে। আমি আরো বিস্মিত হই একথা ভেবে যে, তিনি মুক্তির চেষ্টা করেছিলেন মানুষের মাধ্যমে। যার জন্য তাঁর কারাবাস বর্ধিত হয়েছিলো আরো সাত বছর। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীর তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে হজরত ইকরামা থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন ভ্রাতা ইউসুফের উদারতা ও সহনশীলতায় আমি মুগ্ধ। আল্লাহ্ তাঁকে মার্জনা করুন। তিনি রাজার স্বপ্নের কথা শোনা মাত্র ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থলে আমি হলে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করতাম মুক্তির শর্তে। আমি আশ্চর্যান্বিত হই এই ভেবে যে, রাজদূতের মুখে মুক্তির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, আগে তদন্ত করা হোক কে অপরাধী— তিনি, না ললনাকুল। আমি হলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে যেতাম কারাগারের বাইরে। কোনো রকম আপত্তি তুলতাম না।

দ্রষ্টব্যঃ উর্ধ্বারোহণ (উরুজ) ও অবরোহণ (নুজুল)— এই দুই অবস্থা থাকে নবী- রসুলগণের। যাঁরা উর্ধ্বারোহী তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক থাকে ক্ষীণ। আর উর্ধ্বারোহনের পর অবরোহনে স্থিত হন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয় অতি ঘনিষ্ঠ। তাই অবরোহী নবী-রসুলগণের দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে। রসুল স. ছিলেন অবরোহীশ্রেষ্ঠ। তাই উর্ধ্বারোহী হজরত ইউসুফের আচরণ দৃষ্টে তিনি বিস্ময়বোধ করেছিলেন। রসুল স. হলেন সর্বসাধারণের তথা বিশ্বমানবতার নবী। তাই তাঁর কথায় এখানে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের অনুসরণযোগ্য অতি সহজ সরল অভিব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ নবী-রসুল ছিলেন উর্ধ্বারোহী। আর পূর্ণ অবরোহন (কামালে নুজুল) মহিমান্বিত করেছে অতি অল্প সংখ্যক নবীকে। তাঁরা হচ্ছেন হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা, হজরত ইসা, ও মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা স.। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি তাঁর মকতুবাত শরীফে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে — 'রাজা নারীগণকে বললো, যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিলো?' একথার অর্থ— রাজা আজিজ-পত্নী জুলায়খা ও তার সহচরীদেরকে রাজ দরবারে ডেকে আনলেন। তারপর জুলায়খাকে অথবা তার সহচরীদেরকে কিংবা তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, সত্য করে বলো, তোমরা নিজেরা ইউসুফকে প্ররোচিত করেছিলে, না ইউসুফ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো?

এখানে 'খতব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কারো কাছে কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হলে আরবী ভাষায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বললো, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম! আমরা তার মধ্যে কোনো দোষ দেখিনি'। একথার অর্থ— জুলায়খার সহচরীরা বললো, বিস্ময়কর ! আল্লাহ্‌র মাহাত্ম বিস্ময়কর! আমরা তার স্বভাবে ও আচরণে মন্দ কিছু দেখতে পাইনি। এখানে 'সু' অর্থ পাপ-পঙ্কিলতা ও আত্মসাৎ। 'আ'লিমনা আ'লাইহি মিনসুইন' অর্থ তার মধ্যে কোনো পাপ-পঙ্কিলতা দেখিনি।

শেষে বলা হয়েছে— আজিজের স্ত্রী বললো, এখন সত্য প্রকাশ হলো, আমিই তাঁর নিকট থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে-তো সত্যবাদী।' একথার অর্থ— জুলায়খা লক্ষ্য করলো, তার সহচরীরা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে। এখন সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া তার উপায়ন্তর নেই। তাই সে বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণেই আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে, আমিই তার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলাম। আমিই অপরাধী। সে নির্দোষ । এখানে 'হাস্‌হাসাল হাক্ব' অর্থ সত্য প্রকাশিত হলো।

এভাবে রাজদরবারে হজরত ইউসুফ নিষ্কলুষ প্রমাণিত হলেন। কিন্তু হজরত ইউসুফ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এর কারণ এই যে, আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ছিলো, হজরত ইউসুফের অনুপস্থিতিতেই একথা প্রমাণিত হোক যে, তাঁর দ্বারা আজিজ পত্নীর শ্লীলতাহানি ঘটেনি। পরস্ত্রীর এমতো শ্লীলতাহানি ঘটানো বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। আল্লাহ্‌র নবীর পক্ষে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র কখনো নিরবচ্ছিন্ন রাখেন না। এ কথাগুলোই পরবর্তী আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে এভাবে— সে বললো, আমি এটা বললাম, যাতে সে (আজিজ) জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার (আজিজের) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তাদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

এখানে 'আন্নি লাম আখুনহু বিলগইব' কথাটির অর্থ আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অর্থাৎ হজরত ইউসুফ একথার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সেই আবদ্ধ ঘরে আজিজ ছিলো অনুপস্থিত। তবুও আমি তার স্ত্রীর শ্লীলতা লুণ্ঠন করিনি। এরকম বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ্‌র নবীর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জুলায়খা। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখেন না। রাজদরবারের তদন্ত অনুষ্ঠানে আজ সেকথাই প্রমাণিত হলো।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৩

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِیْۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْؕ اِنَّ رَبِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

❑ সে বলিল,'আমি নিজকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি নিজকে নির্দোষ মনে করি না।' কথাটির অর্থ— আমি নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেকে নিরপরাধ মনে করি না। আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি নির্দোষ। আর রাজার তদন্তানুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে আল্লাহ্ই নিষ্কলুষ প্রমাণ করেছেন আমাকে। হজরত ইউসুফ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত, উদ্ধৃত বাক্যটি তার প্রমাণ। এ বিষয়টিও এখানে সুপ্রমাণিত যে, সকল নবীর মতো তিনিও ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ।

হজরত আনাস থেকে মারফুরূপে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতা জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, হে নবী ইউসুফ! জুলায়খার প্ররোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে মুহূর্তের জন্য হলেও আপনি তো কামনাকম্পিত হয়েছিলেন, তবে একথা কেনো বললেন যে, 'আজিজের অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি?' হজরত ইউসুফ তখন বললেন, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। এই হাদিসটিই বায়যাবী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ।' একথার অর্থ মানব-প্রবৃত্তি (নফস) স্বভাবতই মন্দকর্মপ্রবণ। উল্লেখ্য যে, আগুন, পানি, মাটি ও

বাতাস এই ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নফস ও শরীর। আর তার অন্তর্জগত গঠিত হয়েছে কলব, রূহ, সির, খফি ও আখফা এই লতিফা পঞ্চকের মাধ্যমে। কিন্তু নফস ও শরীর হচ্ছে তার অন্তর্জগতের প্রকাশ বা অবলম্বন। ভূতচতুষ্টয়ের ভারসাম্য বা সুসমন্বয় ঘটলেই কেবল মানুষ রক্ষা করতে পারে তার মর্যাদা ও মহত্ত্ব। কিন্তু ক্ষতিকর নয়, এরকম এক ধরনের অপপ্রবৃত্তির রেশ তখনো থেকেই যায়। কিন্তু ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে বিষয়টি গড়ায় ক্ষতির দিকে। যেমন অগ্নির প্রাবল্য ঘটলে প্রকাশ পায় ক্রোধ ও আত্মম্ভরিতা। পানির প্রাবল্য হলে দেখা দেয় বহুরূপী স্বভাব ও ধৈর্যহীনতা। মাটির প্রভাব প্রবল হলে স্বভাবে দেখা দেয় নীচতা ও নম্রতা । আর বায়ুর অতি প্রভাব তাকে করে তোলে চপল, চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রবণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন।' একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক যাদের প্রতি দয়া করেন, তাদের নফস হয়ে যায় অপকর্মপ্রবণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এখানে 'মা' (যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মান (যার) অর্থে । এরকম শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— মা তবা লাকুম মিনান্ নিসা (রমণীদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়)। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালার করুণাভাজন যারা, তারাই আত্মরক্ষা করতে পারেন কু রিপুর তাড়না থেকে। তাঁরা তখন তাঁদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও জয়ী হন। এই যুদ্ধই তাঁদেরকে ক্রমাগত উন্নীত করে চলে উন্নততর স্তরে। ফেরেশতাদের এ সুযোগ নেই। তাদের প্রবৃত্তি নেই । তাই যুদ্ধের প্রয়োজন ও পারিশ্রমিক কোনোটাই নেই। তাই তাদের মর্যাদা স্থবির। অথচ মানুষের আত্মোন্নয়নের সুযোগ সীমাহীন। তাই বিশিষ্ট মানুষ বিশিষ্ট ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্তায়ালার দয়া সরাসরি লাভ করেন নবী-রসুলগণ। অন্যেরা লাভ করেন নবী-রসুলগণের মাধ্যমে অথবা নবীর প্রিয়ভাজন প্রতিনিধি কোনো পীর মোর্শেদের মাধ্যমে। এটাই আল্লাহ্র দয়া প্রাপ্তির বিধান। আর এভাবেই একজন সত্যান্বেষী আল্লাহ্র করুণাসিক্ত হয়ে নিজের নফসকে করে তোলেন পবিত্র ও প্রশান্ত। একা একা চেষ্টা করে এই পবিত্রতা ও প্রশান্তি লাভ হয় না। তাই আল্লাহ্পাক এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— 'ফালা তুজাক্কু আনফুসাকুম' (তোমরা নিজেকে পবিত্র স্থির কোরো না)। অন্য আয়াতে বলেছেন—'বালিল্লাহু ইউজাককি মাঁইইয়াশাআ' (বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন)। প্রশান্ত প্রবৃত্তির অধিকারীদের সম্পর্কে আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুত্বমাইন্না তুরজিই ইলা রব্বিকি রদ্বিয়াতাম্ মারদ্বিইয়্যা, ফাদ্খুলি ফী ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি' (হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি ! তুমি ফিরে চলো তোমার পালনকর্তা সকাশে, তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন, অন্তর্ভূত হও তাঁর প্রিয় দাসদের দলে এবং প্রবেশ করো জান্নাতে)। উল্লেখ্য যে, প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নাফসুল মুত্বমাইন্না) অর্জিত হলে মানবদেহের সকল সূক্ষ্ম অংশ (লতিফা) সমূহ হয়ে যায় পুণ্যকর্মের পুরোধা। অবস্থা তখন এমন দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্র যে সকল সিফাতের (গুণাবলীর) বিকিরণ (তাজাল্লি) লতিফাসমূহ ধারণ করতে পারে না, সেগুলোর

আনুরূপ্যহীন বিকিরণও ধারণ করে ওই নফস। কোনো কোনো ভাষ্যকার এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) শব্দটির অর্থ করেছেন 'কিন্তু' (উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে এরকমই লেখা রয়েছে)। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— মানব প্রবৃত্তি অপকর্মপ্রবণ, কিন্তু আমার মহান পালনকর্তা সেই অপপ্রবণতাকে ফিরিয়ে দেন, বিপথকে করে দেন সুপথ— যাকে তিনি দয়া করেন। এরকমও বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি জুলায়খার । যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এরকম— ইউসুফকে আমিই অপবাদ দিয়ে কারাবন্দী করিয়েছি। কিন্তু এখন এই রাজসভায় তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি সত্য সাক্ষ্যই দিলাম। তবু আমি নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারি না। আর আমিও ছিলাম নিরূপায়। কারণ মানব-প্রবৃত্তি স্বভাবই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু আমাদের প্রভুপালক যাকে দয়া করেন, সে এর ব্যতিক্রম। যেমন ইউসুফ।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।' একথার অর্থ— আমার প্রভুপালক অবশ্যই ক্ষমাপরবশ ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি ক্ষমা করে দেন প্রবৃত্তির অপ-প্রবণতাকে, যদি তা বাস্তবায়িত না হয়। আর তাকেও তিনি ক্ষমা করেন যে ক্ষমা চায় ও প্রত্যাবর্তনকামী হয় সলজ্জিত ও সানুতপ্তরূপে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৫৪

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ○

❑ রাজা বলিল, 'ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস; আমি উহাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করিব।' 'অতঃপর রাজা যখন তাহার সহিত কথা বলিল তখন রাজা বলিল, 'আজ তুমি আমাদিগের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাস-ভাজন হইলে।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'রাজা বললো, ইউসুফকে আমার নিকটে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করবো।' একথার অর্থ— মিসররাজ হজরত ইউসুফের জ্ঞান গরিমার ও নিষ্কলুষ চরিত্রের প্রমাণ পেয়ে অভিভূত হলেন। ভাবলেন, এই মহামূল্যবান রত্ন কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। আর তাঁকে কোনো মন্ত্রী বা সভাসদের অধীনস্থ রাখাও ঠিক নয়। তাই তিনি ঠিক করলেন ইউসুফকে বানাবেন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহচর, একান্ত সচিব । এই প্রস্তাব দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠালেন এক বিশেষ দূত। সে কারাগারে গিয়ে হজরত ইউসুফকে জানিয়ে দিলো সম্রাটের প্রস্তাব। বললো, জলদি চলুন। সম্রাট একান্ত আগ্রহভরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আবদুল হাকাম তাঁর 'ফত্হে মিসর' গ্রন্থে কালাবী সূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন রাজদূত হজরত ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো, এবার বন্দীর পোশাক খুলে ফেলুন। নতুন পোশাকে

সজ্জিত হয়ে চলুন সম্রাটের দরবারে। তিনি আপনাকে তলব করেছেন। ফরীদ আম্মীর বর্ণনা উদ্ধৃত করে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির বলেছেন, সম্রাটের দরবারে প্রবেশকালে দৃষ্টি পড়লো আজিজের প্রতি। তৎক্ষণাৎ হজরত ইউসুফ প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! আমি তাঁর নিকটে নয়, আপনার নিকটেই মঙ্গলপ্রার্থী। তাঁর অশুভ পরিকল্পনা থেকে আমি তোমার পরাক্রমের আশ্রয় যাচ্‌ঞা করি। বাগবী লিখেছেন, রাজদূতের মুখে শুভসংবাদ শুনে হজরত ইউসুফ দণ্ডায়মান হলেন। দোয়া করলেন সকল বন্দীর জন্য। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! বন্দীদের জন্য সদয় করে দাও পুণ্যশীলদের হৃদয়। তাদের জন্য গোপন কোরো না দেশ ও জাতির সংবাদ প্রবাহ। হজরত ইউসুফের এভাবে দোয়া করার কারণ হচ্ছে, বন্দীরা দেশের সকল নগর-বন্দরের খবরাখবর জানতে পারতো না। দোয়া সমাপনের পর রওয়ানা হলেন সদর ফটকের দিকে। সদর ফটকের গায়ে লিখে রাখলেন, বন্দীশালা হচ্ছে জীবিতদের সমাধিক্ষেত্র। দুঃখ যাতনার আবাস। বন্ধুদের পরীক্ষাগার। শত্রুদের প্রমোদ ভবন। এরপর তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করে উত্তমরূপে গোসল করলেন। হৃদয় ভরে গেলো মুক্তির আনন্দে। পরিধান করলেন সম্রাটের পক্ষ থেকে পাঠানো মূল্যবান পরিধেয়। তাঁর সৌন্দর্যের ছটা বিকশিত হলো আরো অধিক মনোহররূপে। এরপর তিনি যাত্রা করলেন সম্রাটের দরবারে।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে পৌঁছে হজরত ইউসুফ বললেন, আমার প্রভুপালকই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষাকর্তা। তাঁর আশ্রয় যাচ্‌ঞাকারীরাই হয় বিজয়ী। তাঁর স্তব-স্তুতি সর্বোপরি। তিনি ব্যতীত উপাস্য কেউ নয়। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন সম্রাটের দরবারে। বললেন, আয় আল্লাহ্! সম্রাট-সান্নিধ্যের সুফলের চেয়ে তোমার সন্নিধানের সুফলই আমার অধিক কাম্য। আর তার সান্নিধ্যের অমঙ্গলাশঙ্কা থেকে আমি তোমারই সহায়তাপ্রার্থী। এরপর সম্রাটের দৃষ্টি তাঁর প্রতি পতিত হতেই তিনি সম্ভাষণ জানালেন আরবী ভাষায়। সম্রাট বললেন, এটা কোন ভাষা? হজরত ইউসুফ বললেন, এটা আমার মহান পূর্বপুরুষ পিতৃব্য ইসমাইলের ভাষা। এরপর তিনি সম্রাটের কল্যাণ কামনা করলেন হিব্রু ভাষায়। সম্রাট বললেন, এটা আবার কোন ভাষা? তিনি বললেন, আমার মহান পিতৃপুরুষের। দু'টো ভাষাই অজানা ছিলো সম্রাটের। অথচ সত্তরটি ভাষা জানা ছিলো সম্রাটের। এরপর শুরু হলো কথোপকথন। সম্রাট যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষাতেই বাক্যালাপ চালিয়ে যান হজরত ইউসুফ। হজরত ইউসুফ তখন তিরিশ বছরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ। সম্রাট তাঁর বাক্যালাপ শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। বসালেন আপন আসনের পাশে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর রাজা যখন তার সঙ্গে কথা বললো, তখন জানালো, আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে।' বাগবী লিখেছেন, সম্রাট তখন বললেন, ওহে ইউসুফ! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি এবার তোমার নিজ মুখে শুনতে চাই। হজরত ইউসুফ বললেন, বেশতো। শুনুন। আপনি দেখেছেন, সুন্দর ও মোটাতাজা সাতটি গাভী উঠে এলো সমুদ্র সৈকত থেকে। গাভীগুলোর স্তন ছিলো দুধে পরিপূর্ণ । এরপর নীল নদীর কর্দমাক্ত তীর থেকে উঠে এলো সাতটি শীর্ণকায় গাভী। সেগুলো ছিলো হিংস্র জন্তুর মতো ধারালো দাঁত ও নখর বিশিষ্ট। ওই গাভীগুলো আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো মোটাতাজা গাভীগুলোকে। তারপর উদরপূর্তি করলো সেগুলোর অস্থি-চর্ম ও গোশতের দ্বারা। আপনি তো বিস্ময়ে ও শঙ্কায় হতবাক। এরপর দেখলেন, সাতটি শ্যামলকোমল শীষবিশিষ্ট একটি গুচ্ছ। পরক্ষণেই দেখলেন, সাতটি শুষ্ক শীষবিশিষ্ট আর একটি গুচ্ছ। গুচ্ছ দু'টো ভাসছে তটিনীর তীব্র স্রোতে। আপনি অবাক হলেন। ভাবলেন, পানি থেকে কী করে উদগত হলো শস্যের শীষ! বাতাস তখন ধীর। ওই মন্দ সমীরণে শুষ্ক শীষ সাতটি ঝরে পড়লো সতেজ সবুজ শীষগুলোর উপর। সহসা হলো অশনিসম্পাত। ওই অশনিপাতে জ্বলতে লাগলো সকল শস্যদানা। ভেসে উঠলো একটি কৃষ্ণকায় অদ্ভুত আকৃতি। দৃশ্যটি একই সঙ্গে বিস্ময়বিমণ্ডিত ও ভয়ার্ত। নয় কি? রাজন! বলুন, তখন কি আপনি ভীত হননি? সম্রাট বললেন, হ্যাঁ, হয়েছি। তবে তোমার বিবরণ আরো বেশী ভয়ংকর। এবার বলো হে প্রাজ্ঞ যুবক! এখন আমাকে কী করতে হবে? হজরত ইউসুফ বললেন, হে রাজ্যাধিপতি! শুনুন, এবার কী করতে হবে। প্রথম সাত বছর ব্যাপক ফলন হবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চাষবাসের প্রচলন ঘটান ব্যাপক হারে। উদ্বৃত্ত শস্যগুলো শীষ সহকারে সংরক্ষণ করুন। এভাবে জমানো সাত বছরের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কাজে লাগবে পরবর্তী সাত বছরে। তখন মানুষ, পশু ও পক্ষীকুল কেউ অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে না। আর জনগণের মধ্যে এই মর্মে রাষ্ট্রীয় আজ্ঞা প্রচার করে দিন, তারা প্রত্যেকে তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক পঞ্চমাংশ যেনো গোলায় তুলে রাখে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ও জনগণের উদ্যোগে যে বিশাল খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে তাই দিয়ে আপনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন ওই প্রলম্বিত দুর্ভিক্ষকে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর খাদ্যের চাহিদাও আপনি তখন মেটাতে পারবেন। বিনিময়ে যে অর্থ সমাগম ঘটবে, তাই দিয়ে ভরপুর হবে আপনার রাজকোষও। সম্রাট এই বিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা শুনে তাজ্জব হলেন। বললেন, বুঝলাম। কিন্তু এই বিরাট আয়োজন বাস্তবায়ন করবে কে? মওজুদ করবে কারা? বিতরণই বা করবে কারা? কে থাকবে এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায়?

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

❒ ইউসুফ বলিল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন; আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ।'

❒ এইভাবে ইউসুফকে আমি সেইদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম; সে সেদেশে যথা ইচ্ছা বসবাস করিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

❒ যাহারা বিশ্বাসী এবং সাবধানী তাহাদিগের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বললেন, হে মিসরাধিরাজ! ব্যাপক ভিত্তিতে চাষাবাদ, খাদ্যশস্য মওজুদ ও বিতরণ ইত্যাদির সার্বিক ব্যবস্থাপকরূপে যে দায়িত্ববান লোকের কথা আপনি ভাবছেন, সেই দায়িত্ব নির্দ্বিধায় আপনি অর্পণ করতে পারেন আমার স্কন্ধে। আমি এ ব্যাপারে সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত। উল্লেখ্য যে, নবুয়তের মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই এই গুরুভার বহন করতে চেয়েছিলেন হজরত ইউসুফ। ভেবেছিলেন, এরকম জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে তিনি যেতে পারবেন মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি। সেই সুযোগে করতে পারবেন সত্য ধর্মের সফল প্রচার। মানুষও তাঁকে আপনজন ভেবে মেনে নিবে তাঁর ধর্মমতকে। নবীজীবনের উদ্দেশ্য তো এটাই। তাঁরাই তো এভাবে নিশ্চিত করেন মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। হজরত ইউসুফের এই স্বতঃপ্রণোদিত প্রস্তাবের মধ্যে পার্থিব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাকাংখা ছিলো না মোটেও। সকল নবী ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এমতো আকাংখা থেকে মুক্ত। পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের দায়িত্বও ছিলো এরকম। পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। উদ্দেশ্য ছিলো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধন ও পুণ্যলাভ। চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর সঙ্গে একারণেই বিবাদ বেধেছিলো হজরত মুয়াবিয়ার। তাঁদের দু'জনের একজনও পৃথিবীপূজক ছিলেন না। ছিলেন বিশুদ্ধ আল্লাহ্‌প্রেমিক।

বায়যাবী বলেছেন, সম্রাটের সঙ্গে আলাপের সময় হজরত ইউসুফ বুঝতে পেরেছিলেন, সম্রাট তাঁকে দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার বিশাল কর্মকাণ্ডটির দায়িত্ব দিতে চান। তাই তিনি পেতে চেয়েছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। সর্বসাধারণের উপকারের জন্যই তিনি এই গুরুভারটি আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাটি প্রমাণিত হয় যে, আপন বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার উপরে আস্থাশীল হলে রাষ্ট্রের কোনো গুরুদায়িত্ব অথবা বিচারকার্যের দায়িত্ব প্রার্থনা করা সিদ্ধ। এমতোক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করাতে কোনো দোষ নেই। আর একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, শাসক কাফের অথবা জালেম হলেও তার অধীনে এরকম জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব গ্রহণ করা অন্যায় নয়। আমাদের সম্মানিত পূর্বসুরীদের জীবনেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁদের অনেকেই জালেম ও ফাসেক শাসকের অধীনে বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ কিন্তু কোনো রাজ কর্মচারী বা রাজার অধীনস্থ কোনো শাসক হতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন রাজার বিশেষ উপদেষ্টা হতে। রাজা তো তাঁর উপদেশ ও পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং রাজাই ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী। তিনি কিন্তু রাজার অনুসারী ছিলেন না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতা ইউসুফের প্রতি আল্লাহ্র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন'— এরকম কথা তিনি বললে সম্রাট তাঁকে দান করতেন মহাসচিবের দায়িত্ব। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্বগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলেই সম্রাট তাঁকে তৎক্ষণাৎ দায়িত্ব না দিয়ে রাজ প্রাসাদে রেখেছিলেন কিছু দিনের জন্য।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি সূত্রে বাগবী লিখেছেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদানের এক বৎসর পর রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার হজরত ইউসুফের উপবে ন্যস্ত করে সম্রাট অবসর গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য অভিষেক। অবসর প্রাপ্ত সম্রাট নিজ হাতে তাঁর শিরে পরিয়ে দিলেন রাজ মুকুট। কটিদেশে বেঁধে দিলেন স্বর্ণখচিত কোষাবদ্ধ অসি। বসালেন মণিমুক্তা খচিত রাজ সিংহাসনে। আলো ঝল্‌মল্‌ রাজ দরবারে সংস্থাপিত ওই রাজসিংহাসনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো মহামূল্যবান রেশমী ঝালর। বহুবিচিত্র ও মহামূল্যবান বসনে সুশোভিত হয়ে হজরত ইউসুফ যখন রাজাসনে উপবেশন করলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়ে পড়লো অসম্ভব। এমনিতেই তিনি ছিলেন পৃথিবীপাগল করা সৌন্দর্যের সম্রাট। এখন সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযোজিত হলো রাজকীয় ঋদ্ধি। যেনো আলোয় আলোয় ভরে গেলো ভুবন। রাজদণ্ডধারী নবী ইউসুফের প্রতি নতজানু হয়ে অভিবাদন জানালো সকল সভাসদ।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, মিসরের ওই মহান নরপতি আজিজকে পদচ্যুত করেছিলেন। তদস্থলে বসিয়েছিলেন হজরত ইউসুফকে। ইবনে জায়েদের বর্ণনায় এসেছে, নরপতি রাইয়ানের কোষাগারে সঞ্চিত ছিলো বিপুল ধনসম্পদ। ওই ধনসম্পদ যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকার তিনি দিয়েছিলেন হজরত ইউসুফকে। ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম।

ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, ওই সময় আজিজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো। তারপর নরপতি রাইয়ান হজরত ইউসুফকে বিবাহ দিয়েছিলেন জুলায়খার সঙ্গে। পরিণয়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রথম দর্শনেই হজরত ইউসুফ জুলায়খাকে বলেছিলেন, এবার তো আমরা পরস্পরের জন্য হালাল। এবার বলো, পূর্বের অপবিত্র আকাংখা অপেক্ষা এটাই আমাদের জন্য উত্তম নয় কি? জুলায়খা বলেছিলেন, প্রিয়তম! আপনিতো জানেন, আমি রূপসী। বিত্তশালিনী। অথচ আপনি একথা জানেন না যে, আজিজ ছিলো পৌরুষহীন। আর আপনার ভুবন পাগল করা রূপ যে আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাইতো আপনাকে দেখলে ভেঙে যেতো আমার ধৈর্যের বাঁধ। ঐতিহাসিকেরা একথাও বলেছেন যে, জুলায়খা ছিলেন অনাঘ্রাতা। কারণ আজিজ ছিলেন নপুংশক। জুলায়খাকে পেয়ে নবী ইউসুফের সংসারে নেমে এসেছিলো স্বর্গ সুখ। দুই সন্তানের জননী হয়েছিলেন তিনি। সন্তানদ্বয়ের নাম ছিলো ইফরাইম ও মাইসা। হজরত ইউসুফ ছিলেন জনগণনন্দিত নরপতি। প্রজাসাধারণ তাঁকে দেখতো যথেষ্ট ভক্তি ও সমীহের দৃষ্টিতে।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে — 'এভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেদেশে যথাইচ্ছা বসবাস করতো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক এরশাদ করছেন, হে আমার রসুল মোহাম্মদ স.! এতক্ষণ ধরে যে রকম বিবরণ উপস্থাপন করা হলো, সেভাবে দীর্ঘ ঘাতপ্রতিঘাতের পর আমি নবী ইউসুফকে নরপতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম মিসরে। ওই দেশে সে ছিলো সর্বমান্য নৃনায়ক। তাই সে দেশের যে কোনো স্থানে সে বসবাস করতে পারতো পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না ।'

এখানে উদ্ধৃত 'রহমত' শব্দটির অর্থ কল্যাণ বা শ্রমফল— যা লাভ হয় তাৎক্ষণিকভাবে অথবা বিলম্বে। হজরত ইবনে আব্বাস ও ওয়াহাব বলেছেন, এখানকার 'মুহসিনীন্' শব্দটির অর্থ ধৈর্যশীল। মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, হজরত ইউসুফ মাঝে মাঝেই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী নরপতি রাইয়ানকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতেন। অভিভূত হয়ে তিনি পান করতেন নবী ইউসুফের কথামৃত। এভাবে এক সময় তিনি হয়ে গেলেন এক আল্লাহ্র প্রতি এবং সত্য নবী ইউসুফের প্রতি বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। লাভ করলেন অনন্ত জীবনের অক্ষয় রাজত্বের চিরস্থায়ী অধিকার।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী এবং সাবধানী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।' হজরত ইউসুফ সারাদেশ জুড়ে শুরু করলেন চাষবাসের মহা আয়োজন। দুর্ভিক্ষের আগমন অবশ্যম্ভাবী— একথা প্রচার করে দিলেন রাজ্যের সর্বত্র। ফলে কৃষকেরাও অতিরিক্ত খাদ্য ফলাতে শুরু করলো। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা হলো বিরাট বিরাট শস্য ভাণ্ডার। কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করে খাদ্যশস্য জমা করা হলো সে সকল ভাণ্ডারে। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রয় করতে পেরে কৃষকেরা তো মহা খুশী। পরের বছর থেকে আর কাউকে তেমন কিছু বলতে হলো না। নগদ অর্থ সমাগমের কথা ভেবে দ্বিগুণ উদ্যোগে চাষবাস শুরু করে দিলো সকলে। আর সম্রাট ইউসুফ এভাবে বছরে বছরে খাদ্য শস্য ক্রয় করে খাদ্য ভাণ্ডারগুলো পরিপূর্ণ করে ফেললেন। কেটে গেলো সাতটি বছর। অষ্টম বছর থেকে শুরু হলো অনাবৃষ্টি, অজন্মা, খরা। প্রথম বছরে তেমন কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই দেখা দিলো খাদ্যাভাব। জনতা হয়ে পড়লো রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। নগদ মূল্যে খাদ্য বিক্রয়ের অনুমতি দিলেন হজরত ইউসুফ। নির্দেশ দিলেন প্রতিদিনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কেউ ক্রয় করতে পারবে না।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, প্রাক্তন রাজা, তার পরিবার পরিজন ও অন্যান্য সভাসদদের নিকটেও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন হজরত ইউসুফ। কাউকেই অতিরিক্ত খাদ্য শস্য দেওয়া হতো না। তিনি নিয়ম করলেন প্রতিদিন সকলকে একবার মাত্র আহার করতে হবে। দ্বিপ্রহর হবে ওই আহারের সময়। প্রাক্তন রাজা প্রথম প্রথম রাত্রি বেলায় ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তেন। হজরত ইউসুফ তাঁকে বুঝাতেন, হে রাজন ! অনুভব করতে শিখুন জঠরজ্বালা কাকে বলে। হজরত ইউসুফ নিজেও প্রতিদিন একবার মাত্র আহার করতেন।

প্রথম বছর মানুষ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করলো নগদ অর্থের বিনিময়ে। অলংকারের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করলো দ্বিতীয় বছরে । তৃতীয় বছরে গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করলো তারা। চতুর্থ বছরে বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়ে দিলো গোলাম বাঁদীকে। পঞ্চম বছরে হস্তান্তর করলো স্থাবর সম্পত্তি। ষষ্ঠ বছরে দিতে হলো শিশু সন্তানদেরকে। আর সপ্তম বছরে আত্মবিক্রয় করা ছাড়া কোনো উপায়ই আর রইলো না। এভাবে সারা দেশের সকল মুদ্রা, অলংকার, পশুপাল, মানবসম্পদ সকল কিছুর অধিকারী হলেন হজরত সম্রাট ইউসুফ।

আমি বলি, বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে বুঝতে হবে, হজরত ইউসুফের শরিয়তে সন্তান-সন্ততি বিক্রয় ও আত্মবিক্রয় সিদ্ধ ছিলো। কোনো কোনো জ্ঞান

প্রবীণ বলেছেন, চরম অনটনের সময় উপায়ন্তর না থাকলে নিজেকে বন্ধক রেখে অথবা সন্তান-সন্ততি বিক্রয় করে আহার্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু শরিয়তে এরকম মতামতের কোনো ভিত্তি নেই।

মিসরের মানুষ বলতে শুরু করলো, এভাবে সকল কিছুর মালিকানা সম্রাট ইউসুফ ছাড়া আর কেউ কখনো পায়নি। তিনি আমাদের জান-মাল সহায়-সম্পদ সকল কিছুর অধিকর্তা। এমতাবস্থায় হজরত ইউসুফ একদিন প্রাক্তন নরপতি রাইয়ানের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। বললেন, হে প্রবীণ রাজা! এখন তো প্রজাসাধারণের সকল কিছুই আমার আয়ত্তে। এসকল কিছু নিয়ে আমি কী করবো? রাইয়ান বললেন, রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে এখন আপনিই একমাত্র সিদ্ধান্তদাতা। আমিও আপনার অভিপ্রায়ানুসারী। হজরত ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহ্ ও আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সকলকে মুক্তি দিলাম। তাদের সকল সহায় সম্পদও ফেরত দিয়ে দিলাম।

বর্ণিত হয়েছে, ওই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হজরত ইউসুফও সকলের মতো মাত্র একবেলা আহার করতেন। কেউ কেউ বলতো, হে মহান সম্রাট! আপনি তো সাম্রাজ্যের সকল খাদ্যশস্যের অধীশ্বর । তবে আপনি এভাবে কষ্টভোগ করবেন কেনো? তিনি জবাব দিতেন, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। আর আমি উদরপূর্তি করে পরিতৃপ্ত হবো— এরকম হয় না। অতিরিক্ত আহার করলে আমি প্রজাসাধারণের দুঃখ বুঝবো কী করে? তিনি তাঁর পাচককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আহারের আয়োজন করতে হবে কেবল দুপুরে। সম্রাটও তো মানুষ। সাধারণ মানুষের সমব্যথী না হলে সম্রাট তাঁর মনুষ্যত্ব রক্ষা করবেন কী করে?

শুধু মিসর নয়, অনটনের আগুন লেগে গেলো আশে পাশের দেশগুলোতেও। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষও খাদ্যক্রয়ের জন্য আসতে লাগলো মিসরে। হজরত ইউসুফ নিয়ম করে দিয়েছিলেন, বিদেশীরা সংগ্রহ করতে পারবে প্রতিবারের জন্য একটি উটের বহনযোগ্য খাদ্যশস্য। সে কুলীন অকুলীন, যে-ই হোকনা কেনো। দুর্ভিক্ষের নিকটে অভিজাত-অনভিজাত বলে কিছু নেই।

দিনদিন খাদ্য সংগ্রাহকদের সমাগম বেড়ে চললো। কিনান ও সিরিয়াতেও দেখা দিলো মন্বন্তর। সম্রাট ইউসুফের জন্মভূমি ফিলিস্তিনেও লাগলো খাদ্য সংকটের আগুন। স্থানটি ছিলো সিরিয়ার প্রান্তবর্তী ফিলিস্তিন অঞ্চলের গারমাত নামক এলাকায়। পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন হজরত ইয়াকুব ও তাঁর গোত্রের লোকেরা। মিসর সম্রাটের মহানুভবতার কথা সেখানেও গিয়ে পৌঁছলো। হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসর প্রেরণ করলেন। কিন্তু বিনইয়ামিনকে রেখে দিলেন নিজের কাছে।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

❒ ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না,

❒ এবং সে যখন উহাদিগের রসদের ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছ না যে আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম অতিথি-সেবক?'

❒ 'কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদিগের জন্য কোন রসদ থাকিবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না।'

❒ উহারা বলিল; 'উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয়ই ইহা করিব।'

❒ ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, 'উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদিগের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও— যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে; তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সম্রাট ইউসুফ একদিন জানতে পারলেন সিরিয়া থেকে কয়েকজন অতিথি এসেছে। তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে অতিথিশালায়। সম্রাট তাদেরকে তলব করলেন। তারা এলে সবিস্ময়ে দেখলেন, এরা তাঁকে অন্ধকূপে নিক্ষেপকারী সেই দশ ভ্রাতা। প্রথম দর্শনেই তিনি তাদেরকে ভালোভাবে চিনতে পারলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনলো না।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, দেখার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে চিনতে পেরেছিলেন। হাসান বলেছেন, তিনি তাদেরকে চিনতে পেরেছিলেন পরিচয় দানের পর।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর হজরত ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছিলো তাদের। তাই অবয়বগত পরিবর্তনের ফলে তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। চিনতে না পারার এটাই ছিলো মুখ্য কারণ। আতা বলেছেন, হজরত ইউসুফ তখন ছিলেন মহামূল্যবান রাজকীয় ভূষণে সুসজ্জিত। সেকারণেই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফের অঙ্গাবরণে তখন শোভিত হচ্ছিলো রেশমী পোশাক। আর তাঁর গলদেশে শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণনির্মিত হার। আমি বলি, একথায় প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইউসুফের শরিয়তে পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার ছিলো বৈধ।

হজরত ইউসুফ ভাইদের সাথে আলাপ করলেন হিব্রু ভাষায়। বললেন, অতিথিবৃন্দ! তোমাদের পরিচয় প্রদান করো। তারা বললো, আমরা সিরিয়ার এক পশুপালক পরিবারের লোক। আমাদের অঞ্চল এখন ভয়ানক অন্নসংকটে নিপতিত। তাই খাদ্যশস্য সংগ্রহের নিমিত্তে আমরা এখানে এসেছি। সম্রাট বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা গুপ্তচর। এখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সংবাদ অবগত হতে এসেছো। তারা বললো, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা সকলেই সহোদর ভ্রাতা এবং এক পিতার সন্তান। আর আমাদের পিতা হচ্ছেন বয়োপ্রবীণ ও মহানুভব নবী হজরত ইয়াকুব। সম্রাট বললেন, তোমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতো? তারা বললো, এখানে উপস্থিত রয়েছি আমরা দশ ভাই। আমাদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈশবে আমাদের সঙ্গে পশু চারণকালে অরণ্যমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ছোট আর এক ভাই এখন পিতার সান্নিধ্যে। পিতা তাকে কাছ ছাড়া করতে চান না। সন্তানবিচ্ছেদের যাতনায় সে-ই এখন মহান পিতার একমাত্র সান্ত্বনা। সম্রাট বললেন, আমি কী করে জানবো যে, তোমরা সত্য বলছো। তারা বললো সম্রাট এই বিদেশ বিভূঁয়ে আমরা তো আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে অক্ষম। সম্রাট আর কথা বাড়ালেন না। নির্দেশ দিলেন, এদের উটগুলোকে খাদ্য শস্য দিয়ে বোঝাই করে দেয়া হোক।

এর পরের আয়াত চতুষ্টয়ের (৫৯, ৬০, ৬১, ৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— দশ ভ্রাতার উটগুলো খাদ্যশস্যে বোঝাই করে দেয়া হলো। সম্রাট বললেন, শোনো হে অতিথি সকল! আবার এলে অবশ্যই তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাকে আনলে তার উটও খাদ্য দ্বারা বোঝাই করে দিবো। তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করবো অধিক মাত্রায়। তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে এখানকার পরিমাপ পূর্ণমাত্রাবিশিষ্ট। আর আমি উত্তম অতিথিবৎসল। আরো শোনো, তাকে সঙ্গে না আনলে আমি তোমাদেরকে কোনো খাদ্যশস্য দিবোই না। আর তাকে ছাড়া তোমরা এসোই না।

দশ ভ্রাতা বললো, মহানুভব সম্রাট! আমরা এ বিষয়ে আমাদের মহান পিতাকে সম্মত করতে চেষ্টা করবো। আর এ চেষ্টার মধ্যে আমরা কোনো কার্পণ্যই করবো না। তিনি আমাদের ওই ছোট ভাইকে ছেড়ে থাকতেই পারেন না। তবুও আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেভাবেই হোক পিতাকে রাজী আমরা করাবোই। সম্রাট বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন তাহলে জামানত হিসাবে থাকো। তারা বললো, ঠিক আছে। এরপর তারা জামানত হিসাবে কে থাকবে, তার জন্য লটারী করলো। লটারীতে উঠলো শামউনের নাম। এ হচ্ছে সেই শামউন, যে চল্লিশ বছর আগে বালক ইউসুফকে হত্যার পরিকল্পনায় বাধা দিয়েছিলো। শেষে শামউনকে রাজদরবারে জামিন হিসাবে রেখে অন্য নয় ভাই যাত্রা করলো সিরিয়া অভিমুখে। ইতোপূর্বে সম্রাটের নির্দেশে খাদ্য শস্যের মূল্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থ তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিলো। সে সময় সম্রাট তার আজ্ঞাবহকে বলেছিলেন, বাড়ীতে গিয়ে মালপত্র খুললেই তাদের প্রদত্ত অর্থ দেখতে পেয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, আমিই গোপনে এগুলো ফেরত দিয়েছি। বিস্মিত হবে তারা। আমার এই উদারতা পুনরায় তাদেরকে এখানে আসতে অনুপ্রাণিত করবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জুহাক বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা খাদ্যশস্যের মূল্য হিসাবে দিয়েছিলো জুতা এবং চামড়া। মুদ্রার প্রচলন তখন ছিলো না। তাই তখন ক্রয়-বিক্রয় হতো দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের মাধ্যমে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য নগদ মুদ্রা বিনিময়ের প্রচলনও ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, তারা বিনিময় মূল্য হিসাবে দিয়েছিলো কয়েক বস্তা ছাতু। বাগবী লিখেছেন এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ওই ছোট ছোট ছাতুর বস্তাগুলো খাদ্য শস্যের বড় বড় বস্তার ভিতরে রেখে দেয়া হয়েছিলো।

কেউ কেউ বলেছেন, উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাইদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে হজরত ইউসুফ ওরকম করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের পুনরাগমন নিশ্চিত করার জন্যই তিনি ওরকম করেছিলেন। কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করেছেন, পিতা, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, বিদেশাগত অতিথিদের জন্য সার্বিক মমত্ববোধ— এসকল কারণেই তাদের পণ্য মূল্য গ্রহণ করাকে সমীচীন মনে করেননি হজরত ইউসুফ। কালাবী বলেছেন, অর্থসঙ্কটের কারণে তাদের পুনরাগমন বিলম্বিত হতে পারে— এটাই ছিল তাঁর পণ্যমূল্য ফেরৎ দেয়ার কারণ। আবার কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, বাড়ীতে যেয়ে মালপত্রগুলো খুলে তাদের পরিশোধিত পণ্য সামগ্রী দেখে তারা চিন্তা করবে, নিশ্চয়ই ভুলবশতঃ এরকম করা হয়েছে। তখন তারা ভাববে এগুলো তো মিসর সম্রাটের সম্পদ। সুতরাং এগুলো তাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। এগুলো আত্মসাৎ করা কিছুতেই বৈধ হবে না। তখন তারা ফিরে আসবে আবার।

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

❐ অতঃপর উহারা যখন উহাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতাকে আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দিন যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।'

❐ সে বলিল,'আমি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস করিব যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম উহার ভ্রাতা সম্বন্ধে। আল্লাহ্ই রক্ষণা-বেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালুদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

❐ যখন উহারা উহাদিগের মাল-পত্র খুলিল তখন উহারা দেখিতে পাইল উহাদিগের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যপর্ণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদিগের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে; পুনরায় আমরা আমাদিগের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদিগের ভ্রাতার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনিব; যাহা আনিয়াছি তাহা পরিমাণে অল্প।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলো নয় ভাই। হজরত ইয়াকুবকে বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আমরা মিসরাধিপতির আতিথ্যে মুগ্ধ, অভিভূত। আমরা সেখানে দিনযাপন করেছি তাঁর বিশেষ অতিথিরূপে। তাঁর আপ্যায়ন দর্শনে আমাদের মনে হয়েছিলো, এরকম মধুর মেহমানদারী ইয়াকুব বংশীয় কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। হজরত ইয়াকুব

বললেন, এবার গেলে অবশ্যই আমার সালাম তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়ো এবং বোলো তাঁর অত্যুত্তম আচরণের নিমিত্তে আমি তার জন্য দোয়া করে চলেছি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপাবর্ষণ করুন। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, শামউন কোথায়? তারা বললো, সম্রাট তাকে জামিন হিসাবে রেখে দিয়েছেন। এরপর তারা বিবৃত করলো পুরো ঘটনা। তারপর বললো, হে মহান জনয়িতা! এরপর আমরা বিনইয়ামিনকে সঙ্গে না নিলে আমাদেরকে আর খাদ্যশস্য দেয়া হবে না। সম্রাট নিজেই একথা জানিয়েছেন। সুতরাং কিছুকাল পর আমাদের মিসর যাত্রার সাথী হিসেবে আপনি অবশ্যই বিনইয়ামিনকে আমাদের সাথে যেতে অনুমতি দিবেন। এতে করে আমাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। হে পিতা! আপনি এতে অমত করবেন না। বিনইয়ামিন তো আমাদেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণে কোনো প্রকার ক্রটিই করবো না।

হাসান বলেছেন, এখানে 'কাইল' অর্থ খাদ্যশস্য। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— মিসরাধিরাজ আমাদের প্রত্যেকের নামে নামে খাদ্যশস্য দিয়েছেন। বিনইয়ামিনের জন্য কিছুই দেননি। সুতরাং হে আমাদের মহান পিতা! তাকেও আমাদের সাথী হতে দিন। তাহলে আমরা সকলের অংশ পেয়ে যাবো। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং সে নিশ্চিত পেয়ে যাবে তার অংশ।

পরের আয়াতের (৬৪) মর্মার্থ হচ্ছে — হজরত ইয়াকুব বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করলাম। চল্লিশ বছর পূর্বে ইউসুফকে নিয়ে যাবার সময়েও তোমরা এরকম বলেছিলে। তখনও তোমাদেরকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখনও করছি। তবে আমার প্রকৃত বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অনুকম্পাপরবশগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ অনুকম্পাপরবশ।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেলো তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।' একথার অর্থ— নয় ভাই মালপত্রগুলো খুলে দেখলো খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে তাদেরই পরিশোধিত পণ্যমূল্য। অবাক হয়ে গেলো তারা। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলো, হে মহানুভব। তিনি আমাদেরকে রাজকীয় মর্যাদায় রেখেছেন। খাদ্যশস্য দ্বারা বোঝাই করে দিয়েছেন আমাদের উট। আবার দেখুন, পরিশোধিত পণ্যমূল্য গোপনে গোপনে আমাদেরকেই ফেরত দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করতে পারি আমরা? এর অধিক কী প্রত্যাশা থাকতে পারে আমাদের? কোন ভাষায় আমরা প্রকাশ করবো তাঁর অভূতপূর্ব বদান্যতার কথা। তাঁর অসাধারণ দানশীলতা সম্পর্কে আপনিও সাক্ষী থাকুন। আমরা পুনরায় খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য নতুন কোনো তহবিলের প্রত্যাশী নই। যে পণ্যমূল্য আমারা ফেরত পেয়েছি, সেই পণ্যমূল্যই নতুন খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট। এরপর আর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে আমাদের?

এরপর বলা হয়েছে— 'পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যশস্য এনে দিবো এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য আনবো; যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।' এ কথার অর্থ— তারা বললো, হে আমাদের মহান জনক! যে পণ্যমূল্য আমরা এখন ফেরত পেলাম, সেই পণ্যমূল্য নিয়েই আমরা আবার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসর অভিমুখে যাত্রা করবো। বিনইয়ামিনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তার যত্নের কোনো ত্রুটি আমরা করবো না। এবার আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্যও আনবো। যা এনেছি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আর অতিরিক্ত পণ্য লাভ হবে আমাদের জন্য সহজ। যেহেতু সম্রাটের সদাশয়তা সুপ্রমাণিত। আর আমাদের উপরে তিনি আরো অধিক সদয়।

অন্য শহর থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করাকে আরবী ভাষায় বলে 'মারা' অথবা 'ইয়ামিরু।' আর এখানে 'নাহ্‌ফাজু আখানা' অর্থ 'আমরা পথিমধ্যে আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করবো'। 'নাজ্‌দাদু কাইলা বাই'র' অর্থ 'কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য আমরা আনবো অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য।'

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ

اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ

مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ

قَضٰىهَا وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❑ পিতা বলিল, 'আমি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহের নামে শপথ কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়।' অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার বিধায়ক। '

❒ সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহের বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের জন্য কিছু করিতে পারি না। বিধান আল্লাহেরই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং যাহারা অপরের উপর নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহেরই উপর নির্ভর করুক।'

❒ এবং যখন তাহারা তাহাদিগের পিতা তাহাদিগকে যে ভাবে আদেশ করিয়াছিল সেইভাবেই প্রবেশ করিল তখন আল্লাহের বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না; কিন্তু ইয়াকুব যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তাহা ছিল তাহার নিজের ইচ্ছা এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে— পিতা বললো, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করো যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়ো।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, হে আত্মজবর্গ! তোমরা আমার নিকট এই মর্মে শপথ করো যে, বিনইয়ামিনকে তোমরা আমার কাছে ফেরত আনবেই। এরকম শপথ না করা পর্যন্ত তাকে আমি তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না। কিন্তু তোমরা যদি অপারগ হয়ে পড়ো, তবে তা ভিন্ন কথা।

এখানে 'মাওছিক্বাম্ মিনাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ অথবা যে শপথের মূল লক্ষ্য কেবলই আল্লাহ্। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা আঁইয়ুহাত্বা বিকুম' অর্থ 'তোমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ো।' কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— তবে হাঁ, তোমরা যদি একান্ত অসহায় হয়ে না যাও। অর্থাৎ 'যদি না ভেঙে পড়ে তোমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।' এখানে ইল্লা (যদি) শব্দটি পার্থক্য নির্দেশক। তাই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে তোমরা তার নিরাপত্তার ব্যাপারে থাকবে সদাসতর্ক। কিন্তু যদি তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়ো, অথবা পরাস্ত হও, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

কথিত আছে, তারা শপথ করেছিলো আল্লাহ্ ও শেষ নবী মোহাম্মদ স. এর নামে। তাই হজরত ইয়াকুব বিনইয়ামিনকে তাদের সঙ্গে মিসর গমনের ব্যাপারে আর আপত্তি তুলতে পারেননি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করলো তখন সে বললো, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক।' কা'ব বলেছেন, হজরত ইয়াকুব যখন একথা বললেন, তখন আল্লাহ্‌পাক স্বীয় পরাক্রমের শপথ করে বলেছিলেন, হে আমার নবী! 'তুমি আমাকে বিধায়ক' (ওয়াকিল) বলে যখন সম্পূর্ণ আমারই উপর নির্ভরশীল হলে, তখন আমি অবশ্যই এর উত্তম প্রতিফল প্রদান করবো। ইউসুফ ও বিনইয়ামিন— দু'জনকেই তুমি এবার পাবে।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোরো না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোরো।' একথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব ভাবলেন, একই দরজা দিয়ে এক সঙ্গে তাঁর সুদর্শন সন্তানবর্গ রাজদরবারে প্রবেশ করলে তাদের উপরে পড়তে পারে অসৎ লোকের অশুভ দৃষ্টি। তাই তিনি বললেন, হে আমার আত্মজবৃন্দ! তোমরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কোরো পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে। এক দরজা দিয়ে নয়। উল্লেখ্য যে, কুদৃষ্টি বা অশুভ দৃষ্টির বিষয়টি সত্য। হাদিস শরীফে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আমি সুরা নুনের তাফসীরে অশুভ দৃষ্টি বা বদনজর সম্পর্কিত হাদিসগুলোর সমাবেশ ঘটাবো।

প্রথম যাত্রার সময় হজরত ইয়াকুব কিন্তু তাঁর পুত্রদেরকে এরকম উপদেশ দেননি। তখন হয়তো ভেবেছিলেন মিসরবাসীরা এদেরকে তো চেনেই না। কিন্তু সেখানে রাজকীয় আতিথ্য লাভের পর এখন হয় তো তাদেরকে অনেকেই চেনে। তাছাড়া এবার বিনইয়ামিন রয়েছে তাদের সঙ্গে। সে তো অন্যদের চেয়ে সুন্দর। তাই তাদের সৌন্দর্য দর্শনে এবং সম্রাটের বিশিষ্ট অতিথি হওয়ার কারণে কোনো হিংসুক ব্যক্তির অশুভ দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবার প্রচুর। তাই তিনি পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রগণকে পৃথক পৃথকভাবে যাত্রা শুরু করতে বলেছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না।' এ কথার অর্থ, তিনি বললেন, এতো হচ্ছে কেবল সতর্কতা অবলম্বন মাত্র। এ হচ্ছে জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা অদৃষ্টে রয়েছে তা ঘটবেই। অদৃষ্টের বিধান খণ্ডন করার ক্ষমতা আমার নেই। জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বললেন, সাবধানতা কখনও তকদিরের সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করতে পারে না। হাকেম। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে আহমদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায্যারও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা অপরের উপর নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুক।'

এর পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিলো সেভাবেই প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনো কাজে আসলো না।' এ কথার অর্থ— পিতার উপদেশানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করলো হজরত

ইউসুফের ভ্রাতাগণ। তবু তারা বিপদ এড়াতে পারলো না। কীভাবে তারা বিপদগ্রস্ত হলো, সেই বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। এক বর্ণনায় এসেছে, রাজদরবারে প্রবেশের দরজা ছিলো চারটি। তারা পূর্বাহ্নে বিভক্ত হয়ে প্রবেশ করেছিলো ওই চার দরজা দিয়ে। এখানে 'মিনাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র বিধান বা সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিলো বিনইয়ামিনকে বন্দী করা হবে। হয়েছিলোও তাই। কিন্তু আল্লাহ্পাকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের কৌশল (ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা) কোনো কাজে এলো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইয়াকুব যা সিদ্ধান্ত করেছিলো তা ছিলো তার নিজের ইচ্ছা এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিলো, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম।' এখানে 'ইল্লা হাজাতান' অর্থ শুধুই প্রত্যাশা বা বাসনা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলার নেপথ্যে হজরত ইয়াকুবের কেবল এই ইচ্ছাটি কার্যকর ছিলো যে, তারা যেনো অশুভ দৃষ্টিতে নিপতিত না হয়। সুগভীর পুত্রবাৎসল্যের কারণেই তিনি এমতো ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সাথে সাথে একথাও বলেছিলেন যে 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না' তাঁর এমতো বিশ্বাস ও আচরণ জ্ঞানসম্মত। আর এই জ্ঞান আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছিলেন। আলোচ্য বাক্যের মর্ম এটাই।

এখানে 'আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম' অর্থ 'এই জ্ঞান আমি তাকে দিয়েছিলাম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে।' এখানে 'মা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ্প্রদত্ত বুদ্ধির দিকে। 'মা আল্লামনা' কথাটির 'মা' অব্যয়টি যদি এখানে সংযোজক অব্যয় হয় তবে এর মর্ম হবে— পূর্ববর্তী আয়াতের 'আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না' কথাটি। আর 'মা' অব্যয়টি যদি এখানে ধাতুগত হয়, তবে 'মা আল্লামনা' কথাটির অর্থ হবে 'শিক্ষা দিয়েছিলাম।'

'জু ই'লমিন্ অর্থ জ্ঞান কার্যকর করা। অর্থাৎ 'আমি যে জ্ঞান দান করেছিলাম, ইয়াকুব তা কার্যকর করেছে।' সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে আলেম তার জ্ঞান কার্যকর করে না সে আলেমই নয়। কেউ কেউ বলেছেন 'জু ই'লমিন' অর্থ তত্ত্বাবধানকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।' এ কথার অর্থ, অধিকাংশ মানুষ নবী ইয়াকুবের এই বিশেষ প্রজ্ঞার কথা অবগত নয়। অথবা অবহিত নয় নিয়তির গূঢ় রহস্য সম্পর্কে। কিংবা অধিকাংশ মানুষ তকদিরের এই সূক্ষ্ম বিধান সম্পর্কে অবগত নয় যে, নিয়তির লিখন কোনো কৌশলেই খণ্ডন করা যায় না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি কী রহস্য উন্মোচন করেন, অধিকাংশ মানুষ তার খবর রাখে না।

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❑ উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, 'আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং উহারা যাহা করিত তাহার জন্য দুঃখ করিও না।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সম্রাট সকাশে উপস্থিত হলো তারা। বললো, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমাদের ছোট ভাইটিকে। এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন। সম্রাট বললেন, সাধু! সাধু! আমি অবশ্যই পূর্ণ করবো আমার প্রতিশ্রুতি। সম্রাট সকলের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। তারা হলো সম্রাটের বিশেষ মেহমান। আহারের সময় পরিচারক এসে জানালো, ভোজনালয়ে চলুন। মহামান্য সম্রাট আপনাদেরকে নিয়ে আহার করবেন। ভোজনালয়ে গেলে বলা হলো, আপনারা সকলে মুখোমুখি জোড়ায় জোড়ায় উপবেশন করবেন। সেভাবেই বসলো সকলে। এভাবে পাঁচ জোড়া পূর্ণ হওয়ার পর বিনইয়ামিন পড়ে গেলো একা। সম্রাট এগিয়ে এসে বললেন, বিনইয়ামিনের তো কোনো আহার-সঙ্গী জুটলো না। ঠিক আছে আমিই হলাম তার সঙ্গী।

সকলের সামনে সাজানো রয়েছে রাজকীয় আহার্য সম্ভার। আল্লাহ্র নামে শুরু হলো পানাহার পর্ব। দশ ভাই যতো ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়। তাদের অদৃষ্টে আজ একি অভূতপূর্ব আপ্যায়ন। আর বিনইয়ামিনের সৌভাগ্যের তো তুলনাই হয় না। স্বয়ং মিসরাধিরাজ আজ তার ভোজনসঙ্গী।

দিবাবসান হলো। পূর্বের নিয়মে নিশীথের পানাহার পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তারা দেখলো, প্রতি দুজনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে একটি করে শয়নকক্ষ। এবারেও দেখা গেলো সকলে জোড়ায় জোড়ায় শয়নকক্ষে প্রবেশের পর বিনইয়ামিন হয়ে পড়েছে একা। সম্রাট বললেন, সেতো এবারেও হয়ে পড়লো নিঃসঙ্গ। ঠিক আছে, আমিই রাত্রিযাপন করবো তার প্রকোষ্ঠে।

পরদিন সম্রাট ঘোষণা দিলেন বিনইয়ামিন নিঃসঙ্গ। সুতরাং এখন থেকে সদরে অন্দরে সব সময় সে আমার সঙ্গে থাকবে। বিনইয়ামিনকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন থেকে আমি তোমার ভাই। সময় বয়ে চলে। সম্রাট কিছুতেই বিনইয়ামিনকে কাছ ছাড়া করেন না। একদিন তিনি একান্তে বললেন, তোমার নাম কি? সে বললো, বিনইয়ামিন। সম্রাট বললেন, অর্থ কি? বিনইয়ামিন বললো পরলোক-গমনকারিণীর সন্তান। আমার জন্মের সময়ে আমার জন্মদাত্রী মাতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলেই আমাকে এ নামে ডাকা হয়। সম্রাট বললেন, শুনেছি তোমার অগ্রজকে শৈশবে বাঘে খেয়ে ফেলছে— মনে করো আমিই তোমার সেই

ভাই, একথা বললে কি তুমি খুশী হবে? বিনইয়ামিন বললো, সম্রাটকে ভ্রাতারূপে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে। কিন্তু আপনি তো আর নবী ইয়াকুব ও তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী রাহীলের সন্তান নন। বিনইয়ামিনের একথা শুনে কেঁদে ফেললেন মহামান্য সম্রাট। বিনইয়ামিনকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অনেকক্ষণ ধরে অশ্রুপাত করলেন অঝোর ধারায়। নিজের পরিচয় উন্মোচন করলেন। বললেন, আদরের ভাইটি আমার। আমিই তো তোমার আসল ভাই। আমি ইউসুফ। তোমার ও আমার পিতা এক। মাতাও এক। সৎভাইয়েরা আমাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলো। এক সওদাগরের দল আমাকে উদ্ধার করেছিলো। আল্লাহ্ই আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এভাবে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমাকে এখানে এনেছেন। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত, অপবাদ, কারাবাস ইত্যাদির পর আমাকে বানিয়েছেন মিসরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভাই! আমার কাহিনী তো শুনলে। দুঃখ কোরো না। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি মেহেরবান। তিনিই আজ দ্যাখো মিলিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। সৎভাইদের নির্মম আচরণের কথা ভেবে দুঃখিত হয়ো না।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ○ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ○ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ○ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

❒ অতঃপর সে যখন উহাদিগের রসদের ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে রাজার পান-পাত্র রাখিয়া দিল। তখন এক আহ্বায়ক চীৎকার করিয়া বলিল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।'

❒ উহারা তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমরা কী হারাইয়াছ?

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারাইয়াছি; যে উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন।'

❒ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করিতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

❒ তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করিয়াছে তাহার শাস্তি কী?

❒ উহারা বলিল, 'যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে দাসত্ব হইবে তাহার শাস্তি। এইভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। তাদের উটগুলো খাদ্যশস্যের বোঝা দ্বারা সজ্জিত করা হলো। সম্রাটের নির্দেশে তখন এক লোক বিনইয়ামিনের নামে প্রস্তুত মালপত্রের ভিতরে সঙ্গোপনে রেখে দিলো সম্রাটের বিশেষ পানপাত্রটি। মালপত্রের বাঁধা ছাদা ঠিক ঠাক করে তারা রওনা হলো সিরিয়া অভিমুখে। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখতে পেলো দৌড়ে আসছে এক রাজকর্মচারী। সে চিৎকার করে ঘোষণা করছে, হে যাত্রীদল, থামো। তোমরা নিশ্চয় অপহারক।

'সিকায়াহ্' ও 'যুকায়াহ্'— শব্দ দু'টোর অর্থ 'পানপাত্র।' এখানে ব্যবহৃত 'সিকায়াহ্' শব্দটির অর্থ হবে সম্রাটের বিশেষ পানপাত্র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই পানপাত্রটি ছিলো জবরজদ প্রস্তরনির্মিত। ইবনে ইসহাক বলেছেন রৌপ্যনির্মিত। কেউ কেউ বলেছেন, পাত্রটি ছিলো স্বর্ণের। ইকরামা বলেছেন রূপার। তবে তা ছিলো মহামূল্যবান রত্নখচিত। অতিথিদের আভিজাত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্রাট নিজেই তাঁর ওই বিশেষ পানপাত্রটি দিয়ে খাদ্যশস্য মেপে দিতে বলেছিলেন। সুদ্দী বলেছেন, সম্রাটের নির্দেশে অত্যন্ত গোপনে ওই পানপাত্রটি রেখে দেয়া হয়েছিলো তাদের মালপত্রের মধ্যে।

কা'ব বলেছেন, সম্রাট যখন বিনইয়ামিনের নিকটে আত্মপরিচয় উন্মোচন করলেন তখন বিনইয়ামিন বলে উঠলো, ভাই আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। হজরত ইউসুফ বললেন, না তা হয় না। এমনিতে আমাদের মহান পিতা দীর্ঘদিন ধরে শোকাচ্ছন্ন। এমতাবস্থায় তুমিও যদি তাঁর কাছছাড়া হও, তবে এতো বিচ্ছেদ যাতনা তিনি সইবেন কীভাবে? তাছাড়া তোমাকে আটকাতেও তো আমি পারবো না। ভাইয়েরা তোমাকে পিতার সমীপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিতৃআজ্ঞাও এটাই। এখন তোমাকে আটকাতে গেলে সর্বসমক্ষে তোমাকে অপরাধী সাজাতে হবে। যদি তুমি এতে রাজী হও। তবে সেরকম একটা গোপন পরিকল্পনা করা যায়। বিনইয়ামিন বললো, যা ইচ্ছা করুন। এতোদিন পর আমি আপনাকে পেয়েছি। তাই আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তখন হজরত ইউসুফ বললেন, তোমার রসদসম্ভারের মধ্যে আমার পানপাত্রটি গোপনে রেখে দেয়া হবে। পরে সকলের সামনে সেটি বের করে তোমাকে বানানো হবে চোর।

এখানে 'মুয়াজ্জিন' অর্থ ঘোষক বা আহ্বায়ক। অর্থাৎ ওই রাজকর্মচারী যে ঘোষণা করেছিলো 'তোমরা নিশ্চয় চোর।' আর এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর বা তখন) শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, যাত্রীদল কিছুপথ অতিক্রম করার পর তাদেরকে থামতে বলা হয়েছিলো। অর্থাৎ এক মঞ্জিল পথ পেরিয়ে যাওয়ার পর অথবা লোকালয় অতিক্রম করে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হওয়ার পর তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিলো 'তোমরা নিশ্চয় চোর।'

'আল ই'রু' বলে পণ্যবাহী উটকে। রূপক অর্থে উটের আরোহীকে। যেমন রসুল স. বলেছিলেন 'ইয়া খইলাললহী ইরকাব্' (হে আল্লাহ্‌র অশ্ব, আরোহণ করো)। কথাটির প্রকৃত অর্থ— হে আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী, অগ্রসর হও। আল্লাহ্‌র অশ্ব বলে রূপকভাবে এখানে অশ্বারোহীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, ওই দলটি ছিলো গর্দভারোহী। ফার্‌রা বলেছেন উষ্ট্রারোহী।

প্রশ্নঃ হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা চোর ছিলেন না। তবুও এখানে তাঁদেরকে চোর বলা হলো কেনো?

জবাবঃ 'তোমরা নিশ্চয় চোর' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন ওই ঘোষকটি। হজরত ইউসুফ তাকে এরকম কথা শিখিয়ে দেননি। আর একদিক থেকে বিনইয়ামিন ছাড়া অন্য সকল ভ্রাতা তো প্রকৃতই চোর ছিলো। তারা হজরত ইউসুফকে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করেছিলো অন্ধকূপে। পরে তাকে বিক্রিও করেছিলো। আমার মতে এই উক্তিটিই যথার্থ। অর্থাৎ তাদেরকে চোর বলার নির্দেশটি এসেছিলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্নের অবতারণা করা যায় না। তাই এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'তিনি যা করেন তার বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না, বরং তারা যা করে তার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।' প্রকৃত কথা হচ্ছে, এসকল ঘটনা ছিলো প্রিয় নবী হজরত ইয়াকুবের জন্য আল্লাহ্‌র এক বিশেষ পরীক্ষা।

পরের আয়াতের (৭১) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষকের কথা শুনে যাত্রীদল থামলো। বললো, এভাবে চিৎকার করছো কেনো? কি হারিয়েছে তোমাদের? এখানে 'ফাকদুন' শব্দটির অর্থ অপহৃত বস্তু, যার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

এর পরের আয়াতের (৭২) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষক ও তার সাথীরা বললো, আমরা সম্রাটের পানপাত্রটি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদেরকে সেটি খুঁজে আনতে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যে পানপাত্রটির সন্ধান দিতে পারবে পুরস্কার হিসেবে সে পাবে মালপত্র বোঝাই করা একটি উট। আমরা একথার জামীনদার অর্থাৎ আমাদেরকেই দেয়া হয়েছে সন্ধানকারীকে পুরস্কার দেয়ার দায়িত্ব। আমাদের ধারণা পানপাত্রটি রয়েছে তোমাদের মালপত্রের মধ্যে। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা উচিত।

এর পরের আয়াতের (৭৩) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, শপথ আল্লাহ্র! তোমরা তো জানো, আমরা কোনো দুষ্কর্ম করবার জন্য এদেশে আসিনি। আর আমরা চোরও নই। এ নিয়ে আমরা দু'বার এখানে এলাম। বেশ কিছুকাল অবস্থানও করলাম। গতবারে আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। সেই পণ্যমূল্য এবার আমরা ফেরতও দিয়ে গেলাম। এসকল ঘটনা তোমরা জানো। একথাটিও অনেকে জানে যে, আমাদের বাহনগুলো যাতে কারো ক্ষেতের ফসল ভক্ষণ না করে, সে জন্য আমরা সেগুলোর মুখ বেঁধে এখানে যাওয়া আসা করি। আমরা যে বিশ্বস্ত, এ সকল কিছু হচ্ছে তার প্রমাণ। সুতরাং আমরা চোর হতে পারি কীভাবে?

এর পরের আয়াতের (৭৪) মর্মার্থ হচ্ছে— ঘোষক ও তার সঙ্গীরা বললো, তোমরা যথার্থই বলেছো। কিন্তু তোমাদের চৌর্যকর্ম যদি প্রমাণিত হয়, তবে তোমরাই বলো, তার শাস্তি কি হতে পারে?

শেষোক্ত আয়াতের (৭৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, ঠিক আছে তাহলে তোমরা আমাদের মালপত্রগুলো খুলে খুলে দেখো। যদি কারো মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যায় তবে দাসত্বই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। আমরা ইয়াকুব নবীর উম্মত। তাঁর শরিয়তের বিধানের কথাই আমরা তোমাদেরকে বললাম। বিধানটি হচ্ছে— কেউ চোর প্রমাণিত হলে তাকে সমর্পণ করা হবে অপহৃত বস্তুর মালিকের নিকট। মালিক তখন তাকে তার ক্রীতদাস বানিয়ে নিবে। একথা শুনে অনুসন্ধানকারী দলটি বললো, ঠিক আছে। এবার তবে আমাদের সঙ্গে রাজদরবারে চলো। সেখানে রাজার উপস্থিতিতে তোমাদের মালপত্রগুলো তল্লাশী করা হবে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৬

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ
كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ
يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

❒ অতঃপর ইউসুফ তাহার সহোদরের মাল-পত্র তল্লাশির পূর্বে উহাদিগের মাল-পত্র তল্লাশি করিতে লাগিল; পরে তাহার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এইভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম। রাজার আইনে তাহার সহোদরকে সে দাস করিতে পারিত না আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতপর ইউসুফ তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগলো।' একথার অর্থ— সম্রাট ইউসুফ তাদের মালপত্র তল্লাশীর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশানুসারে বিনইয়ামিনের মালপত্র ছাড়া অন্যদের মালপত্র একে একে অনুসন্ধান করে দেখা হলো। কিন্তু পাত্রটির কোনো হদিস মিললো না। বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত— একথা যাতে অন্য ভাইয়েরা বুঝতে না পারে, তাই তাদের মালপত্রই খুঁজে দেখা হলো আগে। কাতাদা বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, পাত্রটি অনুসন্ধানের সময় যার মালপত্র খোলা হতো, তিনিই তখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতেন 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী)। দশ ভাইয়ের মালপত্র খুঁজে দেখার পরেও পাত্রটি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো অনুসন্ধানকারীরা। বিনইয়ামিনের মালপত্র তল্লাশী করার কোনো আগ্রহ আর তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলো না। দশ ভাই বললো, বিনইয়ামিনের মালপত্রগুলো তল্লাশী না করা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা-ও অগ্রসর হবো না। অতএব আপনারা তল্লাশী সমাপ্ত করুন। আমরা সন্দেহ-সংশয় থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আপনারাও পুরোপুরি আশ্বস্ত হোন।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের করলো।' একথার অর্থ— এবার তল্লাশী শুরু হলো বিনইয়ামিনের মালপত্র-গুলোর মধ্যে। শেষে একটি বস্তার মধ্যে পাওয়া গেলো পানপাত্রটি। লজ্জায় মস্তক অবনত করলো দশভাই। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বিনইয়ামিনকে লক্ষ্য করে বললো, হে রাহীলের পুত্র! এরকম অপকর্ম তুমি করলে কিরূপে? আমরা কোন মুখে আর সততার বড়াই করবো। তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্যই আমাদেরকে বার বার বিপদগ্রস্ত হতে হয়। বিনইয়ামিন বললো, হে ভ্রাতৃবর্গ! রাহীলের সন্তানদ্বয়কে এভাবে অপবাদ দিয়ো না। তাদের জন্য তোমরা বিপদগ্রস্ত হও, না তোমাদের কারণেই তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকে? তোমরা কি আমার অগ্রজকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুম করে দাওনি? এখন তোমরা যাই বলো না কেনো, আমি এই ঘটনায় বিস্মিত নই। আমার মনে হয়, আমার মাল-পত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখেছে সে-ই যে ইতোপূর্বে তোমাদের মাল-পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলো পরিশোধিত পণ্যমূল্য। এরপর কেউ আর কথা বাড়ালো না। বিনইয়ামিনকে শৃঙ্খলিত করে ক্রীতদাসরূপে নিয়ে যাওয়া হলো সেখান থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম।' একথার অর্থ— বিনইয়ামিনকে কাছে রাখার জন্য আমার নবী ইউসুফ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সে কৌশল তাকে আমিই শিক্ষা দিয়েছি। একথায় প্রতীয়মান হয় যে 'তোমরা নিশ্চয় চোর' ঘোষককে একথাটি বলতে বলেছিলেন স্বয়ং হজরত ইউসুফ। উক্তিটি অতর্কিতে উচ্চারিত কোনো উক্তি নয়। আর হজরত

ইউসুফ এরকম বলেছিলেন প্রত্যাদেশানুসারে। প্রত্যাদেশই হচ্ছে সকল নবী রসুলগণের বক্তব্যের ভিত্তি। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'কাইদ' অর্থ প্রতিশোধ। অর্থাৎ এ হচ্ছে চল্লিশ বছর পূর্বের চক্রান্তের প্রতিশোধ। ওই চক্রান্ত সম্পর্কে হজরত ইয়াকুব বালক ইউসুফকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে' (আয়াত ৫)। বাগবী আরো লিখেছেন, কাইদ শব্দটি সৃষ্টজগতের কারো সাথে সম্পর্কিত হলে তার অর্থ হবে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তার অর্থ হবে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের জবাব বা প্রতিশোধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'রাজার আইনে তার সহোদরকে সে দাস করতে পারতো না আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে।' লক্ষণীয় যে, মিসর রাজ্যের আইন ছিলো চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে দৈহিক শাস্তি দিতে হবে এবং তার নিকট থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করতে হবে চুরি যাওয়া সম্পদের দ্বিগুণ। আর হজরত ইয়াকুবের শরিয়তের আইন ছিলো, চোর ক্রীতদাস হবে চুরিকৃত সম্পদের মালিকের। মিসরের আইন অনুসারে হজরত ইউসুফ কিছুতেই তার ভাইকে আটকাতে পারতেন না। তাই তিনি হজরত ইয়াকুবের শরিয়তের আইনে তাকে আটক করেছিলেন। এভাবে আটক করার কৌশলটি আল্লাহ্‌পাকই তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস এখানে উল্লেখিত 'দ্বীন' শব্দটির অর্থ করেছেন প্রজ্ঞা। আর কাতাদা অর্থ করেছেন— বিধান বা আইন।

'আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে'— কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌পাক অনুমোদন না করলে। এখানে 'হরফে ইসতিসনা' (ব্যতিক্রমী বর্ণটি) বিচ্ছিন্ন। ব্যতিক্রমী ও সংযোগ বিবর্জিত। যেমন হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের দেশে চুরির শাস্তি কি? তারা বলেছিলো, চোরকে বানাতে হবে ক্রীতদাস। এভাবে হজরত ইউসুফ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং তা কার্যকরও করেছিলেন। ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হয়েছিলো সফল।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন।'

জ্ঞানে সকল বিজ্ঞজন অপেক্ষা আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। এখানে 'আ'লীম' অর্থ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সৃষ্ট জগতের কেউ এরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। তাই দেখা যায় একেক জন একেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের ঘটনাটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রসুল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ এক প্রকারের জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁকে হজরত খিজিরের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন শরিয়তের শাহানশাহ্ আর হজরত খিজির ছিলেন ইলমে লাদুন্নীর সম্রাট। সৃষ্টি-রহস্যের একটি বিশেষ দিক ছিলো তাঁর জন্য উন্মুক্ত। ওই জ্ঞান হজরত মুসার ছিলো না। তাই হজরত খিজির তাঁকে বলেছিলেন, হে নবীপ্রবর! আল্লাহ্ যে রহস্যময় প্রজ্ঞা আমাকে দান করেছেন, আপনি সে সম্পর্কে অনবগত। আর যে জ্ঞানে তিনি আপনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমিও সে বিষয়ে

অনবহিত। হজরত মুসা ও হজরত খিজিরের কাহিনী থেকে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন বোখারী। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, তোমরা জাগতিক বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখো। এভাবে একেক জন একেক বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান কারো নেই। এরকম পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে কেবল মহান আল্লাহ্‌র। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, চরমোৎকর্ষ জ্ঞান সৃষ্টিজগতের কারো নেই। চরম, পরম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাজ্ঞানী কেবল আল্লাহ্‌। এখানে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— আমি যাকে উন্নততর মর্যাদা দান করি, যেমন দান করেছি ইউসুফকে। বিনইয়ামিন ও ইউসুফের মিলনের জন্য যে কৌশলের অবতারণা আমি করেছি তা আমারই অপার প্রজ্ঞাবলে এখন পরিগ্রহ করলো বাস্তব রূপ। মহাজ্ঞানী আমি। তাই এরকম নিখুঁত পরিকল্পনা করা কেবল আমার পক্ষেই সম্ভব।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৭, ৭৮, ৭৯

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

❐ উহারা বলিল; 'সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদিগের নিকট প্রকাশ করিল না; সে মনে মনে বলিল, 'তোমাদিগের অবস্থা তো হীনতার এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।'

❐ উহারা বলিল, 'হে আযীয, ইহার পিতা আছেন, যিনি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদিগের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদিগের একজন।'

❐ সে বলিল, 'যাহার নিকট আমরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহের শরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিলো।' এ কথার অর্থ— দশ ভাই বললো, হ্যাঁ, বিনইয়ামিন চুরি করতেও পারে। এরকম অভ্যাস তার বড় ভাই ইউসুফেরও ছিলো। সুতরাং ব্যাপারটি আমাদের নিকটে বিস্ময়কর কিছু নয়। ঘটনাটি ছিলো এরকম— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইউসুফের এক নানা ছিলো প্রতিমাপূজক। তিনি তাঁর নানার সেই প্রতিমাটি চুরি করে ভেঙে চুরে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁর নানা যেনো আর প্রতিমা পূজা না করতে পারে। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে মুজাহিদ বলেছেন, একদিন এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো। তখন হজরত ইউসুফ গৃহ থেকে গোপনে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলেন তাকে। দশ ভাই ইঙ্গিত করেছিলো ওই ঘটনাটির প্রতি।

মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, জননীর মৃত্যুর পর শিশু ইউসুফের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ফুফু। তিনি ছিলেন হজরত ইসহাকের পুত্রী। হজরত ইয়াকুব ছিলেন তাঁর ছোট ভাই। একটু বড় হতেই হজরত ইউসুফকে ফেরত চাইলেন তাঁর পিতা। কিন্তু তাঁর ফুফু তাঁকে ফেরত দিতে সম্মত হলেন না। এদিকে হজরত ইয়াকুবও নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাঁর ফুফু রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, তবে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও। মনে হয় এর মধ্যে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারবো। আর এরমধ্যে আল্লাহ্ও হয়তো আমাকে ধৈর্য ধারণের সামর্থ্য দান করবেন। বড় বোনের দাবি এবার মেনে নিলেন হজরত ইয়াকুব। হজরত ইসহাকের ছিলো একটি মূল্যবান মেখলা। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে হজরত ইউসুফের ফুফুই পেয়েছিলেন ওই কটিভূষণটি। ওই কটিভূষণটি তিনি গোপনে বেঁধে দিলেন হজরত ইউসুফের কোমরে। তারপর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, হায়! আমার মহান পিতার মেখলাটি কোথায় গেলো। কে চুরি করলো আমার পিতার কোমরবন্ধ। সবাই খুঁজতে শুরু করলো। শেষে কোমরবন্ধটি দেখা গেলো হজরত ইউসুফের কোমরে। তাঁর ফুফু তখন তাঁর ছোট ভাই ইয়াকুবকে ডেকে বললেন, দেখো তোমার পুত্রের কাণ্ড। আমার পিতার মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নটি সে চুরি করেছে। সুতরাং শরিয়তের আইন অনুসারে সে এখন আমার ক্রীতদাস। তুমি আর তাকে দাবি করতে পারো না। হজরত ইয়াকুব বললেন, না তাতো পারিই না। সেই থেকে ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত হজরত ইউসুফকে তাঁর ফুফুর কাছেই থাকতে হয়েছিলো। এই ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই দশভাই বলেছিলো, 'তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিলো।'

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের নিকট প্রকাশ করলো না। সে মনে মনে বললো, তোমাদের

অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— ভাইদের কথা শুনে হজরত ইউসুফ বিচলিত হলেন না। তাদের প্রদত্ত অপবাদ খণ্ডনের চেষ্টাও করলেন না। মনের কথা মনেই রেখে দিলেন। মনে মনে কেবল বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছো। কিন্তু তোমরা তো চোরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমরা ছিলে ষড়যন্ত্রকারী ও হন্তারক। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন, অপরাধী কে? আমি, না তোমরা?

বিনইয়ামিনকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন সম্রাট ইউসুফ। নিরুপায় দশ ভাই অসহায় দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল। ক্ষোভে, দুঃখে তারা হয়ে পড়লো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরপর রাগে ফুঁসতে লাগলো তারা। হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের স্বভাব ছিলো, একবার তারা রেগে গেলে তাদেরকে সামলানো হয়ে পড়তো খুবই কষ্টকর। রুবেলের রাগ ছিলো সবচেয়ে বেশী। রাগ হলে বিকট চিৎকার দিয়ে বসতো সে। সেই ভয়ঙ্কর চিৎকারে গর্ভপাত ঘটে যেতো গর্ভিণী নারীর। আরেকটি বিশেষত্ব ছিলো ইয়াকুব তনয়দের। ওই সময় কেউ তাদেরকে স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাগ হয়ে যেতো পানি। কেউ কেউ বলেছেন, এই বিশেষত্বটি ছিলো শামউনের।

বিনইয়ামিনকে ছাড়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাই করতে পারছিলো না দশ ভাই। পরদিন ক্রোধান্ধ অবস্থায় তারা পুনরায় উপস্থিত হলো রাজ দরবারে। রুবেল বললো, মহামান্য সম্রাট, বিনইয়ামিনকে ফিরিয়ে দিন। না হলে আমি এমন বিকট চিৎকার দিবো যে, শহরের সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। সম্রাটের পাশে ছিলো তাঁর এক শিশু সন্তান। তিনি তাকে বললেন, যাও, ওই লোকটিকে ছুয়ে এসোতো বাবা। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সম্রাট তাঁর শিশু পুত্রকে বললেন, লোকটির হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো তো বাবু। শিশুটি এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে রুবেলের ক্রোধ অন্তর্হিত হলো। সে অবাক হয়ে বললো, নিশ্চয় এখানে হজরত ইয়াকুবের বংশধর কেউ রয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, পুনরায় রাগান্বিত হলো রুবেল। সম্রাট তখন অগ্রসর হয়ে তাকে ধাক্কা দিলেন। সেও হলো ধরাশায়ী। বললেন, হে সিরিয়াবাসী! তোমরা কি মনে করো তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই? দশ ভাই সম্রাটের এমতো আচরণ দেখে পরাভব মানলো। নিজেরা সলাপরামর্শ করে ঠিক করলো, না। এভাবে আমরা আমাদের কার্য সফল করতে পারবো না। সম্রাটের নিকটে দাবি উত্থাপন করতে হবে বিনয়ের সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আজিজ! এর পিতা আছেন, যিনি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং এর বদলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিবর্গের একজন।' একথার অর্থ— পিতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে সম্রাটের কাছে তারা তাদের শেষ নিবেদনটি জানালো এভাবে, মহামহিম সম্রাট! আমাদের মহান পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। বিনইয়ামিনকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসেন। তাকে না পেলে তিনি শোকে দুঃখে শয্যা গ্রহণ করবেন। হে মিসরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! আমাদের প্রতি

সদয় হোন। বিনইয়ামিনের পরিবর্তে আমাদের যে কোনো একজনকে রেখে দিন। আপনি তো আমাদের প্রতি অনেক মহানুভবতা দেখিয়েছেন। এখন আমাদের এই শেষ আবেদনটি আপনার মহানুভবতার মাধ্যমে গ্রহণ করুন।

এর পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ থেকে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হবো।' এ কথার অর্থ— সম্রাট বললেন, না। তা হয় না। আমরা আমাদের মাল পেয়েছি বিনইয়ামিনের রসদসম্ভারের মধ্যে। তাই বিনইয়ামিনকেই রেখে দিতে হবে। এর জন্য অন্য কাউকে আটকে রাখলে তা হবে জুলুম। এরকম জুলুম আমরা করি না। লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ এখানে বিনইয়ামিনকে চোর বলেননি। বলেছেন 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি।' বস্তুত সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিলো বিনইয়ামিনকে আটকে রাখার একটি কৌশল। হজরত ইউসুফ এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে। এর বিপরীত কিছু করলে তা হতো আল্লাহ্‌র পরিতোষের প্রতিকূল। তাই হজরত ইউসুফ এখানে বলেছেন, 'তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার জুলুম থেকে আমরা আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করছি।'

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

❒ যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল, 'তোমরা কি জান না যে তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইতে আল্লাহের নামে অংগীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

❒ তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বলিও, 'হে আমাদিগের পিতা! তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিতাম না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যখন তারা তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হলো তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলো সে বললো, তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।' একথার অর্থ— বিনইয়ামিনকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা বিফল হলো। নৈরাশ্য জর্জরিত অন্তরে একটি জনমানবহীন স্থানে পরামর্শ সভায় বসলো দশ ভাই। যে ভাই সকলের বড় সে বললো, তোমরা এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, পিতা তোমাদের নিকট থেকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এখানে 'নাজিয়া' শব্দটি এক বচন হলেও বহুবচনার্থক। এর অর্থ একে অপরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বয়োজ্যেষ্ঠ' বলে যে ভাই বয়সে সকলের বড় তাকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে জ্ঞানে ও গুণে যে বড়, তাকে। আর তাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রবীণ ছিলো ইয়াহুদ। কালাবীও এ কথা বলেছেন। কিন্তু কাতাদা, সুদ্দী ও জুহাক বলেছেন, এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে বয়সে যে সকলের বড় তাকে বুঝানো হয়েছে। আর সে ছিলো রুবেল। এই রুবেলই হজরত ইউসুফকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইটির নাম ছিলো শামাউন। সে-ই ছিলো অভিযাত্রী দলের নেতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে' (ওয়ামিন্ ক্বব্লু মা ফার্রাত্বতুম ফী ইউসুফ)। এখানকার 'মা' অব্যয়টি অতিরিক্ত, ধাতুমূল অথবা সংযোজক। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'মা' উপক্রমণিকামূলক উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে মিন্ক্বব্লু বাক্যাংশটির বিধেয় হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এবং 'ক্বব্লু' শব্দটিও সম্বন্ধবাচকরূপে ব্যবহৃত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।' একথার অর্থ— জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরো বললো, আমি পণ করলাম, কিছুতেই আমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবো না। প্রত্যাবর্তন করবো তখন যখন পিতা আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে বলবেন। অথবা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিবেন। অথবা বিনইয়ামিনকে নিষ্কৃতি দানে সম্রাটকে বাধ্য করবেন বা আমাকে এখানে মৃত্যুদান করবেন।

'আল্লাহ্ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— অথবা আল্লাহ্ নবী ইয়াকুবের মাধ্যমে আমাকে মিসরবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' একথার অর্থ— প্রকৃত বিচারকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। মিসরাধিরাজের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। এই অন্যায়ের বিচার তিনি নিশ্চয় করবেন।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বোলো, হে আমাদের পিতা! তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম।' একথার অর্থ— দশ ভাইয়ের মধ্যে একজন বললো, হে মহান পিতার সন্তানেরা! পিতার নিকটেই তোমরা ফিরে যাও এবং যা জানো তাই বলো। যা সত্য তাইতো তোমরা বলবে। সুতরাং একথা পিতাকে জানাতে দ্বিধান্বিত হয়ো না যে, বিনইয়ামিনের চৌর্যকর্ম প্রমাণের দৃশ্য আমরা চাক্ষুষ করেছি। আমরা যা দেখেছি, তাই আপনাকে বললাম। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ বললাম— কথাটির অর্থ হবে আমরা বানিয়ে কিছু বলিনি। যা দেখেছি তাই বলেছি। বিন-ইয়ামিনকে আমরা চুরি করতে দেখিনি। কিন্তু তদন্তকালে সম্রাটের পানপাত্র বের হতে দেখেছি তারই মাল-পত্র থেকে।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, পুত্রদের এরকম কথা শুনে হজরত ইয়াকুব বলেছিলেন, চুরি করলে চোরকে যে দাসত্ববরণ করতে হবে একথা তো মিসরাধিপতির জানার কথা নয়। নিশ্চয় তোমরাই এ বিধানটি সম্পর্কে তাঁকে বলেছো। তাঁর পুত্রগণ তখন বলেছিলেন, হ্যাঁ। আমরাই একথা বলেছি।

শেষে বলা হয়েছে— 'অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না।' হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— আমরা তো বিনইয়ামিনকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারিনি। তাঁর মাল-পত্র বাঁধাছাদার সময়ও সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে মনে হয় কে বা কারা অত্যন্ত গোপনে সম্রাটের পানপাত্রটি তার মালপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছিলো। এটা আমাদের অনুমান। কেননা অদৃশ্য বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— যখন আমরা বিনইয়ামিনের রক্ষণাবেক্ষণ করবো বলে আপনার নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন কি আমরা একথা ঘুনাক্ষরেও জানতাম যে বিনইয়ামিন শেষ পর্যন্ত চুরি করবে। আর তার ফলে আপনাকে পুনরায় ভোগ করতে হবে বিচ্ছেদ-যাতনা, যেমন ভোগ করতে হয়েছিলো ইউসুফের ব্যাপারে। যে সকল বিষয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েই সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছিলাম।

وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

❐ 'যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।'

❐ ইয়াকূব বলিল, 'না, তোমরা এক মন-গড়া কথা লইয়া আসিয়াছ; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ উহাদিগকে এক সংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রত্যাবর্তন করলো স্বগৃহে। পিতাকে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা জানিয়ে শেষে বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা যা বললাম সত্য বললাম। আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলে আপনি ওই জনপদের অধিবাসীদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। ওই যাত্রীদলকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, যারা এখান থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিসর গিয়েছিলো এবং যারা আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরে এসেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জনপদ' বলে ওই জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যে স্থানে সম্রাটের ঘোষক তাদেরকে আটক করেছিলো। অর্থাৎ যেখান থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো রাজদরবারে। আর এখানে যাত্রীদল অর্থ সিরিয়ার ওই খাদ্য সংগ্রহকারী যাত্রীদল, যারা মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলো হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণের সঙ্গে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, দশ ভাইয়ের মধ্যে ওই ভাইটি মিসরে রয়ে গিয়েছিলো, যে ইউসুফকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে ছিলো অনুতপ্ত। অনুতাপ-জর্জরিত হওয়ার কারণেই সে বিনইয়ামিনের ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারছিলো না। ইউসুফের জন্য পিতার যে কি কষ্ট, তা তাকে দেখতে হয়েছে চল্লিশ বছর ধরে। এবার তার সঙ্গে যোগ হবে বিনইয়ামিন-বিচ্ছেদের ঘটনা। তাই দ্বিগুণ যাতনাক্লিষ্ট পিতার মুখ দর্শন ছিলো তার জন্য অসহনীয়। মিসরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিলো এ কারণেই। তার আরো আশঙ্কা ছিলো, পিতা হয়তো

ভাববেন, ইউসুফের ঘটনার মতো বিনইয়ামিনের ক্ষেত্রেও সেরকম কোনো ঘটনা ঘটিয়েছি আমরা। তাই সে ভাইদের বলে দিয়েছিলো, তোমরা যা দেখেছো তাই বলবে, অনুমান করে কিছু বলবে না। শেষে একথাও বলবে যে, আমরা যা বললাম, সত্য বললাম।

একটি জটিলতাঃ বাগবী লিখেছেন, পুত্র বিরহে জর্জরিত পিতার সঙ্গে হজরত ইউসুফ দেখা করতে যাননি। তিনি এখন কোথায় কি ভাবে রয়েছেন, সে সংবাদও জানাননি। তার উপরে বিনইয়ামিনকেও তিনি আটকে রেখে দিলেন। পিতৃহৃদয়ে সৃষ্টি করলেন সীমাহীন শূন্যতা। এটা কি হজরত ইউসুফের নির্মমতা ও স্বজন-বন্ধনছিন্নতার প্রমাণ নয়?

জটিলতার জবাবঃ বিষয়টি বাহ্যতঃ সমালোচনাযোগ্য বটে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্য নবী। সুতরাং তিনি যে কিছুতেই প্রবৃত্তিতাড়িত নন, সেকথা বলাই বাহুল্য। নবীগণ যা আদিষ্ট হন তাই করেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় ছিলো, তিনি হজরত ইয়াকুবের মর্যাদা আরো উন্নত করবেন। তাই এটা ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র এক মহা পরীক্ষা। পরীক্ষার মাধ্যমেই তো উন্নততর মর্যাদা লাভ হয়। তাঁর পিতামহ হজরত ইব্রাহিমও সম্মুখীন হয়েছিলেন মহা পরীক্ষার। স্বপ্নে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তোমার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে স্বহস্তে জবাই করতে হবে। এই মহা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হয়েছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু (খলিল)। এরও আগে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো প্রিয়তমা ভার্যা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাইলকে দূর দেশে বিজন প্রান্তরে নির্বাসন দিতে হবে। এই মহা পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হজরত ইয়াকুবের প্রতি আপতিত পরীক্ষা অপেক্ষা ওই সকল পরীক্ষা অধিকতর জটিল ও কঠিন ছিলো না কি? আসলে প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে তার প্রেমিকের উপর এরকম জটিল ও কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ইউসুফ তো জানতেন যে, তাঁর ভাইয়েরা চক্রান্তপ্রবণ। তারা নতুন কোনো চক্রান্ত শুরু করতে পারে, এ কথা ভেবেই তিনি তাঁর আত্মপরিচয় গোপন করেছিলেন। আর অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের আকর্ষণে মহান পিতা হয়তো মিসরে আগমন করবেন। তখন সরাসরি সংঘটিত হবে পিতা ও হারানো পুত্রদ্বয়ের মিলন। একথা ভেবেই তিনি কৌশলে বিনইয়ামিনকেও আটক করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত অভিমতটিই সমধিক যুক্তিসংগত ও বিশুদ্ধ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'ইয়াকুব বললো, না, তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছো; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে একসঙ্গে আমার নিকটে এনে দিবেন।' একথার অর্থ— বিরহাহত হজরত ইয়াকুব পুত্রদের কথা শুনে বললেন, না। তোমরা ঠিক বলোনি।

তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো অসৎ। তাই চোরকে ক্রীতদাস বানানোর বিধান তোমরা মিসররাজকে জানিয়ে দিয়েছিলে। তোমাদের এই দুরভিসন্ধি কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই তোমরা বিনইয়ামিনকে মিসরে নিয়ে গিয়েছিলে। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যা করেছো, তাতো করেছোই। আমি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করবো না। ধৈর্য সর্বোত্তম। তাই পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই হবে আমার পক্ষে শ্রেয়। হয়তো একদিন আল্লাহ্ আমার প্রতি দয়া করবেন। সেদিন হয়তো আমি এক সঙ্গে ফিরে পাবো তাদেরকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়। আমার উপর আপতিত এই মহা পরীক্ষা নিশ্চয় ওই মহাজ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার একটি বিশেষ নিদর্শন।

উল্লেখ্য যে, বিনইয়ামিনের বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনে উথ্‌লে উঠেছিলো তাঁর শোকের সমুদ্র। শোকসাগরের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তিনি। আর এই প্রতীতিও তাঁর জন্মেছিলো যে, বিনইয়ামিনের এই দুরাবস্থার নেপথ্যে তার সৎ ভাইদের দুরভিসন্ধি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৪

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

❑ সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল 'আফসোস ইউসুফের জন্য।' শোকে সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, আফসোস ইউসুফের জন্য।' এখানে 'আসাফ্' শব্দটির অর্থ আফসোস বা আক্ষেপ। দুঃখ-যাতনার শেষ সীমা বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মওকুফ পদ্ধতিতে আবদুর রাজ্জাক এবং ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, উম্মতে মোহাম্মদী ছাড়া অন্য কোনো নবী বা তাঁদের উম্মতকে বিপদাপদের সময় ইন্নালিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন— দোয়াটি পাঠ করার রীতি শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাই হজরত ইয়াকুবও তাঁর বিপদকালে দোয়াটি পাঠ করেননি। তিনি কেবল তাঁর ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। ইমাম বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, বর্ণনাটি শিথিল সূত্রে মারফু পদ্ধতিতে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও উল্লেখিত হয়েছে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মারফু পদ্ধতিতে সা'লাবীও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'শোকে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং সে ছিলো অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট।' একথার অর্থ— প্রিয়তম পুত্র ইউসুফের বিরহে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব। চোখের কৃষ্ণ-বর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলো। আর তিনি ছিলেন অসহ ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত। মুকাতিল বলেছেন, তিনি দৃষ্টিহীন অবস্থায় ছিলেন ছয় বছর। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হয়ে পড়েছিলো অত্যন্ত দুর্বল। এখানে বলা হয়েছে, তাঁর চোখ হয়ে গিয়েছিলো শাদা। আর শাদা হওয়া মানে একেবারে অন্ধ হওয়া নয়।

নিঃশ্বাস নির্গমনের পথকে বলে 'কাজম'। আর 'কাজুম' বলে নিঃশ্বাস রহিত হওয়াকে। রূপক অর্থে মৌনতাকে। 'কাজীম' অর্থ শ্বাসরহিত। এভাবে আয়াতের শেষ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইয়াকুব অসহনীয় মনোস্তাপে অহর্নিশি দগ্ধিভূত হতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বিলাপ করতেন না। যেমন বলা হয় 'কাজামাল বায়ীরু' (উট তার রোমন্থন বন্ধ করেছে, উদরের খাদ্য উদরেই আটকে রেখেছে)। অনুরূপ 'কাজামাস্ সিকাউ' (পানি ভর্তি করার পর পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে)। মোট কথা হজরত ইয়াকুব তাঁর নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে দগ্ধিভূত হতেন। সেই অন্তর্গত দুঃখ যাতনায় ছিলো না কোনো অভিযোগ অথবা বিলাপ।

কাতাদা বলেছেন, হজরত ইয়াকুবের হৃদয় ছিলো বেদনাকাতর। কিন্তু তাঁর মুখে ছিলো উপদেশের অমিয় বাণী। হাসান বলেছেন, প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে হারানোর পর পিতা-পুত্রের মিলন ঘটেছিলো প্রায় আশি বছর পর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনো একটি মুহূর্তও তাঁর চোখ অশ্রুহীন ছিলো না। অথচ তিনি ছিলেন ওই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্প্রেমিক ও বিশুদ্ধচিত্ত সাধক। আরও তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়ভাজন।

একটি বিপত্তিঃ আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দ বলেন, কলবের ফানা হওয়ার পর আধ্যাত্মিক সাধকগণ আল্লাহ্র সঙ্গে স্থায়ী আত্মিক সম্পর্ক লাভ করেন। তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা থাকে না। হজরত ইয়াকুব ছিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত এক নবী। তাহলে—

১. পুত্রের বিরহে তিনি এতো মনোকষ্ট পেয়েছিলেন কেনো? পুত্র-বিচ্ছেদে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধই বা হয়ে গিয়েছিলেন কেনো?

২. এর জবাবে যদি বলা হয়, এই মহাবিশ্ব তো সেই এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ্র নাম গুণাবলীর বিকাশস্থল। মহাসত্যের দর্পণ। সুতরাং এ কথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, প্রকারান্তরে ইউসুফপ্রেম ছিলো সেই মহামহিম আল্লাহ্ প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে ইউসুফ ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টির প্রতি তাঁর এমতো আকর্ষণ জন্মেনি কেনো?

৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি আকর্ষণ কচিৎ কখনো সাময়িকভাবে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধকগণের আচরণে পরিলক্ষিত হতেও পারে। কিন্তু হজরত ইয়াকুব তো ছিলেন আধ্যাত্মিকতার সর্বোন্নত স্তরে উন্নীত। অথচ তিনি হজরত ইউসুফের শোকে সাময়িকভাবে কখনো কখনো বেদনাহত হননি। তাঁর ব্যথা-বেদনা ও মনোস্তাপ ছিলো সার্বক্ষণিক। এরকম হওয়াই বা কী করে সম্ভব?

বিপত্তির অপনোদনঃ আত্মিক বিনাশনের পর পার্থিবতার সঙ্গে আন্তরিক আকর্ষণ আর থাকে না। অন্তরে তখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আখেরাতের আকর্ষণ। আর আখেরাতের আকর্ষণও আল্লাহ্র আকর্ষণ। পৃথিবীর কোনো প্রভাব সেখানে নেই। রসুল স. এরশাদ করেছেন, পৃথিবী অভিশপ্ত। অভিশপ্ত পৃথিবীর বস্তুনিচয়ও, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞানীরা নয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং তিবরানী বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে মাজা থেকে বায্যারও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

আল্লাহ্পাক চিরস্থায়ী। আখেরাতও চিরস্থায়ী। তাই আখেরাত আল্লাহ্পাকের প্রিয়। তিনি এরশাদ করেছেন— 'ওয়াজকুর ইবাদানা ইব্রহীমা ওয়া ইসহাকা ও ইয়াকুবা উলিল আইদি ওয়াল আবসার।' একথার অর্থ— আমার বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ করো, যারা ছিলো বলশালী ও বিচক্ষণ। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র আনুগত্যে সুদৃঢ় ও তাঁর পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ। আরো এরশাদ করেছেন— ইন্না আখলাসনাহুম বিখলিসাতিন জিকরাদ্দার (আমি তাদেরকে দান করেছি এক বিশেষ স্বভাব, যাতে নেই কোনো আবিলতা এবং যা পারলৌকিক আবাসের স্মরণে বিভোর)। মালেক ইবনে দীনার আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তাদের হৃদয় থেকে অপসারিত করেছি পৃথিবীপ্রীতি ও উদ্দেশ্যের অসাধুতা। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছি পরকালপ্রেম ও পরকালের স্মরণ। তাই তাদের চিন্তায় ও আচরণে অগ্রাধিকার পায় আখেরাত। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী প্রবাস মাত্র। প্রকৃত আবাস হচ্ছে আখেরাত। সুতরাং একথা সুপ্রমাণিত যে, আখেরাতই আল্লাহ্র প্রিয়। আখেরাতের সকল কিছুই প্রশংসার্হ।

রসুল স. বলেছেন, এক রাতে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, এক মহামান্য গোত্রপ্রধান নির্মাণ করলেন এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। অভ্যন্তরভাগে বিছিয়ে দিলেন সুপ্রশস্ত দস্তরখানা। মানুষকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য জনসমাজে প্রেরণ করলেন এক আহ্বানকারীকে। কেউ কেউ তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। যথাসময়ে সুদৃশ্য ভবনটিতে এসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার করলো। প্রাসাদস্বামীও তুষ্ট হলেন। আর যারা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো, তারা বঞ্চিত হলো। প্রাসাদকর্তাও তাদের প্রতি হলেন রুষ্ট। রবীয়াতুল জারাশী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন দারেমী। এখানে মহামান্য গোত্রপ্রধান হচ্ছেন আল্লাহ্। আহ্বানকারী হচ্ছেন রসুল স.। প্রাসাদ হচ্ছে ইসলাম। আর দস্তরখানা হচ্ছে জান্নাত।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, হজরত ইয়াকুব ছিলেন অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী। ওই অনন্যসাধারণ মর্যাদার পরিচয় লাভ করা সাধারণ সাধকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে রাবেয়া বসরীর মতো তাপসীও সাধারণ সাধকদের মতো। তিনি এই সুউচ্চ মারেফতের ক্ষেত্রে অপূর্ণ ও অপরিণত ছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন, আমি জান্নাতকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবো, যাতে জান্নাতের লোভে নয়, মানুষ উপাসনা করে কেবল আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে। তিনি ও তাঁর মতো অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীরা আসলে আখেরাতের মর্যাদাই বুঝতে সক্ষম হননি। আল্লাহ্‌পাক এক আয়াতে জানিয়েছেন— 'মান কানা ইয়ারজু লিক্বাআল্লহি ফাইন্না আজালাল্লহি লাআত (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলনাকাঙ্খী, তার মিলনলগ্ন আগমন করবে আখেরাতে)। বলা বাহুল্য যে, জান্নাতই হবে ওই মহামিলনের স্থান।

রসুল স. আরো বলেছেন, জান্নাতের মৃত্তিকা পুতঃপবিত্র, সুবাসিত। সলিল সুমিষ্ট। সেখানে রয়েছে সুবিশাল প্রান্তর। আর ওই প্রান্তরে রয়েছে অসংখ্য বৃক্ষ। ওই বৃক্ষগুলো হচ্ছে মূলতঃ 'সুবহানাল্লহ্‌', 'আলহামদুলিল্লাহ্‌', ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবর'। তিরমিজি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে। বোখারী ও মুসলিমে লিখিত হাকেম ও তিবরানীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো 'তোমাদের আপ্ত বাক্যগুলোকে বৃক্ষরূপে রোপন করা হবে সেখানে।'

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, 'তানজিহি কালিমাত্' বা আপ্ত বাক্যগুলো হচ্ছে 'সুবহানাল্লহ্‌' আলহামদুলিল্লাহ্‌ ইত্যাদি। এ সকল উচ্চারণ হচ্ছে পার্থিব ভূষণ। আখেরাতে এগুলোর প্রকাশ ঘটবে জান্নাতের তরুলতা ও ফলমূল হিসেবে। পৃথিবীতেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে হয়। তাই বাহ্যতঃ এগুলোর আকর্ষণকে পার্থিব বলা যায়। কিন্তু আখেরাতেই যেহেতু এগুলোর প্রকৃত ও পরিণত বিকাশ তাই এগুলোর আকর্ষণ মূলতঃ আখেরাতেরই আকর্ষণ।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ও গুণাবলী অগণিত। ওই সকল নাম ও গুণাবলীর যে কোনো একটি হচ্ছে একজন মানুষের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন)। ওই নাম ও গুণই তার প্রতিপালক বা রব। আখেরাতে ওই মাবদায়ে তা'য়ুন বা প্রতিপালনকারী নাম ও গুণাবলী বিকশিত হবে বেহেশতের বৃক্ষসম্ভার, নয়নাভিরাম প্রাসাদ, স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী ও হুরগেলেমান-রূপে। আর তা হবে মানুষের অপার আনন্দের কারণ। আল্লাহ্‌পাকের নাম গুণাবলী পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোনো কোনো গুণ সমষ্টিভূত, আবার কোনো কোনো গুণ বিস্তৃত। কোনো কোনোটি তাঁর সত্তার (জাতের) সন্নিকটে। কোনো কোনোটি আবার দূরে। এমতো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে মাবদায়ে তা'য়ুন অনুসারে বেহেশতবাসীদের বেহেশতও হবে বহুধাবিচিত্র। উন্নত ও অধিকতর উন্নত জান্নাতগুলোর স্তর বিন্যাস ঘটেছে এ কারণেই। বেহেশতের কোনো কোনো বৃক্ষ হবে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। ওই অতীব সুন্দর বৃক্ষরাজিই হবে চির

আনুরূপ্যবিহীন আল্লাহ্‌র দর্শনের উপলক্ষ। ওই বৃক্ষগুলোতে প্রতিফলিত জ্যোতি একবার প্রকাশিত হবে। আর একবার থাকবে সংগুপ্ত। এভাবে পালাক্রমে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে দীদার ও দীদার বিরতি।

একটি সংশয়ঃ ইহকাল ও পরকালের সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব হচ্ছে সম্ভাব্য অস্তিত্ব (মুমকিনুল অজুদ)। এরা সকলেই অনস্তিত্বনির্ভর, অসম্পূর্ণ। অপকর্ষই হলো এগুলোর ভিত্তি। সত্তাগতভাবেই সমগ্র সৃষ্টি সৌন্দর্যবঞ্চিত। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে পরিদৃশ্যমান সৌন্দর্য, পুণ্য ও পূর্ণত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র দয়া ও দান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তাই হয়, তবে পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে কেনো? কেনো নিন্দনীয় হবে পৃথিবীপ্রীতি? আর কেনোই বা প্রশংসনীয় হবে আখেরাতের প্রেম।

সংশয়ের অপনোদনঃ এর জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ্‌পাকের নাম ও গুণাবলীর দৃশ্যমান প্রতিবিম্বই হচ্ছে এই সম্ভাব্য জগত। আবার পরম সত্তার (জাতে বাহাতের) চিরন্তন অস্তিত্বের তুলনায় তাঁর গুণাবলীও এক ধরনের সম্ভাব্য। কারণ তাঁর গুণাবলী তাঁরই সত্তার মুখাপেক্ষী। মুখাপেক্ষিতা হচ্ছে সম্ভাব্য জগতের ধর্ম।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌পাকের সত্তা যেহেতু চিরবিদ্যমান, তাই তাঁর গুণাবলীও চিরবিদ্যমান হেতু তাঁর সত্তার মতো গুণাবলীও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল ওজুদ) সম্পৃক্ত। কারণ সিফাতবিহীন জাত (গুণাবলী বিবর্জিত সত্তা) হওয়া অসম্ভব। তাই তাঁর সত্তার চিরন্তনতার কারণে তার গুণাবলীও চিরন্তন। সুতরাং জাতের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সিফাত সম্ভাব্য নয়, অবশ্যম্ভাবী। সিফাতকে সম্ভাব্য বললে তা জাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু এরকম হওয়াও অসম্ভব। মারেফাতের সাধকবৃন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে যখন পরম সত্তার গুণাবলী সমূহের প্রতিভাস ঘটে, তখন পরিস্ফুট হয় গুণাবলীর গুণগুলোর দু'টি দিক। একদিক সম্ভাব্য আর একদিক অবশ্যম্ভাবী। একদিকে থাকে শূন্যতা এবং অপরদিকে থাকে পূর্ণতা। তাই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দৃশ্যমান দিকটি সম্ভাব্য এবং দৃষ্টির অতীত দিকটি অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কারণে অবশ্য আল্লাহ্‌র গুণাবলীর একটি দিককে সম্ভাব্য বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যম্ভাবী। একারণেই সৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট দিকটি নিন্দনীয়, অশুভ, অসম্পূর্ণ এবং সৌন্দর্য ও পুণ্য বঞ্চিত। আর আল্লাহ্‌পাকের সত্তাসম্পৃক্ত দিকটি কল্যাণ, পূর্ণত্ব ও অক্ষয় সৌন্দর্য দ্বারা বিভূষিত। এই দর্শন অবশ্য সৃষ্টির দিক থেকে ধারণাপ্রসূত একটি দর্শন। সাধকগণের আত্মিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশ ও জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দৃশ্যতঃ এভাবেই দ্বিধাবিভক্ত। পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের উপর আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনুমাননির্ভর সম্ভাব্য দিকটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। আর তাঁর অস্তিত্বের জ্যোতি বা তাজাল্লী প্রতিবিম্বিত হয় আখেরাতের বস্তুনিচয়ের প্রতি। তাই পৃথিবীর

সম্পদের প্রতি আকর্ষণ আল্লাহ্পাকের অপছন্দ। পক্ষান্তরে আখেরাতের বৈভব সমূহের প্রতি আকর্ষণ তাঁর পছন্দ। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, আখেরাতকে ভালোবাসার অর্থ আল্লাহ্কে ভালোবাসা। অর্থাৎ প্রকৃত আল্লাহ্-প্রেমিকেরাই আখেরাতপ্রেমিক হয়। একারণেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগত সৃষ্টির সীমানাভূত হওয়া সত্ত্বেও একটি জগতের প্রতি অনুরাগ অসিদ্ধ এবং আর একটি জগতের প্রতি অনুরাগ অপরিহার্য।

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপরে আলোকপাত করার পর হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি তাঁর মকতুবাত শরীফের ১০০ সংখ্যক মকতুবে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্য পৃথিবীতে বিকশিত হলেও তা অন্যান্য পার্থিব সৌন্দর্যের মতো ছিলো না। আসলে ওই সৌন্দর্য ছিলো আখেরাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতিপালনকারী হচ্ছে আল্লাহ্র গুণাবলীর সম্ভাব্য দিকটি। আর অবশ্যম্ভাবী দিকটি হচ্ছে বেহেশতী বস্তুনিচয়ের প্রতিপালনকারী। তাই কামেল ও মোকাম্মেল মনীষীবৃন্দের আন্তরিক অনুরাগ থাকে বেহেশতী বস্তুসমূহের প্রতি। হজরত ইয়াকুবের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিলো। অবিকল বেহেশতের সৌন্দর্যধারী হজরত ইউসুফের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা তাই নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং প্রশংসনীয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির এই সমাধানটি বিশুদ্ধ ও অনবদ্য। তবে এর বাস্তবতা মেনে নিতে গিয়ে সৃষ্টি হয় আরো দু'টো জটিলতার। সেই জটিলতা দু'টোর একটি হচ্ছে— ১. এক স্থানে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, নবী-রসুল ও ফেরেশতামণ্ডলী ছাড়া অন্য সকলের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন) হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্ব, অবিকল নাম ও গুণাবলী নয়, কিন্তু এখানে তিনি বলেছেন, সম্ভাব্য সকল কিছুর প্রতিপালক হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী। অর্থাৎ নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্ব নয়, অবিকল নাম-গুণাবলীই সকলের মাবদায়ে তা'য়ুন। এই বর্ণনাবৈষম্যের হেতু কি? আর এটাই বা কি করে সম্ভব যে, পার্থিব বস্তুনিচয় নাম-গুণাবলীর বিকাশস্থল, আর পারলৌকিক বস্তুনিচয়ে প্রতিফলিত হয় আল্লাহ্র নামসমূহের জ্যোতি বা তাজাল্লী? আবার এখানে নাম-গুণাবলীর সম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী দু'টো দিকের অবতারণা করা হলো। এভাবে সৃষ্টি করা হলো জটিলতা। এই জটিলতার সমাধান তাহলে কি ?

সমাধানঃ এটা ঠিক যে, নবী-রসুল ও ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির সূচনাস্থল হচ্ছে আল্লাহ্র নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। এমতাবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর নাম-গুণাবলীর প্রকাশস্থল বলা যাবেনা কেনো? প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছায়া তো মলিন প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই বিশাল সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার নাম-গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিচ্ছায়া। অর্থাৎ মূলের যে প্রতিবিম্ব সেই প্রতিবিম্বের

প্রতিচ্ছায়া। একটি সরাসরি প্রতিবিম্ব, আরেকটি হচ্ছে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। তাই নবী-রসুল ও ফেরেশতামণ্ডলীর উপরে আল্লাহ্‌র নাম-গুণাবলীর তাজাল্লী বর্ষিত হয় সরাসরি। আর অপরাপর সৃষ্টির প্রতি বর্ষিত হয় মাধ্যম সহকারে। অতএব আল্লাহ্‌পাকের সত্তা ও তাঁর নাম-গুণাবলীই চিরন্তন। কারণ তা প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

২. এতক্ষণের আলোচনায় প্রমাণিত হলো যে, নবী-রসুল ও ফেরেশতা-মণ্ডলীসহ সকল সৃষ্টির প্রতিপালনকারী বা মাবদায়ে তা'য়ুন হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলীর) প্রতিবিম্ব। অথবা প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব। কেবল হজরত ইউসুফ হচ্ছেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন সিফাতে ইলাহীর (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) এক দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শন, যে সিফাতের সরাসরি সম্পৃক্তি রয়েছে জাতের (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের) সঙ্গে। একারণেই তিনি হয়েছিলেন আখেরাতের সৃষ্টবস্তুনিচয়ের সমগোত্রীয়। এখন প্রশ্ন, যদি তাই হয়, তবে নবী শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উপরে তাঁর মর্যাদা অনিবার্য হয়ে পড়ে না কি?

সমাধানঃ সকল নবী-রসুল আখেরাতের সৌন্দর্য দ্বারা বিভূষিত। কিন্তু পৃথিবীতে সে সৌন্দর্য রয়েছে সংগুপ্ত অবস্থায়। এই সৌন্দর্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকাশ ঘটেছিলো কেবল হজরত ইউসুফের বেলায়। এই প্রকাশ হওয়া না হওয়ার উপরে মর্যাদার তারতম্য নির্ভর করে না। নির্ভর করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও প্রেমের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপরে— যা সংগুপ্ত থাকাই সমীচীন। হজরত ইউসুফের মতো অন্যান্য নবীর এই সংগুপ্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করা হয়নি কেনো, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌পাকই অধিক পরিজ্ঞাত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নবী-রসুলগণের মাবদায়ে তা'য়ুন সাধারণ মানুষের মাবদায়ে তা'য়ুন থেকে পৃথক। আল্লাহপাকের নাম-গুণাবলীর কথিত সম্ভাব্য দিক থেকে নয়, নবী-রসুলগণ প্রতিপালিত হন নাম-গুণাবলীর অবশ্যম্ভাবী দিকটির দ্বারা।

রসুল স. এর রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে মোজাদ্দেদে আলফেসানি লিখেছেন, মোহাম্মদ স. এর উৎপত্তিস্থল (মাবদায়ে তা'য়ুন) এবং প্রতিপালনকারী সিফাত হচ্ছে সিফাতে এলেম (জ্ঞান নামক গুণ)। এই গুণটি অন্য সকল গুণকে একত্র করেছে বা পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর অন্য সকল গুণ অপেক্ষা এলেম গুণ আল্লাহ্‌র জাতের (সত্তার) অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আলেম, এলেম এবং মা'লুম (জ্ঞানী, জ্ঞান এবং জ্ঞানায়ত্ব বিষয়) এক বা একাকার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুদরত (ক্ষমতা), ইরাদা (অভিপ্রায়), কালাম (কথা), সামা (শ্রুতি), বাসার (দৃষ্টি) ইত্যাদি গুণগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। সে কারণেই অন্যান্য গুণ অপেক্ষা এই

'এলেম' গুণ জাতের (আল্লাহ্‌র সত্তার) নিকটতম। আবার এলেম সিফাতের রূপ-লাবণ্য বা সৌন্দর্য সত্তাগত। অপরাপর সিফাতগুলো কিন্তু এরকম নয়। তাই এলেম সিফাত আল্লাহ্‌র প্রিয়তম। এলেম সিফাতের রূপ-লাবণ্য বর্ণনার অতীত। দৃষ্টিও তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য যেমন নয়নগোচর নয়, তেমনি তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ স. এর রূপ-সৌন্দর্যও পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান হয়নি। অবশ্য আখেরাতে তাঁর ওই অতুল রূপ পূর্ণরূপে বিকশিত হবে এবং তা দৃষ্টিগোচরও হবে।

ইহজগতকে যে রূপ-সৌন্দর্য দেয়া হয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছেন হজরত ইউসুফ— এ কথাটি সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আখেরাতে মোহাম্মদ স. ই হবেন সৌন্দর্যের সম্রাট। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আমার ভ্রাতা ইউসুফকে দেয়া হয়েছে সাবাহাত্ (চোখধাঁধানো রূপ)। আর আমাকে দেয়া হয়েছে মালাহাত (চোখ জুড়ানো লাবণ্য)। সূর্যকিরণের প্রখরতা এবং চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতার মধ্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্যুতিচ্ছটার মধ্যে পার্থক্য যেমন, তেমনই পার্থক্য রয়েছে সাবাহাত্ ও মালাহাতের মধ্যে। হজরত ইউসুফের রূপে মুগ্ধ ছিলেন হজরত ইয়াকুব, জুলায়খা ও মিসর নন্দিনীরা। আর মোহাম্মদ স. এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ স্বয়ং মহান প্রভুপালক আল্লাহ্। তবুও শেষ কথা হচ্ছে, মৃত্তিকা কি কখনো তার স্রষ্টার সহচর হতে পারে?

এতক্ষণের আলোচনায় প্রতীয়মান হলো যে, ফানা বা আত্মলীন হওয়ার পর পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি সুফী সাধকগণের কোনো আকর্ষণই থাকে না। তাদের হৃদয় তখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ্‌র স্মরণে ও প্রেমে। কিন্তু এরকম ভাবা ঠিক নয় যে, তাঁদের অন্তরে তখন নবী-প্রেমের সংকুলান হয় না। বস্তুতঃ নবীপ্রেমই আল্লাহ্প্রেম। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যদি না আমি তার নিকটে তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এমন কি সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হই। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আনাস থেকে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি উত্তম স্বভাবের যে কোনো একটি হস্তগত হলেই ইমানের স্বাদ অনুভব করা যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভাবা।

তাপসী রাবেয়া বলেছেন, আমার হৃদয় আল্লাহ্প্রেমে কানায় কানায় পরিপূর্ণ তাই রসুল প্রেমের সংকুলান সেখানে হয় না। তার এই কথাটি ছিলো

মত্ততাসম্ভূত। বিপরীত ধরনের মত্ততা মোজাদ্দেদে আলফেসানির ক্ষেত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নবীপ্রেমের আবেগে আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমণের একপর্যায়ে বলে ফেলেছিলেন, মোহাম্মদের স্রষ্টা বলেই আমি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শোক-কাতর ব্যক্তির জন্য রোদন ও শোক প্রকাশ সিদ্ধ। তবে শর্ত হচ্ছে ওই প্রকাশের মধ্যে আর্তনাদ ও বিলাপ থাকবে না। হাত-পা ছোঁড়া ছুঁড়িও চলবে না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর প্রিয় পুত্র একবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাই দেখে তিনি অশ্রুপাত শুরু করলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিও কি শোকাক্রান্ত হোন? তিনি স. বললেন, হে আউফ তনয়! অন্তর শোকাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত। চোখ রোরুদ্যমান। কী করবো! কিন্তু আমি মুখে এমন কিছু উচ্চারণ করিনি যাতে আমার মাহবুব (প্রেমাস্পদ) অতুষ্ট হোন। এরপর তিনি জ্ঞানহীন পুত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে ইব্রাহিম! আমি তোমার জন্য ব্যথিত, শোকার্ত।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর এক দৌহিত্রের অন্তিম সময় উপস্থিত হলো। তার গলদেশ থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স.। তিনি আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। দু'চোখ থেকে ঝরে পড়তে শুরু করলো তপ্ত অশ্রুর ধারা। সেখানে উপস্থিত হজরত সা'দ নিবেদন করলেন, হে প্রিয়তম রসুল! আপনি কাঁদছেন! তিনি স. বললেন, এ হচ্ছে প্রেমানুভূতি, যা আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করে দিয়েছেন মানুষের অন্তরে। আর আল্লাহ্‌ প্রেমিক ও দয়ার্দ্রচিত্তদেরকে ভালোবাসেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জীবিতদের অশ্রুবর্ষণ ও হৃদয়ের শোকাকুলতার কারণে আল্লাহ্‌ শাস্তি দেন না। বরং অনুগ্রহের দ্বারা নিষিক্ত করেন। অর্থাৎ মার্জনা করে দেন। একথা বলে তিনি তাঁর মুখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর মৃতের শোকাকুল গৃহবাসীদের কান্নার কারণে মৃতকে শাস্তি দেয়া হয়— হাদিসটির এমনও অর্থ করা যেতে পারে যে, মৃতের স্বজনেরা তার সৎকর্মগুলোর উল্লেখ করে কাঁদতে থাকলেও তার শাস্তি হতে থাকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত আর একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স . বলেছেন, মৃতের জন্য যারা মাতম করে, মাথা-বুক চাপড়ায় ও পরিধেয় বসন-ছিন্ন করে, আমি তাদের উপর অতুষ্ট।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

❒ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ। আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলিবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করিবেন।'

❒ সে বলিল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহের নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহের নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না।'

❒ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহের আশিস হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণ, আল্লাহের আশিস হইতে কেহই নিরাশ হয় না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় ব্যতীত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— শোকাকুল পিতাকে লক্ষ্য করে পুত্রগণ বললো, হে আমাদের পিতা! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো দেখছি জ্বরাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত ইউসুফের কথা ভুলতে পারবেন না।

এখানে 'হারাদ্বান' অর্থ মুমূর্ষু, জ্বরাগ্রস্ত বা মরনোন্মুখ। 'হারাদ্ব' শব্দটি ক্রিয়ামূল হিসেবে বহুবচনরূপে ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। কামুস প্রণেতা লিখেছেন, 'হারাদ্ব' অর্থ দুঃখ শোকে জর্জরিত মুমূর্ষু ব্যক্তি, যার ধর্মকর্ম ও বোধ-বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে। অথবা যার দেহ, ধর্মবোধ ও বিবেক হয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খল। কিংবা ওই ব্যক্তি যার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করছি।' একথার অর্থ, আমি আমার অসহ বেদনা, দুঃখ-যাতনা প্রকাশ করছি কেবল আল্লাহ্ সকাশে। অতএব হে আমার পুত্রগণ। আমাকে বাধা দিয়োনা। শোক প্রকাশ করতে দাও।

'বাছ' বলে অত্যধিক শোকাকুলতাকে। অর্থাৎ যে শোক চেপে রাখা অসম্ভব, সেই শোককে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— প্রকাশ করা। হাসান বসরী শব্দটির অর্থ করেছেন, অসহনীয় অবস্থা।

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইয়াকুবের এক প্রতিবেশী তাঁকে বললেন, ইয়াকুব! তোমার শরীর যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে। এভাবে তুমি তো নিঃশেষ হতে চলেছো। অথচ এখনো তুমি তোমার পিতার বয়সে পৌঁছাওনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইউসুফের বিচ্ছেদ অসহনীয়। ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে চলেছি আমি। আল্লাহ্ আমাকে মহা পরীক্ষায় ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে আমার নবী! তুমি মানুষের সম্মুখে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছো। হজরত ইয়াকুব বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপালক! ভুল হয়েছে। দয়া করে আমাকে মার্জনা করুন। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, মার্জনা করলাম। এরপর থেকে কেউ তাঁর দুরবস্থা দেখে আলাপচারিতা শুরু করলে তিনি বলতেন,'ইন্নামা আশকু বাছ্ছী ওয়া হুজনী ইলাল্লহ্'।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার দৃষ্টি শক্তি এমন নিষ্প্রভ হলো কেনো? কেনো হলো কটিদেশ এমন বঙ্কিম? তিনি বললেন, ইউসুফের জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখের এই অবস্থা। আর বিনইয়ামিনের বিচ্ছেদের কারণে কটিদেশের এই হাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ হলো, ইয়াকুব! তুমি আমার সৃষ্টির নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো? তুমি না আমার নবী। ঠিক আছে। আমিও আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি, যতক্ষণ তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করাকে যথেষ্ট মনে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার দুঃখ দূর করবো না। হজরত ইয়াকুব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করছি'। আল্লাহ্পাক পুনরায় বললেন, আমার সম্মানের শপথ! তোমার পুত্রদ্বয় মৃত্যুবরণ করলেও আমি তাদেরকে জীবিত করে তোমাকে অর্পণ করতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদকে আমি দীর্ঘায়িত করবো একটি কারণে। কারণটি এই— একবার তোমরা একটি ছাগল জবাই করেছিলে। জনৈক দরিদ্র তখন উপস্থিত হয়েছিলো তোমাদের কাছে। কিন্তু তোমরা ওই দরিদ্রকে কিছুই দাওনি। আরো শুনে রাখো, নবীগণই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তারপর প্রিয় মিসকিনেরা। এবার তুমি আহার্য প্রস্তুত করো। দাওয়াত করো মিসকিনদের। হজরত ইয়াকুব তাই করলেন। আহার্য প্রস্তুত করে মিসকিনদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা রোজাদার, আমার বাড়ীতে আজ তাদের দাওয়াত।

আরো বর্ণিত হয়েছে, এরপর থেকে দিবসের আহার গ্রহণের সময় তিনি আহ্বান জানাতেন এভাবে— যে নিরন্ন, সে যেনো ইয়াকুবের বাড়ীতে আসে। নৈশ আহারের সময় আবার বলতেন, যারা অন্নহীন তারা যেনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইয়াকুবের গৃহে। এভাবে প্রতিদিন তিনি দুইবেলা আহার গ্রহণ করতেন ক্ষুধার্ত মিসকিনদের সঙ্গে বসে।

ওয়াহাব বিন মুনাববাহ্ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী ইয়াকুবের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! বলতে পারো, কী কারণে তোমাকে আমি আশিবছর ধরে পুত্র শোকে কাতর করে রেখেছি? হজরত ইয়াকুব বললেন, ইয়া ইলাহী! আমি তা জানি না। আল্লাহ্পাক বললেন, তোমার গৃহে একবার প্রস্তুত হয়েছিলো উপাদেয় ব্যঞ্জন। কিন্তু তুমি ওই গোশত্ প্রতিবেশীকে আহার করাওনি। লংঘন করেছিলে প্রতিবেশীর অধিকার।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াকুবকে সুদীর্ঘ শোকের পাথার অতিক্রম করতে হয়েছিলো এ জন্যে যে, তিনি একবার একটি গো-শাবককে তার মাতার সামনেই জবাই করেছিলেন। গোমাতা ক্রমাগত আর্তনাদ করছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

ওয়াহাব, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, একবার কারাবন্দী ইউসুফের নিকটে হাজির হলেন হজরত জিব্রাইল। বললেন, হে সিদ্দিক। আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? হজরত ইউসুফ বললেন, আমি তো দেখছি একটি পবিত্র অবয়ব। আর অনুভব করছি অপার্থিব সুবাস। হজরত জিব্রাইল বললেন, আমি রুহুল আমিন। বিশ্বপ্রতিপালকের বাণীবাহক। হজরত ইউসুফ বললেন, তাহলে আপনিই আল্লাহ্র সেই সৌভাগ্যশালী নিকটজন, আল্লাহ্র একান্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু হে রুহুল আমিন! এ স্থান তো পাপীতাপীদের আবাস স্থল। এখানে আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? হজরত জিব্রাইল বললেন, আপনি কি জানেন না যে, নবীগণের অবস্থান স্থলকে আল্লাহ্পাক পবিত্র করে দেন? আর নবীগণের আবির্ভাব স্থল হয় পৃথিবীর অন্য সকল স্থানের চেয়ে অধিকতর সম্মানিত? হে পবিত্র নবী! হে নির্বাচিত পুণ্যাত্মাগণের সন্তান! আপনার অসিলায় এই কারাগার ও কারাগার সংলগ্ন চতুষ্পার্শ্ব মহিমান্বিত হয়েছে। হজরত ইউসুফ বললেন, আপনি আমাকে সিদ্দিক বলে সম্বোধন করলেন কেনো? আর আমাকে নির্বাচিত পুণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভুক্তই বা করলেন কেনো ? আমি তো এখন অপরাধীদের দলে। আমাকে করা হয়েছে দুর্বৃত্তদের দলভূত। হজরত জিব্রাইল বললেন, আল্লাহই সিদ্দিক বানিয়েছেন আপনাকে। আপনাকে নির্বাচিতও করেছেন তাঁর প্রিয় বান্দারূপে। আপনি পবিত্র রেখেছেন আপনার প্রবৃত্তিকে। প্রভুপত্নীর অসুন্দর প্রস্তাবকে করেছেন প্রত্যাখ্যান। হজরত ইউসুফ বললেন, হে রুহুল আমিন! আপনি কি আমার সম্মানিত পিতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত? হজরত জিব্রাইল বললেন,হ্যাঁ। আপনার বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি কাতর। শোকে দুঃখে মুহ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা। হজরত ইউসুফ বললেন, আপনি কি অনুমান করতে পারেন, তাঁর শোক কতো গভীর? হজরত জিব্রাইল বললেন, হ্যাঁ। তাঁর শোক সদ্য সন্তানহারা সত্তর জন সন্তানহারা রমণীর মতো। হজরত ইউসুফ বললেন, তাঁর সেই অসহনীয় বেদনার প্রতিফল কী? হজরত

জিব্‌রাইল বললেন, একশত শহীদের পুণ্য। হজরত ইউসুফ বললেন, তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কি না, সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন? হজরত জিব্‌রাইল বললেন, জানি। একদিন পিতা-পুত্রের মিলন অবশ্যই ঘটবে। হজরত ইউসুফ বললেন, তবে শত বিপদ মুসিবতেও আমি দুঃখিত নই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যা জানি, তা তোমরা জানো না। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী ও অপার দয়াপরবশ। অশ্রুবর্ষণকারীকে তিনি নিরাশ করেন না। প্রত্যাখ্যান করেন না সমর্পণকারীর নিবেদনকে। তিনি অসহায়ের সহায়। এ সকল কথা আমি অতি উত্তমরূপে অবগত। কিন্তু তোমরা এ সকল কথা অবগত নও। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইউসুফ জীবিত। দীর্ঘ দিন পর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও ঘটবে। এই গোপন সংবাদটি আমি জানি। কিন্তু তোমরা জানো না।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন হজরত আজরাইল। নবীপ্রবর বললেন, হে পুতঃপবিত্র মৃত্যুদূত! তুমি কি আমার প্রিয়তম পুত্র ইউসুফের প্রাণ হরণ করেছো? হজরত আজরাইল বললেন, না। হজরত ইয়াকুব একথা শুনে প্রীত হলেন। তখন থেকে তিনি পুত্রদর্শনের প্রতীক্ষায় সময়াতিপাত করে চললেন।

কোনো কোনো ভাষ্যকার আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এরকম— হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রগণকে বললেন, আরো শোনো। একথাটি আমি ভালো করেই জানি যে, ইউসুফের স্বপ্ন সফল হবে। একসময় আমি ও তোমরা সকলে তাকে সেজদা করবো। কিন্তু এ তথ্যটি তোমরা জানো না।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, প্রথমবার মিসর থেকে ফিরে হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ যখন মিসরপতির মহানুভবতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করেছিলো, তখনই হজরত ইয়াকুব বুঝতে পেরেছিলেন, ইউসুফ জীবিত। আর এক সময় তার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটবেই। একথা তিনি বলেও বসেছিলেন যে, মনে হয় মিসরপতিই ইউসুফ।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, নসর বিন আরাবী বলেছেন, প্রিয় পুত্রকে হারাবার পর তেইশ বছর পর্যন্ত হজরত ইয়াকুব একথা জানতেন না যে, ইউসুফ জীবিত না মৃত। এরপর একদিন মানবরূপে হজরত ইয়াকুবের সামনে আবির্ভূত হলেন হজরত আজরাইল। তিনি বললেন, আপনি কে? হজরত আজরাইল বললেন, মৃত্যুদূত। তিনি বললেন, হে মৃত্যুদূত ! আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে আমি জানতে চাই, আপনি কি ইউসুফের জীবন হরণ করেছেন? হজরত আজরাইল বললেন, না।

এর পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহ্‌র আশিস থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ আল্লাহ্‌র আশিস থেকে কেউই নিরাশ হয় না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ব্যতীত।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে

'তাহাস্‌সাসু' (অনুসন্ধান করো) শব্দটির আভিধানিক অর্থ জিজ্ঞাসাবাদসহ অনুসন্ধান করো। 'রউহুন' অর্থ রহমত বা দয়া। কেউ কেউ বলেছেন, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি। অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রশান্তি। আর 'আলকাফিরূন' অর্থ আল্লাহ্‌পাকের সত্তা ও গুণবত্তা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বা অজ্ঞ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাককে যারা বিশ্বাস করে ও তাঁর পরিচয় যারা জানে তারা কখনো নিরাশ হয় না। নিরাশ হয় কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ○ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

❒ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদিগের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য লইয়া আসিয়াছি; আপনি আমাদিগকে রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?'

❒ উহারা বলিল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' সে বলিল, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ; আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সেই সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পিতার নির্দেশে বিনইয়ামিনকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ও হজরত ইউসুফের অনুসন্ধানে ইয়াকুব তনয়গণ পুনরায় মিসরে গমন করলো। সাক্ষাত করলো মিসরপতির সঙ্গে। বললো, হে মহামান্য সম্রাট! আমরা ও আমাদের পরিবারের লোকজন অন্ন-সংকটে পতিত। তাই আমরা পুনরায় খাদ্য শস্য সংগ্রহ করতে এলাম। কিন্তু উপযুক্ত পণ্যমূল্য আমরা আনতে পারিনি। তবুও

আমাদের নিবেদন, আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় রসদপত্র দান করুন। এর অতিরিক্ত অনুদানও আমরা চাই। আপনি হয়তো জানেন, আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

এখানে 'আদ্ব দুর্‌রু' অর্থ ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'মুয্‌জাতিন' অর্থ অচল মুদ্রা। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। তাঁর এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আবু উবাইদ, ইবনে আবু শায়বা, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— স্বল্পসংখ্যক দিরহাম।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ বিন হারেস বলেছেন, 'বিদ্বআ'তিম্ মুয্‌জাতিন' অর্থ মরুচারীদের সম্পদ। অর্থাৎ পশম ও ঘি। কোনো কোনো বর্ণনায় ঘিয়ের স্থলে উল্লেখিত হয়েছে পনির। আবু সালেহের উদ্ধৃতি সহযোগে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, কথাটির অর্থ সবুজ শস্য ও সন্নুর কাঠের জ্বালানী। ইবনে নাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা তখন পণ্যমূল্য হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলো মাকালের ছাতু। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কাঁচা চামড়া ও জুতা। 'মুয্‌জাতিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— তাড়িয়ে দেয়া। যেমন, আল্লাহ্-পাক এরশাদ করেন— আন্নাল্লহা ইয়ুয্‌জি সাহাবা (আল্লাহ্ মেঘমালা পরিচালনা করেন)। অচল মুদ্রা কেউ গ্রহণ করতে চায় না। দূরে নিক্ষেপ করে। তাই অচল মুদ্রাকে বলা হয় 'মুয্‌জাতিন'। তেমনি অধিক পণ্যের জন্য স্বল্প মুদ্রা দিলেও তা কেউ গ্রহণ করতে চায় না। তবে দয়া করে কেউ যদি তা গ্রহণ করে, তবে তা ভিন্ন কথা।

'ফাআওফি লানা' অর্থ আমাদেরকে রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন, যেমন ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে। অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় দান করলে যে ঘাটতিটুকু আপনার হবে সেটুকু আপনি দিবেন অনুদান হিসেবে। অধিকাংশ ভাষ্যকার 'তাস্বাদ্‌দাক্ব আ'লাইনা' কথাটির অর্থ এরকমই করেছেন। কিন্তু ইবনে জুরাইজ ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'দান করুন' কথাটির মর্ম হবে আপনি আমাদের যে ভাইটিকে আটকে রেখেছেন সেই ভাইটিকে ফেরত দিন।

এখানে 'জাযা' অর্থ ইহ-পরকালের প্রতিদান। 'জাযা' এবং 'তাস্বাদ্‌দাক্ব'— দু'টো শব্দেরই অর্থ হবে করুণাপরবশ হওয়া। রসুল স. প্রবাসকালীন নামাজ সম্পর্কে বলেছেন, কসরের নামাজ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদকা (করুণা বা

মেহেরবানি) কাজেই তোমরা আল্লাহ্র সদকা গ্রহণ করো। বোখারী। তবে শরিয়তের পরিভাষায় সদকা হচ্ছে ওই করুণা, যার মধ্যে রয়েছে সওয়াবের প্রত্যাশা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

হাসান বসরী বলেছেন, আমি একদিন এক লোককে দোয়া করতে শুনলাম এভাবে— হে আমার আল্লাহ্! আমার প্রতি সদকা। আমি বললাম সদকার নেপথ্যে থাকে পুণ্যার্জনের বাসনা। তুমি বরং এভাবে দোয়া করো— হে আল্লাহ! আমার প্রতি মেহেরবানি করো, আমাকে দান করো। উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী যে সদকা চাইতে নিষেধ করেছেন, তা হচ্ছে, শরিয়ত নির্দেশিত সদকা— যা পুণ্যের আশায় করা হয়।

জুহাক বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা মিসরপতিকে একথা বলেনি যে, আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। তারা বলেছিলো, আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। এরকম বলার কারণ হচ্ছে— তারা তখন পর্যন্ত জানতো না যে সম্রাট ইমানদার কি না। আর তিনি যে দান করবেনই সে সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত ছিলো না।

একটি সমীক্ষাঃ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, রসুল স. এর জন্য সদকা গ্রহণ হারাম ছিলো। অন্যান্য নবীগণের বেলায়ও এরকম ছিলো কি? তিনি বললেন, না। তুমি কি শোনোনি এই আয়াত— 'ওয়া তাসাদ্দাক্ব আ'লাইনা ইন্নাল্লহা ইয়াজ্যিল মুতাস্বদ্দিক্বীন' (এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন)। ইবনে জারীর। আমি বলি, এই আয়াতের মাধ্যমে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা প্রমাণ করেছেন যে, অন্যান্য নবীগণের জন্য সদকা গ্রহণ সিদ্ধ ছিলো। কিন্তু এই প্রমাণ তখনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে যে হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন। কারণ উদ্ধৃত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলো তারাই। হজরত ইয়াকুব তো সেখানে ছিলেনই না।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?' এ কথার অর্থ— সম্রাট ইউসুফ বললেন, হে নবী ইয়াকুবের সন্তানগণ! তোমাদের কি মনে পড়ে তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলে? তোমরা কি ইউসুফকে ঘর ছাড়া করোনি? অন্ধকূপে কি নিক্ষেপ করোনি? বিদেশী বণিকের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে কি বিক্রয় করে দাওনি? তখন কত অজ্ঞই না ছিলে তোমরা! এরকমও অর্থ হতে পারে যে— সম্রাট বললেন, হে সিরিয়াবাসীগণ! ইউসুফের উপর তোমরা এক সময় অকথ্য

অত্যাচার চালিয়েছিলে। কিন্তু তোমরা জানতে না, এর প্রতিফল কি হবে। সেই মহা অপরাধ থেকে বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করা প্রয়োজন। এখনকি তোমরা তওবা করবে না?

এখানে 'ইয্ আনতুম জাহিলূন' কথাটির অর্থ— যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ বা অপরিণামদর্শী। একথার মাধ্যমে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে তওবার প্রতি উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ বক্তব্যটি তিরস্কারার্থক নয়। বরং সৌহার্দ প্রকাশক। পরবর্তী আয়াতে (৯২) একথা আরো খোলাখোলিভাবে বলা হয়েছে এভাবে— 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'

কালাবী বলেছেন, সম্রাট ইউসুফ তখন বলেছিলেন, হে দূরাগত পথিকবর্গ! তোমাদের কি ওই দিনের কথা মনে পড়ে, যখন তোমরা অন্ধকূপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ইউসুফকে দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করেছিলে? তখন মালেক বলেছিলো, আমি এই সুন্দর বালকটিকে পেয়েছি একটি কূপ থেকে এবং আমি তাকে ক্রয় করেছি এতো দিরহামে। হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, মহামান্য সম্রাট! সেই ক্রীতদাসকে তো বিক্রয় করেছিলাম আমরাই। একথা শুনে সম্রাট ইউসুফ ক্রোধান্বিত হলেন। নির্দেশ দিলেন, এদের শিরশ্ছেদ করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো জল্লাদ বাহিনী। তারা হজরত ইউসুফের ভাইদেরকে নিয়ে চললো বধ্যভূমির দিকে। যেতে যেতে ইয়াহুদা বললো, কয়েক যুগ ধরে আমাদের মহান পিতা তাঁর এক পুত্রের শোকে মরণোন্মুখ। দৃষ্টিক্ষমতারহিত। এবার তাঁর নিকটে পৌঁছবে সকল সন্তানের মৃত্যু সংবাদ। হায়! কী নিদারুণ অবস্থা হবে তখন তাঁর। একথা শুনে থমকে দাঁড়ালো সকলে। সম্রাটের নিকটে নিবেদন করলো, হে মহামান্য নরপতি! আমাদের শেষ অনুরোধটি দয়া করে রক্ষা করবেন। আমাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর আমাদের জিনিস-পত্রগুলো পৌঁছে দিবেন আমাদের মহান পিতার নিকটে। সম্রাট ইউসুফ একথা শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন এবং বললেন আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে ফারওয়া বলেছেন, বিনইয়ামিনকে যখন চুরির দায়ে মিসরে আটকে রাখা হলো, তখন হজরত ইয়াকুব মিসররাজের নিকটে প্রেরণ করলেন একটি পত্র। পত্রটি ছিলো এরকম— আল্লাহ্র বান্দা ইয়াকুব ইবনে ইসহাক জবীহুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম খলিলুল্লার পক্ষ থেকে— আল্লাহ্পাকের জন্য সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা। পর সমাচার এই যে, যে পরিবারে বিপদাপদ নিত্যদিনের ভূষণ, আমি সেই পরিবারের লোক। আমার পিতামহ নবী ইব্রাহিমকে হাত-পা বেঁধে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অগ্নিকুণ্ডে। আল্লাহ্ সেই অগ্নিকুণ্ডকে তাঁর জন্য করে দিয়েছিলেন শীতল ও

শান্তিদায়ক। আমার মহান পিতাকে চোখ ও হাত পা বাঁধার পর তাঁর কণ্ঠদেশে চালানো হয়েছিলো ছুরি। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর স্থলে জবাই হয়ে গিয়েছিলো স্বর্গ থেকে প্রেরিত একটি দুম্বা। আর আমার বিপদ আরো প্রলম্বিত ও অসহনীয়। আমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তাঁর সৎভাইয়েরা বিজন বনে নিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ করেছিলো। তখন তারা আমাকে দেখালো শুধু তার রক্তমাখা অঙ্গাবরণ। বললো, বনের বাঘ নাকি তাকে ভক্ষণ করেছে। তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে এখন আমি প্রায়ান্ধ। তার কনিষ্ঠ সহোদরই ছিলো আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু হে নৃপতি ! আপনি তাকে আটক করে রাখলেন কেনো? কী অপরাধ তার? চুরি? চুরি সে তো করতেই পারে না। আমাদের বংশে চোরের জন্ম অসম্ভব। অতএব হে মিসরের নৃনায়ক! সত্বর বিনইয়ামিনকে মুক্তি দিন। নতুবা শোকাকুল পিতার নিষ্পাপ নয়ণমনিকে যে বন্দী করেছে তার জন্য অপপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না। আর ওই বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকবে আপনার অধঃস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত। পত্রটি পাঠ করে সম্রাট ইউসুফ আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো বাঁধ ভাঙা অশ্রুর প্রপাত। প্রবেশ করলেন রাজদরবারে। ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী?' কেউ কেউ এখানকার 'জাহিলূন' শব্দটির অর্থ করেছেন— অপরাধী, পাপী। হাসান বসরী বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে হজরত ইউসুফ তাঁর ভাইদেরকে একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, ইউসুফের প্রতি তোমাদের নির্মম আচরণের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে যুবক। আর যখন যৌবনের দুর্বিনীত অজ্ঞতায় ছিলে নিমজ্জিত।

এর পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'তারা বললো, তবে কি তুমিই ইউসুফ?' প্রশ্নটি ইতিবাচক। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, সম্রাট ইউসুফ তার ভাইদের সঙ্গে ইতোপূর্বে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। কিন্তু 'তোমরা কি জানো তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কী আচরণ করেছিলে' বলার সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উন্মুক্ত করলেন মুখাবয়ব। তখনই তাঁকে চিনতে পারলো তার ভাইয়েরা। সবিস্ময়ে বললো, তবে কি তুমিই ইউসুফ!

আমি বলি, কাহিনীর পূর্বাপর বিবরণে ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের সমর্থন নেই। আর বিষয়টি সাধারণ বিচার বিবেচনার অনুকূলও নয়। তাছাড়া জুহাক কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন কথা বলার সময় হজরত ইউসুফ মৃদু হেসেছিলেন। উন্মোচিত হয়েছিলো তাঁর শাদা মুক্তাসদৃশ দন্তরাজি। তাই দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলো তাঁর ভাইয়েরা।

আতা কর্তৃক বিবৃত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উষ্ণীষ উন্মোচন না করা পর্যন্ত তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। জন্ম থেকে তাঁর কপালের একপাশে ছিলো অতি ক্ষুদ্র একটি মাংশপিণ্ড। ওইরূপ ক্ষুদ্র মাংশপিণ্ড ছিলো তাঁর পিতা, পিতামহ এবং পিতামহের মাতা অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের সহধর্মিণী হজরত সারার কপালেও। বংশগত ওই নিদর্শনটি দেখেই তাঁর ভাইয়েরা উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছিলো, নিশ্চয় তুমিই ইউসুফ। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ এরকম নিশ্চয়তার সাথে কথা বলেনি। সংশয়িত কণ্ঠে বলেছিলো, তবে তুমি ইউসুফ না কি?

এরপর বলা হয়েছে—'সে বললো, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' ভাইদের প্রশ্নের জবাব তিনি দিলেন এভাবে। আত্মপরিচয় দানের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অনুজ বিনইয়ামিনের কথাও বললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ আমার ও আমার অনুজের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি সাবধানী এবং ধৈর্যশীল সে-ই সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' একথার অর্থ— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে মুক্ত, তাঁর নির্দেশ সমূহের প্রতি সতত অনুগত এবং বিপদে ধৈর্য অবলম্বনকারী, তারাই পুণ্যকর্মপরায়ণ। আর আল্লাহ এ ধরনের পুণ্যকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। ইহকালেও না পরকালেও না। এখানে 'আজরাল মুহ্সিনীন' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যারা সাবধানী বা ধর্মভীরু এবং যারা ধৈর্যশীল, তারাই পুণ্যকর্মপরায়ণ।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ○ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

❒ উহারা বলিল, 'আল্লাহের শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদিগের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।'

❒ সে বলিল, 'আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

❒ 'তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। তোমাদিগের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আইস।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি রূপে ও গুণে বিশ্বের বিস্ময়। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে আল্লাহ্‌পাক তোমাকে করেছেন মহিমান্বিত। আমরা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে তোমার মর্যাদাকে অবমাননা করেছি। তাই আজ অকপটে স্বীকার করছি আমাদের অপরাধ।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— সে বললো, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। এখানে 'তাছ্‌রীব' অর্থ অক্ষিগোলকের পর্দা অপসারণ করে দেয়া। রূপক অর্থ অভিশাপ দেয়া বা তিরস্কার করা। অর্থাৎ অপরাধীকে লাঞ্ছিত করা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে— হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! কৃত অপরাধের জন্য আমি আজ তোমাদেরকে অভিশাপ দিতে পারতাম। তিরস্কৃতও করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করলাম না। ভবিষ্যতেও এরকম করবো না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি তোমাদেরকে আজ সর্বান্তকরণে মার্জনা করে দিলাম। আল্লাহ্‌ও যেনো তোমাদেরকে মার্জনা করেন। তিনি ক্ষমাপরবশ ও দয়ালু। আমি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও যখন মার্জনা করলাম তখন চির অমুখাপেক্ষী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু আল্লাহ্‌ও নিশ্চয় তোমাদেরকে মার্জনা করবেন।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফকে চিনতে পেরে তার ভাইয়েরা বললো, তুমি আমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা আহারের জন্য ডেকে থাকো। অথচ কতো অবোধ আমরা। তোমার মতো উদারচিত্ত ভাইয়ের সঙ্গে কী অন্যায় আচরণই না আমরা করেছি। প্রত্যুত্তরে হজরত ইউসুফ বললেন, হে আমার অগ্রজবর্গ! আজ তোমাদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার পর মিসরবাসীরা জানতে পারলো যে, আমি ইব্রাহিমের মতো মহান নবীর বংশধর নবী ইয়াকুবের পুত্র। মিসরবাসীরা তো আমাকে জানে অন্য পরিচয়ে। তারা বলে, কুড়ি দিরহাম মূল্যের ক্রীতদাসের কি সৌভাগ্য দেখো। আল্লাহ্ তাকে কোথায় সমাসীন করেছেন! হে প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ ! তোমাদের কারণেই আজ তারা জানতে পারলো আমার প্রকৃত পরিচয়। তা হলে কেনো আমি তোমাদের সমাদর করবো না।

বাগবী লিখেছেন, পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর হজরত ইউসুফ জানতে চাইলেন মহান পিতার সমাচার। ভ্রাতাগণ বললো, তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিতপ্রায়। হজরত ইউসুফ বললেন, পিতাসহ পরিবারের সকলকে নিয়ে তোমরা এখানে এসে পড়ো। একথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৯৩) এভাবে—

'তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলে রেখো; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ বললেন, আমার এই জামাটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। জামাটি তোমরা নিয়ে গিয়ে আমার পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দিয়ো। তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। তারপর তোমরা পিতা ও তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যসহ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে এখানে চলে এসো।

হাসান বলেছেন, হজরত ইউসুফ নিশ্চয় আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, হজরত ইয়াকুব পুনরায় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হবেন। এরকম কথা তিনি নিজে থেকে বলেননি। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত জিবরাইল তাঁকে বলেছিলেন, হে নবী ইউসুফ ! আপনি আপনার ওই বিশেষ পরিধেয়টি আপনার পিতার নিকটে পাঠিয়ে দিন। আল্লাহ্ এরকম নির্দেশ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ওই পরিধেয় বস্ত্রটি ছিলো হজরত ইব্রাহিমের। যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, তখন হজরত জিবরাইল ওই রেশমী অঙ্গাবরণটি পরিয়ে দিয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিমকে। এরপর থেকে ওই অঙ্গাবরণখানি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন হজরত ইসহাক। তারপর হজরত ইয়াকুব। তিনি ওই বেহেশতী বস্ত্রটি বালক ইউসুফের গলদেশে তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে দেন। জামাটি ছিলো স্বর্গীয় সুবাসে সুবাসিত। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে নবী ইউসুফ ! আপনার তাবিজের মধ্যে রক্ষিত বস্ত্রখানি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। বস্ত্রখানির মধ্যে রয়েছে সকল রোগের নিরাময়। হজরত ইউসুফ একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাবিজের ভিতর থেকে বস্ত্রটি বের করলেন এবং ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, আপনারা এই জামাটি পিতার মুখের উপরে রাখবেন। তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

আমি বলি, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির আত্মিক দর্শনের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত ইউসুফের অবয়ব ও সৌন্দর্যচ্ছটা ছিলো জান্নাতী। যদি তাই হয়, তবে হজরত ইউসুফের জামাটি যে জান্নাতী জামা ছিলো, সেকথা প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না। এটুকু বললে যথেষ্ট হয় যে, জামাটি ছিলো হজরত ইউসুফের অর্থাৎ তিনি যখন জান্নাতী অবয়ব বিশিষ্ট তখন তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে জান্নাতী প্রভাব তো থাকবেই।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰـهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

❒ অতঃপর যাত্রীদল যখন মিশর হইতে বাহির হইয়া পড়িল তখন উহাদিগের পিতা বলিল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

❒ উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিল, 'আল্লাহের শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন।'

❒ অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে আমি আল্লাহের নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না?'

❒ উহারা বলিল, 'হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।'

❒ সে বলিল,'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইউসুফের ভ্রাতারা ওই অলৌকিক জামাটি নিয়ে যখন গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু করলো, তখন সুদূর সিরিয়ার কেনান অঞ্চলে বসে হজরত ইয়াকুব তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো, তবে আমি বলতে চাই, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। পিতা-পুত্রের মিলনলগ্ন আসন্ন। লক্ষণীয় যে, এখানে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ বলা হয়নি। বলা হয়েছে ইউসুফের ঘ্রাণ। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইউসুফের সুরভি ছিলো জান্নাতের সুরভি। জামার নিজস্ব কোনো সুরভি নয়।

বাগবী লিখেছেন, প্রত্যুষের সমীরণ আল্লাহ্‌পাকের অনুমোদনক্রমে প্রত্যা-বর্তনকারী যাত্রীদলের গৃহগমনের পূর্বেই হজরত ইয়াকুবের নিকটে পৌঁছে দিয়েছিলো শুভসংবাদটি।

মুজাহিদ বলেছেন, যাত্রীদল তিনদিনের পথের দূরত্বে অবস্থানকালেই হজরত ইয়াকুব পেয়েছিলেন প্রিয়পুত্রের অঙ্গাবরণের সুবাস। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আট রাতের দূরত্বের কথা। এরকমও বলা হয়েছে যে, প্রভাতের বাতাসই জান্নাতী জামাটির আগাম সুবাস পৌঁছে দিয়েছিলো হজরত ইয়াকুবের নিকটে। হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রাপ্ত ওই জামাটি ছিলো জান্নাতাগত। বহুদূর থেকে ওই জামার সুগন্ধ পেয়েই হজরত ইয়াকুব দৃঢ় প্রতীতির সঙ্গে বলেছিলেন 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'

এখানে 'ফান্‌দুন' শব্দটির অর্থ অপ্রকৃতিস্থ, বয়সজনিত বুদ্ধিবিকৃতি। আর 'তাফনিদ' অর্থ, কাউকে অপ্রকৃতিস্থ স্থির করা। একারণেই বৃদ্ধাকে বলা হয় 'আজুজুন মুফান্‌নাদাতুন' (নির্বোধ বৃদ্ধা)। সাধারণতঃ সকল বয়সের নারীকে এরকম সম্বোধন করা হয়ে থাকে। কারণ স্বভাবগতভাবেই তারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না। এখানে 'লাওলা' এর জবাব উহ্য। অর্থাৎ হজরত ইয়াকুবের বক্তব্যটি ছিলো এরকম, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধ, অপ্রকৃতিস্থ বা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনে না করো, তবে বলতে চাই ইউসুফের সঙ্গে আমার মিলনকাল অত্যাসন্ন। কারণ আমি তার সুবাস পাচ্ছি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। একথার অর্থ— উপস্থিত লোকেরা বললো, হে নবী ইয়াকুব! আপনি তো ইউসুফ ইউসুফ করেই জীবনপাত করলেন। এখনও সেই বিভ্রান্তির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন। এখানে 'দ্বলাল' শব্দটির অর্থ বিভ্রান্তি। অর্থাৎ ইউসুফ-মিলনের বিভ্রম।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখলো, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, অভিযাত্রীদলের গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বেই শুভসংবাদ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো এক লোক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই লোকটির নাম ইয়াহুদা। ইয়াহুদা বলেছিলো, ইউসুফের রক্তমাখা জামা আমি প্রথমে পিতাকে দেখিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এভাবে দুঃসংবাদ প্রদান করে আমিই প্রথমে মহান পিতাকে করে তুলেছিলাম দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাই আমিই প্রথমে শুভসংবাদ প্রদান করে তাঁকে

করে তুলবো প্রসন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, হজরত ইউসুফের জামা নিয়ে তিনি দৌড় দিয়েছিলেন দেশের দিকে। সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র সাতটি রুটি। সুদীর্ঘ আশি ফরসখ দূরত্বের পথ অতিক্রম করে গৃহে পৌঁছে গিয়েছিলেন রুটি নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শুভসমাচার প্রদাতা ছিলো মালেক বিন ওয়ারছিলা। এখানে 'ফারতাদ্দা বস্বীরা' কথাটির অর্থ হজরত ইয়াকুব পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। দূর হয়ে গেলো তাঁর বার্ধক্যজনিত অবসাদ।

তারপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি, যা তোমরা জানো না।' এ কথার অর্থ— হজরত ইয়াকুব বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইউসুফ জীবিত এবং তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবেই? একথাও কি বলিনি যে, আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না? একথাও তো বলেছি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এ সকল তথ্য ও তত্ত্ব আল্লাহ্ই আমাকে জানিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এসকল রহস্য সম্পর্কে অবগত নও। বাগবী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইয়াকুব শুভসমাচার প্রদাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো ইউসুফ কেমন আছে? সে বললো , ইউসুফ তো এখন মিসরের মহামান্য সম্রাট। হজরত ইয়াকুব বললেন, সেটা কোনো বড় কথা নয়। তোমরা আমাকে বলো, সে বর্তমানে কোন ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত? শুভসমাচার দাতা বললো, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের উপর। তিনি বললেন, তবে তো পূর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র নেয়ামত।

এর পরের আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী।' একথার অর্থ— গৃহে আগমনের পর হজরত ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, হে আমাদের মহান পিতা! আপনাকে ও ইউসুফকে কষ্ট দিয়ে মহা অপরাধ করেছি আমরা। এজন্য আল্লাহ্র দরবারে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনিও আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এর পরের আয়াতে (৯৮)বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' প্রখ্যাত তাফসীরবিদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হজরত ইয়াকুব সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করেননি। অপেক্ষা করেছিলেন সেহেরীর সময় পর্যন্ত। কারণ সেহেরীর সময় হচ্ছে দোয়া কবুলের প্রকৃষ্ট সময়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাদের প্রভুপালক রজনীর তৃতীয় প্রহরে আবির্ভূত হন প্রথম আকাশে এবং

ঘোষণা করেন, কে আমাকে এখন আহ্বান করতে চাও, আহ্বান করো। কে আমার কাছে যাচ্ঞা করতে চাও, যাচ্ঞা করো। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো। ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও কে? ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। হজরত ইয়াকুব তাই নিশীথের তৃতীয় যামে নামাজে দণ্ডায়মান হলেন। নামাজ সমাপনান্তে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করলেন তাঁর পবিত্র দুই হাত। নীরবে নিভৃতে নিবেদন করলেন, হে পরওয়ার দিগারে বেনীয়াজ! হে পরিত্রাতা! হে নিঃস্ব জনের সহায়! ইউসুফের জন্য যে ধৈর্যচ্যুতি আমার ঘটেছে, তা তুমি মাফ করে দাও। ইউসুফ ও আমার সঙ্গে আমার যে সকল সন্তান দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের অপরাধও মার্জনা করো। প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন, আমি মার্জনা করে দিলাম, তোমাকে ও তোমার সন্তানদেরকে।

ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো,' কথাটির অর্থ হবে— আমি তোমাদের জন্য দোয়া করবো শুক্রবার রাতে। ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ইয়াকুব তাঁর পুত্রদের জন্য কুড়ি বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রতি শুক্রবার রাতে দোয়া করেছিলেন। তাউস্ বলেছেন, শুক্রবার রাতে সেহেরীর সময় দোয়া করবেন বলে হজরত ইয়াকুব তাঁর দোয়া বিলম্বিত করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে শুক্রবারের ওই রাত্রিটি ছিলো দশই মহররমের রাত্রি। শা'বী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্ম হচ্ছে— আমি ইউসুফকে বলবো, সে যেনো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। সে ক্ষমা করার পর আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো আল্লাহ্পাকের দরবারে। কারণ যার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। পুত্রগণ প্রকৃতই অনুতপ্ত কিনা এবং আন্তরিকভাবে তারা ক্ষমাপ্রার্থী কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই হজরত ইয়াকুব বিলম্বিত করেছিলেন তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনাকে।

ইমাম নববী লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে, সম্রাট ইউসুফ শুভসমাচারবাহী যাত্রীদলের সঙ্গে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন দুইশত উট ও অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেনো তাঁর মহান পিতার পরিবারের সকল সদস্য নির্বিঘ্নে পৌঁছতে সক্ষম হয় মিসরে।

হজরত ইয়াকুব মিসর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। নারী পুরুষ মিলে যাত্রীদলের সংখ্যা দাঁড়ালো বায়াত্তর। মাকরুস্ বলেছেন, বিশাল পরিবারের তিনশত নব্বই জন সদস্য সমভিব্যাহারে হজরত ইয়াকুব যাত্রা করলেন মিসর অভিমুখে। রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌঁছে দেখতে পেলেন, মিসরের সম্রাট তাঁর সভাসদবর্গ ও চার হাজার সৈন্যসহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসছেন। সাধারণ জনতাও যোগ দিয়েছে তাঁদের সঙ্গে। ইয়াহুদার কাঁধে ভর

দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হলেন হজরত ইয়াকুব। বিপুল সংখ্যক মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইয়াহুদা! এতো লোক কেনো? ওরা কি সকলেই ফেরাউন? ইয়াহুদা বললো, না, ওরা হচ্ছে আপনার প্রিয় পুত্রের প্যারিষদবর্গ ও প্রজাসাধারণ।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৯৯

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

❒ অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিংগন করিল এবং বলিল, 'আপনারা আল্লাহের ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।'

অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করা হলো শহরের বাইরে। মহামান্য পিতা এবং মহান পুত্র অগ্রসর হলেন একে অপরের দিকে। শেষ হয়ে এলো শোক ও সন্তাপের সুদীর্ঘ অধ্যায়। বিরহের অমা-বিভাবরী শেষে এলো মহা মিলনের আলোকজ্জ্বল প্রত্যুষ। পিতা ও পুত্রের হৃদয়ে ছায়াপাত করে চললো অতীতের শত সহস্র স্মৃতি। সেই বাল্যবেলা। পিতৃবক্ষের স্বর্গীয় স্নেহচ্ছায়া। ভাইদের চক্রান্ত। অন্ধকূপ। বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে মিসর যাত্রা। আজিজের আশ্রয়। আজিজ-পত্নীর ষড়যন্ত্র। কারাগার। সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ। ওদিকে পিতার বিরতিহীন রোদনার্ত জীবন। বিরামহীন অশ্রুপাত ও ধৈর্য। বিরতিবিহীন ধৈর্য ও অশ্রুপাত। এভাবেই তো হারিয়ে গিয়েছিলো চোখের জ্যোতি। কিন্তু প্রতীক্ষার প্রদীপ ছিলো সতত প্রোজ্জ্বল। সেই অশ্রুভেজা প্রতীক্ষার অবসান হলো আজ। অশীতিপর বৃদ্ধ মহান নবী হজরত ইয়াকুব ইয়াহুদার স্কন্ধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন পুত্র ইউসুফ। ভুলে গেলেন, তিনি বিশাল মিসর সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। আজ তিনি ফিরে পেয়েছেন মিসরের চেয়ে, বরং সারা বিশ্বের চেয়ে অধিক বিশাল চিরন্তন পিতৃস্নেহের হৃত সাম্রাজ্যের অমূল্য অধিকার। বাকরুদ্ধ পিতা-পুত্র পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অভিবাদন, প্রত্যাভিবাদন কোনো কিছুই উচ্চারিত হতে পারলো না বাকরুদ্ধ পিতা-পুত্রের কণ্ঠে। মহামিলনের আনন্দে উল্লসিত হলো আল্লাহ্‌র আরশ। ফেরেশতারা ভুলে গেলো তাদের যথাকর্তব্য। আর যিনি এই মহামিলন ঘটালেন, সেই পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে এই মিলনমেলায় বর্ষিত হতে থাকলো অজস্র-অসংখ্য-অগণনীয় দয়া ও রহমত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ প্রথমে অভিবাদন জানাতে চেয়েছিলেন পিতাকে। কিন্তু হজরত জিব্রাইল তখন বলেছিলেন, না। তাঁকেই প্রথমে সালাম করতে দিন।

আমি বলি, হজরত ইউসুফ তখন ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেমে আসক্তা নিমজ্জিত। তাই পিতাকে সালাম করার ইচ্ছা তখন তাঁর হৃদয়ে ছায়াপাত করতে পারেনি। হজরত ইয়াকুবই প্রথমে সালাম বলেছিলেন এভাবে— হে শ্রান্তিহারক স্নেহাস্পদ সন্তান! তোমার উপর বর্ষিত হোক শান্তি কেবলই শান্তি।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমে সেই মহামিলনের বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে— 'অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলো।' অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'মাতা' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ইউসুফের খালাকে। কারণ তাঁর জন্মদাত্রী জননী পরলোকগমন করেছিলেন বিনইয়ামিনের জন্মের পর পর। যেমন অন্য এক আয়াতে পিতামহ, প্রপিতামহ সকলকেই পিতা বলা হয়েছে এভাবে— আবাইকা ইব্রহীমা ওয়া ইসমাঈলা ও ইসহাক। এখানেও মাতৃতুল্য হিসেবে খালাকে বলা হয়েছে মা। হজরত ইউসুফের ওই খালার নাম ছিলো লাইয়া। এরকমও বলা যেতে পারে যে, হজরত ইয়াকুব প্রথম স্ত্রীর পরলোকগমনের পর বিবাহ করেছিলেন স্ত্রীর ছোট বোন লাইয়াকে। সেই হিসেবে তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের মা। ওই খালাই ছিলেন তাঁর প্রতিপালনকারিণী। সেদিক থেকেও তিনি মাতৃতুল্য বটেন।

হাসান বসরী বলেছেন, এখানে হজরত ইউসুফের জন্মদাত্রী জননীর কথাই বলা হয়েছে। কারণ তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর মাকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছিলেন। আর তিনিও ছিলেন তখন হজরত ইয়াকুবের সহযাত্রী। এভাবে মাতা-পিতা দু'জনের সঙ্গেই মিলন হয়েছিলো হজরত ইউসুফের।

বাগবী লিখেছেন, তখন পিতা-পুত্র বুকে বুক রেখে জড়িয়ে ধরেছিলেন পরস্পরকে। সুফিয়ান সওরী লিখেছেন, তাঁরা তখন করেছিলেন গলাগলি। আর কেঁদেছিলেন অঝোর নয়নে। পুত্র বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আপনি প্রায়ান্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কেনো? এজগতে দেখা না হলেও ওই জগতে তো আমাদের সাক্ষাত ঘটতোই। পিতা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র আমার! আমি তো তোমার ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কাতেই কেঁদে কেঁদে মরতাম। ভাবতাম, ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেলে তোমাকে তো আমি হারিয়ে ফেলবো চিরকালের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বললো, আপনারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' একথার অর্থ— হজরত ইউসুফ আরো বললেন, স্বাগতম! স্বাগতম। এবার আপনারা চলুন নগরাভ্যন্তরে, যদি আল্লাহ্ এরকম ইচ্ছা করেন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— শেষ হলো আপনাদের দুষ্কালের দিবস-রজনী। এখন থেকে আপনারা নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, তখন রাজানুমতি ব্যতিরেকে কেউ নগরমধ্যে প্রবেশ করতে পারতো না।

একটি সন্দেহঃ উদ্‌খুলু (প্রবেশ করুন) শব্দটি আদেশসূচক। কিন্তু এর সঙ্গে এখানে যোগ করা হয়েছে 'ইনশাআল্লাহ্' (আল্লাহ্র ইচ্ছায়) কথাটি। এভাবে অভিপ্রায় ও আদেশের একত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ আদেশের মাধ্যমেই আদিষ্ট বিষয় অপরিহার্য হয়। এর সঙ্গে আল্লাহ্র অভিপ্রায় সংযুক্ত হলে আদেশজাত অপরিহার্যতা আর থাকে না। তা হলে এখানে ইন্ (যদি) শব্দটি বসানো হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জনঃ এখানে 'ইনশাআল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন) কথাটির সম্পৃক্তি ঘটেছে নিরাপদে প্রবেশ করার সঙ্গে। কেবল প্রবেশ করার সঙ্গে নয়। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— আপনারা শহরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে আপনাদের এই প্রবেশ হবে নিরাপদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'লা তাদ্‌খুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইনশাআল্লহু আমিনীন (তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবিষ্ট হবে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় হলে নিরাপদে)।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ইন' (যদি) শব্দটি এখানে শর্তপ্রকাশক শব্দ হিসেবে ক্রিয়ার আধাররূপে ইজ (যখন) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মু'মিনুন' (তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যখন তোমরা হবে মুমিন)। এখানেও 'ইন' ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজ' অর্থে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে বক্তব্যের মধ্যে কিছু অগ্রপশ্চাৎ বিদ্যমান। অর্থাৎ এখানে ইনশাআল্লাহ্ কথাটির সম্পর্ক ঘটেছে আগের আয়াতের 'সাওফা তাস্‌তাগফিরলাকুম' কথাটির সঙ্গে। তাই আগের আয়াতের 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবো' কথাটির মূল রূপ হবে— 'ইনশাআল্লাহ্ আমি আমার প্রভুপালকের নিকটে তোমাদের জন্য করবো ক্ষমাপ্রার্থনা।'

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

❏ এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার প্রতি সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়িল। সে বলিল, 'হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং ইউসুফ তার মাতাপিতাকে উচ্চাসনে বসালো এবং তারা সকলে তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়লো।' এখানে 'রাফাআ' অর্থ উচ্চাসনে সমাসীন করা। 'ইউসুফের প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়লো' কথাটির অর্থ— সসম্ভ্রমে তাঁর প্রতি মস্তক অবনত করলো। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'খর্‌রু' শব্দটি। এর অর্থ— মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন করে সেজদা করা। তাই কেউ কেউ বলেছেন, যেভাবে আল্লাহ্‌কে সেজদা করা হয়, সেভাবেই হজরত ইউসুফের পিতা ও ভ্রাতাগণ তাঁকে সেজদা করেছিলেন। কিন্তু ওই সেজদার উদ্দেশ্য ছিলো হজরত ইউসুফের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন। এভাবে সম্ভ্রম প্রদর্শন করাই ছিলো তখনকার শরিয়তের রীতি। এই রীতিটিকে আমাদের শরিয়ত রহিত করেছে। তাই শেষ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা সিদ্ধ নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউসুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁকে সামনে রেখে তাঁরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই সেজদাবনত হয়েছিলেন। তাই এখানে 'লাহু' (তাঁর প্রতি) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। অর্থাৎ তাঁরা সেজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, হজরত ইউসুফের উদ্দেশ্যে নয়।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যানুসারে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইউসুফ ছিলেন সেজদার উপলক্ষ আর লক্ষ্য ছিলেন আল্লাহ্। এবং তাঁকে উপলক্ষ স্থির করার নির্দেশটিও ছিলো আল্লাহ্র— যেমন আমাদের সেজদার উপলক্ষ বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফ কিন্তু লক্ষ্য আল্লাহ্। আর এই উপলক্ষ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফেরেশতারাও হজরত আদমকে সেজদা করেছিলেন এভাবে। তাঁদেরও সেজদার লক্ষ্য ছিলেন আল্লাহ্ এবং হজরত আদম ছিলেন উপলক্ষ মাত্র।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'লাহু' শব্দটির 'লা' হচ্ছে কারণ নির্দেশক আর 'হু' (তার) সর্বনামটি সম্পর্কিত হয়েছে হজরত ইউসুফের সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে হজরত ইউসুফের সঙ্গে মিলনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা সেজদাবনত হয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক প্রকৃষ্ট। এখানে 'রাফাআ' শব্দটি 'খর্রু' শব্দের পূর্বে উদ্ধৃত হলেও আলোচ্য বাক্যের মর্মটি হবে এরকম—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকলে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং হজরত ইউসুফ তাঁর মাতাপিতাকে বসালেন সমুন্নত আসনে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পিতা ! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক ওই স্বপ্নকে সত্যে প্রতিপন্ন করেছেন।' একথার অর্থ— বাল্যবেলায় আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, চন্দ্র-সূর্য ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হলো আজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং শয়তান আমার ও ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করবার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' একথার অর্থ— শয়তানই আমার ও আমার ভ্রাতাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলো। ফলে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম কারাগারে। কিন্তু সে এবার পরাস্ত হয়েছে। তাইতো আমরা এভাবে মিলিত হতে পারলাম। আল্লাহ্ই আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে এই মহামিলনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ।

লক্ষণীয় যে, হজরত ইউসুফ এখানে কারাগারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্ধকূপের উল্লেখ করেননি। অথচ ওই অন্ধকূপের অবস্থানটি ছিলো কারাজীবন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর এক অধ্যায়। এরকম করার কারণ হচ্ছে, হজরত ইউসুফ ভেবেছিলেন,অন্ধকূপের উল্লেখ করলে তাঁর ভাইয়েরা লজ্জিত হবেন ও অপমানবোধ করবেন। তাই তিনি তাঁদের সম্মুখে অন্ধকূপের কথা না বলে কেবল বলেছিলেন কারাগারের কথা। এটা ছিলো তাঁর স্বভাবগত শিষ্টাচারিতার চরম নিদর্শন। অথবা কেবল কারাগারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন একারণে যে, তাঁর

অন্ধকূপ থেকে পরিত্রাণের পরের অধ্যায়টি ছিলো কলঙ্কময়। বহন করতে হয়েছিলো দাসত্ব ও অপবাদের বোঝা। কিন্তু কারাগার থেকে পরিত্রাণের পরের অধ্যায়টি ছিলো আলোকজ্জ্বল। লাভ হয়েছিলো রাজসিংহাসন। তাই পূর্বের কলঙ্কিত স্মৃতি অপেক্ষা পরের আলোকিত স্মৃতিই ছিলো উল্লেখযোগ্য। সে কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে উল্লেখ করেছিলেন কেবল কারাগারের কথা।

'আলবাদউ' অর্থ চারণভূমি। মরু অঞ্চলেই এ ধরনের বিশাল চারণভূমি পরিদৃষ্ট হয়। তাই এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে মরু অঞ্চল। 'নাজ্‌গা' অর্থ— অনাসৃষ্টি। শয়তানই হজরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে এরকম অনাসৃষ্টি উৎপাদন করেছিলো। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সঙ্গে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ, হজরত ইউসুফ শেষে বললেন, আমার প্রতিপালক যেরকম অভিপ্রায় করেন, সেরকমভাবেই অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করেন সকল কিছুর। তাঁর নিকটে কঠিন বা অসম্ভব বলে কিছু নেই। কারণ তিনি তো অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একক অধিকর্তা।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'লতীফ' শব্দটির অর্থ, মেহেরবান বা দয়ার্দ্র। বস্তুতঃ অতি নম্র ও শিষ্টাচারীশ্রেষ্ঠ পবিত্র সত্তাকে বলা যেতে পারে লতীফ। 'হুয়াল আ'লীম' অর্থ যিনি তাঁর যথাকর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। আর 'হাকীম' অর্থ, প্রেক্ষিত ও সময়ানুসারে যিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণে পূর্ণ সক্ষম।

বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ইউসুফ তাঁর মাতা-পিতাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার পরিদর্শন করালেন। হজরত ইয়াকুব এক স্থানে স্তূপিকৃত কাগজপত্র দেখে বললেন, এতো কাগজপত্র তোমার কাছে অথচ আমার নিকটে তো তুমি একটি পত্রও প্রেরণ করোনি। হজরত ইউসুফ বললেন, হজরত জিবরাইল আমাকে এরকমই পরামর্শ দিয়েছিলেন। পিতা বললেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করোনি কেনো? পুত্র বললেন, আপনার সঙ্গেই তো তাঁর সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ। আপনিই জিজ্ঞেস করুন না। হজরত ইয়াকুব হজরত জিবরাইলকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌ আমাকে এরকমই নির্দেশ করেছেন। যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে চারণভূমিতে নিতে চেয়েছিলো তখন আপনি বলেছিলেন, 'আমি আশঙ্কা করি তোমরা তাঁর প্রতি অমনোযোগী হলে তাঁকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।' আপনি তখন আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ না করে নেকড়ে বাঘের ভয় করেছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, প্রিয় পুত্রের সান্নিধ্যে চব্বিশ বছর অতিবাহিত করার পর হজরত ইয়াকুব পরলোক গমন করলেন। ওই চব্বিশ বছর তাঁর জীবনে ছিলো কেবল অনাবিল সুখ। তাঁর মহাতিরোধান ঘটলো মিসরেই। অন্তিমযাত্রার সময়

প্রিয়পুত্র ইউসুফকে তিনি অসিয়ত করলেন, মহান পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে আমাকে সমাধিস্থ কোরো। হজরত ইউসুফ পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন। পবিত্র মরদেহ সিরিয়ায় নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসহাকের কবরের পাশে। তারপর ফিরে এলেন মিসরে।

ইমাম আহমদ 'জুহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, অন্তিমকালে হজরত ইয়াকুব হয়ে পড়লেন চলচ্ছক্তিরহিত। পুত্রকে বললেন, হাতে কাপড় জড়িয়ে আমার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করো। এই মর্মে অঙ্গীকার করো যে, আমাকে আমার পিতা ও পিতামহের অন্তিম বিশ্রামস্থলের পাশে সমাধিস্থ করবে। আমি পার্থিব কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশীদার ছিলাম। তাই পৃথিবী পরিত্যাগের পরেও তাঁদের সমাধিক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের সঙ্গে অবস্থান করতে চাই। বলা বাহুল্য, হজরত ইউসুফ তাঁর পিতার এই অন্তিম বাসনা পূরণ করেছিলেন। মহা তিরোধানের পর তাঁর কফিন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বাইতুল মাকদিসে। যেদিন সেখানে পৌঁছলেন সেদিন হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন ঈস। ঈস ছিলেন হজরত ইয়াকুবের জমজ সহোদর। দুই ভ্রাতাকে তিনি সমাধিস্থ করেছিলেন একই কবরে। উভয়ের বয়স হয়েছিলো তখন একশত সাতচল্লিশ বছর।

মহান পিতার মহাপ্রস্থান হজরত ইউসুফের চিন্তা চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো। তিনি ভাবতে শুরু করলেন পৃথিবীর জীবনের এইতো পরিণতি। স্বজন-বন্ধন ছিন্ন করে এভাবেই সকলকে চলে যেতে হয়। এ পৃথিবী তো চিরকালের নয়। উত্থান-পতন ভরা জীবনের শেষ অধ্যায় এখন। অনন্ত যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন তিনি। প্রার্থনা জানালেন—

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০১

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا

وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

❐'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীর মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।'

এখানে 'মিনাল মুল্‌ক' (রাজ্য) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ তুমি আমাকে দান করেছো আংশিক বা অস্থায়ী রাজত্ব। হজরত ইউসুফ ছিলেন সত্য নবী। তাই তিনি জানতেন, চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ রাজত্বের

অধিকারী কেবল আল্লাহ্। আল্লাহ্র বিশাল সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র। আর মিসর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তাই তাঁর বক্তব্যে উচ্চারিত হয়েছে 'মিনাল মুল্ক'। 'মিন তা'বীল' (ব্যাখ্যা) কথাটির মধ্যেও 'মিন' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে আংশিক অর্থ প্রকাশকরূপে। অর্থাৎ তুমি আমাকে দান করেছো স্বপ্নের ব্যাখ্যাবিষয়ক আংশিক শিক্ষা। হজরত ইউসুফ জ্ঞানী ছিলেন বলেই কথাটিকে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে। তিনি এ বিষয়েও উত্তমরূপে অবগত ছিলেন যে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই কেবল স্বপ্নসহ সকল কিছুর ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল।

'ফাত্বির' অর্থ স্রষ্টা, উদ্ভাবনকারী। 'ওয়ালী' অর্থ দায়িত্বশীল, অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, সাহায্যকারী। অথবা সেই সত্তা, যিনি ইহ-পরকালের নেয়ামত দাতা, ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্ত্রক। অবিনশ্বরতার সংগে যিনি মিলিয়ে দেন নশ্বরতাকে। আর এখানে 'আস্সলিহীন' অর্থ নবীগণ। ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ব্যক্তিগণই হচ্ছেন সালেহে কামেল (পরিপূর্ণরূপে ক্রটি-বিচ্যুতি মুক্ত)। এই যোগ্যতা রয়েছে কেবল নবী-রসুলগণের। তাঁরা নিষ্পাপ। তাই প্রকৃত সলিহীন হচ্ছেন নবী-রসুলগণ।

কাতাদা বলেছেন, হজরত ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো নবী মৃত্যু প্রার্থনা করেননি। রসুল স. অন্তিমকালে দোয়া করেছিলেন— আল্লাহুম্মার রফীক্বিল্ আ'লা (হে আল্লাহ্! হে আমার সর্বোত্তম বন্ধু)। জননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, অন্তিমযাত্রার সময় সমুপস্থিত হলে নবীগণকে দুনিয়া ও আখেরাত, যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয়। নবীগণ বেছে নেন আখেরাতকে। মহা প্রস্থানকালে আমি শুনতে পেলাম আমার প্রিয়তম রসুল স. বলছেন— মাআল্লাজীনা আ'নআমাল্লহু আ'লাইহিম মিনান্ নাবীয়্যীনা ওয়াস্ সিদ্দিক্বীনা ওয়াশ্ শুহাদাআ ওয়াস্সলিহীনা ওয়া হাসুনা উলায়িকা রফীক্বা (তাঁদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ। আর তাঁরা বন্ধু হিসেবে সুন্দরতম)। রসুল স.কে এরকম বলতে শুনে আমি বুঝলাম তাঁকে দেয়া হয়েছিলো দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করবার অধিকার। বোখারী, মুসলিম, ইবনে সা'দ।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীঃ মাতা-পিতা ও পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন হজরত ইউসুফ। প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! পবিত্র মিলনাকাঙ্খার পথে আর অন্তরায় কেনো? হাসান বসরী বলেছেন, এরপর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন মাত্র কয়েকটি বছর। কেউ কেউ বলেছেন, পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ অথবা এক মাসের মধ্যেই তিনি পরকালে পাড়ি দিয়েছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল কতদিন ছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। কালাবী বলেছেন, বিচ্ছেদকাল ছিলো বাইশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছর। হাসান বসরী বলেছেন,

তিনি অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সতের বছর বয়সে। এরপর আশি বছর ছিলেন নিরুদ্দেশ। পিতৃ-মিলনের পর জীবিত ছিলেন তেইশ বছর। এভাবে তাঁর পৃথিবীর বয়স হয়েছিলো একশত বিশ বছর। তওরাতে উল্লেখিত হয়েছে, তাঁর বয়স হয়েছিলো একশত দশ বছর।

জুলায়খাকে বিয়ে করে তিনি সংসারী হয়েছিলেন। জুলায়খার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলো তাঁর তিন সন্তান। দুই পুত্র এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিলো ইফরাইম ও মাইশা। কন্যার নাম ছিলো রহমত। ইফরাইমের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত মুসার বিশেষ সহচর হজরত ইউশা ইবনে নুন। হজরত আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো রহমতের। এরকম বর্ণনাও এসেছে যে, পিতার মহাপ্রয়াণের পর হজরত ইউসুফ পৃথিবীতে ছিলেন ষাট বছর। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমতানুসারে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিলো একশত বিশ বছর বয়সে। মিসরবাসীগণ মর্মর পাথরের কফিন প্রস্তুত করে সেই কফিনের ভিতরে রেখে তাঁকে সমাধিস্থ করেছিলো নীল নদের ঠিক মাঝখানে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— তাঁর মহা তিরোধানের পর প্রতিটি মহল্লার লোকেরা আপনাপন মহল্লায় তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য শুরু করে দিলো প্রচণ্ড বিতণ্ডা। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো রক্তপাতের পর্যায়ে। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরকৃত হলো যে, কোনো মহল্লাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে না। সমাধিস্থ করা হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে।

ইকরামা বলেছেন, প্রথমতঃ তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিলো নীল নদের দক্ষিণ পার্শ্বে। ফলে দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমি হয়ে গেলো অসম্ভব রকমের উর্বর। আর অপর পাশের ভূমি হয়ে গেলো শুষ্ক, অনুর্বর। এভাবে এক পাশে উৎপন্ন হতে লাগলো প্রচুর ফল ও ফসল। আর অপর পাশে দেখা দিলো কেবল খরা ও অজন্মা। এ অবস্থা দেখে সকলে ঠিক করলো, তাঁকে স্থানান্তর করতে হবে। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তখন তাঁকে দক্ষিণ দিক থেকে উঠিয়ে এনে কবরস্থ করা হলো উত্তর দিকে। এবার দেখা গেলো নতুন কবরের দিকে শুরু হয়েছে ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। আর পরিত্যক্ত কবরের দিকে দেখা দিয়েছে মরুভূমি। সেখানকার মৃত্তিকা হয়ে গিয়েছে নিষ্ফলা। অবস্থা বেগতিক দেখে মিসরবাসীরা এবার ঠিক করলো, তাঁকে সমাধিস্থ করতে হবে নীল নদের ঠিক মাঝখানে। তাই করা হলো। এবার দেখা গেলো নীল নদের উভয় পাশে উৎপাদিত হচ্ছে একই রকম ফল-মূল ও শস্য দানা। প্রায় চারশ' বছর পর মিসরে আবির্ভূত হলেন হজরত মুসা। তিনি নীল নদের মাঝখান থেকে হজরত ইউসুফের শ্বেত মর্মর নির্মিত কফিন উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন পিতৃপুরুষগণের কবরস্থানে।

ওরওয়া বিন যোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে ইসহাক ও ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, আল্লাহ্পাক হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, ফেরাউনের কবল থেকে উদ্ধার করে বনী ইসরাইলদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে হবে সিরিয়ার দিকে।

সঙ্গে করে নিতে হবে ইউসুফের কফিন। আর তাঁকে সমাহিত করতে হবে তাঁর পিতা-পিতামহের কবরস্থানে। কিন্তু তিনি জানতেন না তাঁর কবর কোথায়। একে ওকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারলো না। শেষে জানলেন এক বৃদ্ধার কাছে রয়েছে এই সংবাদ। হজরত মুসা ওই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি মিসর পরিত্যাগ কালে যদি বনী ইসরাইলদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যান, তবে আমি হজরত ইউসুফের সমাধি কোথায় তা বলবো। হজরত মুসা বললেন, ঠিক আছে, আপনাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। বৃদ্ধা তখন হজরত ইউসুফের সমাধির সংবাদ দিলেন। হজরত মুসা বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাত্রা শুরু করতে হবে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। চন্দ্রোদয়ের সময় হলো। কিন্তু তখনও হজরত ইউসুফের কফিন সংগ্রহ করা যায়নি। তাই হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, ইয়া ইলাহী! চন্দ্রোদয় বিলম্বিত করুন। আমিতো এখনো নবী ইউসুফের কফিন উদ্ধার করতে পারিনি। আল্লাহ্র হুকুমে চন্দ্র উদিত হলো বিলম্বে। হজরত মুসা তাঁর একান্ত সহচরগণের দ্বারা হজরত ইউসুফের কফিন নদীর মাঝখান থেকে তুলে আনলেন। এরপর কফিন, বৃদ্ধা ও বনী ইসরাইল জনতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন সিরিয়া অভিমুখে। সেখানে তাঁকে দাফন করলেন হজরত ইসহাক ও হজরত ইব্রাহিমের সমাধির পাশে।

হজরত ইউসুফের পৃথিবী পরিত্যাগের পর মিসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো আমালিকা বংশোদ্ভুত ফেরাউনদের শাসন। স্বৈরাচারী নৃপতিরা শুরু করলো প্রজা পীড়ন। সরে গেলো সত্য ধর্ম থেকে। এভাবে চারশ' বছর গত হওয়ার পর ফেরাউন, তার পারিষদবর্গ ও মিসরবাসীদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্পাক প্রেরণ করলেন হজরত মুসাকে। তাঁর সময়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো তৎকালীন ফেরাউন ও তার অনুসারীরা।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০২

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

❑ ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ— যাহা তোমাকে আমি ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌছিয়াছিল তখন তুমি উহাদিগের সংগে ছিলে না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ! এতক্ষণ ধরে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আপনাকে জানালাম নবী ইউসুফের জীবন-বৃত্তান্ত। সুদূর অতীতে ইউসুফের বিরুদ্ধে তাঁর ভাইয়েরা যে ষড়যন্ত্র

করেছিলো সে সময় এবং এই কাহিনীতে বিবৃত অন্যান্য ঘটনার সময় আপনি তো সেখানে ছিলেন না। কারো নিকট থেকে এই ইতিবৃত্তের আনুপূর্বিক বিবরণ জানবার কোনো সুযোগও আপনার নেই। তাই এই কাহিনীটি আপনাকে জানানো হলো প্রত্যাদেশরূপে। এতে করে এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, আপনি আমার বার্তাবাহক। আর এই সুন্দর ইতিবৃত্তটি কবি বা কাহিনীকারের কল্পিত কোনো উপাখ্যান নয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সন্দেহবিমুক্ত প্রত্যাদেশ।

বাগবী লিখেছেন, মদীনার ইহুদী অথবা মক্কার মুশরিকেরা একবার রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে হজরত ইউসুফের ইতিবৃত্ত জানতে চাইলো। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা ইউসুফ। ইহুদীরা দেখলো, প্রত্যাদেশিত কাহিনীটি তাদের নিকটে রক্ষিত তওরাতের বিবরণের পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ইসলাম গ্রহণ করলো না। প্রকৃষ্ট প্রমাণ দর্শন করেও ইসলাম গ্রহণ না করাতে রসুল স. মর্মাহত হলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

❒ তুমি যতই চাহ না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে।

❒ এবং তুমি তাহাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না। ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! বিধর্মীদের আচরণ দেখে ব্যথিত হবেন না। আপনার একান্ত কামনা, তারা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে পুণ্যময় জীবনের অধিকারী হোক। কিন্তু ইমান গ্রহণের যোগ্যতাই যে তাদের নেই। সুতরাং যতো মোজেজাই আপনি প্রদর্শন করুন না কেনো, কস্মিনকালেও তারা আপনার এই শুভ আহ্বানকে গ্রহণ করবে না। অসত্যকে তারা কিছুতেই পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই আল্লাহ্‌ও চান, তারা অসত্যের উপরেই চিরস্থায়ী হোক। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করে যান। অব্যাহত রাখুন কোরআনের প্রচার। আপনি তো কেবল আমারই পরিতোষকাঙ্খী। নবী ইউসুফের কাহিনী ও কোরআনের অন্যান্য ঘোষণা প্রচার করার জন্য আপনি তো কারো নিকটে পারিশ্রমিক দাবি করেন না। কোরআন তো বিশ্ববাসীদের জন্য সদুপদেশ। এই কোরআনকে যারা মান্য করবে তারাই বুদ্ধিমান। আর যারা মান্য করবে না, তারা মূর্খ।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা এই সব দেখে কিন্তু তাহারা এসবের প্রতি উদাসীন।

❒ তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহার শরীক করে।

❒ তবে কি তাহারা আল্লাহের সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখুন, আকাশমার্গ ও পৃথিবীতে সতত পরিদৃশ্যমান রয়েছে আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা ও একক সৃষ্টিশীলতার অসংখ্য প্রমাণ। মানুষ প্রতিনিয়ত এসকল কিছু অবলোকন করে যাচ্ছে। তদুপরি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে অলৌকিক নিয়মে শোনানো হচ্ছে নবী ইউসুফ ও অন্যান্য নবী রসুলগণের কাহিনী। এ কাহিনীগুলোর মধ্যেও রয়েছে শতসহস্র সদুপদেশ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দেখুন, এ সকল কিছু সম্পর্কে কেমন উদাসীন। এতো কিছু দেখে শুনে বুঝেও যথাকর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় না। শিক্ষা গ্রহণ করে না আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য থেকে। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত অতীতকালের কাহিনী থেকে। এখানে 'কাআইয়েন' শব্দটির অর্থ, অধিকাংশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর সঙ্গে শরীক করে।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! দেখুন এসকল লোক আল্লাহ্র প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস রাখে। কিন্তু তাদের ওই বিশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে অংশীবাদিতা। তারা আল্লাহ্কেও ডাকে, আবার পূজা করে কল্পিত দেব-দেবীদের। তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তারা বলবে, আল্লাহ্। আরো বলে দেখুন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? তারা বলবে আল্লাহ্। এরকম বলা সত্ত্বেও তারা উপাসনা করবে বৃক্ষের, পাথরের, দেব-দেবীদের।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অংশীবাদীরাও হজ করতো। হজের সময় বলতো, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (আমি উপস্থিত, হে প্রভু আমি উপস্থিত)। হজের ইহরাম পরে বৃত্তাকারে কাবা শরীফ প্রদক্ষিণের সময় বলতো, হে প্রভু আমি হাজির। আমি হাজির। তোমার কোনো অংশীদার নেই, ওই সকল দেব-দেবী ছাড়া, যাদেরকে তুমি তোমার অংশীদার করে নিয়েছো। তুমি তাদের (দেব-দেবীর) প্রভু। তারা তোমার প্রভু নয়।

আতা বলেছেন, অংশীবাদীরা এরকম শিরিকমিশ্রিত প্রার্থনা করতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়। কিন্তু বিপদের সময় তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকতো না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন তারা জলযানে আরোহণ করে, তখন তারা পরিশুদ্ধ অন্তরে আহ্বান করে আল্লাহ্‌কে। আর যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদে সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেন, তখন তারা পুনরায় ফিরে যায় অংশীবাদিতায়।'

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ইল্লা ওয়াহুম মুশরিকুন' (কিন্তু তারা শিরিক করে) কথাটির অর্থ হবে— তারা আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতিকূলে পথভ্রষ্ট ধর্ম-নেতাদের বিধানানুসারে চলে। তাদেরকেই বসায় প্রভুপালনকর্তার আসনে। অথবা আল্লাহ্‌র সঙ্গে স্থাপন করে পিতা-পুত্র সম্পর্ক। বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। কিংবা তারা করে আগুনের উপাসনা। মুতাজিলারাও এরকম অংশী-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু তওহীদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস হচ্ছে— আল্লাহপাকই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা। সুফী সাধকগণই হচ্ছেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসী। আর মুতাজিলারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা মনে করেছে কী? তারা কি ভেবেছে, আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে না? তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত কি অকস্মাৎ এসে পড়বে না? আল্লাহ্ তো যে কোনো সময় তাদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। আর যে কোনো সময় তো এসে পড়তে পারে মহাপ্রলয়।

কাতাদা বলেছেন, এখানে 'গাশীয়্যা' অর্থ অবতীর্ণ বিপদ। জুহাক বলেছেন, আকাশের বিদ্যুৎ, অদৃশ্য অনাসৃষ্টি। 'বাগতাতান্' অর্থ আকস্মিক উপস্থিতি, যার কোনো পূর্বাভাস দেয়া হয় না, যা আগমনের নির্ধারিত সময় নেই এবং যা পূর্বধারণাবিমুক্ত। 'ওয়াহুম লা ইয়াশউরূন' অর্থ অজ্ঞাতসারে, অপ্রস্তুত অবস্থায়। 'আফাআমিনু' অর্থ তারা কি নিরাপদ? প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্‌তিফ্‌হামে ইনকারী)। অর্থাৎ আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের এরকম বিস্মৃতি নিরাপদ নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষ পথেঘাটে, হাটেবাজারে কর্মব্যস্ত থাকবে, হঠাৎ এসে পড়বে কিয়ামত। ভয়ে আতঙ্কে তখন চিৎকার জুড়ে দিবে তারা। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বাজারে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা মাপজোখ করতে থাকবে বস্ত্র বিছিয়ে। সহসা শুরু হবে মহাপ্রলয়। কাপড় কাটতে ভুলে যাবে তারা। চুকে যাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পাট। উল্লেখ্য যে, সুরা আ'রাফের তাফসীরে কিয়ামত সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৮

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❒ বল, 'ইহাই আমার পথ ঃ আল্লাহের প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি; আমি এবং আমার অনুসারিগণ সজ্ঞানবিশ্বাসী। আল্লাহ্ মহিমান্বিত, এবং যাহারা আল্লাহের শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল মোহাম্মদ! উদাসীন জনতাকে আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ ও মত। এই সত্যপথে ও মতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাই আল্লাহ্র প্রতি। মনে রেখো আমি ও আমার অনুসারীরা এই পথের আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বাসী। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ্ মহিমান্বিত ও পবিত্র। অংশীবাদিতার আবিলতা থেকে চিরমুক্ত। তাই সেই পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে যারা অংশীবাদী হয়, আমি তাদের অন্তর্গত নই।

এখানে 'সাবীলী' অর্থ পথ, মত বা পদ্ধতি। 'বাসীরাতিন' অর্থ দৃঢ় প্রতীতি বা আত্মজ্ঞান। একথার মাধ্যমে বলা হয়েছে— আমি ও আমার অনুসারীগণ অন্য লোকের মতো আত্মজ্ঞানবিবর্জিত নই। অথবা 'বাসীরাত' অর্থ— বিবৃতি ও দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণ। 'ওয়ামানিত্ তাবাআ'নী' অর্থ— আমার অনুসারীগণ। অর্থাৎ যারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমার অনুগমন করে, তারাও আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানায়।

কালাবী ও ইবনে জায়েদ বলেছেন, রসুল স. এর অনুসারীগণের প্রতি এই দায়িত্বটি অপরিহার্য যে, তারাও রসুল স. এর অনুসরণে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকবে। সতত আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ পালনে থাকবে সদা সতর্ক। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, আমি ও আমার অনুসারীগণ দিব্যদৃষ্টি বা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আমার অনুসারীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর সহচরবৃন্দকে। তাঁরা ছিলেন হেদায়েতের নিশানবাহী, জ্ঞানের

ভাণ্ডার, বিশ্বাসীদের অগ্রনায়ক। ছিলেন আল্লাহ্‌র পথের সমর্পিতপ্রাণ সৈনিক। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, যারা রসুল স. এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেনো অনুসারী হয় বিগত বিশ্বাসীগণের। অর্থাৎ তারা যেনো মান্য করে চলে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে। এই উম্মতের মধ্যে সাহাবীগণ হচ্ছেন, সর্বোৎকৃষ্ট বক্ষের অধিকারী। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা ছিলো অথৈ। কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিলো না তাঁদের মধ্যে। রসুল স. এর বিশেষ প্রচার সহচর হিসেবে আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। তাঁদের পথ ছিলো নির্ভুল গন্তব্যবিশিষ্ট পথ। অতএব তোমরা তাঁদের পূতপবিত্র আদর্শ গ্রহণ করো। হেদায়েতের যে আলোকবর্তিকা তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছেন, পথ চলো সেই আলোকবর্তিকার আলোকে।

সুরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ
اِسْتَايْئَسَ
وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ حَتّٰىٓ اِذَا
الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ
بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى
الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

❐ তোমার পূর্বে জনপদবাসীদিগের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম; অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা সাবধানী তাহাদিগের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা বুঝ না?

❐ অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে, রসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদিগের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

❒ উহাদিগের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আছে শিক্ষা। কুরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের অনেককে প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, ইতোপূর্বেও আমি অনেক জনপদে অনেককে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। আপনাকে যেমন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে, তেমনি তাদেরকেও পরিচালনা করেছিলাম প্রত্যাদেশ সহকারে। আপনি যেমন আপনার সম্প্রদায়ের একজন মানুষ, তেমনি তারাও ছিলো তাদের সম্প্রদায়ভূত মানুষ। আপনি যেমন ফেরেশতা নন তেমনি তারাও ফেরেশতা ছিলো না। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা বলতো, আল্লাহ্ ফেরেশতাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, মানুষকে নয়। তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

'নূহী ইলাইহিম' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আপনি যেমন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ, তেমনি ওই সকল জনপদের নবীগণও ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট। ফলে সাধারণ জনতার মধ্যে থেকেও তাঁরা ছিলেন মহিমান্বিত, আদর্শ পুরুষ। মহাপুরুষ। 'মিন্ আহলিল কুরা' অর্থ, জনপদবাসীগণের মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ওই নবীগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন সুসভ্য সমাজের মধ্যে থেকে। মরুচারী অথবা অরণ্যবাসী তাঁরা ছিলেন না। ছিলেন না যাযাবরের মতো স্বেচ্ছাচারী।

হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক কোনো জিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেননি। তেমনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেননি মরুচারী যাযাবর স্বভাবের কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো রমণীকে।

আমি বলি, এখানে 'রিজাল' অর্থ— অনেককে। 'অনেককে' কথাটিতে জিন ও মানুষ উভয়ের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। সুতরাং জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ নবী হতে পারবে না, এরকম কোনো তথ্য আলোচ্য বাক্যে নেই। আল্লাহ্পাক স্বয়ং এক আয়াতে বলেছেন— পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা বিচরণ করতো, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করতাম তাদের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিলো তা কি দেখেনি? যারা সাবধানী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা বুঝো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলুন, তারা বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে না কেনো? পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা অস্বীকার করেছিলো, তাদের জনপদসমূহের ধ্বংসাবশেষ তো

এখনও বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র গজবের ওই নিদর্শনসমূহ দেখে এখনও তারা সাবধান হয় না কেনো? গজব থেকে নিরাপত্তা লাভের নিমিত্তে এখনও আপনাকে নবী বলে স্বীকার করে না কেনো? হে আমার নবী! তাদের প্রত্যাখ্যানজনিত যাতনায় আপনি ব্যথিত হবেন না। মনে রাখবেন, যারা সাবধানী (মুত্তাকী) তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়ঃ। আপনি তো এ বিষয়ে সম্যক অবগত। কিন্তু আপনার অনুসারীরা কি একথা অবগত নয়? অথবা আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি একথা বোঝে? না বোঝে না?

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে— 'অবশেষে যখন রসুলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবলো যে, রসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।' একথার অর্থ— অতীতের উম্মতদেরকে ইমান গ্রহণের জন্য দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইমান আনার পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার করেও তা ভঙ্গ করেছিলো। শেষে নবীগণ তাদের ইমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর তাদের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করতে শুরু করেছিলো যে, ইমান না আনলে শাস্তি অবতীর্ণ হবে— একথা বলে আল্লাহ্ নবীগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। এমতাবস্থায় যথাসময়ে অবতীর্ণ হলো আল্লাহ্‌র সাহায্য। আল্লাহ্ অবাধ্যদেরকে ধ্বংস করলেন এবং নবী ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহ্ যাকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা করেন, সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। আর অপরাধী সম্প্রদায়ের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়, সে শাস্তি কখনো রদ হয় না। রসুলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে— এরকম ধারণা করতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। নবীগণ নন। তাঁদের নিরাশ হওয়ার কারণ ছিলো ভিন্ন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও যখন তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা ইমান আনলো না, তখনই তাঁরা তাদের ইমান আনয়নের ব্যাপারে হয়ে পড়েছিলেন নিরাশ। আল্লাহ্ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেন না কেনো, সেকথা ভেবে তাঁরা নিরাশ হননি।

এখানে উল্লেখিত 'কুজিবু' শব্দটিকে জননী আয়েশা উচ্চারণ করতেন 'কুজ্জিবু'। কিন্তু কুজিবু উচ্চারণটিই প্রসিদ্ধ, যদিও জননী আয়েশা তা অনবহিত ছিলেন। এখানে কথাটির শব্দগত মর্ম ধর্তব্য নয়। প্রকৃত অর্থ হবে এরকম— রসুলগণ এই ভেবে নিরাশ হয়েছিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা মনে হয়, কোনোদিনই ইমান আনবে না।

এরকমও অর্থ হতে পারে যে, নবীগণ ধারণা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি যে ভুল প্রমাণিত হলো। আমরা মনে করেছিলাম, খুব শীঘ্রই আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত

হবো। কিন্তু তা তো হলো না। অথবা এখানে 'জন্নু আন্নাহুম' (তারা ভাবলো নিশ্চয় তারা) কথাটির সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— অবিশ্বাসীরা ভাবলো, নবীগণ আমাদেরকে যে ইমানের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অমান্যকারীদের জন্য যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছেন— সেটা ভুল। আমাদেরকে তারা মিথ্যা কথা বলেছেন। সর্বনামটি নবীগণের বিশ্বাসী অনুসারীদের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের অন্তরে তখন এই ধারণার উদয় হয়েছিলো যে, নবীগণ আমাদের সাথে বিজয় ও সাহায্যের যে আশ্বাস দিয়েছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অনিবার্য, এরকম যে কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন, তা ভুল। বাস্তবতাবিবর্জিত। দীর্ঘদিন গত হলো, তবুও তো অবিশ্বাসীদের উপরে গজব অবতীর্ণ হলো না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের মতে এখানে আয়াতের শব্দগত মর্মই গ্রহণীয়। অর্থাৎ নবীগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। নবীগণ মানুষ। তাই তাঁদের এই নৈরাশ্যকে মানবিক দুর্বলতা হিসেবে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে নবীগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। মনে করেছিলেন, আমাদেরকে মনে হয় এতদিন ধরে অযথা আশ্বাসবাণী শোনানো হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস এ প্রসঙ্গে তেলাওয়াত করেছিলেন এই আয়াতটি— 'হাত্তা ইয়াকুলার্ রসুলু ওয়াল্লাজীনা আমানু মাআ'হু মাতা নাসরুল্লাহ্।' (এমনকি রসুল ও তাঁর সহচর বিশ্বাসীবৃন্দ বলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে)। অতএব জননী আয়েশা যেটাকে অস্বীকার করেছেন, সেটাই হবে আলোচ্য আয়াতের মর্ম। আর এই প্রকৃত মর্মটিকে অস্বীকার করতেন বলেই তিনি 'কুজিবু' কথাটিকে পাঠ করতেন কুজ্জিবু।

বায়যাবী লিখেছেন, বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যটি যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে এখানে 'জুন্নু' (ধারণা) শব্দটির মর্মার্থ হবে— অলীক ধারণা, যা মানুষের স্বভাবজাত। আল্লামা তিব্‌বী লিখেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। ইমাম বোখারীও তাঁর গ্রন্থে বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বিশুদ্ধ কথা এই যে, এখানে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়, রূপক অর্থই গ্রহণযোগ্য। অবিশ্বাসীদেরকে দীর্ঘ অবকাশ প্রদান ও বিলম্বিত শাস্তির বিষয়টিকে এখানে উপমা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। 'কুজিবু' উচ্চারণটি কুফাবাসী আলেমগণের এবং 'কুজ্জিবু' উচ্চারণটি অন্যান্যদের। কাতাদাও এরকম মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো আলেম অর্থ করেছেন এভাবে— নবীগণ অবিশ্বাসীদের ইমান গ্রহণের বিষয়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। একথা ভেবেও শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আগমনের বিলম্বহেতু বিশ্বাসীরাও যে দোদুল্যচিত্ত। তারাও না শেষে ইমানের পথ থেকে দূরে সরে যায়।

'মান্‌নাশাউ' অর্থ— নবী ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ। এরকম অর্থ করার কারণ হচ্ছে, নবীগণ তাঁদের সাথীগণের পরিত্রাণকামী। একথা অচিন্তনীয় যে, তাঁরা অবিশ্বাসীদের পরিত্রাণ কামনা করেন।

'ওয়ালা ইউরাদ্দু' বা'সুনা আ'নিল্ ক্বওমিল মুজ্‌রিমীন' অর্থ— অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। এখানে বা'স্ অর্থ, শাস্তি বা আযাব।

আমি বলি, এখানে 'মান্নাশাউ' অর্থ— স্বল্পসংখ্যক ইমানদার। কারণ কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে একত্রবাসের কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অন্য এক আয়াতেও এ কথার প্রমাণ রয়েছে। যেমন— 'আর ওই শাস্তিকে ভয় করো, যা কেবল জালেমদের জন্য আসবে না।'

শেষের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'তাদের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। কোরআনের বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ ও দয়া।' এ কথার অর্থ— হজরত ইউসুফের বৃত্তান্তে রয়েছে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃষ্ট শিক্ষা। অন্ধকূপ, দাসত্ব, কারাগার ইত্যাদি কৃষ্ণ অধ্যায় অতিক্রম করে তিনি লাভ করেছিলেন মিসরের সিংহাসন। কী অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিলো তাঁর! হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা মানুষকে লাঞ্ছিত করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও ধৈর্য করে মহিমান্বিত— এই অমূল্য উপদেশটির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছিলো হজরত ইউসুফের জীবনে। এই সমুন্নত শিক্ষাটি সুস্থ বিবেকধারীদের নিকটে তাই এতো সমাদৃত। এই কাহিনীটি আবার বিবৃত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। সুতরাং এটা কাল্পনিক কোনো উপাখ্যান নয়। বিশ্বাসীরা এটা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, এই সর্বোত্তম কাহিনীটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের পূর্ণ অনুকূল এবং এই কোরআন হচ্ছে সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

'ইউফ্‌তারা' অর্থ স্বরচিত, কাল্পনিক বা মিথ্যা। 'আল্লাজীনা বাইনা ইয়াদাইহি' অর্থ এটা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে যা আছে তার সমর্থন। অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসৃতি। 'শাই' অর্থ প্রতিটি ধর্মীয় বাণী (সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ) মানব জীবনে যে বাণী নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। উল্লেখ্য যে, যে বিধান হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তা কোরআনের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত। কারণ আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'আমি সকল রসুলকে কেবল আমার আদেশের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি।' আরো এরশাদ করেছেন— 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' আরো বলেছেন— 'রসুল তোমাদেরকে যা করতে বলেছেন তা পালন করো, আর যা বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।' আবার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিধানও প্রকারান্তরে কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— 'হেদায়েত প্রকাশ পাওয়ার পর যে ব্যক্তি রসুলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীগণের পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে; তাকে আমি তার অভীষ্ট পথেই পরিচালনা করবো।' কিয়াসও কোরআনের

অনুকূল। অর্থাৎ কিয়াসকৃত বিধানও কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! উপদেশ গ্রহণ করো।'

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকলের উপকারের জন্য। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এই কোরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়া। কোরআন থেকে উপকার গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে কেবল বিশ্বাসীদের। তাই এখানে 'সকলের জন্য' না বলে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'।

শায়েখ আবুল মনসুর মাতুরিদি বলেছেন, হজরত ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের কাহিনীতে রসুল স. এর জন্যও রয়েছে শিক্ষা। হজরত ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতাগণ ছিলেন একই ধর্মভূত ও এক পিতার ঔরসজাত। অথচ তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে করেছিলো চরম দুর্ব্যবহার। কিন্তু হজরত ইউসুফ তাঁদের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন উত্তম শিষ্টাচার। ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তাদেরকে। এ সকল ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্পাক এখানে তাঁর প্রিয়তম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে এইমর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকেও তাঁর দুর্বিনীত স্বজাতির লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। বারবার ক্ষমা করে দিতে হবে অবিশ্বাসী স্বজনদেরকে। কারণ তারা নির্বোধ।

ওয়াহাব বলেছেন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহেও কোরআনের মতো বিশদভাবে হজরত ইউসুফের ইতিবৃত্ত উল্লেখিত হয়েছে।

সুরা রা'দ

এই সুরার আয়াতের সংখ্যা তেতাল্লিশ। আর রুকুর সংখ্যা ছয়। ত্রয়োদশ পারায় গ্রন্থিত এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

❐ আলিফ্ লাম্ মীম্ রা; এইগুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।

আয়াতের শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে— আলিফ্ লাম্ মীম্ র। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। এগুলোর প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর

রসুল। আর জানেন তাঁরা, যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানিও এ সকল বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজির রহস্য সম্পর্কে জানতেন। সুরা বাকারার শুরুতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো কোরআনের আয়াত।'এখানে 'কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। অথবা এই সুরা। আর 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এই কোরআনের অথবা এই সুরার এই আয়াতের দিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যা তোমার প্রতিপালক থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য।' এরকম অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারবে তখন, যখন ওয়াল্লাজী (এবং যা) কথাটির 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টিকে ধরা হবে সূচনামূলক, আর আল্লাজী (যা) কে ধরা হবে উদ্দেশ্য ও আলহাক্ব (সত্য) কে ধরা হবে বিধেয়। এমতাবস্থায় এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য থেকে হয়ে পড়বে পৃথক। তখন মর্ম দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু গ্রন্থকার বলছেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ যদি 'সুরা' ধরা হয়, তবে ওয়াল্লাজী (এবং যা) কথাটির অর্থ হবে কোরআন। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— এই আয়াতটি এই সুরা এবং এই কোরআনের আয়াত। আর যদি 'আল কিতাব' ও 'আল্লাজী' উভয়টির অর্থ 'কোরআন' ধরে নেয়া হয়, তবে একটি বিশেষণ সম্মিলিত হবে অপর বিশেষণটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় 'আলহাক্ব' হবে বিধেয় এবং ধরে নিতে হবে উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত।

একটি জটিলতাঃ 'আল হাক্ব' কথাটির সঙ্গে আলিফ লাম যুক্ত হওয়াতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল কোরআনই হক বা সত্য। তাহলে প্রশ্ন জাগে, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস কি সত্য নয়?

জটিলতার নিরসনঃ এখানে 'উনজিলা' অর্থ— অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ যা অবতীর্ণ হয়েছে প্রকাশ্যরূপে, অথবা যা অবতীর্ণ হয়েছে প্রকাশ্য অর্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ সহকারে। এভাবে কোরআনের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বলিত হাদিস, ইজমা ও কিয়াসও হয়েছে কোরআনের নির্দেশের অন্তর্গত। তাই ইসলামের এই ত্রয়ীসূত্রও সত্য এবং অনুসরণীয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।' একথার অর্থ— কোরআন মজীদ দিবালোক অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ এতে আস্থাশীল নয়। কারণ অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তিপরায়ণ ও অস্বচ্ছ চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন। বিভ্রান্তি তাদের সতত সহচর।

মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বলতো, কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদের নিজস্ব রচনা। তাদের ওই অপকথনের প্রতিবাদ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

❒ আল্লাহ্ই উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত— তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

❒ তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করিয়াছেন দুই প্রকারের। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত— তোমরা তা দেখছো।' এখানে 'আ'মাদুন' অর্থ স্তম্ভ। শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 'ইমাদ' অথবা 'উমুদ'— যেমন 'ইহাব' এর বহুবচন 'আহাব' এবং 'আদীম' এর বহুবচন 'আদাম'। এখানে 'তোমরা তা দেখছো' বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। অথবা কথাটি 'স্তম্ভ ব্যতীত' বাক্যাংশটির বিশেষণ। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমাদের সম্মুখে পরিদৃশ্যমান স্তম্ভবিহীন ওই অনন্ত অম্বর একথাই প্রমাণ করে যে, এরকম অসম্ভব কার্যের স্রষ্টা একজন রয়েছেনই। আর এই অলৌকিক সৃজনকর্ম যাঁর, তিনি মহাকুশলী।

প্রতিটি বস্তুর মৌল উপাদানসমূহ একই। কিন্তু তাদের বহিরঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন আকার, প্রকার ও রঙ। এই বহুধা বৈচিত্রও আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক মহাক্ষমতাধর ও মহাকুশলী ছাড়া এই অবাক করা সৃষ্টিশৈলী উন্মোচন করতেন কে? সৃজনরহস্যের বহুবিচিত্র বিবর্তনই বা সতত সঞ্চারমান রাখতেন কে? শায়েখ আবু

আলী ইবনে সিনার অভিমতও এরকম। একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই বিশাল সৃষ্টি অবয়ববিশিষ্ট। আর এর স্রষ্টা হচ্ছেন অবয়বের অতীত, আনুরূপ্যবিহীন। আল্লাহ্পাক তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিপ্রায় ও প্রতাপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর এই বিশাল সৃষ্টিতে। প্রতিটি সৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছেন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যধারীরূপে। শিল্প যেমন শিল্পীর সমতুল নয়, তেমনি সৃষ্টিও নয় তার স্রষ্টার সমতুল বা সমকক্ষ। এই মহা সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টা আল্লাহ্র তুলনা কিন্তু এরকমও নয়। কারণ সকল প্রকার তুলনা, উপমা ও দৃষ্টান্ত থেকে তিনি চিরমুক্ত ও চিরপবিত্র। তিনি আনুরূপ্যবিহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে।' আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার ব্যাখ্যাটি একটি জটিল ব্যাখ্যা। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করার অর্থ তাদেরকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে বাধ্য করা। আল্লাহ্পাকই অন্য সকল সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। তাঁর নির্দেশে, নিয়মে ও নির্ধারিত সময়ে তারা আবর্তিত হয়। আর এই সুশৃঙ্খল আবর্তনের কারণেই অভ্যুদয় ঘটে দিবস ও রাত্রির।

'কুল্লুঁই ইয়াজ্রী' অর্থ প্রত্যেকেই পরিক্রমণরত। অর্থাৎ প্রত্যেকে পরিক্রমণ করে তাদের আপন আপন কক্ষ পথে। 'লি আজালিম্ মুসাম্মা' অর্থ নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রতিটি আবর্তন শেষ করার জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে, সে পর্যন্ত। অথবা যতদিন পৃথিবী ও আকাশের আয়ুষ্কাল, ততোদিন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ই সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সৃষ্টি-ধ্বংস, সকল কিছুর তিনি একক পরিকল্পক, ব্যবস্থাপক ও সিদ্ধান্তদাতা। এসকল কিছুর মধ্যে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন।' একথার অর্থ তিনিই একমাত্র দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণকারী। অথবা— তিনিই প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেন ধারাবাহিক রীতিতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।' একথার অর্থ—'হে মানুষ, এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কার্যাবলীর বিবরণসমূহ উপস্থাপন করা হলো এ জন্যে যে, তোমরা যেনো অতঃপর এই বিশ্বাসে স্থিত হতে পারো— যিনি বিনা মৌল উপাদানে এরকম বিচিত্র ও রহস্যময় মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি

এসকল কিছু ধ্বংস করতেও সক্ষম। ধ্বংসের পর পুনরায় সৃষ্টি করাও তাঁর নিকটে অতি সহজ। আর তিনি এরকমই করবেন। আখেরাতে তোমাদেরকে হাজির হতেই হবে বিচারের জন্য। তখন তিনি পুণ্যবানদেরকে করবেন পুরস্কৃত। আর তিরস্কৃত করবেন পাপিষ্ঠদেরকে।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই ভূপৃষ্ঠকে করেছেন সমতল ও সম্প্রসারিত, যেনো মানুষ পৃথিবীতে চলাফেরা করতে পারে নির্বিঘ্নে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন।' এখানে 'রওয়াসি' অর্থ পর্বত, যা অচঞ্চল। যেমন বলা হয় 'রসিয়াশ শাই' (বস্তুটি সুস্থির হয়ে গেলো)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় আবু কুবাইস্ পাহাড়। 'আন্‌হারা' অর্থ— নদীসমূহ যা পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়। আলোচ্য বাক্যটির কর্ম দু'টি একে অপরের সম্পূরক। তাই এখানে দু'টি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে একই ক্রিয়ার অধীনে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের।' একথার অর্থ— এই পৃথিবীতে তিনি সৃষ্টি করেছেন দুই প্রকারের ফল। ভালো ও মন্দ। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— তিনি সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন জাতের ফল। আর ওই ফলগুলো দু'রকমের। অথবা এখানে 'দুই প্রকারের' বলে স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় ফলকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।' একথার অর্থ— তিনিই রাতের আঁধারে ঢেকে দেন দিনকে। আবার নিশীথের তমসাকে দূর করে দেন দিবসের উজ্জ্বলতা দ্বারা। এভাবে নিয়মিত চলতে থাকে দিবা-রাত্রির আবর্তন। পুনরাবর্তন।

শেষে বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।' একথার অর্থ— পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ফল-মূল ও দিবস-রজনীর বিবর্তনের মধ্যে সতত প্রতিভাত হয়ে চলেছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এসকল কিছুই হচ্ছে তাঁর অদ্বিতীয়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। এসব নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা দেখে বুঝে নিতে হবে, এগুলোর প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক কতোই না মহান। কিন্তু সবাই একথা বোঝে না। এই সরল রহস্যটি বুঝতে পারে কেবল চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ সম্প্রদায়।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

❐ ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেওয়া হয় একই পানি; এবং ফলের হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন।' একথার অর্থ— ভূ-প্রকৃতি এক রকম নয়। তাই দেখা যায়, কোথাও কর্দমাক্ত জলাভূমি। কোথাও প্রস্তরময় প্রান্তর। কোথাও অরণ্য। আবার কোথাও দিগন্তবিস্তারী শস্যভূমি। কোথাও চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি। আবার কোথাও পত্রপুষ্পহীন উদ্ভিদের সমাবেশ। এরকম বিচিত্র প্রকৃতির মৃত্তিকাখণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই ধরিত্রী। মাটির এই রূপবৈচিত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্য ও পরস্পরলগ্নতার মধ্যেও রয়েছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কুশলী নির্মাণের নিদর্শন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; তাদেরকে দেয়া হয় একই পানি; এবং ফলের হিসাবে তাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্টত্ব দিয়ে থাকি।' এখানে 'যারউন্' হচ্ছে ধাতুমূল। তাই এর বহুবচনরূপী ব্যবহার নেই। 'সিন্ওয়ান' (একাধিক শিরবিশিষ্ট) হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'সান্বু'। যেমন 'ক্বিন্ওয়ান' এর একবচন ক্বান্বু। কথাটির অর্থ একমূলে দুই বা ততোধিক কাণ্ড। হজরত ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে একবার রসুল স. বলেছিলেন, পিতৃব্য তার পিতার সানবু (কাণ্ড)। অর্থাৎ পিতামহ মূল এবং পিতা ও পিতৃব্য হচ্ছে ওই মূলের দু'টি কাণ্ড। 'গইরু সিন্ওয়ান' অর্থ এক শিরবিশিষ্ট বা এক কাণ্ডবিশিষ্ট। আর 'আল্উকুল' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে— বর্ণ, গন্ধ, পরিমাপ, আস্বাদ ও সুগন্ধিতে ফলগুলো একটি অপেক্ষা অন্যটি উৎকৃষ্টতর। হাসানের সূত্রে ইমাম তিরমিজি এবং বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত ফলগুলো কোনোটি মিষ্টি এবং কোনোটি টক। এই হিসেবে একটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আলোচ্য বাক্যে উল্লেখিত ফল-মূলের বৈচিত্র বিষয়ক বিবরণও আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় সৃজনকৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌পাকই এ সকল কিছুর একক সৃজক ও নিয়ন্ত্রক। একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফল-মূলের এই বিচিত্র সমারোহ এককভাবে কেবল তাঁরই মহিমা নির্দেশ করে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন মুজাহিদ বলেছেন, একই জনকের ঔরসজাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কত বিচিত্র। কেউ উত্তম। কেউ অধম। হাসান বলেছেন, প্রথমে পৃথিবী ছিলো একটি মাত্র মৃত্তিকাপিণ্ড। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন পবিত্র হস্তের মাধ্যমে মৃত্তিকাপিণ্ডটিকে করলেন খণ্ড বিখণ্ড ও সুবিস্তৃত। কিন্তু পরস্পরসংলগ্ন। ফলে দেখা গেলো কোথাও রয়েছে আদিগন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর। কোথাও সুউচ্চ পর্বতমালা। কোথাও বিশাল সাগর, আবার কোথাও ধু ধু মরু-পাথার। এরপর প্রবাহিত করে দিলেন মৌসুমী বাতাস। সৃষ্টি করলেন মেঘপুঞ্জ। বৃষ্টিপাত হলো। কোথাও জন্ম নিলো শ্যামল উদ্ভিদ। কোথাও ফললো বৈচিত্রময় ফল ও ফসল। আবার কোথাও সৃষ্টি হলো লবনাক্ততা, অনুর্বরতা। একই বৃষ্টিপাতে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথক বৈচিত্র নিয়ে পরিদৃশ্যমান হলো এই পৃথিবী। মানুষের উপমাও এরকম। একই পিতা থেকে শুরু হয়েছে তাদের জন্মপ্রবাহ। সকলের উপরে বর্ষিত হয়ে চলেছে হেদায়েতের সমমাত্রিক বর্ষণ। কিন্তু সে বর্ষণে সিক্ত হচ্ছে কারো কারো হৃদয়। তাদের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কোমলতা, আনুগত্যপ্রবণতা ও বিনয়। আবার কারো কারো অসিক্ত হৃদয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ঔদাসিন্য, অনানুগত্য ও অবিনয়।

হাসান বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ, কোরআন পাঠের অনুষ্ঠানে উপবেশনকারী যখন সেখান থেকে প্রস্থান করে, তখন হয় সে লাভবান, নতুবা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। কল্যাণ অর্জন করতে পারলে হয় লাভবান। আর না করতে পারলে হয় ক্ষতির শিকার। যেমন আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন— 'আর আমি ধারাবাহিকভাবে কোরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও করুণা এবং জালেমদের জন্য বৃদ্ধি করে কেবল অকল্যাণ।'

শেষে বলা হয়েছে—'অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত অনন্যসাধারণ সৃজনশৈলীর প্রতি যদি কেউ জ্ঞানচক্ষু সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে আল্লাহ্‌পাকের একক অস্তিত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিদর্শন অবশ্যই অবলোকন করবে।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌পাকের এই অনির্বচনীয় সৃজনমহিমা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তাই তারা বিশ্বাসী হতে সক্ষম হয় না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরকালকেও অস্বীকার করে বসে। তাই পরকালকে অস্বীকার করার শাস্তি সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

❒ যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা: 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করিব?' উহারাই উহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগেরই গলদেশে থাকিবে লৌহ-শৃংখল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা: মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো?' এখানে 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো?'— প্রশ্নটি 'ক্বওলুহুম' (তাদের কথা) উক্তিটির প্রতি-উক্তি। অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের বক্তব্য-বিষয়। তাদের বক্তব্যে রয়েছে পারলৌকিক জীবনের প্রতি অস্বীকৃতি। উত্থাপিত প্রশ্নটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর তিনি পুনরায় আর সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করতে পারবেন না। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর। কারণ প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত থাকে অভূতপূর্ব অভিপ্রায়, পরিকল্পনা ও পরিমাপ। অংশীবাদীরা একথা স্বীকারও করে। কিন্তু ধ্বংসের পর পুনরায় সৃষ্টি করাকে তারা মনে করে অসম্ভব। পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের ধারণাও এরকম। এটা কি তাদের চরম মূর্খতা নয়?

আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— অংশীবাদীদের সম্মুখে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ দিবালোকের মতো পরিস্ফুট। বিভিন্ন দলিল প্রমাণাদির উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা রসুল স. এর রেসালতকে অস্বীকার করে চলেছে। উপাসনা করে চলেছে দেব-দেবীদের, শুভাশুভের বোধ ও ক্ষমতা তাদের একেবারেই নেই। তাদের এসকল মূর্খজনোচিত কর্মকাণ্ড দেখে রসুল স. বিস্মিত হন। আর তারাও একথা ভেবে বিস্মিত হয় যে, আমাদেরকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে—'তারাই তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— আখেরাতকে অস্বীকার করা, প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। কারণ এতে করে আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করা হয়। আর যিনি অপার ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি তো প্রভুপালক ও উপাস্য হওয়ার যোগ্যও নন।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তাদের গলদেশে থাকবে লৌহশৃঙ্খল।' একথার অর্থ— অংশীবাদীদের গলদেশে রয়েছে ভ্রষ্টতার, অবিশ্বাসের অথবা পাপাসক্তির শিকল, যা থেকে নিষ্কৃতির কোনো সম্ভাবনাই তাদের নেই। অথবা নরকবাসের সময় তাদের কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হবে আগুনের শিকল। কিংবা পুনরুত্থান দিবসে তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে অনল-জিঞ্জির।

শেষে বলা হয়েছে—'তারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' এখানে 'হুম' হচ্ছে জমির ফসল (বিয়োজক সর্বনাম)। বাক্যের মধ্যভাগে শব্দটি বসানো হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, যারা কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কেবল তারাই চিরকাল বসবাস করবে দোজখে। এটাই সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা একথা মানে না। তাদের মতে পাপী বিশ্বাসীরাও চিরস্থায়ী দোজখবাসী হবে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৬

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

❑ মংগলের পরিবর্তে উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদিও উহাদিগের পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মংগলের পরিবর্তে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।' নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো কিছু কামনা করাকে আরবী ভাষায় বলে 'ইস্‌তি'জ্বাল'। 'সাইয়্যিআহ্' অর্থ শাস্তি। 'হাসানা' অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ। 'আলমাছুলাত' অর্থ ওইরূপ শাস্তি, যা দেয়া হয়েছিলো বিগত যুগের কাফেরদেরকে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— মক্কায় মুশরিকেরা ক্ষমা ও নিরাপত্তার বদলে চাইতো শাস্তি। উপহাসচ্ছলে তারা বলতো, হে আল্লাহ্! তোমার নবী ও তোমার কোরআন যদি সত্য হয়, তবে আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো, অথবা অবতীর্ণ করো অন্য কোনো ভয়াবহ গজব। কিন্তু তারা একথা কেনো ভাবেনা যে, বিগত যুগের কাফেরদের উপর অনেক গজব আপতিত হয়েছে। এখনো সেসকল স্থানে রয়েছে গজবের চিহ্ন। তারা ওই সকল গজবের কথা শুনে অথবা গজবের চিহ্ন সমূহ পরিদর্শন করে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয় না কেনো? উল্লেখ্য যে 'মাছুলাতুন',

'মাছালাতুন', 'সাদুক্বাতুন' 'সাদাক্বাতুন'— এ সকল শব্দের মাধ্যমে সব ধরনের শাস্তিকে বুঝানো হয়। শাস্তি নির্ধারিত হয় অপরাধের নিরীখে। তাই 'কিসাস' (বদলা) কেও বলা হয় 'মিছাল' (দৃষ্টান্ত)। যেমন বলা হয় 'আমছালতুর্ রজুলা' (আমি লোকটির কিসাস গ্রহণ করেছি)।

এরপর বলা হয়েছে—'মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।' একথার অর্থ— আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে আত্মঅত্যাচার করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা চিরস্থায়ী ক্ষমা নয়। এখানে ক্ষমা বা মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে অবকাশ। অর্থাৎ বিশ্বাসে, আচরণে ও কথায় পুনঃ পুনঃ সীমালংঘন সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিদান করছেন না। তারা চাইলেও এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত শাস্তিদান আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সাময়িক অবকাশ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক যেমন ক্ষমাশীল, তেমনি কঠোর শাস্তিদাতাও। তাঁর শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই। সুদ্দী বলেছেন, 'আপনার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল'— কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে গোনাহ্গার মুমিনদের জন্য। তাদের জন্য কোরআন মজীদে যতো আয়াত এসেছে, সেগুলোর মধ্যে এই আয়াতটিই সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক। এই আশাব্যঞ্জকতার মাধ্যমে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, তওবা ব্যতিরেকেও মার্জনাপ্রাপ্তি সম্ভব। কারণ তওবাকারীর প্রতি 'সীমালংঘন' কথাটি প্রয়োগ করা যায় না। তওবাকারী তো নিষ্পাপ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সর্বোন্নত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'ইন্না রব্বাকা লাজূ মাগফিরাহ্' (তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল) এবং 'ইন্না রব্বাকা লাশাদীদ' (তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর) — দু'টো উক্তিই বিশ্বাসীদের প্রতি প্রযোজ্য। তবে ক্ষমা ও শাস্তি— দু'টোই নির্ভর করে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের উপর। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইয়াগফিরু লিমাঁইয়্যাশাউ ওয়া ইউ আ'জ্জিবু মাঁইয়্যাশাউ' (তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন)।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে মুরসালরূপে ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী ও ওয়াহেদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি ক্ষমা ও নিষ্কৃতি না থাকতো, তবে কেউই জীবিত থাকতে পারতো না। আর তাঁর পক্ষ থেকে দণ্ডদানের হুঁশিয়ারী না থাকলে মানুষ কাজকর্ম সব বাদ দিয়ে বসে থাকতো কেবল তাঁর রহমতের আশায়।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

❑ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'মুহম্মদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' তুমি তো কেবল সতর্ককারী, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?' একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা তাদের পছন্দমতো মোজেজা দেখতে চাইতো। তাই তারা বলতো, মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো? অর্থাৎ তারা যা চায়, সেরকম কিছু অবতীর্ণ হয় না কেনো?

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমিতো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! অংশীবাদীদের অসংগত উক্তিসমূহের প্রতি দৃকপাত করবেন না। আপনার দায়িত্ব কেবল বার্তা প্রচার করা। আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা। তারা যে রকম চায়, সে রকম কোনো অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করা আপনার দায়িত্বভূত কোনো বিষয় নয়। আপনার পূর্ববর্তী প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিকটে বার্তাবাহক প্রেরিত হয়েছে। তারাও মানুষকে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সজাগ হতে বলেছিলেন। তাদের মতো আপনিও একজন সতর্ককারী। তারা ছিলেন তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য পথ-প্রদর্শক। আপনিও তেমনি আপনার সম্প্রদায়ের (বিশ্বমানবতার) পথ-প্রদর্শক। অবিশ্বাসীদের মনগড়া আবদারের প্রতি তারা কর্ণপাত করেননি, সুতরাং আপনিও অংশীবাদীদের অসংগত আবেদনে সাড়া দিবেন না।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হাদ' অর্থ আল্লাহ্। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— প্রতিটি সম্প্রদায়ের হেদায়েতপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেন আল্লাহ্, অথবা মানুষের হেদায়েতের যোগ্যতা সৃষ্টি করেন আল্লাহ্। যেমন তিনি এরশাদ করেন— 'ইয়াহ্দি মাঁইয়্যাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাক্বীম' (তিনি তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন)। ইকরামা বলেছেন, এখানে 'হাদ' অর্থ রসুল স.। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— রসুল স. শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী নন, তিনি প্রতিটি সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শকও বটে।

শিয়া ও রাফেজীরা বলে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শক ছিলেন হজরত আলী। তাদের মতে আয়াতটির প্রকৃতরূপ এরকম— ওয়া লিকুল্লি ক্বওমিন হাদিন্

আলীউন্ (আলী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক)। কোরআন সংকলনের সময় হজরত আলীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হজরত ওসমান 'আলীউন্' কথাটি বাদ দিয়েছেন। এরকম অপবাদ দেয়ার পর তারা আরো বলে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কারণ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজূন' (আমিই কোরআনের সংরক্ষক)। উল্লেখ্য যে, রাফেজীদের এরকম অপবিশ্বাসকে মেনে নিলে হজরত আলী তো রসুল স. অপেক্ষা অধিক মর্যাদা লাভ করেন। তাদের মতানুসারে তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়— হে রসুল! আপনি তো ভীতিপ্রদর্শনকারী মাত্র। আর আলী হচ্ছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শক। অর্থাৎ পথ প্রদর্শনের যোগ্যতা আপনার নেই, কারণ তা আলীর জন্য নির্ধারিত। এরকম হওয়া কি সম্ভব? কখনোই নয়। সুতরাং তাদের মতামত সর্বোতভাবে পরিত্যজ্য।

আল্লাহ্পাকের জ্ঞান ও শক্তিমত্তা অবিভাজ্য। তিনিই সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। ওই নির্ধারণের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। অবিশ্বাসীদের সকল আবেদন তিনি পূরণ করতে সক্ষম। তাদেরকে হেদায়েত দান করাও তাঁর পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্য তাদের একেবারেই নেই। তাই শত সহস্র অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করলেও তারা কখনোই ইমান আনবে না। তারা যা আদৌ চায় না, তা তাদের উপরে জোর করে চাপানো আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। তাই তিনি রসুলগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, আপনি তো কেবল সতর্ককারী, আর আপনার মতো সতর্ককারী ও পথ-প্রদর্শক প্রেরণ করা হয়েছিলো অতীতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৮

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

❒ স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যাহা আছে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— স্ত্রীজাতি তাদের গর্ভে যা ধারণ করে তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা উত্তমরূপে অবগত। অর্থাৎ গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে না মেয়ে, একজন না জময, পূর্ণ অবয়বধারী না বিকলাংগ এবং তার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত। আর তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, যা অলংঘনীয়।

এখানে 'মা' মাসদারিয়া বা ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। অথবা 'মা' শব্দটি এখানে সংযোজক। 'তামদাদু' শব্দটি এসেছে 'ইযদাদ' থেকে। এটি হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক সকর্মক অথবা অকর্মক ক্রিয়ার রূপ। যেমন বলা হয়, 'ইযদাদাল ক্বওমু আ'লা আশারাহ্' (দলটি দশ জনের অধিক সদস্যবিশিষ্ট)। আরো বলা হয় 'ওয়া নাযদাদু কাইলা বাঈর' (আমি একবার বেশী করে উট দিবো)। এখানকার এই ক্রিয়াটি যদি অকর্মক হয় তবে 'মা' অব্যয়টি হবে ধাতুগত অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ জরায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত। আর হ্রাস-বৃদ্ধি অর্থ ভ্রূণের অবয়ব অথবা সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধি। আর যদি ক্রিয়াটি এখানে সকর্মক হয় তবে 'মা' অব্যয়টি হবে সংযোজক ও ধাতুগত উভয় প্রকার অর্থ প্রকাশক।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, গর্ভকালীন সময়সীমা ছয় মাস। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে কারো স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে, তবে হজরত ওসমানের অভিমতানুসারে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। কারণ সে ব্যভিচারিণী। হজরত ইবনে আব্বাস কিন্তু এই বিধানের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, এভাবে কোরআনের বিধানের মধ্যে বিতণ্ডার সৃষ্টি করলে এ বিতণ্ডা কখনো শেষ হবে না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— সন্তানের গর্ভ ধারণ ও স্তন্য পান করানোর সময় সীমা ত্রিশ মাস। অন্যত্র এরশাদ করেন স্তন্য পান করানোর সময় সীমা দুই বছর। অর্থাৎ দুই বছর পর শিশুর দুগ্ধপান স্থগিত করতে হবে। উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা যেতে পারে যে, দুধ পান করানোর সময়সীমা দুই বছর আর গর্ভধারণের সময়সীমা ছয়মাস। এইভাবে মোট তিরিশ মাস। হজরত ইবনে আব্বাসের এই ব্যাখ্যা শুনে হজরত ওসমান তাঁর অভিমতটি প্রত্যাহার করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে কেউ কোনো উচ্চবাচ্যও করেননি। ফলে ঐকমত্যানুসারে স্থিরিকৃত হয়েছে যে, গর্ভধারণের ন্যূনতম সময়সীমা হচ্ছে ছয়মাস। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, ছয় মাসেও সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং সে অন্য শিশুদের মতো ভালোভাবে বেড়ে উঠে। জীবিতও থাকে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সীমা দুই বছর।

ইমাম বায়হাকী ও দারা কুতনী ইবনে মোবারকের পদ্ধতিতে ধারাবাহিক সূত্রে দাউদ বিন আবদুর রহমান ইবনে জুরাইজ, জুমিলা বিনতে সা'দ থেকে সুনান গ্রন্থে একটি হাদিস সংকলন করেছেন। হাদিসটি এই— উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা দু'বছরের অধিক হতেই পারে না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, গর্ভধারণের সময়কাল দুই বছরের অধিক হয়ই না, যদিও অতিরিক্ত সময়টি একটি সরল গাছের ছায়ার মতো।

ইমাম মালেকের মতানুসারে ও ইমাম শাফেয়ীর এক বক্তব্যানুসারে গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়-পরিসর চার বছর। আর এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে, ওই সময়সীমা সর্বাধিক পাঁচ বছর। হান্নাত বিন সালমা বলেছেন, হরম বিন সানান মাতৃউদরে অবস্থান করেছিলেন চার বছর। তাই তাঁকে হরম বলে ডাকা হতো। হরম বলে বয়োবৃদ্ধকে।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন, ওলিদ বিন মুসলিম একবার ইমাম মালেক বিন আনাসকে বললেন, জননী আয়েশা বলেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা দুই বছরের বেশী হতে পারে না এবং ওই দীর্ঘতম গর্ভধারণ একটি সরল বৃক্ষের ছায়া সদৃশ। একথা শুনে ইমাম মালেক বললেন, সুবহানাল্লহ্! কেউ কি এরকম কথা বলতে পারে! মোহাম্মদ উজলানের সহধর্মিণী ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। ছিলেন সত্যভাষিণী। তাঁর স্বামীও ছিলেন সত্যবাদী। আমার ওই প্রতিবেশিনী তিনবার গর্ভবতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি গর্ভবহনের সময়সীমা ছিলো চার বছর।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, জননী আয়েশার বর্ণনাটি কিয়াসসম্ভূত ছিলো না। কারণ এ ধরনের সমস্যায় কিয়াসের অবকাশ নেই। বরং কথাটি তিনি শুনেছিলেন রসুল স. থেকে। তাই হাদিসটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। অর্থাৎ কথাটি জননী আয়েশার নয়, রসুল স. এর। আর একটি মারফু হাদিস রয়েছে, যা মোহাম্মদ বিন উজলানের সহধর্মিণীর উক্তির চেয়েও অধিক নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি যদি সরাসরি রসুল স. এর বাণী হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে জননী আয়েশার কথাটিকে আর ভুল বলা যাবে না। আর ওলিদ বিন মুসলিমের বর্ণনা সত্য হলেও, ইমাম মালেকের উদ্ধৃত উক্তিটি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এবং তাঁর প্রতিবেশিনীর সাক্ষ্যটিকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হলেও ভুলের আশংকা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ দীর্ঘ চার বৎসর ধরে কোনো নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকলে কী করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে চার বৎসরের পুরোটা সময়ই সে গর্ভবতী ছিলো? গর্ভধারণ ছাড়াও তো দীর্ঘকাল ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ওই নারীর দুই বৎসর বা ততোধিক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ ছিলো এবং তার অন্তঃসত্ত্বার সময়সীমা ছিলো দুই বৎসর অথবা দুই বৎসরের নিম্নে— এমনো তো বলা যেতে পারে। যদি বলা হয় গর্ভবতী নারী তার উদরাভ্যন্তরে চার বছর ধরে ভ্রূণের নড়াচড়া অনুভব করেছে, তবে এর জবাবস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উদরাভ্যন্তরে কেবল ভ্রূণেরই আলোড়ন অনুমিত হয় না, আবদ্ধ বায়ুর আলোড়নও অনুমিত হতে পারে। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক রমণী নয় মাস যাবৎ তার উদরে কোনো কিছুর নড়াচড়া অনুভব করলো। বন্ধ হয়ে গেলো তার রজঃস্রাব। উদর স্ফীত হতে লাগলো ক্রমান্বয়ে। এক সময় উপস্থিত হলো

প্রসবকাল। কিন্তু দেখা গেলো রমণীটি কেবল পানি নির্গমন করে চলেছে। এভাবে তার স্ফীত উদর স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো না। আরেকটি ঘটনা— এক লোক কয়েক বৎসর যাবৎ ছিলো নিরুদ্দেশ। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পেলো তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। হজরত ওমর ওই রমণীটিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চাইলেন। হজরত মুয়াজ তখন বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! শরিয়ত আপনাকে ওই রমণীটির প্রাণ সংহারের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু উদরের সন্তান সংহারের অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি। তাই আমি বলি, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনি আপনার বিধান কার্যকর করুন। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু সন্তানটিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, তার বয়স কয়েক বৎসর। তার সামনের পাটিতে দু'টি দাঁতও গজিয়েছিলো। রমণীটির স্বামী শিশুটিকে দেখে বলে উঠলো, কাবার প্রভুপালকের শপথ! এই শিশুটিতো আমারই ঔরসজাত শিশু। হজরত ওমর রমণীটিকে দণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি দিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুই বৎসরের অধিক অন্তঃসত্ত্বার সময়সীমা হজরত ওমর কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলো।

উপরে বর্ণিত ঘটনাটি একটি অনুক্ত প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে— হজরত ওমর কর্তৃক ঘোষিত দণ্ডাদেশটি রহিত হলো কেনো? জবাবে বলা যেতে পারে যে, ওই লোকটি তার স্ত্রীর প্রসবকৃত সন্তানকে নিজের ঔরসজাত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। বলেছিলো, কাবার প্রভুপালকের শপথ এই শিশু আমারই ঔরসজাত। শরিয়তের বিধান হচ্ছে— শয্যা যার সন্তান তার। উপপতির মাধ্যমে কোনো রমণী যদি গর্ভধারণ করে থাকে তবুও ওই সন্তান তার স্বামীর বলে মেনে নেয়া হয়। আর এ ক্ষেত্রে স্বয়ং স্বামীই ওই সন্তানকে তার নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ কারণেই হজরত ওমর দণ্ডাদেশটি রহিত করেছিলেন।

মাসআলা ঃ একই উদরে এক সঙ্গে কতজন শিশু জন্মলাভ করতে পারে, তার কোনো সীমারেখা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এক সঙ্গে চারটি শিশুর জন্মলাভের কথা জানা যায়। ইমাম আবু হানিফাও এরকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইয়েমেনের একজন বয়োপ্রবীণ আমাকে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী পাঁচ বার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো। প্রতিবারেই জন্ম নিয়েছিলো পাঁচটি করে শিশু সন্তান। আমি বলি, ভারতবর্ষের একটি বহুল প্রচারিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, ইউরোপের অধিবাসী জনৈক বিচারকের স্ত্রী একই সঙ্গে একশত শিশু সন্তান প্রসব করেছে এবং সকলেই জীবিত রয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, স্বনামধন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, রজঃপাত হচ্ছে জরায়ুর কোপ। গর্ভস্থিত শিশুর উপর কুপিত জরায়ুর প্রভাব পড়লে শিশুর অনিষ্ট হয়। রজঃস্রাবের রক্ত হচ্ছে গর্ভস্থিত শিশু-ভ্রূণের খাদ্য। সেই রক্ত বেরিয়ে এলে

তার খাদ্য ঘাটতি তো দেখা দিবেই। গর্ভধারণের পর ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে বলেই শিশুর অবয়ব স্বাভাবিকভাবে পূর্ণত্ব লাভ করতে থাকে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'জরায়ুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তা জানেন।' একথার অর্থ— গর্ভস্থিত শিশুর অবয়বগত ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়, তবে আল্লাহ্ তা জানেন। আবার উত্তরোত্তর যদি তার সুসমঞ্জস প্রবৃদ্ধি ঘটে, তবু তা আল্লাহ্র জ্ঞানের অধীনেই ঘটে। কখনো কখনো এরকমও হয় যে, গর্ভবতী রমণীর ঋতুস্রাবের কারণে শিশুর প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে গর্ভকালীন সময়সীমা। প্রসবকাল অতিক্রম করার পরেও কখনো কখনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। গর্ভাবস্থায় পাঁচ দিন ঋতুস্রাব হলেও দেখা যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে নয় মাস পাঁচ দিনের মাথায়। মোট কথা, শিশুখাদ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে গর্ভকালীন সময়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। হাসান বসরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'গইদুল আরহাম' বলে নয় মাসের কম গর্ভাবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর 'যিয়াদাত' বলে বুঝানো হয়েছে নয় মাসের অধিক গর্ভাবস্থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'পরিবর্তন' বা হ্রাস-বৃদ্ধি বলে বুঝানো হয়েছে যথাক্রমে গর্ভপাত ও সুষম গর্ভকে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৯, ১০

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ

وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○

❒ যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

❒ তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্লাহের জ্ঞানগোচর।

'গইব' অর্থ অদৃশ্য এবং 'শাহাদত' অর্থ দৃশ্যমান। সুরা জ্বিনের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। 'কাবীর' অর্থ সর্বোচ্চ। অর্থাৎ আল্লাহ্র তুলনায় সকল কিছুই গৌণ। আর তিনি সকল কিছুর উপরে পূর্ণ প্রভাবশীল। এভাবে প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— প্রকাশ্য, গোপন সকল কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ব। আর তিনি সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাধারী।

পরের আয়াতের (১০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বাক্যাবলী এবং নিশিথের আত্মগোপন ও দিবসের প্রকাশ্য বিচরণ— সকল কিছুই আল্লাহ্র নিকটে সমভাবে জ্ঞানগোচর। এখানে 'মান আসারর' অর্থ

যারা মনের কথা মনেই রেখে দেয়। আর 'মান জহারা' অর্থ যারা মনের কথা অপরের নিকটে প্রকাশ করে। 'মানহুয়া মুসতাখফিম' অর্থ যে অপরের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে। আর 'সারিবুম্ বিন্নাহার' অর্থ যে দিবাভাগে সর্বসমক্ষে বিচরণ করে। 'সুরুব' থেকে গঠিত হয়েছে 'সারাবা' অথবা 'সারিবুন্।' এর অর্থ আগমন করা, নিষ্ক্রান্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, 'সারাবুন' অর্থ পথ এবং 'সারিবুন' অর্থ পথিক। কিত্বী বলেছেন, যারা দিনভর বিভিন্ন কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে, তাদেরকে বলে সারিবুম বিন্নাহার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুস্তাখফিম' অর্থ ব্যভিচারী। আর 'সারিবুম্ বিন্নাহার' অর্থ গোপনে ব্যভিচারী হওয়া সত্ত্বেও যে নিজেকে জনসমক্ষে ভালো মানুষ হিসেবে জাহির করে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১১

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

☐ মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে ; উহারা আল্লাহের আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি ব্যতীত উহাদিগের কোন অভিভাবক নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহ্র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।' একথার অর্থ— প্রতিটি মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্পাক নিয়োজিত রেখেছেন ফেরেশতামণ্ডলীকে। তারা প্রহরী হিসেবে ওই মানুষটির সামনে ও পিছনে অবস্থান করে এবং আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ানুসারে তাকে বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে এবং লিখে রাখে তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ।

এখানে 'মুয়াক্বিবাত্' (প্রহরী) শব্দটি হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'মুয়াক্বিবাহ্'। বাগবী লিখেছেন, 'মুয়াক্কাবুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'মুয়াক্কাবাতুন্'। আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে 'মুয়াকক্বিবাত'। যেমন, 'রিজালুন' শব্দটি বহুবচন।

আর 'রিজালাতুন্' হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন। এভাবে এখানে 'মুয়াক্কিক্বাতুন' কথাটির অর্থ হবে ফেরেশতামণ্ডলী, যারা দিবসে ও নিশিথে গমনাগমন করে। এক দল আসে আরেক দল চলে যায়। তারা মানুষের আমলের খবরাখবর সংগ্রহ করে এবং তাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

জ্ঞাতব্য ঃ ইয়ালাতুল খিফা গ্রন্থে কেনানা আদুবী থেকে বর্ণিত হয়েছে হজরত ওসমান একবার মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! একজনের সঙ্গে সবসময় কত জন ফেরেশতা থাকে? তিনি স. বললেন, দু'জন। একজন থাকে ডানে আরেকজন থাকে বাঁয়ে। ডানের ফেরেশতাই নেতৃস্থানীয়। কেউ সৎকর্ম করলে সে লিখে নেয় দশটি পুণ্য। আর অসৎকর্ম করলে বাম পাশের ফেরেশতা নেতা ফেরেশতাকে বলে, আমি কি তার পাপ লিখে রাখবো? নেতা বলে, অপেক্ষা করো সে তওবা অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। এভাবে তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর নেতা ফেরেশতা তাকে পাপ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয় এবং বলে এতো বড়ই দুর্জন। আল্লাহ্ এর সাহচর্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এ লোকের আল্লাহ্র ভয় ও লজ্জা কোনোটাই নেই। এই ফেরেশতাদ্বয় সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— মানুষের বাকস্ফূরণের সাথে সাথে সতত প্রস্তুত লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তা লিখে রাখে। আর দু'জন ফেরেশতা থাকে প্রত্যেকের সম্মুখে ও পশ্চাতে। এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে।' সম্মুখের ফেরেশতা অধিকার করে থাকে মানুষের ললাটদেশ। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে মস্তক অবনত করে, ওই ফেরেশতা তাকে চির উন্নত শির করে দেয়। আর যে গর্বভরে মস্তক উন্নত করতে চায়, তাকে সে করে দেয় অবনমিত ও লাঞ্ছিত। ওষ্ঠদেশে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। তারা কেবল ওই ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত দরূদ শরীফের হেফাজত করে। মুখমণ্ডলের হেফাজতের দায়িত্বে রয়েছে একজন ফেরেশতা। সে হেফাজত করে মুখমণ্ডলের, যাতে মুখগহ্বরে প্রবেশ না করতে পারে সাপ-বিচ্ছু অথবা ক্ষতিকর কোনো কিছু। চক্ষুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে দু'জন ফেরেশতা। এভাবে সর্বমোট দশজন ফেরেশতা প্রতিটি মানুষের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাদের দায়িত্ব পালনের নিয়মটি এরকম— রাতের দায়িত্ব শেষ করে দশজন চলে যায়। আসে দিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা। দিন শেষে তারা চলে গেলে নতুন দশজন এসে প্রহরায় নিয়োজিত হয়। এভাবে দিনে ও রাতে নতুন নতুন ফেরেশতার দল পালাক্রমে প্রতিটি মানুষের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পন্ন করে চলে। অপর দিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দিবাভাগে আগমন করে ইবলিস স্বয়ং। আর রাত্রিভাগে আগমন করে তার বংশধরেরা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধসূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের নিকট দিবস রজনীর ফেরেশতারা পালাক্রমে গমনাগমন করে। ফজর ও আসর হচ্ছে তাদের গমনাগমনের সময়। রাতের ফেরেশতারা উষাকালে উড়ে যায় ঊর্ধ্বজগতের দিকে। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তবু তিনি প্রত্যাগত ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার দাসদেরকে তোমরা কী অবস্থায় দেখে এলে? একদল বলে, আমরা গিয়েই তাকে নামাজরত অবস্থায় পেয়েছিলাম। আগমনের সময়ও দেখে এলাম নামাজ পাঠরত অবস্থায় (এভাবে নামাজী ও বে-নামাজী সম্পর্কে প্রহরী ফেরেশতারা তাদের আপনাপন সাক্ষ্য উপস্থিত করে)।

'মিম্‌বাইনি ইয়াদাইহি' অর্থ সম্মুখের প্রহরী। আর 'ওয়ামিন খলফিহি' অর্থ— এবং সম্মুখের দিক বাদে অন্যান্য দিকের প্রহরী। অর্থাৎ দক্ষিণের, বামের ও পশ্চাতের প্রহরী।

'তারা আল্লাহ্র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটির অর্থ— ওই সকল প্রহরী ফেরেশতা তাদের প্রহরাধীন মানুষটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে তার নিয়তি বহির্ভূত বিপদাপদ থেকে। কিন্তু নিয়তি নির্ধারিত বিপদাপদের ক্ষেত্রে তারা সরে দাঁড়ায়।

মুজাহিদ বলেছেন, প্রতিটি মানুষের প্রহরায় রয়েছে একজন করে ফেরেশতা। সে সুপ্তি ও জাগরণে তার হেফাজত করে। সকল ক্ষতিকারক বিষয়াবলী থেকে তাকে বাঁচায়। বিপদাপদ আপতিত হলে বলে, সরে যাও। কিন্তু ওই বিপদ যদি তকদিরের নির্ধারণ হয়, তবে সেই বিপদ থেকে সে বাঁচাতে পারে না। কা'ব আহবার বলেছেন, আল্লাহ্র আদেশে ফেরেশতারা মানুষের হেফাজত করে। আহারে-বিহারে, এমনকি নগ্ন অবস্থাতেও তারা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে রত। এভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে ইবলিসের দল মানুষকে ছিনিয়ে নিতো। 'রক্ষণাবেক্ষণ করে'— কথাটির অর্থ, মানুষের কার্যকলাপের সংরক্ষণ করে, এরকমও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে 'মুয়াক্কিবাত' কথাটির মর্মার্থ হবে— দক্ষিণে ও বামে নিয়োজিত ফেরেশতাদ্বয় মানুষের সৎ ও অসৎ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'যখন সাক্ষাৎকারী দল তার সাথে সাক্ষাৎ করে ডান ও বাম থেকে।' একথার অর্থ— ডান ও বাঁয়ের প্রহরী ফেরেশতারা রক্ষণাক্ষেণ করে মানুষের কার্যকলাপ।

'মিন্ আমরিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র আদেশে। দু'রকম অর্থ হতে পারে কথাটির— ১. ওই ফেরেশতারা একের পর এক গমনাগমন করে কেবল আল্লাহ্র নির্দেশে। ২. আল্লাহ্র নির্দেশেই তারা মানুষের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যানুসারে কথাটি হবে 'মুয়াক্কিবাত' শব্দের বিশেষণ। আর দ্বিতীয়

ব্যাখ্যানুসারে কথাটি সম্পৃক্ত হবে 'ইয়াহ্ফাজুনাহু' (তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে) এর সঙ্গে। আমরিল্লাহ্ (আল্লাহ্র আদেশ) বলতে আল্লাহ্র শাস্তিকেও বুঝায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আদেশে আল্লাহ্র বান্দাকে রক্ষা করে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে। তাদের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। মানুষের জন্য আবেদন জানায় অবকাশ প্রদানের জন্য অথবা শাস্তিকে শিথিল করার জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মিন আমরিল্লাহ্' কথাটির অর্থ হবে 'বিআমরিল্লাহ্।' অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশের কারণেই তারা আল্লাহ্র বান্দাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'প্রহরী' অর্থ ওই প্রতিরক্ষাবাহিনী যারা রাজার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বিশেষভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'তার রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটির অর্থ ওই প্রহরী ফেরেশতারা রসুল স. এর রক্ষণাবেক্ষণ করে— এরকমও হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে— রসুল স. এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মনোনীত করা হয়েছে, যারা মানব ও দানবের দিক থেকে সম্ভাব্য সকল অনিষ্টের আড়াল হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ বিন জায়েদ বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমের বিন তুফাইল এবং আরবাদ বিন রবীয়া সম্পর্কে। আবু সালেহের সূত্রে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আমের বিন তুফাইল আমেরী এবং আরবাদ বিন রবীয়া আমেরী রসুল স. এর পবিত্র দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। রসুল স. তখন সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মসজিদে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় আমেরীদ্বয় প্রবেশ করলো মসজিদে। আমের ছিলো অন্ধ, কিন্তু রূপবান। মানুষ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। দরবারে উপস্থিত একজন বললেন, আমের বিন তুফাইল আসছে। রসুল স. বললেন, আসতে দাও। আল্লাহ্পাক যদি তার কল্যাণ চান, তবে তিনিই তাকে পথপ্রদর্শন করবেন। আমের উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই তবে কী পাবো? তিনি স. বললেন, অন্যান্য মুসলমান যে অধিকার পায় তুমিও তা পাবে। সুখে দুঃখে হবে তুমি সকল মুসলমানের সাথী। সে বললো, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার এই রাজ্যপাট যদি আমাকে দান করতে সম্মত হন, তাহলে আমি মুসলমান হতে পারি। তিনি স.বললেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়-নির্ভর। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। সে বললো, তাহলে নগরবাসীর প্রশাসক হিসেবে আপনি থাকুন। আর বেদুঈন যাযাবরদের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করুন আমাকে। তিনি স. বললেন, এরকমও সম্ভব নয়। সে বললো, তাহলে? রসুল স. বললেন, আমি

তোমাকে ঘোড়ার লাগামগুলো দিতে পারবো। আর তুমি ঘোড়ায় আরোহণ করে জেহাদ করতে পারবে। সে বললো, আমার নিকট তো অনেক যুদ্ধাশ্ব রয়েছে। ঠিক আছে, আপনি একটু উঠুন। আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই। রসুল স. গাত্রোত্থান করলেন। আমেরের সঙ্গে নিরিবিলি কিছু সময় কাটালেন। আমের তার সাথী আরবাদকে আগেই বলে রেখেছিলো, মোহাম্মদ যখন আমার সঙ্গে আলাপে মগ্ন থাকবে তখন তুমি অতর্কিতে পিছন থেকে তাকে তলোয়ারের আঘাত করে শেষ করে দিবে। কথাবার্তা এক সময়ে কথাকাটাকাটির পর্যায়ে চলে গেলো। সুযোগ বুঝে আরবাদ গিয়ে দাঁড়ালো রসুল স. এর পশ্চাতে। ভাবলো, এই তো সুযোগ। কিন্তু খাপ থেকে কিছুতেই সে তার তলোয়ার বের করতে পারলো না। বার বার চেষ্টা করেও বিফল হলো। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে রসুল স. তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার নিকটে। বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তো মুনতাক্বিম (প্রতিশোধ গ্রহণকারী)। সুতরাং তুমি আমার শত্রুকে আমার জিম্মায় ছেড়ে না দিয়ে সরাসরি প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আকাশ ছিলো মেঘমুক্ত। তবুও অকস্মাৎ বজ্রপাত ঘটলো। আর সে বজ্র পড়লো আরবাদের মাথার উপর। বজ্রাহত হয়ে নিমেষের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে। ভয়ে পলায়ন করলো আমের। কিন্তু পালিয়ে যেতে যেতে বললো, অতি শীঘ্রই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্ব ও রণকুশলী যুবক যোদ্ধাদের এনে আমি এই উপত্যকা ভরে ফেলবো। মোহাম্মদের বদ্দোয়ায় নিহত আরবাদের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বো। রসুল স. বললেন, আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তোমাকে হতাশ করে দিবে। আমের দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো এক সলুলী রমণীর গৃহে। সেখানে রাত্রি যাপনের পর অতি প্রত্যুষে সে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলো। ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অতিদ্রুত উপস্থিত হলো একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে। বিকট হুংকার ছেড়ে বললো, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! এবার বেরিয়ে এসো। প্রত্যক্ষ করো আমার শৌর্যবীর্য। এরপর সে কিছু উত্তেজনাগন্ধী কবিতা আবৃত্তির পর বললো, শপথ লাত ও উজ্জার। আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যে যদি মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে পৌঁছে যেতে পারি, তবে আমি তাদের দু'জনকেই এই বর্শা দ্বারা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবো। আল্লাহ্পাক অদৃশ্য জগৎ থেকে পাঠিয়ে দিলেন এক ফেরেশতাকে। ওই ফেরেশতা এসে তার পাখা দ্বারা একটি ঝাপটা মারলো আমেরের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। তার উরুর উপর উদগত হলো অস্বাভাবিক একটি মাংশপিণ্ড। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে দৌড় দিলো ওই সলুলী রমণীর গৃহের দিকে। কিন্তু

দৌড়াতে গিয়ে উরুর মাংশপিণ্ডটি দেখে বললো, এতো দেখছি উটের কুজের মতো একটি মাংশপিণ্ড। এর যন্ত্রণায় তো আর বাঁচি না। তার ইচ্ছে হলো, কমপক্ষে ওই রমণীর গৃহে উপস্থিত হওয়ার পর তার মৃত্যু হোক। সে কষ্টেসৃষ্টে পুনরায় তার ঘোড়ায় আরোহণ করলো। ঘোড়া ছুটছিলো দিশেহারার মতো। আর ওই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো সে।

সা'লাবী বর্ণনা করেছেন, আরবাদ ধ্বংস হয়েছিলো বজ্রপাতে এবং আমের নিপাত হয়েছিলো প্লেগে। তাদের ওই ঘটনাই এই সুরার দশ ও এগারো আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তারা সমভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর (রসুল স. এর) রক্ষণাবেক্ষণ করে।' তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরবাদ বিন কায়েস ও আমের বিন তুফাইল মদীনায় রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। আমের বললো, মোহাম্মদ, আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে তুমি আমাকে কি দিবে? তিনি স. বললেন, অন্য মুসলমানরা যা পায় তুমিও তাই পাবে। আর সকল মুসলমানের যে কর্তব্য, তোমার উপরেও সেই কর্তব্য বর্তাবে। আমের বললো, তোমার ইন্তেকালের পর তোমার এই রাজত্বের অধিকারী কি আমি হতে পারবো? তিনি স. বললেন, না। তুমি অথবা তোমার সম্প্রদায়ের কেউই তা পাবে না। রসুল স. এর এমতো জবাব শুনে আমের ক্ষিপ্ত হলো। সে উঠে গিয়ে আরবাদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করে এলো। সে গোপনে আরবাদকে বললো, আমি মোহাম্মদকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিরিবিলি আলাপ শুরু করবো। ওই সময় তুমি সুযোগ বুঝে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। ফিরে এসে আমের বললো, মোহাম্মদ, আমি তোমার সঙ্গে একা একা কিছু কথা বলতে চাই। রসুল স. তার সঙ্গে উঠে বাইরে গেলেন এবং একা একা আলাপচারিতা শুরু করলেন তার সঙ্গে। খুনের নেশা পেয়ে বসলো আরবাদকে। সে তার কৃপান কোষমুক্ত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার হাত কেঁপে উঠলো অজানা আশংকায়। এমন সময় রসুল স. পিছনে তাকালেন। তার দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরে তিনি স. সরে গেলেন সেখান থেকে। ধরা পড়ার ভয়ে আমের ও আরবাদ দ্রুত সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলো। পথিমধ্যে তাবারকম নামক স্থানে পৌছলে আকস্মিক বজ্রপাতে মারা গেলো আরবাদ। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'স্ত্রী জাতির প্রত্যেকের গর্ভে' থেকে 'যদিও তিনি মহাশক্তিশালী' (আয়াত ৮-১৩) পর্যন্ত।

সা'লাবীর বর্ণনায় ওই ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের নাম বলা হয়েছে আরবাদ বিন রবীয়া। আর তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে আরবাদ বিন কায়েসের কথা। সা'লাবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে আমেরের মৃত্যু হয়েছিলো প্লেগে। আর তিবরানীর বর্ণনায়

আমেরের মৃত্যুর উল্লেখ নেই। বর্ণনা দু'টোর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে — সা'লাবীর বর্ণনা দীর্ঘ এবং তিবরানীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই।' একথার অর্থ— কোনো জাতিই সুদিনের মুখ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না তারা সুদিন ফিরে পাওয়ার জন্য দুর্দিনে চেষ্টা সাধন না করে। আর কোনো জাতির প্রতি যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু আপতিত করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার সাধ্যও কারো নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।

এখানে 'মা বিক্বওমিন্' অর্থ জাতির সুদিন বা শুভদিন। 'মা বিআনফুসিহিম' অর্থ তারা কল্যাণ কামনা না করে কামনা করে অকল্যাণের (অকল্যাণকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে)।

'ইজা আরাদাল্লহু বিক্বওমিন্' অর্থ চেষ্টা সাধনার পরেও যদি আল্লাহ্ তাদের প্রতি অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, শাস্তি প্রদান করতে চান। 'ফালা মারাদ্দা লাহু' অর্থ তবে তা প্রতিরোধ করবার কেউ নেই। 'মারাদ্দুন' শব্দটি ধাতুমূল, তবে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। 'মিঁউওয়াল' অর্থ বিপদ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। হতে পারে না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে এরকম হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমার প্রিয়তম রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ যেনো তার সর্বনাশ ডেকে না আনে। আমার কোপ ও শাস্তি প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১২, ১৩

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۗ

☐ তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

❑ বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই তোমাদেরকে দেখান বজ্র-বিদ্যুৎ এবং তিনিই আকাশে সঞ্চার করেন পুঞ্জীভূত মেঘ। উল্লেখ্য যে, বজ্র ও বৃষ্টির মধ্যে আশংকা ও আনন্দ দু'টোই রয়েছে। যেমন, বজ্রপতনের ফলে সম্ভাবনা রয়েছে মৃত্যুর। অতিবৃষ্টির কারণে কখনো কখনো দেখা দেয় ভূমিধস। আবার কখনো হয় ফসলের ক্ষতি। আবার পরিমিত বৃষ্টিপাতের মধ্যে রয়েছে দাবদাহ থেকে মুক্তির আনন্দ। ফল ও ফসলের অধিক ফলনের আশা। এখানে 'সাহাবাতুন' এর বহুবচন 'সাহাবুন্'। এর অর্থ বৃষ্টি। সাহাবুন্ ও সিহাবুন্ এর শাব্দিক অর্থ আকর্ষণ। যেহেতু শূন্য মার্গ থেকে বায়ুর আকর্ষণে বৃষ্টি ঝরে, তাই এর নাম 'সিহাব' বা বৃষ্টি। কামুস অভিধান রচয়িতা এরকম বলেছেন।

'ছাক্বিলাতুন' এর বহুবচন হচ্ছে 'ছিক্বাল'। এর অর্থ ঘন বা ভারী। অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মেঘ অথবা বৃষ্টিভরা মেঘ।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।' একথার অর্থ— ফেরেশতাগণ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলে ঘোষণা করে আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স.কে একবার বজ্রধ্বনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে এক ফেরেশতা, মেঘমালা যার কর্তৃত্বাধীন। তার কাছে রয়েছে অগ্নি-যষ্টি, যদ্দারা সে মেঘমালা পরিচালনা করে।

জ্ঞাতব্যঃ তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এবং আহমদ, তিরমিজি ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কিছু সংখ্যক ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলো, রা'দ (বজ্রধ্বনি) কি? তিনি বললেন, মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা। আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে সে মেঘমালা পরিচালনা করে। তারা বললো, শব্দ হয় কিসের? তিনি বললেন, ওদেরই শব্দ। হজরত জাবের থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মেঘমণ্ডলীর উপর এক ফেরেশতাকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। সে বিক্ষিপ্ত মেঘগুলোকে একত্রিত করে। তার হাতে রয়েছে একটি আগুনের লাঠি। যখন সে তার আগুনের লাঠিটি উত্তোলন করে তখনই বিদ্যুৎ চমকায়। যখন হুংকার দেয়, তখন ধ্বনিত হয় বজ্রনির্ঘোষ। আর যখন ওই লাঠি দ্বারা মেঘকে প্রহার করে, তখন হয় বজ্রপাত।

'মিন্ খীফাতিহী' অর্থ সভয়ে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে। 'খীফাতিহী' এর 'হী' সর্বনামটি এখানে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি নিবদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে ওই ফেরেশতামণ্ডলীর প্রতি, যারা আকাশের মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বজ্রধ্বনি শুনে পাঠ করতে হয়— সুবহানাল্লাজি ইউসাব্বিহুর্ রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফতিহী ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। বজ্রাহত ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যু হবে ধর্মসম্মত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের বজ্রের আওয়াজ শোনা মাত্র কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেন— সুবহানা যাঁই ইউসাব্বিহুর্ রা'দু বিহামদিহি ওয়াল মালাইকাতু মিন খীফাতিহি। আর বলতেন, এটা পৃথিবীবাসীদের জন্য একটি হুঁশিয়ারী।

জুহাক সূত্রে জুয়াই বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রা'দ ফেরেশতা মেঘমালার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। যেদিকে নির্দেশ দেয়া হয়, সেদিকেই সে মেঘ পরিচালনা করে। তার অঙ্গুরীয়ের ঢাল সাতসাগরের পানিতে ভরপুর। সে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করলে আকাশের সকল ফেরেশতা সমস্বরে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা শুরু করে। তখনই শুরু হয় বৃষ্টি। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার দাসেরা যদি আমার নির্দেশ মতো চলতো, তবে আমি তাদের রাতকে করতাম বর্ষণমুখর এবং দিনকে করতাম সূর্যকরোজ্জ্বল। প্রাত্যহিক কাজকর্মে তারা কোনো অসুবিধাই বোধ করতো না। বজ্রধ্বনির ভীতিও তাদেরকে আচ্ছাদিত করতো না। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ। বায়যাবী আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর করেছেন এভাবে, রা'দের গুরুগম্ভীর নাদ শুনে অন্য ফেরেশতারাও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকে। চিৎকার করে সকলে বলতে থাকে সুবহানাল্লহ্, ওয়াল হামদুলিল্লাহ্। এরকমও হতে পারে যে— রা'দ স্বয়ং তসবিহ্ পাঠে মগ্ন হয়। অর্থাৎ মেঘের গর্জনে ঘোষিত হয় আল্লাহ্‌র এককত্ব ও শক্তিমত্তা ও অনুকম্পা। আমি বলি, এই ব্যাখ্যাটি তখনই গ্রহণীয় হবে, যখন রা'দ বলতে কোনো একজন ফেরেশতা প্রমাণিত হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন।' এখানে 'সওয়াইক্ব' অর্থ ধ্বংস সাধনকারী বিদ্যুৎ। অর্থাৎ বজ্রপাত, যা কারো উপরে নিপতিত হলে তাকে ভস্মীভূত করে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে।' একথার অর্থ— মেঘ, বিদ্যুৎ ,বজ্র ইত্যাদি দেখেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র এককত্ব

ও অতুলনীয়-অবিভাজ্য ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। 'জ্বিদাল' অর্থ তুমুল বাকবিতণ্ডা। শব্দটি গঠিত হয়েছে, 'জ্বাদ্‌লুন্‌' থেকে। জ্বাদ্‌লুন্‌ অর্থ প্রাণ সংহার করা।

বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন আলী বাকের বলেছেন, বজ্রপাত বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের উপরে আপতিত হতে পারে কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র জিকিরে রত তাদের উপর আপতিত হয় না।

হজরত আনাস থেকে নাসায়ী ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে একবার রসুল স. তাঁর এক সহচরকে প্রেরণ করলেন এক গোত্রাধিপতির নিকটে। তিনি তাকে ইমানের প্রতি আহ্বান জানালেন। গোত্রাধিপতি বললো, তুমি যে পালনকর্তার প্রতি আমাকে আহ্বান জানাচ্ছো, সে কিসের তৈরী? লোহার, তামার, না সোনা-রূপার। একথা শুনে রসুল সহচর ফিরে এলেন। বিষয়টি গোচরে আনলেন তাঁর। তিনি স. তাঁকে পুনরায় প্রেরণ করলেন। একই কথা শুনে ফিরে আসার পর আবারও প্রেরণ করলেন তাঁকে। কিন্তু সে বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন আল্লাহ্‌ তার উপর বজ্রপাত ঘটালেন। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো তার। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'এবং তিনি বজ্রপাত ঘটান' থেকে আলোচ্য আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

বাগবী লিখেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো, আরবাদ বিন রবীয়া সম্পর্কে। সে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমার পালনকর্তা কোন বস্তু দ্বারা তৈরী? মোতি, ইয়াকুত না স্বর্ণ দ্বারা? একথা বলার কারণে বজ্রাঘাতে মৃত্যু ঘটেছিলো তার।

হাসান বসরীকে একবার আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে অসম্ভব গোঁড়া এক পৌত্তলিক ছিলো। তাকে আল্লাহ্‌র দিকে আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. তাঁর কয়েকজন সহচরকে পাঠালেন। সে সহচরবৃন্দকে বললো, তোমরা আমাকে মোহাম্মদের প্রভুপালকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছো। কিন্তু আগে বলো, সেই প্রভুপালক কোন বস্তু দ্বারা গঠিত— সোনা, চাঁদি, লোহা না তামা? তার এরকম অশালীন উক্তি শুনে সহচরবৃন্দ ফিরে এসে রসুল স.কে জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যে লোকের কাছে আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, তার চেয়ে বড় কাফের মনে হয় আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় নাই। রসুল স. বললেন, পুনরায় গমন করো। তারা পুনরায় সেখানে গেলেন। এবারেও সে একই প্রশ্ন করে বসলো। আরো বললো, কী ভাবছো তোমরা? মোহাম্মদের আদেশে আমি এমন এক পালনকর্তাকে স্বীকার করবো, যে কোনো দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেনি।

তার সঙ্গে তো আমার কোনো পরিচয়ই নেই। সহচরগণ আবার ফিরে এলেন। সব কথা শুনে রসুল স. তাঁদেরকে পুনরায় লোকটির কাছে পাঠালেন। সে আগের মতোই কথাবার্তা শুরু করে দিলো। সহসা শুরু হলো মেঘের সমারোহ। শুরু হলো গুরুগম্ভীর বজ্র-নিনাদ। হঠাৎ বজ্রপাত হলো লোকটির উপর। বজ্রানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সে। সহচরগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। যাত্রা করলেন রসুল স. এর দরবার অভিমুখে। রাস্তায় দেখা হলো আরো কয়েকজন রসুল সহচরদের সঙ্গে। তাঁরা রসুল স. এর দরবার থেকে ফিরে আসছিলেন। তাঁরা প্রত্যাগমনকারী দলটিকে দেখে বললেন, লোকটি তাহলে বজ্রাহত হয়েই মরলো। প্রত্যাগমনকারী সহচরবৃন্দ বললেন, তোমরা জানলে কি করে? তারা জবাব দিলেন, রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে 'আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার দ্বারা আঘাত করেন' (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

শেষে বলা হয়েছে— 'যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।' বাগবী লিখেছেন, হাসান বসরী বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আর তিনি দুর্দমনীয় প্রতিশোধপরায়ণ। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আর তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী। আবু উবায়দা বলেছেন— কঠিন শাস্তি আরোপকারী। কেউ কেউ বলেছেন— মহাকুশলী, অপ্রতিরোধ্য। কামুস রচয়িতা লিখেছেন— অদৃশ্য চক্রান্তসহ কৌশলে কার্যসিদ্ধকারী। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কৌশল বাস্তবায়নকারী, শক্তিমত্তার অধিকারী, কঠোর শাস্তিদানকারী, প্রতিশোধ প্রতিষ্ঠাকারী, অতুলনীয় শৌর্যের অধিকারী ইত্যাদি যে কোনো একটি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মিহাল' শব্দের 'মীম' বর্ণটি শব্দের মূল বর্ণ নয়। এমতো ক্ষেত্রে 'হাওল', 'হিলা' অথবা 'হাইলুলাহ্' ধাতুমূল থেকে শব্দটি বিধিবহির্ভূত নিয়মে গঠিত। তাই হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— প্রচণ্ড শক্তিশালী। হজরত আলী অর্থ করেছেন— কঠিনভাবে আটককারী।

আলোচ্য আয়াতে রসুল স. এর বিরুদ্ধাচারীদের জঘন্য পরিণামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এইমর্মে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অংশীবাদী, মূর্খতার অন্ধকার গহ্বরে তোমরা আমূল প্রোথিত। আমার রসুল তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন পবিত্র বিশ্বাসের দিকে। প্রকৃত ধর্মাদর্শের দিকে। অথচ তোমরা ক্রমাগত তাঁর বিরোধিতা করে চলেছো। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা শত বিরোধিতা করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বিচ্যুতও করতে পারবে না তাঁকে তাঁর ধর্মমত থেকে। কারণ তোমাদের মতাদর্শ কল্পনানির্ভর। আর তাঁর মতাদর্শ বাস্তবোচিত।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

❒ আল্লাহের প্রতি আহ্বানই বাস্তব; যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা; তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মুখে পানি পৌছিবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌছিবার নহে। সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদিগের আহ্বান নিষ্ফল।

❒ ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহের প্রতি সিজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাহাদিগের ছায়াগুলিও— সকাল ও সন্ধ্যায়।

'লাহু দা'ওয়াতুল হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানই বাস্তব। এই আহ্বান হচ্ছে সত্যের আহ্বান। এই চিরসত্য আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, চিরসত্য এই দাওয়াত বা আহ্বানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাসনার্হ। সুতরাং উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁর। আর সকল অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য প্রার্থনার হস্ত উত্তোলন করতে হবে তাঁরই দিকে। বিশুদ্ধচিত্তে প্রার্থনা করাকেও দা'ওয়াতুল হাক্ব বলা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রার্থী হতে হবে কেবল তাঁরই সকাশে। এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পেক্ষাপটে 'হাক্ব' (সত্য) কথাটির মর্ম হবে ওই সকল বিষয়বস্তু, যা বাতিলের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনও বলা যায় যে, এখানে 'হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্। তিনিই সত্য। সুতরাং তাঁর দিকের সকল আহ্বানই সত্য।

একটি সন্দেহঃ 'হক' অর্থ যদি আল্লাহ্ হয়, তাহলে দেখা যায় বাক্যটি অসম্পন্ন। আল্লাহ্‌পাকের আহ্বান তো আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় এই আহ্বানের সঙ্গে অন্য কেউ সংশ্লিষ্ট থাকবে কি করে?

সন্দেহভঞ্জনঃ এই বিষয়টি সন্দেহের অতীত যে, আল্লাহ্ই সত্য। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে 'হাক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান বুঝানোর জন্য। বাতিলের আহ্বান যেমন বাতিল, তেমনি হকের আহ্বানও হক। বাক্যটি স্বয়ং একটি দলিল। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানই বাস্তব বা সত্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, দাওয়াতে হাক্ব অর্থ তওহীদ (আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লাইলাহা ইল্লাল্লহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই)— এ কথার সাক্ষ্য দেয়াই হচ্ছে দাওয়াতে হাক্ব। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তওহীদ এবং সত্যের প্রতি আহ্বান আল্লাহ্পাকের সঙ্গেই বিজড়িত।

আমের ও আরবাদকে যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ বলে মেনে নেয়া হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তারা কিছু বুঝে উঠবার আগেই আল্লাহ্পাকের অদৃশ্য সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। আর তা বাস্তবায়িত হলো রসুল স. এর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে। সত্যিকারের রসুল যদি তিনি না হতেন, তবে আল্লাহ্পাক কি তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করতেন? আর আয়াতটি যদি কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত না করা হয়, তবে বুঝতে হবে সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে শাসানোর উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হচ্ছো, কিন্তু জেনে রেখো, আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী এবং তিনি তাঁর রসুলের আবেদন মঞ্জুরকারী। এমনও বলা যায় যে, তাদেরকে তিরস্কার বা শাসানোর উদ্দেশ্যে নয়, তাদের বিভ্রান্তি ও অপবিশ্বাস প্রকাশ করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তাঁকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে কোনোই সাড়া দেয় না তারা; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তার মুখে পানি পৌঁছাবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে যে সকল দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে তারা তো নিঃসাড়। সুতরাং তারা কীভাবে তাদের পূজকদের আবেদন পূরণ করবে? তাদের দৃষ্টান্তটি এরকম— পানির কাছে কেউ তার হস্ত প্রসারিত করলো, এমতাবস্থায় পানি কি আপনা আপনি তার মুখে প্রবেশ করবে?

'ওয়াল্লাজীনা ইয়াদউ'না মিন দুনিহী' অর্থ যারা তাঁকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে। এখানে 'যারা' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর 'ইয়াদউ'না' (আহ্বান করে) কথাটির কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদ হচ্ছে প্রতিমা, দেব-দেবী ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে দেব-দেবীদেরকে ডাকে, তাদের পূজা করে এবং তাদের নিকট

প্রার্থনা জানায়। অথবা এখানে আল্লাজীনা (যারা) কথাটির মর্ম হবে— ওই সকল বস্তু, যাদেরকে পূজা করে কাফেরেরা। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— এই কাফেরেরা যে সকল দেব-দেবীর পূজা করে।

'লা ইয়াস্‌তাজীবুনা লাহুম বিশাইইন' অর্থ তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দেয় না। অর্থাৎ ওই সকল জড় প্রতিমা কাফেরদের বিপদমুক্তি বা কল্যাণজনক কোনো আবেদন কবুল করতে পারে না। এখানে 'লা ইয়াস্‌তাজীবুনা' কথাটির অর্থ হবে লাইয়ুজীবুনা (কবুল করতে পারে না)।

এখানে 'ইল্লা কাবাসিত্বি কাফ্‌ফাইহি' (শুধুমাত্র তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে) একটি ব্যতিক্রমী বাক্য। কিন্তু যে কথার ব্যতিক্রম সে কথাটি এখানে উহ্য। আবার 'বাসিত্ব' শব্দটির সম্বন্ধপদও এখানে উহ্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ালেই কি হবে? আপনা আপনি কি তার মুখে পানি ঢুকবে?

'ওয়ামা হুয়া বিবালিগিহ' অর্থ যা তার মুখে পৌঁছবার নয়। অর্থাৎ পানি একটি নিষ্প্রাণ পদার্থ। তাই তার নিকট হাজারো কাকুতি-মিনতি করলেও সে পিপাসিত ব্যক্তির মুখে প্রবেশ করবে না। অংশীবাদীদের দৃষ্টান্তও এরকম। তারা জড় প্রতিমার নিকট প্রার্থী হয়। কিন্তু সেগুলো অনুভূতি ও স্পন্দনহীন। তাই শোনার, বোঝার ও আবেদন মঞ্জুর করার কোনো যোগ্যতাই তাদের নেই। এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন মুজাহিদ ও আতা। হজরত আলী থেকেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ভাষ্যকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে। বলেছেন, বিগ্রহবন্দনাকারীরা বিগ্রহগুলোর নিকটে বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত করে। কিন্তু তাদের এমতো আবেদন নিষ্ফল। কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ— কোনো কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিগ্রহপূজকদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো— যে তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সে পানির নিকট গমন করলো। হস্ত প্রসারিত করে আঁজলা ভরে পানি তুলতে চাইলো। কিন্তু খালি হাতে পানি ধারণ করার সাধ্য তার নেই। সুতরাং সে কীভাবে পানি তুলে এনে পান করবে? আর বিগ্রহগুলোও তো নিষ্প্রাণ। কারো লাভ অথবা ক্ষতি করার সামর্থ্য তাদের একবারেই নেই। তাই তাদের উপাসনা করা খালি হাতে পানি ধারণ বা সংরক্ষণ করার মতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপরকে উপাস্য স্থির করার দৃষ্টান্তটি এরকম— কোনো পিপাসিত ব্যক্তি পানি পান করার উদ্দেশ্যে পানির মধ্যে তার হাত প্রবেশ করালো, কিন্তু আঁজলা তৈরী করলো না। সোজা আঙ্গুলে ঘি তোলার মতো যদি সে সোজা হাতে পানি তুলতে চায়, তবে কি সফল হবে?

শেষে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান নিষ্ফল।' এখানে 'দ্বলাল' অর্থ ভ্রান্তি বা নিষ্ফলতা। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌র নিকটে যে প্রার্থনা জানায় তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাই তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে অন্তরায়। সে অন্তরায় অভেদ্য।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলোও— সকাল ও সন্ধ্যায়। এখানে 'মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ত্বাওয়া' (আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে) কথাটির অর্থ— ফেরেশতাকুল ও বিশ্বাসবান মানুষ ও জ্বিন আনন্দিতচিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়।

'কারহান' অর্থ অবিশ্বাসী ও কপটচারী। তারাও ধর্মনিষ্ঠদের প্রভাবে বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করে। অথবা বিপদ-মুসিবত তাদেরকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করায় যদিও তারা এ ব্যাপারে অপ্রসন্ন।

'ওয়া জিলালুহুম' অর্থ তাদের ছায়াসমূহ। ছায়া সব সময় তার মূলের অনুসারী। তাই সেজদাবনতদের ছায়াগুলোও সেজদাবনত হয়। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে সেজদাবনত হওয়ার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের বৃত্তে আশ্রয় গ্রহণ করা। নিজের ইচ্ছাকে অপসারিত করে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে চলা। আর ছায়াগুলোর সেজদাবনত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ই ছায়া প্রতিচ্ছায়াগুলোকে তাঁর ইচ্ছেমতো সংকুচিত অথবা প্রসারিত করেন। কখনো করেন প্রলম্বিত, কখনো সংকুচিত।

'আল্লাহ্‌র প্রতি সেজদাবনত থাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে......' এই আয়াতটির মর্মার্থ এমনও হতে পারে যে, এখানে 'যা কিছু আছে' অর্থ হবে— ফেরেশতা ও ইমানদারদের যতো আত্মা আছে। আর 'তাদের ছায়াগুলো' অর্থ হবে— ফেরেশতা ও ইমানদারদের ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব বা আকার। রসুল স. মানুষের প্রকাশ্য দিকটিকে অন্ধকারের সঙ্গে এবং অপ্রকাশ্য দিকটিকে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি স. সেজদাবনত অবস্থায় দোয়া করতেন এভাবে— হে চিরঅমুখাপেক্ষী প্রভুপালক! আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'টো দিকই তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যাটিই সুসঙ্গত। সূর্যালোক যেখানে পৌঁছতে পারে না, সেটাই তো ছায়া, যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীন কোনো কিছু তো সেজদা করার যোগ্য নয়। অতএব বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ছায়া আলোছায়ার ছায়া নয়। বরং এই ছায়া হচ্ছে মানুষের একাংশের অস্তিত্ব, যা সেজদায় অংশ গ্রহণের যোগ্য।

'গুদুউয়্যি ওয়াল আসাল' এর শাব্দিক অর্থ সকাল-সন্ধ্যায়। আর মর্মার্থ, সব সময় (সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল— এভাবে সকল সময়)। 'আসাল' শব্দটি 'আসিল' এর বহুবচন। আসর মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়কে বলে আসাল।

নির্দেশনাঃ যাঁরা ১৫ সংখ্যক আয়াত আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিন।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১৬

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

❒ বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'তিনি আল্লাহ্।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহের পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কি তাহারা আল্লাহের এমন শরীক করিয়াছে যাহারা আল্লাহের সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে-কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে! বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

প্রথমে বলা হয়েছে, 'বলো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলো, আল্লাহ্।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে প্রশ্ন করুন, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালনকর্তা কে? এই প্রশ্নটির উত্তর চিরন্তন। অর্থাৎ সত্যানুসারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী নির্বিশেষে সকলেই একথা স্বীকার করে, আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে হে আমার রসুল! সকলের পক্ষে আপনিই এই ইতিবাচক প্রশ্নটির উত্তরটি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিন। বলুন, আল্লাহ্। এভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচার করলে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র নাম শুনে হবে আনন্দিত। আর অবিশ্বাসীরা পাবে শিক্ষা।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. একবার মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে? তারা বললো, তুমিই বলো। তখন আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে প্রত্যাদেশ করলেন, বলুন, আল্লাহ্।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে।' আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। সেই বক্তব্যটি সহযোগে মর্মার্থ দাঁড়াবে, কী বিস্ময়! তোমরা আল্লাহ্‌কে আকাশ পৃথিবীর পালনকর্তা বলে মানছো, অথচ প্রার্থী হচ্ছো গায়রুল্লাহর (আল্লাহ্ ছাড়া অপরের) নিকটে। এটা কি চরম মূর্খতা নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।' একথার অর্থ— ভেবে দেখো, ওই মূর্তিগুলো কীভাবে উপাস্য হতে পারে। তোমাদের কোনো উপকার-অপকার তারা করবে কীভাবে, তারা নিজেরাও তো নিজেদের লাভ-ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারা কাউকে আক্রমণও করতে পারে না, আবার আক্রমণ প্রতিহত করার সাধ্যও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' এখানে 'আ'মা' অর্থ অন্ধ। আর 'বাসীর' অর্থ চক্ষুষ্মান। 'জুলুমাত' অর্থ অন্ধকার এবং 'নূর ' অর্থ আলো। এখানে 'অন্ধ' অর্থ জ্ঞানান্ধ, অপরিণামদর্শী বা অদূরদর্শী। আর 'চক্ষুষ্মান' অর্থ দূরদর্শী, বিচক্ষণ। যারা চক্ষুষ্মান, তারা সহজেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার্হ কেউ নেই। কিন্তু অন্ধরা এই সহজ ও চিরন্তন রহস্যটি বুঝতে অসমর্থ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, অন্ধ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বাতিল উপাস্যকে, যারা তাদের উপাসকদের সম্পর্কে অজ্ঞ ও অক্ষম। আর চক্ষুষ্মান বলে বুঝানো হয়েছে ওই পবিত্র সত্তাকে যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

'অন্ধকার ও আলো কি এক' কথাটির অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান হচ্ছে অন্ধকার। আর সত্যানুসরণ হচ্ছে আলো। আলো অন্ধকার যেমন সমান নয়, তেমনি ইমান ও কুফরও এক কথা নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে।' এখানে 'আম' অব্যয়টি 'বাল' (বরং বা তবে) অর্থে ব্যবহৃত। আলোচ্য বাক্যটি একটি আজ্ঞাসূচক প্রশ্ন। এখানে 'শুরাকা' (শরীক)শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে 'খলাকু' (সৃষ্টি করেছে)। অর্থাৎ যে বাতিল শরীকগুলো তারা নিজেরাই নির্মাণ করেছে। আবার সৃজন ও নির্মাণের মধ্যে যে চিরন্তন পার্থক্যরেখাটি রয়েছে, তারা তা অবলোকনও করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা যে উপাস্যগুলোকে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে শরীক করেছে, তারা সম্পূর্ণতই সৃজনক্ষমতারহিত। নির্মাণ ক্ষমতাও তাদের নেই। জীবন্ত কোনো সত্তাও তারা নয়। প্রকৃত অবস্থা যদি এই-ই হয়, তবে দিনের পর দিন অংশীবাদিতাকে তারা এভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছে কেনো? কেনো ঘটিয়ে চলেছে বিভ্রান্তি আর বিভ্রান্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকই সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা। অবয়ব বিশিষ্ট, নিরাবয়ব, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ভালো-মন্দ— সকল কিছুই তিনি ইচ্ছেমতো সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টি করতে চাইলে সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। না চাইলে কোনো কিছুই প্রকাশিত হয় না। তাই ইবাদত গ্রহণের যোগ্যতা তিনি ছাড়া অন্য কারো নেই। মুতাজিলারা কতোইনা অজ্ঞ। তারা বলে মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। একথা বলে তারাও অংশীবাদকে প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং তারাও এক ধরনের অংশীবাদী। তাদের অংশীবাদিতা প্রকাশ্য (জলি) নয়। বরং খফি (সূক্ষ্ম) ও আখফা (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম)।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া হুয়াল ওয়াহিদুল ক্বহ্‌হার (তিনি এক, পরাক্রমশালী)। 'ওয়াহিদ' অর্থ এক। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন পালনকর্তা হিসেবে এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি উপাস্য হিসেবেও অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যাবলীতে তিনি এক ও অসমকক্ষ। এই বিশাল সৃষ্টি তাঁর নাম ও গুণাবলীর অতি দূরবর্তী প্রতিচ্ছবি ও একটি ঝলক মাত্র। ছায়া কখনো মূলের অংশ নয়। সর্বোপরি তিনি হচ্ছেন আনুরূপ্যবিহীন (বেমেছাল)। 'আল ক্বহ্‌হার' অর্থ চির বিজয়ী। অর্থাৎ তাঁর প্রতিপক্ষ কেউ নেই। হতে পারে না। কীভাবে হবে? তিনি চিরবিদ্যমান, চিরঞ্জীব। আর সৃষ্টি অনস্তিত্ব-নির্ভর, পরিবর্তনপ্রবণ, ক্ষয়প্রবণ। সত্তাগতভাবে সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভাব্য। আর তাঁর পবিত্র সত্তা অনিবার্য ও উদাহরণ রহিত। তাই তিনি অমুখাপেক্ষী ও অজেয়। আর সৃষ্টি মুখাপেক্ষী, অবনমিত ও চিরপরাজিত।

জ্ঞাতব্যঃ 'তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মতো শিরিক করেছে'— এই আয়াতাংশের প্রেক্ষাপটে ইবনে জুরাইজের একটি বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি বিভিন্ন সূত্রপরম্পরায় উপনীত হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত মা'কাল বিন ইয়াসার পর্যন্ত। বিবরণটি এই— রসুল স. একবার আজ্ঞা করলেন, পিপিলিকার চলার গতির চেয়েও সূক্ষ্মভাবে শিরিক তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। আমি কি বলবো, কীভাবে তোমরা ওই সূক্ষ্ম শিরিক থেকে মুক্ত থাকতে পারবে? সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, প্রতিদিন তিন বার এই বলে দোয়া করবে— হে আমার আল্লাহ্! জ্ঞাতসারে শিরিক করা থেকে তোমার আশ্রয় যাচ্ঞা করি। আর অজ্ঞাত শিরিক থেকে তোমারই সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করি। জেনে রেখো, এটাও শিরিক— যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ ও অমুকে আমাকে সাহায্য করেছে। আবার এটাও শিরিক, যদি কেউ বলে— অমুক লোক না থাকলে অমুকে আমাকে শেষ করে দিতো।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ○

❒ তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে, উপত্যকাসমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে তখন যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায়। এইভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়া থাকেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরস্থিত আবর্জনা বহন করে।' 'ওয়াদি' অর্থ উপত্যকা। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটির বহুবচন রূপ 'আওদিয়াহ্।' যে সকল নদী-নালা দিয়ে অত্যধিক পানি প্রবাহিত হয়, সেগুলোকেও আওদিয়াহ্ বলা যায়। পানি প্রবাহের বিষয়টি ওই সকল প্রণালী বা নদী-নালার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় রূপকভাবে। আবার সকল স্থানে সমান বৃষ্টিপাত হয় না। তাই বৃষ্টিতে সকল নদী সমান ভাবে প্লাবিত হয় না। তাই 'আওদিয়াহ্' শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে অনির্দিষ্টবাচকরূপে।

'পরিমাণ আনুযায়ী প্লাবিত হয়' কথাটির অর্থ সকল নদী তো এক রকম নয়। কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বৃহৎ। কোনোটি সংকীর্ণ, কোনোটি প্রশস্ত। আবার কোনোটি গভীর, কোনোটি অগভীর। তাই সেগুলো প্লাবিত হয় তাদের ধারণক্ষমতা অনুসারে।

'আসসাইলু' অর্থ প্লাবনের পানি, যা প্রবাহিত হয় তটিনীতরঙ্গরূপে। 'জাবাদান' অর্থ ফেনপুঞ্জ, ভাসমান আবর্জনা। 'রবিয়্যান' অর্থ স্বচ্ছ সলিল। অর্থাৎ প্লাবনের স্বচ্ছ পানি বহন করে ভাসমান আবর্জনা সমূহকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে তখন, যখন অলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়।' এখানে 'ইউক্বিদুনা' (উত্তপ্ত করে) কথাটির কর্তৃবাচক শব্দটি (মানুষ) উহ্য রয়েছে। অলংকার তৈজসপত্র ইত্যাদি উত্তপ্ত করে মানুষই— একথা সর্বজনবিদিত। তাই এখানে কর্তার উল্লেখ করা হয়নি। 'ইক্বাদ' অর্থ কোনো বস্তু গলানোর জন্য আগুনে উত্তপ্ত করা। 'মিম্মা' শব্দটির মিন (থেকে) অব্যয়টি এখানে উপক্রমণিকা হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মানুষ যে বস্তুগুলো গলানোর জন্য আগুনে উত্তপ্ত করে, সেগুলোতেও প্লাবনের পানির মতো ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। ফলে পানির উপরিভাগে যেমন ফেনা বা আবর্জনা ভেসে ওঠে, তেমনি ফেনা বা আবর্জনা ভেসে ওঠে গলিত বস্তুর উপরিভাগে। 'মা ইউক্বিদূনা' অর্থ যা কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় —সোনা, রূপা, লোহা, তামা বা অন্য ধাতব বস্তু। সব রকমের বিগলনযোগ্য ধাতব পদার্থই কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

'ইবতিগাআ হিলইয়াতিন আও মাতাই'ন' অর্থ অলংকার বা অন্য কোনো তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে। যেমন সোনা, চাঁদি গলানো হয় অলংকার নির্মাণের জন্য। তামা, পিতল গলিয়ে ফেলা হয় বাসন-কোসন প্রস্তুত করার জন্য। আবার যুদ্ধোপোকরণ, কৃষি উপকরণ, যানবাহন ইত্যাদির জন্য বিগলিত করা হয় লোহাকে।

'জাবাদুম মিছলুহূ' অর্থ ওইরূপ আবর্জনা। অর্থাৎ বন্যার পানির উপরে যেরূপ আবর্জনা ভেসে ওঠে, সেরূপ ভেসে ওঠে গলিত পদার্থের উপরে আবর্জনা। এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।' এ কথার অর্থ— উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যকে পরিস্ফুট করেন। আকাশের বৃষ্টি মাটিতে পতিত হয়ে যেমন প্লাবিত করে মাঠ-ঘাট, প্রান্তর ও নদী-নালা, তেমনি কোরআন মজীদ ও ইতোপূর্বের আকাশী পুস্তকগুলোর মাধ্যমে নভজ জ্ঞানের বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে ভরে তোলে মানুষের অন্তরের প্রান্তর। নদী ও নিম্নভূমিসমূহ যেমন তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবনের পানি ধারণ করে, তেমনি মানুষও তার যোগ্যতানুসারে ধারণ করে আকাশী জ্ঞানের প্লাবন। এ জ্ঞান অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন, অনিঃশেষ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ হয় পৃথিবী ও পরবর্তী

পৃথিবীর সমূহ কল্যাণ। মানবজাতি কতোভাবে যে এ জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হয় তার ইয়ত্তা নেই। অথবা আল্লাহ্‌র অপার জ্ঞান-ভাণ্ডারের তুলনা দেয়া যেতে পারে ধাতব পদার্থনিচয়ের সাথে। ধাতব পদার্থ গলিয়ে বিভিন্নভাবে মানুষ তার হৃদয়ের ও পার্থিবতার প্রয়োজন মেটায়। প্রস্তুত করে চিত্তরঞ্জক বহুবিধ অলংকার। নির্মাণ করে যুদ্ধাস্ত্র, যানবাহন, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জ্ঞান উদ্‌গত হয় প্রবৃত্তিপরায়ণ মস্তিষ্ক থেকে। তাদের জ্ঞান শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত, অস্থির, অস্থায়ী ও সংশয়াকীর্ণ। পানির উপরিভাগে ভাসমান খড়কুটো, আবর্জনা ও ফেনার মতো, স্রোত যাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এদিকে ওদিকে। এসকল বর্জ্য মানুষের কোনো উপকারেই আসে না। অথবা তাদের জ্ঞান উত্তাপে গলিত পদার্থনিচয়ের উপরে ভাসমান গাদ বা ফেনার মতো— যেগুলোকে অপসারণ করেই নির্মাণ করতে হয় নিখাদ অলংকার ও প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সত্য ও কল্যাণকর। আর প্রবৃত্তিপ্রসূত ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত জ্ঞান অসত্য ও অকল্যাণকর। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক এভাবে সত্য ও অসত্যকে এখানে পরিস্ফুট করে দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন।'

এখানে 'জুফায়ান' অর্থ ওই সকল বর্জ যা পানিতে ভাসমান ফেনার মতো অথবা উত্তপ্ত ও গলিত ধাতুর উপরের খাদ ও গাদের মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'জাফা' ও তিনের অধিক বর্ণ বিশিষ্ট 'আজফা' সমার্থক। 'জুফাআ' অর্থ বিক্ষিপ্ত। যেমন বলা হয় 'জ্বাফাআতির রীহু' (বায়ু বিক্ষিপ্ত)।

'যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়' অর্থ পানি ও ধাতু স্বস্থানে অবস্থান করে। মঙ্গলজনক জ্ঞানের উপমাও তেমনি। স্বস্থানে তা স্থির ও অচঞ্চল। তাই মানুষ মঙ্গলজনক জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে। এভাবে উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ্ কঠিন ও জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তোলেন। কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, এখানে বিশ্বাসবানদের জন্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি স্বস্তিদায়ক বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তিটি হচ্ছে— অসত্য প্রকাশ্যতঃ উন্নত পরিলক্ষিত হলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অপসারণযোগ্য। অচিরেই অসত্যের ভাসমান প্রভাব বিদূরিত হবে এবং চিরভাস্বর হয়ে উঠবে মহান সত্য, যার নাম ইসলাম।

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

❐ মংগল তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না তাহাদিগের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকিত উহারা মুক্তিপণস্বরূপ তাহা দিত। উহাদিগের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদিগের আবাস; উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

আলোচ্য আয়াতে মর্মার্থ হচ্ছে— তাদের জন্যই কল্যাণ যারা তাদের প্রতিপালককে স্বীকার করেছে। কিন্তু যারা স্বীকার করেনি তাদের অবস্থা হবে কতোইনা শোচনীয়। পৃথিবীর সকল সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ যদি তাদের কাছে থাকে, তবুও তারা তা মুক্তিপণস্বরূপ প্রদান করে পুনরুত্থান দিবসের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা পেতে চাইবে। কিন্তু সে সুযোগ তারা পাবে না। তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের চিরকালীন আবাস। আর জাহান্নাম কতোইনা নিকৃষ্ট আবাস।

এখানে 'আলহুসনা' শব্দটি সাধারণ কর্মপদের বিশেষণ। অথবা বিশেষণ একটি অনুক্ত সন্নিহিত কর্মপদের। অর্থাৎ তারা আপন প্রতিপালকের ইসলামের আহ্বান মেনে নিয়েছে। যথানিয়মে কার্যকর করেছে তাঁর বিধানাবলী। অথবা যারা সাড়া দিয়েছে তাদের পালনকর্তার আহ্বানে।

'আল্লাজীনা লাম ইয়াসতাজীবু' অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেয়নি। অর্থাৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এমতাবস্থায় 'লিল্লাজীনা' কথাটির 'লাম' (জন্য) অব্যয়টির সম্বন্ধ সূচিত হবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইয়াদ্বরিবু' (বর্ণনা করেন) কথাটির সঙ্গে। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয় দলের স্বরূপ দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'লিল্লাজীনা ইয়াসতাজীবু' বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত 'আল হুসনা' কথাটির বিধেয়। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— কল্যাণ, উত্তম প্রতিদান বা জান্নাত তাদের জন্য, যারা তাদের পালনকর্তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'আল্লাজীনা লাম ইয়াসতাজীবু' (যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি) বাক্যটি স্বস্থলে উদ্দেশ্য হবে। আর 'লাও আন্‌না লাহুম' কথাটি হবে বিধেয়।

'লাফ্তাদাও বিহী' অর্থ— মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতো। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং তার সমপরিমাণ সম্পদ যদি তাদের কাছে থাকতো, তবে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্তে তারা মুক্তিপণরূপে সবকিছু দিয়ে দিতো।

'উলাইকা লাহুম সুউল হিসাব' অর্থ— তাদের জন্য কঠোর বা নিকৃষ্ট হিসাব। ইব্রাহিম নাখ্য়ী বলেছেন, কথাটির অর্থ, শেষ বিচারের দিনে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হিসাব সম্পন্ন হবে। তবে কোনো অপরাধীকেই মার্জনা করা হবে না।

'ওয়ামা'ওয়াহুম জাহান্নাম ওয়াবি'সাল মিহাদ' অর্থ— এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; তা কতোইনা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের বাসস্থান এবং পরিচ্ছদ হবে আগুনের। আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বাসস্থান হিসেবে জাহান্নাম নিকৃষ্টতম।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২

أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ط إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ
الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

❐ তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে যে ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া জানে সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।

❐ যাহারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অংগীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না,

❐ এবং আল্লাহ্ যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ণ রাখে, ভয় করে তাহাদিগের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে,

❒ এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে— ইহাদিগেরই জন্য শুভ পরিণাম—

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হে আমার রসুল! আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর অবতরিত বিষয়াবলীকে যে সত্য বলে জানে, তার সমতুল্য কি ওই ব্যক্তি যার অন্তর্চক্ষু অন্ধ? কেবল বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এখানে অন্ধ অর্থ অদূরদর্শী, অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। এরকম অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে সক্ষম নয়। এক বর্ণনায় এসেছে, এখানে উল্লেখিত প্রথমোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত হামজা অথবা হজরত আম্মার। আর অন্ধ ব্যক্তি হচ্ছে আবু জেহেল।

'উলুল আলবাব' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন, যারা তাদের বোধ ও বুদ্ধিকে অতিরিক্ত আবেগ ও ক্ষতিকর শৈথিল্য থেকে মুক্ত রাখে।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে।' একথার অর্থ— আত্মার জগতে আল্লাহ্ প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? সকল রূহ সমস্বরে জবাব দিয়েছিলো, অবশ্যই— সেই অঙ্গীকার যারা পূর্ণ করে চলে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।' একথার অর্থ— এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

আলোচ্য আয়াতে 'প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে' কথাটিতে বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা। আর 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না' কথাটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার কথা।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে।' এখানে সকল নবী রসুল ও সকল আসমানি কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এসকল বিষয় বিশ্বাসের বৃত্তভূত। আর বিশ্বাসবানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহমর্মিতা ও শিষ্টাচারের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টিও ওই আদেশের অন্তর্ভূত। বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, আমিই আল্লাহ্। আমিই রহমান। আমিই রহমতের সৃজক। আমার রহমান নাম থেকে রহম

(অনুগ্রহ) শব্দটিও আমা কর্তৃক নির্বাচিত। যে একে জড়িয়ে রাখবে, আমিও তাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে রাখবো। আর যে একে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। আবু দাউদ। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি সৃজনের পর দণ্ডায়মান হলো রহম (অনুগ্রহ বা দয়া)। জড়িয়ে ধরলো আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন কটিদেশ। আল্লাহ বললেন, কি বলতে চাও? রহম বললো, হে দয়াময়! এই স্থানটি তার, যে সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে জড়িয়ে রাখবে, আমিও তাকে জড়িয়ে রাখবো আমার সঙ্গে। আর যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করবে, আমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। একথা বলার পর রসুল স. উচ্চারণ করলেন, হে আমার পালনকর্তা অবশ্যই এতে আমি তুষ্ট। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে বাগবী, হাকেম ও মোহাম্মদ বিন নসর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিনটি বস্তু আশ্রয় গ্রহণ করবে আরশের নিচে— কোরআন মজীদ, আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধন। কোরআন প্রত্যায়ন করবে আল্লাহ্র বান্দাকে বা সাক্ষী হবে আল্লাহ্র বান্দার পক্ষে। দু'টি দিক রয়েছে কোরআনের— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর আত্মীয়তার বন্ধন ঘোষণা করবে, শোনো হে মানুষ! যে আমাকে অটুট রেখেছে, আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন।

....

জ্ঞাতব্যঃ কোরআনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক দু'টো একে অপরের পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয় (একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো)। অপ্রকাশ্য দিকটি আবার অনুধাবনের অতীতও নয়। তবে অপ্রকাশ্য দিকটি সাধারণবোধ্য নয়। যারা জ্ঞানে সুগভীর ও জ্ঞানপ্রবীন, তারাই কেবল অপ্রকাশ্য দিকটির মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম। বিষয়টি এরকম— যেমন হজরত মুসাকে বলা যেতে পারে আত্মা ও তার অনুসারী বনী ইসরাইলকে আত্মার শক্তি। এভাবে ফেরাউনকে কু-রিপু বললে, তার অনুসারী কিবতীদেরকে বলা যেতে পারে কু-রিপুর তাড়না। কিন্তু এরকম করলে তা হবে কোরআনের অর্থগত পরিবর্তন। বরং এরকম বলা যায় যে, বাতেন (অপ্রকাশ্য) অর্থ কোরআনের আত্মা। আর জাহের (প্রকাশ্য) অর্থ কোরআনের অবয়ব। যেমন নামাজের বাহ্যিক অর্থ নামাজের আনুষ্ঠানিকতা। আর অভ্যন্তরীণ অর্থ একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও পরিশুদ্ধতা। জাকাতও তেমনি প্রকাশ্য অর্থে দান খয়রাত। আর অপ্রকাশ্য অর্থে বিত্তহীনদের প্রতিপালনের মাধ্যমে অন্তর থেকে সম্পদের মোহ দূরীভূত করে দেয়া।

....

হজরত আনাস বিন মালেকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দীর্ঘায়ু ও জীবিকার প্রশস্ততা যদি কারো কাম্য হয়, তবে সে যেনো স্বজন-বন্ধন অটুট রাখে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমাকে এমন বিষয়ের আজ্ঞা করুন, যা আমাকে স্বর্গের নিকটবর্তী করবে এবং দূরে সরিয়ে রাখবে দোজখ থেকে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত কোরো। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুর শরীক কোরো না। নামাজ পাঠ কোরো। জাকাত প্রদান কোরো। আর স্বজন বন্ধন বজায় রেখো। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ওই ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সমতা রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ তার কোনো আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলে, সেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে-ই, যে তার সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়ের সঙ্গে স্বউদ্যোগে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার শিষ্টাচারের উপরে সর্বাধিক অধিকার কার? রসুল স. বললেন, তোমার জননীর। সে বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জননীর। সে পুনরায় বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জননীর। সে আবার বললো, তারপর? তিনি স. বললেন, জনকের। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত রয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. বললেন, তোমার জনকের পরে নৈকট্যের ক্রমানুসারে অন্যান্য আত্মীয়ের। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পিতার পরলোকগমনের পর তার বন্ধু বান্ধবদেরকে মান্য করাও পিতৃমান্যতার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা আপন আপন বংশের পরিচয় জেনে রেখো। একত্রে রেখো আত্মীয়স্বজনকে। রক্ত সম্পৃক্ত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মধ্যে রয়েছে সম্প্রীতি, সম্পদগত স্বাচ্ছন্দ্য ও দীর্ঘায়ু। তিরমিজিও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি বিরল।

শেষে বলা হয়েছে— ' ভয় করে তাদের প্রতিপালকের এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।' একথার অর্থ, তারা আল্লাহ্র তিরস্কারের ভয়ে ভীত হয়। পাপ পুণ্যের কঠোর হিসাবকেও তারা ভয় করে চলে। তাই শেষ বিচারের আগেই তারা দৈনন্দিন জীবনের হিসাব মিলিয়ে দেখে। পাপাসক্তি ও পুণ্যকর্মের শৈথিল্যের কারণে নিজেকেই নিজে ধিক্কার দেয়।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য কষ্টবরণ করে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'কষ্টবরণ করে' অর্থ— তারা আল্লাহ্‌র বিধানের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং বিপদাপদে অবলম্বন করে ধৈর্য। কোনো কোনো আলেমের মতে অপপ্রবৃত্তির প্রাবল্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নামই হচ্ছে ধৈর্য বা সবর। সমধিক উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে, অপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার নাম ধৈর্য। এই ব্যাখ্যাটি ধৈর্য সম্পর্কিত সকল ব্যাখ্যার সমাহার।

'প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য' কথাটির অর্থ— প্রদর্শন বা প্রচারপ্রবণতা, সম্মান, সম্পদ বা কর্তৃত্বের আকাঙ্খা অথবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে কেবল আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ সাধনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।' একথার অর্থ— তারা যথা-নিয়মে ও যথাসময়ে ফরজ নামাজসমূহ পাঠ করে এবং সাধ্যানুসারে পাঠ করে অন্যান্য নামাজ।

এরপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। একথার অর্থ— আমি তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, সেই সম্পদ তারা ফরজ জাকাত হিসেবে, ওয়াজিব ফিত্‌রা হিসেবে অথবা নফল খয়রাতরূপে ব্যয় করে। জাকাত ও ফিত্‌রা অত্যাবশ্যক। এরপরেও দরিদ্র জনসাধারণকে দান করা উচিত। সেকথাই এক আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— ইন্নাফিল আমওয়ালি হাক্‌কান সিওয়ায্‌ যাকাত (জাকাত আদায়ের পরেও বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের দাবী রয়েছে)। তাই অভাবীদেরকে দান করা মোস্তাহাব (অভিপ্রেত)। এখানে 'ব্যয় করে' কথাটির মধ্যে ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব— তিন ধরনের দানের কথাই রয়েছে।

প্রকাশ্য এবং গোপন দু'ভাবেই দান করা যায়। তবে জাকাত প্রকাশ্যে এবং নফল দান গোপনে করা উত্তম। প্রকাশ্য দান অন্যান্যদেরকে দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর গোপন দানে দূর হয় আত্মপ্রচারপ্রবণতা। তাছাড়া জাকাত অত্যাবশ্যক হয় কেবল বিত্তশালীদের উপরে। তাদের সংখ্যাও অল্প। প্রকৃত মুসলমানেরা বিভিন্নভাবে গোপনে গোপনে ক্রমাগত দান করতে থাকে। তাই প্রায়শঃই তাদের জমানো সম্পদের পরিমাণ এমন পর্যায়ে পৌছেনা, যাতে জাকাত ফরজ হয়। যা ফরজ তা-ই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাই এখানে প্রথমে গোপন ব্যয়ের পূর্বে বলা হয়েছে প্রকাশ্য ব্যয়ের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— যারা পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় উৎকৃষ্ট কর্ম অপসারণ করে অনুৎকৃষ্ট কর্মকে।' হজরত আবু জর গিফারী থেকে বিশুদ্ধসূত্রে আহমদ কতৃর্ক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পাপ সংঘটিত হওয়ার পরক্ষণেই তোমরা পুণ্য কর্মে রত হয়ো। পুণ্য পাপকে মিটিয়ে দেয়। মাওকুফ সূত্রে ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, দশটি পাপ করলে দশটি পুণ্যও কোরো। পাপের অপনোদন ঘটে পুণ্যের দ্বারা।

হজরত উকবা বিন আমের থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, চরম পর্যায়ের পাপীরা কষ্টদায়ক লৌহ আবেষ্টনীতে আবদ্ধ ব্যক্তির মতো। একটি পুণ্য কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় লৌহ আবেষ্টনীর একটি শিকল। আর একটি শিকল ভাঙে তখন, যখন সে আর একটি পুণ্য কর্ম করে ফেলে। এভাবে পুণ্য কর্ম করতে থাকলে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করবে লৌহ বেষ্টনী সদৃশ পাপের বর্ম থেকে।

ইবনে বীসান বলেছেন, পাপ অপসারিত হয় তওবার মাধ্যমে। তাই এখানে হাসানা (ভালো) অর্থ হবে তওবা। অপরিণত সূত্রে আতা থেকে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা গোনাহ্ করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তওবা কোরো। গোপন গোনাহের তওবা করতে হবে গোপনে। আর প্রকাশ্য তওবা করতে হবে প্রকাশ্য পাপের জন্য।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জনের মতে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে — অপকর্মের দ্বারা অপকর্ম প্রতিহত করা যাবে না, অপকর্ম প্রতিরোধ করতে হবে সৎকর্মের দ্বারা। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ— নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন নয়, প্রদর্শন করতে হবে সহনশীলতা। তাঁর মতে 'সাইয়েআহ' অর্থ নির্বুদ্ধিতা বা মূর্খতা, আর 'হাসানা' অর্থ সহিষ্ণুতা। কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ হবে— যে অসদাচরণের বিনিময়ে সদাচরণ উপহার দেয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— যখন কোনো নির্বোধ তাকে সম্বোধন করে, তখন সে বলে, শুভাশীষ, শুভাশীষ। হাসান বলেছেন, উদ্ধৃত আয়াতাংশটির মর্মার্থ হবে— যে বঞ্চিত হয়েও বঞ্চনা করে না বঞ্চনাকারীকে। যে উৎপীড়িত হয়েও মার্জনা করে উৎপীড়ককে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে যে অটুট রাখে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি সুসম্পর্ক

অক্ষুণ্ন রাখতে চাইলেও আমার কতিপয় আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু তারা চায় আমার অমঙ্গল। তারা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু আমি প্রদর্শন করি সহিষ্ণুতা। তিনি স. বললেন, তুমি যদি সত্যি এরকম করে থাকো, তবে তো তুমি পানি ঢেলে চলেছো তপ্ত পাতিলে (তাদের উদ্দেশ্য তুমি অকৃতকার্য করে দিচ্ছো— তারা চলেছে ক্ষতির দিকে, আর তুমি অবস্থান নিয়েছো সফলতার সোপানে)। যতক্ষণ তুমি এরূপ করবে, ততক্ষণ তুমি পেতে থাকবে আল্লাহর সাহায্য।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেছেন, এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আটটি শুভ স্বভাব আটটি বেহেশতের প্রতীক। এই স্বভাব অষ্টক মানুষকে পরিচালিত করে আট বেহেশতের আটটি তোরণের দিকে।

তাই এর পর পরই বলা হয়েছে— উলায়িকা লাহুম উক্ববাদ্দার (এদেরই জন্য শুভপরিণাম বা পারলৌকিক আলয়)। 'উক্ববা' অর্থ শ্রমের বিনিময়। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আক্বাবাহু' অর্থ সে তাকে বিনিময় দিয়েছে। পারিশ্রমিক থাকে শ্রমের নেপথ্যে। তাই বিনিময়কে বলে 'উক্ববা।' সে বিনিময় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, যাই হোক না কেনো। তবে সাধারণতঃ 'আক্বাবাহ্' 'উক্ববা' বা 'আক্বিবাত্' অর্থ করা হয় উৎকৃষ্ট বিনিময় বা পুণ্যফল। আর 'উক্ববাহ্' 'মু'ক্বিবাত' বা 'য়ীক্বাব' এর অর্থ করা হয় নিকৃষ্ট বিনিময় বা শাস্তি। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— ১. খয়রুন্ ছওয়াবাঁও ওয়া খয়রুন উক্ববা (পুণ্য হবে উত্তম আর বিনিময় হবে উত্তম) ২. উলায়িকা লাহুম উক্ববাদ্দার (তাদের জন্য শুভ পরিণাম) ৩. নি'মা উক্ববাদ্দার (পারলৌকিক নিবাস কতোই না উত্তম) ৪. ওয়াল আক্বিবাতু লিল্ মুত্তাকীন (আল্লাহ-ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম বিনিময়)। আবার নিকৃষ্ট বিনিময়ের কথা বলেছেন এভাবে— ১. ফাহাক্কা ইক্বাব (অতঃপর বাস্তব হলো শাস্তি) ২. শাদীদুল ইক্বাব (কঠোর শাস্তি) ৩. ওয়া ইন্ আক্বিবতুম ফাআক্বিবু বি মিছলি মা উক্বিবতুমবিহী (যদি তোমরা শাস্তি বিধান করো, তবে তেমনি দণ্ড দান করো, যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছো তোমরা) ৮. মান আক্বাবা বিমিছলি মা উক্বিবা বিহী (যে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে যেনো যেরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে, সেরূপ করে)। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, 'আক্বিবাত' শব্দটি যদি কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষণায়িত হয়, তবে তার অর্থ হবে শাস্তি। যেমন— 'সুম্মা কানা আক্বিবা-তুল্লাজীনা আসাউস্ সুআ.. (যারা অসৎকর্মে অভ্যস্ত, তাদের শাস্তি ছিলো...)। ফলকথা, আক্বিবাত শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

❒ স্থায়ী জান্নাত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও, এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া,

❒ এবং বলিবে, 'তোমরা কষ্ট বরণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।'

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে শুভপরিণামের কথা। সেই শুভপরিণাম কি তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই আয়াতের প্রথমে। বলা হয়েছে— 'স্থায়ী জান্নাত'। অর্থাৎ স্থায়ী আবাস জান্নাত। একথায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আখেরাতের আবাসই স্থায়ী আবাস। পৃথিবীর আবাস আসলে আবাস নয়, প্রবাস।

জ্ঞাতব্যঃ মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ওমর মসজিদের মঞ্চে (মিম্বরে) দণ্ডায়মান হয়ে জান্নাতু আ'দনিন পাঠ করে জনতার উদ্দেশ্যে বলতেন, হে জনতা! তোমরা কি জানো আদন জান্নাত কী? আদন জান্নাতের প্রাসাদমালার তোরণসমূহের সংখ্যা দশ হাজার। প্রতিটি তোরণে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে পাঁচশ' হাজার করে আয়তআখিঁনী হুর। নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ছাড়া অন্য কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে, তারাও।' একথার অর্থ— ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে পুণ্যবান ও পুণ্যবতী স্বামী-স্ত্রী, তাদের পুণ্যবান পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিরা।

এখানে 'মা লাহা' অর্থ ইমান— যৌথভাবে ইমান ও আমল নয়। কারণ অন্বয়ী ও সমন্বিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা থাকবেই। তবে 'ওয়া আলহিক্নি বিস্‌সলিহীন'— এই আয়াতের 'সলিহ্' অর্থ— ইমান ও আমল। আলোচ্য বাক্যের মর্ম হচ্ছে— জান্নাতবাসীর মনোতুষ্টির জন্য তাদের কোনো কোনো প্রিয়জনকে এমন কিছু মর্যাদা দেয়া হবে, যে যোগ্যতা তাদের ছিলো না। এভাবে

স্বামী অথবা স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিরা লাভ করবে উন্নততর মর্যাদা। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে ইমানদার। 'সলাহা' দ্বারা সীমাবদ্ধ করার কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইমান ব্যতিরেকে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য বংশগত সম্পর্ক মূল্যহীন। 'আবাইহিম' অর্থ তাদের পিতাগণ। এর মধ্যে তাদের মাতাগণও অন্তর্ভুক্ত।

একটি সংশয়ঃ বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত মুসাওয়ার বিন মাখরিমা থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আমার বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, সেদিন আমার বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়া অন্য সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক বিলুপ্ত হবে। এখন কথা হচ্ছে, হাদিসে এরকম বলা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতাংশে দেখা যাচ্ছে, মুমিনদের আত্মীয়রাও তাদের সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন আর ছিন্ন হলো কেমন করে?

সংশয়ের অপনোদনঃ মুমিনগণ রসুল স. এর আত্মিক সন্তান। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন— বিশ্বাসীদের নিকটে তাদের আপন সত্তা অপেক্ষা নবী প্রিয়তম। আর তাঁর সহধর্মিণীবৃন্দ বিশ্বাসীদের জননী। ক্বারী উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের শেষে পড়তেন 'ওয়াহুয়া আবুল্ লাহুম' (এবং রসুল স. তাদের পিতা)। আর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে 'ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন' (বিশ্বাসবানেরা একে অপরের ভ্রাতা)।

সুরা কাওসারের ব্যাখ্যায় আমি উল্লেখ করেছি, একবার আস বিন ওয়াইল তার সঙ্গী সাথীদেরকে বললো, মোহাম্মদের কথা বাদ দাও। ওর তো বংশধারাই নেই। একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করলেন, 'ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার (হে আমার রসুল! নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই বংশধারাহীন)। উল্লেখ্য যে, আস বিন ওয়াইলের দুই পুত্র ছিলো। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই তাঁরা মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁদের নাম ছিলো ওমর ও হিশাম। ফলে পিতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হলো ছিন্ন। তখন আসকে সকলে বলতে লাগলো নিঃসন্তান। ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর ও হজরত হিশাম হয়ে গেলেন রসুল স. এর রূহানী আওলাদ। পৈতৃক সম্পদ থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখলেন তাঁরা। এই ঘটনাটির আলোকে উপরে বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াবে এরকম— পুনরুত্থান দিবসে কেবল আমার রক্ত সম্পর্কীয় ও আত্মিক বংশ থাকবে অটুট। এছাড়া আর সকল বন্ধন হয়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ সেদিন কেবল বিশ্বাসবানদের পারস্পরিক

সম্পর্ক অটুট থাকবে। এক আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে— 'সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব পর্যবসিত হবে শত্রুতায়, আল্লাহ্ ভীরুগণের সম্পর্ক অটুট থাকবে। অন্যরা হয়ে যাবে একে অপরের শত্রু।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।' একথার অর্থ— তখন স্বর্গোদ্যানের সিংহদ্বার দিয়ে অথবা প্রাসাদসমূহের প্রবেশদ্বার দিয়ে বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকনসহ প্রবেশ করবে ফেরেশতারা। মুকাতিল বলেছেন, প্রতিদিন তিন বেলা উপহার নিয়ে হাজির হবে ফেরেশতামণ্ডলী। সেখানেও পৃথিবীর দিবস রজনীর মতো আবর্তিত হতে থাকবে দিন ও রাত।

পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এবং বলবে, তোমরা কষ্টবরণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতো ভালো এই পরিণাম।' একথার অর্থ— বিভিন্ন দরজা দিয়ে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করে ফেরেশতারা জানাবে সাদর সম্ভাষণ। বলবে, হে বেহেশতবাসী! পৃথিবীতে তোমরা পাপ থেকে নিবৃত্ত ছিলে, বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করেছিলে, আর জীবন যাপন করেছিলে আল্লাহ্র বিধানের অনুকূলে, তাই তোমাদেরকে আজ দেয়া হলো চিরসুখময় এই জান্নাত। দ্যাখো, তোমাদের এই পরিণাম কতোই না উত্তম।

হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন, স্বর্গাভ্যন্তরে পর্দাবৃত পালঙ্কে শুয়ে স্বর্গবাসীরা উপভোগ করবে অনাবিল শান্তি। দুই সারিতে দণ্ডায়মান থাকবে স্বর্গীয় পরিচারকবৃন্দ। তাদের সারির দৈর্ঘ্য হবে পালঙ্ক থেকে দরজা পর্যন্ত। গৃহদ্বারে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় এসে দাঁড়াবে ফেরেশতাবৃন্দ। তাদের আগমন সংবাদ সারিবদ্ধ স্বর্গীয় পরিচারকদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে পালঙ্কে শায়িত বেহেশতবাসীদের কাছে। সে অনুমতি দিলে সেই অনুমতি আবার সারিবদ্ধ পরিচারকদের মাধ্যমে পৌঁছবে ফেরেশতাদের কাছে। তখন প্রাসাদের বহির্দ্বার উন্মুক্ত করা হবে তাদের জন্য। আর তখনই তারা প্রবেশ করে সালাম জানিয়ে উপঢৌকনসমূহ পেশ করবে। তারপর করবে প্রত্যাগমন। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুসলিম ও মুহাজিরবৃন্দ, যারা ইসলামী রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত রাখতো। দরিদ্র বিশ্বাসবানেরা অর্থাভাবে পৃথিবীতে অনেক পুণ্যকর্ম করতে পারে না। এভাবে তারা পুণ্যকর্মের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে একসময় পৃথিবী পরিত্যাগ করে। তাই তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে আজ্ঞা করবেন, যাও। তোমরা তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছাও। ফেরেশতারা নিবেদন করবে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা

আকাশবাসী। তুমি আমাদেরকে করেছো সম্মানিত, আমরা কি তাদের নিকট গমন করে তোমার সালাম পৌঁছাবো? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ। তারা আমার প্রকৃত দাস। একনিষ্ঠভাবে পৃথিবীতে তারা আমার উপাসনা করেছে। আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি। রক্ষা করেছে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা। তাদের দায়িত্বনিষ্ঠার কারণে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীব ছিলো নিরাপদ। তারা তাদের মনের অনেক আশাই পূর্ণ করতে পারেনি। এভাবে সাঙ্গ হয়েছে তাদের জীবন। ফেরেশতারা একথা শুনে গমন করবে ওই সকল মহাসম্মানিত বিশ্বাসবানদের কাছে। সেই অবস্থার কথাই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে এবং বলবে, তোমরা কষ্টবরণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কতো উত্তম এই পরিণাম।'

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ২৫, ২৬

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

❒ যাহারা আল্লাহের সহিত দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করে, যে-সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদিগেরই জন্য আছে অভিশাপ এবং তাহাদিগেরই জন্য আছে মন্দ আবাস।

❒ আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আত্মার জগতে 'আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই'— আল্লাহ্‌র এই প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলো, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পৃথিবীতে এসে আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে চলে, অবতরিত গ্রন্থসমূহের কোনোটিকে মানে আবার কোনোটিকে করে

অস্বীকার, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মধ্যে নির্মাণ করে ব্যবধানের অনড় প্রাচীর, আল্লাহ্কে মানলে তাঁর রসুলকে মানে না, রসুলকে মানলে আল্লাহ্কে মানে না এবং যারা ছিন্ন করে আত্মীয়তার বন্ধন এবং যারা ঘটায় শস্যহানি, ক্ষতিসাধন করে পশুপালের, মানুষের, ক্রমাগত করে চলে লুণ্ঠন, রাহাজানী, অনাসৃষ্টি তারাই অভিশপ্ত এবং তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম।

হজরত আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সকল পাপের শাস্তি আখেরাতে নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি এই পৃথিবীতেই হয়। অন্য কোনো পাপ এ দু'টো পাপের মতো অতি শীঘ্র শাস্তিকে ডেকে আনে না। আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বোখারী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আউফা বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যাদের মধ্যে স্বজন-বন্ধন ছিন্নকারী রয়েছে, তাদের উপরে আল্লাহ্র অনুকম্পা বর্ষিত হয় না। ইমাম বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উপকার করার পর কেউ খোঁটা দিলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপ। নাসাঈ, দারেমী।

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত। অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী! একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছা মতো রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অঢেল রিজিক পেলেও কৃতজ্ঞচিত্ত হয় না। আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকে পার্থিবতায়। অথচ তারা জানে না যে, পার্থিব জীবনোপকরণের প্রাচুর্য ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবনোপকরণ চিরস্থায়ী। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই তত্ত্বটি জানে। তাই পার্থিব জীবনে জীবনোপকরণের স্বল্পতা দেখা দিলে, তারা হতোদ্যম এবং ধৈর্যচ্যুত হন না। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি তার অঢেল সম্পদ পুণ্য পথে ব্যয় করে, তবে তা প্রশংসার্হ। কিন্তু অপব্যয় অথবা অসৎ পথে ব্যয় নিন্দার্হ। এরকম লোকের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝

❐ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'মুহম্মদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাঁহার পথ দেখান যাহারা তাঁহার অভিমুখী,

❐ 'যাহারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহের স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জানিয়া রাখ, আল্লাহের স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়;

❐ 'যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাহাদিগেরই।'

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন মোজেজা দর্শন করা সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতো, 'মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?' অবজ্ঞা, আত্মম্ভরিতা ও মূর্খতাই ছিলো তাদের এমতো উক্তির ভিত্তি। প্রথমোক্ত আয়াতের শুরুতে একথাই উল্লেখ করা হয়েছে। শেষে বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান, যারা তাঁর অভিমুখী।' একথার অর্থ— 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্পাকের অসীম ভাণ্ডারে অলৌকিক নিদর্শনাবলী রয়েছে অনেক। কিন্তু কথা হচ্ছে, শত সহস্র নিদর্শন অবলোকন করলেও তোমরা কখনো সৎপথ প্রাপ্ত হবে না। কারণ অলৌকিক নিদর্শন দেখায় কেবল পথের দিশা। পথশেষের গন্তব্য পর্যন্ত উপনীত করায় না। গন্তব্যে উপনীত করান আল্লাহ্। তিনি যাকে ইচ্ছা সত্যপথের পরিব্রাজক করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে করেন বিভ্রান্ত। তোমরা বিভ্রান্ত পথের যাত্রী। সুপথ তোমরা চাও না। অতএব অলৌকিক নিদর্শন তোমাদের কি উপকারে আসবে? তিনি তো তাকেই তাঁর পথে পরিচালিত করেন, যারা তাঁকে চায়। অর্থাৎ যারা তাঁর অভিমুখী, তাদেরকেই তিনি জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। অলৌকিক নিদর্শন তারা চায় না, চায় ইমান।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌ অভিমুখী যারা তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। সকল সন্দেহের হয় অবসান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে তাদের হৃদয় হয় পরিতৃপ্ত। এখানে 'জিকির' অর্থ কোরআন মজীদ এবং 'ইত্‌মিনান' অর্থ ইমান। উল্লেখ্য যে, অপবিত্রতা ও অপবিশ্বাস হচ্ছে হৃদয়ের অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য। আর হৃদয়ের প্রশান্তি বা পরিতৃপ্তি হচ্ছে ইমান। অথবা 'আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' কথাটির অর্থ হবে, আল্লাহ্‌র জিকিরে হৃদয় থেকে দূরীভূত হয় শয়তানের প্ররোচনা। এমতাবস্থায় জিকিরের অর্থ হবে আল্লাহ্‌র স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণে রয়েছে দুইটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে থাকে ফেরেশতা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। অন্তরে জিকির উত্থিত হলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর জিকির না থাকলে শয়তান অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় তার চিন্তা। এভাবেই সে মানুষকে প্ররোচিত করে। মুনসিফ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্‌ বিন শাকীক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফুরূপে প্রলম্বিত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন বোখারী। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, শয়তান দলিত মথিত করতে থাকে মানুষের অন্তর। সে যখন জিকিরে রত হয়, তখন শয়তান পশ্চাদপসরণ করে। আর অমনযোগী হলে, শয়তান তার অন্তরে ঢেলে দেয় কুমন্ত্রণা। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহর জিকিরে চিত্ত প্রশান্ত হয়। যেমন সলিলাভ্যন্তরে প্রশান্তি লাভ করে মৎস্য, উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ এবং অরণ্যে অরণ্যবাসীরা। পক্ষান্তরে জিকির বিস্মৃত অন্তরে সৃষ্টি হয় অশান্তি, যেমন অশান্তি ভোগ করে পানির সাথে সম্পর্কচ্যুত মাছ, পানিতে নিমজ্জিত স্থলচর প্রাণী এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি। এই বিষয়টি বিশুদ্ধচিত্ত সুফী সাধকগণের অনুসারীদের নিকটে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সত্যনিষ্ঠ পীর মোর্শেদের খানকায়ে গমনাগমনকারীরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। অতএব এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' কথাটি মর্মার্থ হবে— ওই সকল সুফী দরবেশ, যাদের অন্তর পবিত্র ও জিকিরময়।

শেষে বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।' একথার অর্থ— পবিত্র হৃদয়বিশিষ্ট যারা তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। এ সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার নিরসনের উল্লেখ করেছেন বাগবী। সন্দেহটি এরকম— এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিঃসন্দেহে বিশ্বাসবান তারাই, আল্লাহ্‌র জিকির করা হলে যাদের হৃদয় শঙ্কিত হয়।' আর এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শঙ্কা ও স্বস্তির সহাবস্থান কি সম্ভব? নিরসনটি এরকম— শাস্তির বিষয় উল্লেখিত হলে বিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে

ওঠে শঙ্কা। আর আল্লাহ্র অপার ক্ষমা ও দয়ার কথা মনে হলে অন্তরে আসে প্রশান্তি। ভয় ও প্রশান্তি পরস্পরবিরোধী দু'টো বিষয়। তাই এ দু'টো একই সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। একটি এলে অপরটি অপসারিত হয়।

আমি বলি, প্রশান্তি ও ভীতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরীত্য নেই। প্রশান্তি সৃষ্টি হয় উন্‌স বা অনুরাগ থেকে। আর অনুরাগ বর্তমান থাকে ভয়ের সময়েও। এভাবে একই সময়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে থাকে ভয় ও আশা। হজরত আনাস বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় এক যুবকের পাশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বললেন, তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন? যুবক বললো, আমি আল্লাহ্র ক্ষমার আশা রাখি, আবার তাঁর ভয়ে আমি ভীতও। তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের প্রাক্কালে যার অন্তরের অবস্থা এরূপ হয়, আল্লাহ্ তাকে দান করেন তার কাম্য বস্তু এবং রক্ষা করেন ভয়সংকুলতা থেকে। তিরমিজি, ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্লভ।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, শুভপরিণাম তাদেরই।' হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'তুবা' শব্দটির অর্থ করেছেন আনন্দময় ও নয়নাভিরাম। ইকরামা অর্থ করেছেন, উত্তম পরিণতি। কাতাদা বলেছেন—কল্যাণকর পরিণতি। 'তুবা' শব্দটির এরকম অর্থ করা হয়েছে মূল ধাতু হিসেবে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— একবার রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, তুমি কি জানো 'তুবা' কি? হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্ ও তার রসুলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, 'তুবা' হচ্ছে জান্নাতের একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষ, যার পরিমাপ সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ। ওই বৃক্ষটির একটি শাখার নিচ দিয়ে সত্তর বছর ধরে এক অশ্বারোহী তার অশ্ব পরিচালনার পরেও সীমানা খুঁজে পাবে না। ইজালাতুল খাফা।

মুয়াম্মার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কাতাদা বলেছেন, বন্ধুদের মঙ্গলজনক কিছু ঘটলে তোমরা বোলো, তুবালাকা (তোমার শুভ হোক)। ইব্রাহিম বলেছেন, 'শুভপরিণাম তাদেরই' অর্থ পুণ্যবান বিশ্বাসীরা কল্যাণ ও সম্মান লাভ করবে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কাফ্রী ভাষায় 'তুবা' অর্থ উদ্যান। হজরত আবু দারদা বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গোদ্যানের একটি ছায়াময় বৃক্ষ, যার শীতল ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করবে স্বর্গবাসীরা। উবায়েদ ইবনে উমায়ের বলেছেন, রসুল স. এর বেহেশতের প্রাসাদ সন্নিহিত একটি সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষের নাম তুবা। ওই বৃক্ষ ছায়া দান করবে সকল বেহেশতবাসীর ভবনে। কৃষ্ণবর্ণ ছাড়া অন্য সকল বর্ণের ফুল ও ফলে ভরা থাকবে বৃক্ষটি। তার মূল থেকে প্রবহমান রয়েছে

দু'টি ঝরণা, যার পানি কর্পুরমিশ্রিত। মুকাতিল বলেছেন, ওই বৃক্ষের প্রতিটি পাতা ছায়াদান করবে একটি বিরাট দলকে। ফেরেশতারা ওই বৃক্ষের পাতায় পাতায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় বিভোর থাকবে।

হজরত উকবা বিন আবদুল্লাহ্ সালামী থেকে আহমদ, ইবনে হাব্বান, তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসুল! বেহেশতে কি ফলমূল পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। সেখানে তুবা নামক এক বৃক্ষ থাকবে, যা ফেরদাউস জান্নাতের সমান (সমগ্র ফেরদাউস জান্নাতে ছায়াদানকারী)। লোকটি বললো, পৃথিবীর কোনো গাছের সঙ্গে সেই গাছটির কোনো সাদৃশ্য আছে কি? রসুল স. বললেন, না। একটু পরেই বললেন, তুমি কি কখনো সিরিয়ায় গিয়েছো? সে বললো, না। তিনি স. বললেন, সেখানে রয়েছে আখরোট বৃক্ষ। আখরোট গাছ কিছুটা তুবা গাছের মতো। বৃক্ষটি এক কাণ্ডবিশিষ্ট, কিছুটা উর্ধ্বে ওঠার পর তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। লোকটি বললো, গাছটি কতো বড়? তিনি স. বললেন, তোমার উটের পাল নিয়ে তুমি যদি ওই বৃক্ষটির গোড়া প্রদক্ষিণ করো, তবে তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেলেও একবার প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারবে না। লোকটি বললো, সেখানে আঙ্গুর পাওয়া যাবে কি? তিনি স. জবাব দিলেন, হ্যাঁ। লোকটি আবারো প্রশ্ন করলো, আঙ্গুরবীথির আকৃতি কেমন হবে? রসুল স. বললেন, প্রস্থ হবে একটি বৃহৎ দাঁড়কাকের এক মাসের উড়ন্ত পথের দূরত্বের সমান। এবার তবে অনুমান করো, দৈর্ঘ্য কতখানি হবে। লোকটি বললো, আর আঙ্গুরদানার আকৃতি? তিনি স. বললেন, বড় ছাগলের চামড়ানির্মিত মশকের সমান, যদ্দারা তোমার পরিবার, বরং তোমার মহল্লার সকল লোক পরিতৃপ্ত হতে পারবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকটে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তুবা কি? তিনি স. বললেন, বেহেশতের একটি বৃক্ষ, যার বিস্তৃতি একশ' বছর পথ চলার পরিসরের সমান। ওই বৃক্ষের তন্তু দ্বারা নির্মিত হবে বেহেশতবাসীদের পরিচ্ছদ।

মুয়াবিয়া বিন কুরবা তাঁর পিতার মারফু বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, রসুল স.বলেছেন, তুবা হচ্ছে জান্নাতের একটি উদ্ভিদ। যা আল্লাহ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতে রোপন করেছেন জান্নাতের জমিনে। বৃক্ষটিতে ফুৎকার করেছেন আপন প্রাণশক্তি। ওই বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত করা হবে অলংকার ও পরিচ্ছদ। স্বর্গপ্রাচীরের বহির্দেশ থেকে নেত্রগোচর হবে বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখা।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তুবা বৃক্ষটির অবস্থান স্বর্গোদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে। একশ' বছর ঘোড়া ছুটালেও ওই গাছের ছায়া অতিক্রম করা যাবে না। প্রমাণরূপে তোমরা পাঠ করতে পারো— 'ওয়াজিল্লিম মামদুদিন' (আর দীর্ঘতম ছায়া)। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আহমদ সংযোজন করেছেন এই কথাটুকু— তার পত্রপল্লব

আচ্ছাদিত করবে জান্নাত। নিহাদ বিন সিয়রি তাঁর জুহ্ গ্রন্থে এবং বাগবী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, কা'বকে এই হাদিস শোনানো হলে তিনি বললেন, এ বাণী সত্য। ওই আল্লাহ্র শপথ! যিনি মুসা নবীর উপরে তওরাত ও মোহাম্মদ নবীর উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যদি কোনো উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি ওই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে তিন চার বছর ক্রমাগত চলতে থাকে, তবু সে তার প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারবে না। এভাবে সে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, বাহন থেকে গড়িয়ে পড়ে, তবুও না। আল্লাহ্ নিজেই ওই বৃক্ষটি রোপন করেছেন। তার প্রতি ফুৎকার করেছেন তার রূহ। তার শাখা প্রশাখাগুলো দেখা যাবে জান্নাতের বাইরে থেকেও। জান্নাতের সব ক'টি প্রস্রবন প্রবাহিত হয়েছে ওই বৃক্ষটির পাদদেশ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গ-তরু। তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দারা যা চায়, তুমি তা বের করে দিয়ো তোমার অভ্যন্তর থেকে। জান্নাতবাসীদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে গদি সজ্জিত তেজী ঘোড়া। আবার কখনো বের হবে নাকে রশি ও পিঠে হাওদাশোভিত উট। পরিধেয় বসনও প্রস্তুত হবে ওই বৃক্ষ থেকে। বাগবী, ইবনে আবীদ্ দুনিয়া, ইবনে মোবারক।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, শাহাব বিন খাওশাব বলেছেন, তুবা হচ্ছে স্বর্গোদ্ভিদ। স্বর্গের সকল উদ্ভিদ উদ্গত হয়েছে ওই উদ্ভিদ থেকে। স্বর্গ-প্রাকারের বহির্দেশ থেকেও উদ্ভিদটি অক্ষিগোচর হয়।

'লাহুম হুসনু মাআব' অর্থ শুভ পরিণাম তাদেরই। অর্থাৎ জান্নাতের সুখ-সমাহার তো বিশ্বাসীদের জন্যই।

পৌত্তলিকদের বিরোধিতা, বচসা ও কুটতর্কের কারণে রসুল স. কখনো কখনো হয়ে পড়তেন বিমর্ষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমতাবস্থায় যথাকর্তব্য নির্দেশ করে অবতীর্ণ হয়েছে—

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩০

وَكَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

❐ অতীতে যেমন পাঠাইয়াছিলাম সেইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে, পাঠাইয়াছিলাম উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি

উহারা যিনি দয়াময় তাঁহাকে অস্বীকার করে। বল, 'তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

চারটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আলোচ্য আয়াত। প্রথমোক্ত দ্বিতীয় বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! হতোদ্যম হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা এরকমই। আপনার পূর্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আমি আমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিলাম। আপনি যেমন মানুষকে আমার বাণী পাঠ করে শোনান, তেমনি তাঁরাও তাঁদের সম্প্রদায়কে শোনাতেন। তবুও তারা দয়াময় আল্লাহ্‌কে স্বীকার করতো না। আপনার সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো তাদেরই উত্তর সুরী। তাই তারাও আপনাকে অস্বীকার করে চলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। প্রচার করতে থাকুন আমার বার্তা। আপনি তো আমার রসুল। এখানে 'রহমান' শব্দটির অর্থ অতীব দয়াময়। মানুষের নিকট নবী-রসুল প্রেরণই হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা বোঝে না। তাই তারা অস্বীকার করে অতীব দয়াময় আল্লাহ্‌কে। তাঁর নবী-রসুলগণকে।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা, মুকাতিল ও ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়। তাই আয়াতটি মাদানী। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও আবু শায়েখ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দ শেষ পর্যন্ত মক্কার কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হতে সম্মত হলেন। কুরায়েশদের প্রতিনিধি হিসেবে এলো সহল বিন আমর। রসুল স. হজরত আলীকে আজ্ঞা করলেন, লিখো— বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম। কুরায়েশরা আপত্তি তুললো, আমরা তো আল্লাহ্‌কে রহমান বলে মানি না। আমরা শুধু জানি, ইয়ামামার মুসায়লামা ওই নামে পরিচিত। তোমরা কেবল লিখতে পারো— বি ইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ্‌ তোমার নামে)। তাদের একথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— ওয়াহুম ইয়াক্‌ফুরুনা বির্‌ রহমান (তথাপি তারা যিনি দয়াময় তাকে অস্বীকার করে)। হুদায়বিয়ার এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা ফাতাহের তাফসীরে।

বাগবী আরো লিখেছেন, সাধারণ তাফসীরবিদগণের অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এই অভিমতটিই প্রসিদ্ধ। রসুল স. হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটে দোয়া করতেন হে আল্লাহ! হে রহমান! বলে। আবু জেহেল একদিন একথা শুনতে পেয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে বলেছিলো, দ্যাখো। মোহাম্মদ দুই উপাস্যের উপাসক। আমরা তো ইয়ামামাবাসী মুসায়লামা কাজ্জাবকে রহমান বলে জানি। আর কোনো রহমানকে তো আমরা চিনি না। মোহাম্মদ আবার কোন রহমানকে ডাকতে শুরু করলো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে

অবতীর্ণ হয়েছিলো— কুলিদ্ উল্লাহা আবিদ ওয়া রহমানা আয়্যামান তাদ্উ ফালাহুল আসমাউল হুসনা (আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ও রহমান বলে সর্বক্ষণ তাঁকে ডাকো, অনেক উত্তম নাম রয়েছে তাঁর)।

জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কার মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে। রসুল স. তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা রহমানকে সেজদা করো। তারা বলেছিলো, রহমান কি? তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আয়াতের শেষোক্ত বাক্য দু'টো

শেষোক্ত বাক্য দু'টো হচ্ছে— 'বলো তিনিই আমার প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।' একথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, যে রহমানকে তোমরা স্বীকার করতে চাও না, তিনিই আমার উপাস্য স্রষ্টা এবং কার্যনির্বাহক। তোমরা আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালেও তিনিই আমার একমাত্র বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাই আমি কেবল তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল। তিনিই আমাদের দান করবেন কল্যাণ। আমার প্রত্যাবর্তন তাই তাঁরই দিকে।

তিবরানী প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি যা কিছু বলো, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তুমি আমাদেরকে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। তারা তোমার দাবির পক্ষে কথা বলুক। আর পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দাও, যাতে আমাদের যাতায়াত সুগম হয়। তাদের এসকল কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩১

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى
بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا ؕ أَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى
النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ
قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

❐ যদি কোন কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হইত, অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহের এখ্তিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। যাবৎ যাহা আল্লাহের প্রতিশ্রুত

তাহা না ঘটিবে তাবৎ , যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদিগের আশে-পাশে আপতিত হইতেই থাকিবে, আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, আতিয়া আওফি বলেছেন, একবার মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে বললো, মোহাম্মদ! চার পাশের পাহাড়গুলোকে যদি অন্যত্র সরিয়ে দেয়া যেতো তাহলে দৃষ্টিগোচর হতো বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমরা ওই প্রান্তরে তৈরী করতে পারতাম ফল ও ফসলের বাগান। অথবা বাদশাহ্ সুলায়মান তার সভাসদসহ যেভাবে সিংহাসনে বসে বাতাসে ভর করে উড়ে উড়ে চলতো, তুমিও আমাদের জন্য সে রকম কিছু একটা করো। কিংবা ঈসা নবী যেভাবে মৃতকে জীবিত করতো, তুমিও তেমনি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও। তাদের এসকল কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বাগবী লিখেছেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কয়েকজন পৌত্তলিকদের সম্পর্কে। পৌত্তলিকদের ওই দলটিতে ছিলো আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া। এক লোকের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়া বলে পাঠালো, হে মোহাম্মদ! তুমি যদি আমাদেরকে তোমার অনুগত হিসেবে পেতে চাও, তবে কোরআনের দ্বারা মক্কার পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দাও। আমরা পাবো বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। আর এখানে প্রবাহিত করে দাও একটি নদী। তাহলে আমরা ওই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে করতে পারবো চাষাবাদ। তৈরী করতে পারবো ফসলের বাগান। দাউদ নবীর চেয়েও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন বলে তুমি নিজেকে জাহির করো। আবার একথাও বলো যে, তার নির্দেশে পাহাড় গতিশীল হতো। আন্দোলিত হয়ে জিকির করতো তার সাথে। তবে তুমি পাহাড়গুলো সরাতে পারবে না কেনো? তুমি আরো বলো,নবী সুলায়মান তাঁর সিংহাসন নিয়ে পারিষদবর্গসহ বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াতো। তুমিও আমাদেরকে সেরকম ব্যবস্থা করে দাও। আমরা সিরিয়ায় গিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে ওই দিনই মক্কায় ফিরে আসি। ঈসা নবীর চেয়েও তুমি বড় বলে দাবী করো। ঈসা নবী তো মৃতকে জিন্দা করতো। তুমিও তেমনি জীবিত করো তোমার পূর্বপুরুষ কুসাইকে। অথবা অন্য কোনো মৃত পূর্বপুরুষকে। তুমি সত্য নবী কি না আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি। মুশরিকদের এরকম কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে আবু ইয়ালীও এরকম বিবরণ এনেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদি কোনো কোরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হতো অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেতো, তবুও তারা এতে বিশ্বাস করতো না।' একথার অর্থ— যদি কোনো অবতারিত

গ্রন্থ অথবা এই কোরআনের মাধ্যমে পর্বতমালাকে স্থানান্তরিত করা হতো, অথবা তাদের ইচ্ছামতো বিমানবিহারের ব্যবস্থা করে দেয়া যেতো, পৃথিবী বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা হতো স্রোতস্বিনী, তবুও তারা ইমান আনতো না। এখানে 'আল মাওতা' (মৃত) অর্থ কুরায়েশদের পূর্বপুরুষ কুসাই প্রমুখ।

আলোচ্য বাক্য শর্তযুক্ত। কিন্তু সে শর্তের জবাব এখানে অনুক্ত। যেনো বলা হচ্ছে— উপরে বর্ণিত মুশরিকদের প্রস্তাবগুলো যদি বাস্তবায়ন করতেই হয়, তবে সেগুলো তো কোরআনের মাধ্যমে করা অধিকতর সহজ। কিন্তু আল্লাহ্পাক তা করেননি। অথবা মর্মার্থ হবে — সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যা চায়, তা কার্যকর করা হলেও তারা ইমান আনবে না। এ প্রসঙ্গে অপর একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়। আয়াতটি হচ্ছে— 'যদি আমি তাদের নিকট ফেরেশতামণ্ডলী প্রেরণ করতাম, আর তারা বাক্যালাপ করতে পারতো মৃতদের সঙ্গে, তবু তারা ইমান আনতো না।'

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অনুক্ত শর্তের জবাব উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে এভাবে — 'তথাপি তারা যিনি দয়াময় তাঁকে অস্বীকার করে।' মধ্যবর্তী কথাগুলো সমালোচনামূলক। যেনো বলা হচ্ছে— কোরআনের মাধ্যমে যদি পাহাড়কে পরিচালনা করা হতো,তবু তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো, বিশ্বাসই করতো না। আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তাই প্রত্যেকের সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী যে কস্মিনকালেও ইমান আনবেনা, তা তিনি ভালো করেই জানেন। কারণ তাদের সূচনাস্থল (মাবদায়ে তায়ুন) হচ্ছে আল্লাহ্পাকের নাম আল মুদ্বিল্লু (পথভ্রষ্টকারী)।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত।' এই বাক্যটির পূর্বেও কিছু কথা উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাগুলোসহ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ সর্বশক্তিধর। তাই একথা ভাবা ঠিক নয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চাহিদা পূরণ করতে তিনি অক্ষম। প্রকৃত কথা এই যে, তাদের চাহিদা পূরণ করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর নেই। কারণ তিনি জানেন শত সহস্র অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা হলেও তারা ইমান আনবে না। তাই তিনি তাদের চাহিদা পূরণ করেননি।

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণ ভাবতে শুরু করেছিলেন, আল্লাহ্পাক যদি দয়া করে তাদের দাবিগুলো পূরণ করে দিতেন তবে কতোই না ভালো হতো। তারা সকলেই ইমানদার হয়ে যেতে পারতো। তাঁদের এ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী বাক্যটি।

বলা হলো— 'তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' একথার অর্থ— বিশ্বাসীগণ (সাহাবীগণ) কেনো আশায় আশায় আছে যে, অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করলেই তারা ইমান আনবে? তারা তো ইতোপূর্বে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, প্রস্তরখণ্ডের কথা বলার মতো বিস্ময়কর মোজেজা দর্শন করেছে। তৎসত্ত্বেও ইমান এনেছে কি? পাহাড় অপসারণ ও আকাশে উড্ডয়ন অপেক্ষা ওই মোজেজাদ্বয়

অধিকতর বিস্ময়কর নয় কি? বিশ্বাসীগণ তো এসকল কথা জানে। এ কথাও তো তারা জানে যে, মৃত ব্যক্তির কথা বলা অপেক্ষা পাথরের কথা বলা অধিকতর অভিভূত হওয়ার মতো বিষয়। এ সকল কিছু দেখে শুনে বুঝে তবে তারা কেনো এখনো ওই সকল চির-ভ্রষ্টদের হেদায়েতপ্রাপ্তির প্রত্যাশাকে লালন করে চলেছে। আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসীগণ ভাবছে, আল্লাহ্‌পাক তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে এক মুহূর্তে বানিয়ে দিতে পারেন ইমানদার। এই বিশ্বাস নিয়েই তারা আছে। এখনো নিরাশ হয়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ লিখেছেন, এখানে 'লামইয়াইআসি' (প্রত্যয় হয়নি বা নিরাশ হয়নি) কথাটির অর্থ হবে 'লাম ইয়ালাম' (জানে না)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছে করলে সকলকে ইমানদার বানিয়ে দিতে পারেন।

কালাবী বলেছেন, নুখা গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় 'ইয়াইআসি' (নৈরাশ্য বা অপ্রত্যয়) শব্দটি জানা অর্থে প্রচলিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ মনে করেন শব্দটি হাওয়াজেন গোত্রে প্রচলিত ভাষার অন্তর্ভুক্ত। তারাও শব্দটিকে জানা অর্থে ব্যবহার করে। ফাররা কিন্তু একথা অস্বীকার করেছেন। বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন এভাবে— শব্দটিকে জানা অর্থে কেউই ব্যবহার করেননি। 'ইয়াইসতু' (আমি নিরাশ হইনি) এর অর্থ 'আলিমতু' (আমি জানি না)— এরকম কেউ বলেননি। তবে শব্দটি রূপকভাবে জানা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ জ্ঞাত বিষয়ের পরিণাম কখনো কখনো নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। তাই পরিণতির দিকে লক্ষ্য করে শব্দটিকে জানা অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ রীতিটি অপ্রচল নয়। মানুষ নিশ্চিত হলেই কেবল নিরাশ হয়। এখানে জানা অর্থে শব্দটি ব্যবহারের আরেকটি প্রমাণ বিদ্যমান। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন 'ইয়াতাবাইয়্যানু' বলে। এর অর্থ— প্রকাশ্য, জলজ্যান্ত। আর জ্ঞাতব্য বিষয় তো প্রকাশ্যই হয়। এ কারণেই নিরাশ হওয়ার অর্থ অবগত হওয়া বা জানা বলা যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাবৎ যা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত তা না ঘটবে তাবৎ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপদ তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে।' একথার অর্থ— যতক্ষণ মক্কা-বিজয় সুসম্পন্ন না হবে, অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যু না ঘটবে কিংবা মহাপ্রলয় উপস্থিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর বন্দীত্ব, দুর্ভিক্ষ, জীবন ও সম্পদহানি ইত্যাকার বিপদ আপদ আপতিত হবেই। এখানে 'কৃরিয়াহ্' অর্থ বিপদ আপদ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'কৃরিয়াহ্' বলে ওই সেনাযুথকে, যা রসুল স. এর সাহায্যার্থে প্রেরিত হয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেনাযুথ দ্বারা তারা সরাসরি আক্রান্ত না হলেও এ ধরনের অন্য কোনো বিপর্যয় তাদের জনপদের নিকটেই কোথাও এসে উপস্থিত হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'তাহুল্লু' এর শব্দরূপ হচ্ছে মধ্যম পুরুষে সম্বোধনসূচক। আর সম্বোধিত জন হচ্ছেন রসুলুল্লাহ্। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— হে রসুল! আপনি অবস্থান গ্রহণ করবেন তাদের জনপদের নিকটে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন মক্কার সন্নিকটে। এই ব্যাখ্যাও হজরত ইবনে আব্বাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে। যদি তাই হয়, তবে ওয়াদাল্লহ্ (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি) কথাটির অর্থ হবে— মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। আর সাধারণ অর্থে, আল্লাহ্র অঙ্গীকারের অর্থ হবে মৃত্যু অথবা মহাপ্রলয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।' একথার অর্থ— নির্ধারিত সময়ে বিজয়ের যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ করেন, তার ব্যতিক্রম কদাচ ঘটে না। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের বাণীতে অঙ্গীকার বিরুদ্ধতার প্রশ্রয় অসম্ভব।

পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবী রসুলগণকে বিভিন্ন রকম বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিতেন না। সংশোধনের জন্য কিছুকাল অবকাশ দিতেন তাদেরকে। তারপর তাদের উপর আপতিত করতেন কঠোর, কঠোরতর শাস্তি। এসকল কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ○

❑ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, তাহার পর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি!

❑ তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহা যিনি লক্ষ্য করেন তিনি তাহাদিগের সমান যাহাদিগকে উহারা শরীক করে? অথচ উহারা আল্লাহের বহু শরীক করিয়াছে। বল, 'উহাদিগের পরিচয় দাও।' তোমরা কি পৃথিবীর এমন

কিছুর সংবাদ তাঁহাকে দিতে চাহ যাহা তিনি জানেন না? অথবা ইহা অসার উক্তি মাত্র? না, উহাদিগের ছলনা উহাদিগের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং উহারা সৎপথ হইতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

❒ উহাদিগের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো আরো কঠোর। এবং আল্লাহের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদিগের কেহ নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি জানি, আপনার সম্প্রদায়ের দুর্জনেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আপনার মনে কষ্ট দেয়। বিভিন্নভাবে আপনাকে করে জ্বালাতন। এতে করে আপনি বিষণ্ন হবেন না। অবিশ্বাসীদের স্বভাবই এরকম। বিগত যুগের অবিশ্বাসীরাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলগণের সঙ্গে এরকম করতো। তাদের সত্যোপলব্ধি যাতে ঘটে, সেজন্য আমি তাদেরকে দীর্ঘ অবকাশও দিয়েছিলাম। তবুও তারা সত্যকে স্বীকার করেনি। তাই শেষে আমি তাদেরকে দিয়েছি কঠিন শাস্তি। সে শাস্তি ছিলো কতোইনা ভয়াবহ। অতএব হে আমার রসুল! নিশ্চিত জানবেন যে, আপনার শত্রুদেরকেও যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

এখানে 'আম্লায়তু' শব্দের ধাতুমূল আল-মালওয়াতু অর্থ— দীর্ঘকাল। রাত্রি-দিবসকে সাহায্য করে বলে, রাত্রিকে বলে মালওয়ান। দিবস-রাত্রিকে মাল্ওয়ান বলে না। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কাল। যেমন জনৈক কবির কবিতায় উল্লেখিত হয়েছে— 'নাহারুন ওয়া লাইলুন্ দাইমুন, মালাওহুমা' (দিবা-রাত্রির সময়চক্র নিয়ত গমনাগমন করে)। এখানে 'মালওয়ান' থেকে 'মালাও' কে কালচক্র হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই 'মালওয়ান' অর্থ দিবস-রজনী নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আমি শাস্তি ব্যতিরেকেই দীর্ঘকাল জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছিলাম। তারপর দিয়েছিলাম শাস্তি।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তা যিনি লক্ষ্য করেন তিনি তাদের সমান, যাদেরকে তারা শরীক করে?' একথার অর্থ— কি ভেবেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা? তারা কি মনে করে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা, তিনি কি তাদের ওই জড় উপাস্যদের সমতুল?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথচ তারা আল্লাহ্র বহু শরীক করেছে। বলো, তাদের পরিচয় দাও।' বাক্যটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'বিমা কাসাবাত্' (যা তারা অর্জন করেছে) কথাটির সঙ্গে। 'মা' অব্যয়টিকে এখানে ধাতুমূল হিসেবে গণ্য না করা হলে বাক্যটির সম্পৃক্তি ঘটবে একটি উহ্য বক্তব্যের

সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তারা আল্লাহ্‌পাককে এক মনে করে না। তাই তারা বহু উপাস্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে। 'বলো, তাদের পরিচয় দাও' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অবাধ্যদের বলুন, ভেবে দেখো হে অদূরদর্শী জনতা! তোমাদের জড় প্রতিমাগুলি কি আল্লাহ্‌পাকের অংশীদার হওয়ার উপযুক্ত? উন্মোচিত করো তাদের প্রকৃত পরিচয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ তাঁকে দিতে চাও, যা তিনি জানেন না।' একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ। সুতরাং তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তোমরা কি এরকম কোনো অস্তিত্বের সংবাদ জানো, যে উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত। তোমরা কি এমন কিছু জানাতে চাও যা তিনি জানেন না?

এরপর বলা হয়েছে— 'অথবা এটা অসার উক্তি মাত্র ?' একথার অর্থ— নাকি তোমাদের সমূহ উক্তি ভিত্তিহীন, যেমন কাফ্রীদের নাম রাখা হয় কর্পূর। কোনো কোনো তাফসীরবিদ কথাটির অর্থ করেছেন— তোমাদের উক্তিগুলো সর্বৈব মিথ্যা, নয় কি ?

এরপর বলা হয়েছে— 'না, তাদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎপথ থেকে নিবৃত্ত হয়।' একথার অর্থ— তারা পতিত হয়েছে শয়তানের প্রতারণায়। শয়তানই তাদের অপকীর্তিগুলোকে তাদের চোখে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। শয়তানের চক্রান্তের গহ্বরে তারা আসক্তা প্রোথিত। তাই তারা সত্যভ্রষ্ট। শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।' একথার অর্থ— যারা বিভ্রমের অনুরাগী, আল্লাহ্ তাদের বিভ্রম চিরস্থায়ী করে দেন। এভাবে আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে পথ প্রদর্শন করার সাধ্য কারো নেই।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করবার তাদের কেউ নেই।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই। তদুপরি রয়েছে পৃথিবীর সাময়িক শাস্তিসমূহ। তাই কখনো তাদেরকে নিহত হতে হয়। কখনো হতে হয় বন্দী। আবার কখনো বহন করতে হয় লাঞ্ছনাদায়ক করের ভার। অর্থাৎ জিযিয়া।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِينَ النَّارُ ○ وَالَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَاٰبِ ○ وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

❒ সাবধানীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার উপমা এইরূপঃ উহার পাদদেশ নদী প্রবাহিত উহার ফলসমূহ ও ছায়া চির-স্থায়ী। ইহা যাহারা সাবধানী তাহা তাহাদিগের কর্মফল, এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের কর্মফল অগ্নি।

❒ আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহের ইবাদত করিতে ও তাঁহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহারই প্রতি সকলকে আহ্বান করি এবং তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।'

❒ এবং এইভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি কুরআন, এক নির্দেশ, আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহের বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বেহেশতে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী সুখের উপকরণসমূহ। যেমন— পাদদেশে বয়ে চলবে নিরন্তর নির্ঝর। আরো থাকবে ফলমূলের অফুরন্ত সম্ভার ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিদায়ক ছায়া। সাবধানীদেরকে এসকল কিছু প্রদান করার অংগীকার করেছেন আল্লাহ্ নিজে। এটা হবে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান। অপরদিকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কর্মফলরূপে রয়েছে অন্তহীন আগুন।

হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা গাছের ফল ছিঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে শূন্য বৃন্তে পরিদৃশ্যমান হবে নতুন ফল। তিবরানী।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, শোয়াইব বিন জ্বায়হান বলেছেন, একবার আমি ও আবুল আলীয়া অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভ্রমণে বের হলাম। আবহাওয়া ছিলো বড়ই শান্তিদায়ক। আবুল আলীয়া বললেন, জান্নাতের ছায়া হবে এরকম। এরপর পাঠ করলেন— ওয়াজিল্লিম মামদুদ (সুদীর্ঘ ছায়া)।

পথভ্রষ্ট জুহমিয়া সম্প্রদায় বলে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংসশীল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত তাদের ধারণাটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

'উক্ববা' শব্দটির অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল অথবা কর্মফল। 'প্রতিদান' (জ্বাযা) অর্থ গ্রহণ করা হলে বুঝতে হবে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ১. 'হাল ছুউবিবাল কুফ্ফারু' (কাফেরদেরকে কি সওয়াব দেয়া হবে)। ২. 'ওয়াবাশ্শিরহু বি আজাবিল আলীম' (আর তাদেরকে শাস্তির সুসংবাদ দাও)।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, যে পবিত্র গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তা পাঠ করে অথবা তার আবৃত্তি শুনে আনন্দিত হয় আপনার সকল সহচর, বিশেষ করে ওই সকল ইহুদী ও খৃষ্টান যারা আপনার ধর্মমতকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। যেমন— ইহুদী থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, তাঁর সঙ্গী সাথীগণ এবং খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া আবিসিনিয়ার প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ। তারা সকলে একথা ভেবে অধিকতর উৎফুল্ল হয় যে, এই কোরআন ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের সমর্থক।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু কোনো কোনো দল এর কতক অংশ অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— কিন্তু যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় এবং ওই সকল ইহুদী ও খৃষ্টান যারা এখনো মুসলমান হয়নি তারা এই কোরআনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অথবা অস্বীকার করে এর কোনো কোনো অংশকে। যেমন কা'ব বিন আশরাফ, উসাইয়েদ, আকিব প্রমুখ। এখানে 'কতক অংশ অস্বীকার করে' কথাটির অর্থ— ইহুদী-খৃষ্টানেরা অস্বীকার করে ওই সকল অংশ, যেগুলো তাদের শরিয়ত ও প্রবৃত্তির বিপরীত।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন মজীদে 'রহমান' শব্দটির অধিক উল্লেখ না দেখে প্রথম দিকে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। কারণ তওরাতের বহু স্থানে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এদিকে কোরআন মজীদের সুরাসমূহ ক্রমাগত অবতীর্ণ হয়ে চললো। পরে দেখা গেলো 'রহমান' শব্দটি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। তখন তিনি ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আনন্দিত হলেন। তাঁদের ওই আনন্দকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'কিন্তু কোনো কোনো দল তার কতক অংশ অস্বীকার করে' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালে সন্ধিপত্রে লিখিত 'বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম' সম্পর্কে তারা আপত্তি তুললো। বললো, আমরা তো ইমামার রহমানকে (মুসায়লামা বিন কাজ্জাবকে) ছাড়া অন্য কাউকে 'রহমান' বলে জানিনা। তাই 'রহমান' কথাটি তুলে দিতে হবে। তখন অবতীর্ণ হয়— ওয়াহুম বি জিক্‌রির্‌ রহ্‌মানি হুম কাফিরূন (তারা রহমানের উল্লেখকে প্রত্যাখ্যানকারী)। আরো অবতীর্ণ হয়— ওয়াহুম ইয়াক্‌ফুরূনা বির্‌রহমানি (আর যারা রহমানকে অস্বীকার করে)। সুতরাং এখানে 'কতক অংশ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, ওই পৌত্তলিকেরা 'আল্লাহ্'কে স্বীকার করে, কিন্তু অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র নাম (রহমান) কে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে ও তাঁর কোনো শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি।' এখানকার বক্তব্যটি যাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে বলা হয়েছে, তারা যদি ইহুদী-খৃষ্টান হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের মাধ্যমে এইমর্মে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো। কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার করবো না। এটাই সত্যধর্মসমূহের ভিত্তি। তোমরাও একথা অস্বীকার করতে পারবে না। শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত কিছু অদল বদলের কথা স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণের শরিয়তে এরকম হেরফের ঘটেছে। কখনো কোনো কোনো বিধানকে স্থগিত করে তদস্থলে জারী করা হয়েছে নতুন বিধান। কোরআনের মাধ্যমেও এরকম কিছু করা হয়ে থাকলে তা দূষণীয় বলে গণ্য হবে কেনো? আর আলোচ্য বক্তব্যটি যদি সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি হয়, তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল ! আপনি সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে জানিয়ে দিন, আমাকে দেয়া হয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার আদেশ। আর সেই সঙ্গে কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর সমকক্ষ না করার নির্দেশ। আর 'রহমান' হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নাম। তাই তাঁকে যদি 'রহমান' 'রহীম' ইত্যাদি গুণবাচক নামে ডাকা যায় তবে দোষের কিছু নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তাঁরই প্রতি সকলকে আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' এ কথার অর্থ— অতএব হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভালো করে শুনে নাও যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য ও শিরিক থেকে মুক্ত থাকার জন্যই আমি সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবো। এটাই আমার কর্তব্যকর্ম। আর আমাকে তো তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

এর পরের আয়াতের (৩৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আপনার আপন ভাষা আরবীতে— যাতে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়, ব্যবহারিক বিষয়, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ ইত্যাদি আপনি স্পষ্টভাবে বোঝেন ও অন্যকে সহজে বুঝাতে সক্ষম হন। কোরআনের এই জ্ঞান প্রাপ্তির পর যদি আপনি নিজের খেয়ালখুশী মতো চলেন, তবে এ কথাটি জেনে রাখবেন যে, যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যায়, তাদের কোনো অভিভাবক ও রক্ষক থাকে না। অবশ্য আপনি খেয়াল-খুশীর অনুসরণ তো করতেই পারবেন না। কারণ আপনি আমার রসুল। আপনার উম্মতেরা এরকম করবে। তাই আপনার মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হলো এই সতর্ক সংকেত।

বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা বলতো, মোহাম্মদ তো ঘোর সংসারী। সাধারণ মানুষের মতোই পরিবার পরিজনের অধিকর্তা। সুতরাং তিনি আবার নবী হবেন কীভাবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

❐ তোমার পূর্বেও অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত কোন আয়াত উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক নির্ধারিত কালের জন্য এক কিতাব থাকে।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি ওই মূর্খদেরকে জানিয়ে দিন নবী-রসুল সংসারী হতে পারবে না, এরকম যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। ইতোপূর্বে অনেক নবী ও রসুল পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁদের স্ত্রী ছিলো। সন্তান-সন্ততিও ছিলো। আর এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার চিরন্তন বিধান যে, নবী-রসুলগণ সংসারী হবেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তিধারী সংসারী নন। তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র বিধানানুকূল। হ্যাঁ, তাঁদের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকলের প্রকাশ ঘটান আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁরা নিজে নিজে ইচ্ছে মতো কোনো মোজেজা প্রদর্শন করতে পারেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই সময়ে অসময়ে মোজেজা প্রদর্শনের জন্য তাঁদেরকে বিব্রত করে তোলে। আল্লাহ্‌তায়ালা সবকিছুরর সূচনা, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতির সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই নির্ধারণ অনুসারে সকল কিছু পরিচালিত হয়। তাই যথাসময়ে সংঘটিত হয় জীবন,

মৃত্যু বিশ্বাসী হওয়া, না হওয়া ইত্যাদি। তেমনি কোরআনের আয়াতসমূহ ও অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রকাশের জন্যও রয়েছে সুনির্দিষ্ট সময়। মানুষ কখনোই তা লংঘন করতে পারবে না। অগ্র-পশ্চাৎও ঘটাতে পারবে না।

'লি কুল্লি আজ্বালিন্ কিতাব' অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ। অর্থাৎ নবী-রসুলগণের যুগের চাহিদা অনুসারে শরিয়তের বিধানসমূহ প্রবর্তিত করা হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই বিধানসমূহেরও পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন সাধন করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কখন কোথায় কীভাবে কোন বিধান তিনি পরিবর্তন করবেন, সে সকল কিছু তিনিই নির্ধারণ করে রেখেছেন। ওই নির্ধারণা-নুসারে যথাসময়ে সকল কিছু সম্পাদিত হয়। তাঁর এই অনড় নিয়ম বা নিয়তির বিপরীত কিছুই ঘটে না।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৩৯

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

❑ আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা বাতিল করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা বহাল রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে কিতাবের মূল।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছামত মানুষের অদৃষ্টলিপির কোনো কোনো অংশ মুছে ফেলেন, আর কোনো কোনো অংশ প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন। আবার যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তবে চারটি বিষয় এর ব্যতিক্রম— সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, জীবন, মৃত্যু। হজরত জাবের থেকে হজরত রবাবের মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কখনো রিজিকের সংকোচন ঘটান, আবার কখনো রিজিককে করেন প্রসারিত। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, একবার আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসুল স. বলেছিলেন, এরকম ঘটে থাকে প্রতি শবে কদরে। ওই রাতে আল্লাহ্ কারো মর্যাদা সমুন্নত করেন, কাউকে নিষ্কৃতি দান করেন নরক থেকে, আবার কাউকে প্রদান করেন জীবনোপকরণ। কিন্তু চারটি বিষয় এর ব্যতিক্রম— সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, জীবন, মৃত্যু।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মতপৃথকতা পরিলক্ষিত হয়। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্ যে সকল অপরিহার্য বিষয় ও বিধান রহিত করতে চান, তা রহিত করেন। ইচ্ছে মতো সেগুলোর রদবদল ঘটান। আবার কোনো কোনো গুলোকে রেখে দেন অবিকল। 'লিকুল্লি আজ্বালিন

কিতাব' (সব সময় বিধিলিপি অনুসারে) কথাটির মর্মার্থও তাই। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, লওহে মাহফুজ থেকে তিনি যা ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন এবং যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। বিলোপযোগ্য অদৃষ্টলিপিকে বলে প্রলম্বিত নিয়তি (কাযায়ে মুয়াল্লাক)। এমতো ক্ষেত্রে বিলুপ্ত বিষয়গুলোর স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নতুন সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধও হতে পারে, আবার বিদ্যমান থাকতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র জ্ঞানে। আর যেগুলো বিলোপযোগ্য নয় সেগুলোকে কখনোই বিলোপ করা হয় না। এ ধরনের অপরিবর্তনীয় অদৃষ্টলিপির নাম স্বতঃসিদ্ধ নিয়তি (কাযায়ে মুবরাম)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এবং যা ইচ্ছা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখেন। চারটি বিষয়ে তিনি এরকম করেন না। সে চারটি বিষয় হচ্ছে— হায়াত, মউত, খোশনসীবী, বদনসীবী।

হজরত হোযায়ফা বিন উসাইয়েদ থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুরুষের শুক্রানু স্ত্রীগর্ভে অবস্থান গ্রহণের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন পর আগমন ঘটে এক ফেরেশতার। সে নিবেদন করে, হে আমার পালনকর্তা! পূর্ণাবয়বের দিকে অগ্রসরমান এই শিশুটি সৌভাগ্যশালী হবে, না হতভাগ্য। এভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত জেনে নিয়ে সে ওই শিশুটির অদৃষ্টে সৌভাগ্যশালী অথবা হতভাগ্য লিখে দেয়। পুনরায় প্রশ্ন করে, পুরুষ হবে, না নারী? জবাবানুসারে সে এ বিষয়টিও লিপিবদ্ধ করে। তারপর লিপিবদ্ধ করে তার জীবন-মৃত্যু, কার্যকলাপ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি। এরপর তকদির মিশিয়ে দেয়া হয় তার সত্তার সঙ্গে। তাই তকদিরের বিপরীত কিছু ঘটেনা।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, সত্য পয়গম্বর রসুল স. বলেছেন, মাতৃজঠরে মানব শিশু বেড়ে ওঠে এভাবে— চল্লিশ দিন থাকে শুক্রানুরূপে। পরের চল্লিশ দিন থাকে জমাট রক্তের আকারে। এর পরের চল্লিশ দিন থাকে মাংশপিণ্ডরূপে। আল্লাহ্‌ ওই সময় জীবন, মৃত্যু, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য— এই চারটি বিষয়সহ এক ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। প্রেরিত ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে এই চারটি বিষয় সুনির্ধারিত করে দেন। এরপর প্রাণ দান করা হয় তাকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আল্লাহ্‌ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে অবলোপন করেন। অবলোপন করেন রিজিক ও হায়াতকেও। আবার ওগুলোর কিছু কিছু অংশ বহালও রাখেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণের সময় কাঁদতে কাঁদতে দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি যদি ভাগ্যবানদের তালিকায় আমার নাম লিখে

রাখো, তবে তা যথাস্থানে রেখে দাও। আর যদি হতভাগ্যদের তালিকায় আমার নাম থাকে, তবে তা বিলোপ করো। দয়া করে লিপিবদ্ধ করে দাও ভাগ্যবান ও ক্ষমাপ্রাপ্তগণের তালিকায়। নিঃসন্দেহে তুমি যা ইচ্ছা তা অবলোপন করো এবং যা ইচ্ছা স্থির রাখো। তোমার অধিকারেই সংরক্ষিত রয়েছে মূল গ্রন্থ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে।

কোনো কোনো সাহাবা-বাণী (আসার) থেকে এসেছে, হায়াত বাড়ানো, কমানো হয়। দৃষ্টান্তটি এরকম— এক লোকের তিরিশ বছর হায়াত আছে। এ সময় সে হঠাৎ কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলো। এমতো ক্ষেত্রে তার হায়াত তিরিশ বছর থেকে কমিয়ে তিন বৎসরে আনা হতে পারে। আবার এক লোকের হায়াত আছে তিন বছর। এমন সময় সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিচ্ছিন্নকৃত কোনো আত্মীয়তার বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। এমতাবস্থায় তার আয়ু তিন বৎসরের স্থলে তিরিশ বৎসর করা হতেও পারে। উদ্ধৃত সাহাবা-বাণীটি উল্লেখ করার পর বাগবী লিখেছেন, আবু দাউদের একটি বিবরণ। বিবরণটি এই— রসুল স. বলেছেন, এক লোকের অন্তিম সময় উপস্থিত। বাকী আছে কেবল রাত্রির তিনটি প্রহর। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত মহিমা প্রকাশ করলেন। বাড়িয়ে দিলেন তার আয়ু। এ ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে অদৃষ্টলিপির কিছু কিছু অবলুপ্ত হয় এবং কিছু কিছু থাকে পূর্ববৎ।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আলী রসুল স. সকাশে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে আমি তোমার নেত্রদ্বয়কে সুশীতল করে দিবো। একথা জেনে আগামী দিনের উম্মতেরও চক্ষুযুগল শীতল হয়ে যাবে। দান করো, মাতাপিতার প্রতি প্রদর্শন করো যথোপযুক্ত শিষ্টাচার। মনে রেখো, কল্যাণজনক কর্ম দুর্ভাগ্যকে অপসারণ করে সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে।

আমি বলি, হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের অনুকূল একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে মাকামাতে মোজাদ্দেদিয়া গ্রন্থে। ঘটনাটি এই— মোজাদ্দেদ তনয় মোহাম্মদ সাঈদ ও মোহাম্মদ মাসুমের ওস্তাদ ছিলেন মোল্লা তাহের লাহোরী। একবার হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি আত্মিক দৃষ্টিতে দেখলেন, তাঁর অদৃষ্টলিপিতে লেখা রয়েছে— দুর্ভাগা। তিনি তাঁর সন্তানদ্বয়কে একথা একান্তে বললেন। তাঁরা সম্মানার্হ শিক্ষকের এরকম পরিণতির কথা জানতে পেরে মনোক্ষুণ্ন হলেন। নিবেদন করলেন, হে পিতৃপ্রবর! আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে আমাদের প্রিয় ওস্তাদজীর তকদির পরিবর্তন করে দিন। হজরত মোজাদ্দেদে

আলফেসানি বললেন, কী করে সম্ভব! লওহে মাহফুজেও যে একই কথা লেখা রয়েছে। মোহাম্মদ সাঈদ এবং মোহাম্মদ মাসুম তাঁদের অনুনয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ, বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর একটি কথা আমার মনে পড়েছে। তিনি বলেছেন, আমার দোয়ার মাধ্যমে অপরিবর্তনীয় তকদিরও পরিবর্তন করে দেয়া হয়। সুতরাং আমিও কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি। হে আমার পরম করুণাপরবশ মাবুদ! হে আমার আল্লাহ্! তোমার অনুকম্পা অসীম। একজনের প্রার্থনা গ্রহণের মাধ্যমে সে অনুকম্পা তো নিঃশেষ হতে পারে না। সুতরাং আমিও এ ব্যাপারে আশাধারী। তোমার মহিমা সকাশে আমি আকুল মিনতি জানাই। দয়া করে আমার নিবেদন গ্রহণ করো। মোল্লা তাহেরের ললাট লিপি থেকে 'দুর্ভাগা' কথাটি মুছে দাও। তদস্থলে মুদ্রিত করো 'ভাগ্যবান', যেভাবে তুমি কবুল করে নিয়েছিলে আমার শ্রদ্ধার্হ পূর্বসূরী শায়েখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর নিবেদন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেন, প্রার্থনা শেষে আমি দেখলাম, মোল্লা তাহেরের ললাট লিখন থেকে 'দুর্ভাগা' কথাটি মুছে ফেলা হলো। তদস্থলে মুদ্রিত হলো 'ভাগ্যবান'। আর এরকম করা আল্লাহ্পাকের নিকট অতি সহজ।

আমি বলি, মাকামাতে মোজাদ্দেদিয়ার এই ঘটনাটি পাঠ করে আমি এক বিরাট সমস্যায় পড়ে গেলাম। সমস্যাটি হচ্ছে— তকদিরের লিখন তো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এভাবে পরিবর্তন করা হলে তা আর অপরিবর্তনীয় থাকে কী করে? শেষে আত্মিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আমার হৃদয়পটে সমস্যাটির সমাধান ভেসে উঠলো এভাবে — নিয়তি দু'ধরনের। একটি প্রলম্বিত— যা লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে)। আর একটি অপরিবর্তনীয়— যা বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ্র জ্ঞানে। যেহেতু লওহে মাহফুজে সকল কিছু সুসংরক্ষিত, তাই সেগুলোকে অপরিবর্তনীয় নিয়তি বলা যায়। ওই সকল লিপির কিছু কিছু অংশ পরিবর্তনশীল। কিন্তু সে পরিবর্তনশীলতার কথা লওহে মাহফুজে লেখা নেই। অলিপিবদ্ধরূপে সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অপার প্রজ্ঞায়। বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী এবং শায়েখ মোজাদ্দেদে আলফেসানির ঘটনা দু'টো এই ধরনের।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জুহাক এবং কালাবী বলেছেন, কিরামান ও কাতেবিন নামে দুই লেখক ফেরেশতা মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। একজন লিখেন পাপ। অন্যজন লিখেন পুণ্য। মানুষের কিছু কিছু কথা ও কাজ আবার পাপ অথবা পুণ্য কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। আল্লাহ্পাক সেগুলোকে অবলোপন করেন। বহাল রাখেন কেবল পাপ-পুণ্যের বিবরণ। কালাবী আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন— আল্লাহ্পাক ওই অবলোপন সাধন করেন বৃহস্পতিবার রাতে।

আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জীবনভর পুণ্যকর্ম করা সত্ত্বেও শেষকালে যে বিপথগামী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার পূর্বের সকল পুণ্যকে আল্লাহ্ বিলোপ করে দেন। আর পুণ্যবান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পুণ্যগুলোকে রাখেন সুপ্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র উদাহরণরহিত দুই আংগুলের মধ্যে। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনভাবে অন্তঃকরণগুলোর অবস্থান্তর ঘটান। এরপর রসুল স. দোয়া করলেন, হে অন্তঃকরণের বিবর্তনকারী আল্লাহ্! আমাদের অন্তঃকরণ-গুলোকে ভরে দাও তোমার আনুগত্যবোধ দিয়ে।

হাসান বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ মুছে দেন তার পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড। আর যার মৃত্যু অত্যাসন্ন নয়, তার জীবনের রূপরেখা রাখেন অটুট। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত অবলোপন ও বহাল করার বিষয়টি এরকম।

ইকরামা বলেছেন, তওবার সুবাদে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার পাপসমূহ অবলোপন করেন। পাপের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন পুণ্য। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন— উলায়িকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লহু সায়্যিআতিহিম হাসানাত্ (আল্লাহ্ ওই সকল লোকের পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত করেন)।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, হাশরের ময়দানে এক লোকের বিচার শুরুর প্রাক্কালে আদেশ করা হবে, তার সগীরা (ছোট) গোনাহ্গুলো উপস্থিত করা হোক। কিন্তু তার কবীরা (বড়) গোনাহ্-গুলোকে রাখা হবে গোপন। বলা হবে, অমুক দিন তুমি কি এই অপকর্মটি করো নি? সে অবনত মস্তকে তার কৃত পাপের স্বীকৃতি দিবে এবং পাপাতঙ্কে আতংকিত হয়ে পড়বে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন, এ লোকের প্রত্যেক পাপের স্থলে পুণ্য লিখে দেয়া হোক। একথা শুনে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে, আমার তো আরো অনেক পাপ আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বলে রসুল স. মৃদু হাসলেন। বিকশিত হলো তাঁর শ্বেতশুভ্র পবিত্র দন্তরাজি। গ্রন্থকার বলেন, যারা আল্লাহ্‌র প্রেমসাগরে নিমজ্জিত, এরকম কাণ্ড ঘটবে তাঁদের বেলায়। এরকম উন্নত মর্যাদাধারীরা হচ্ছেন পীর-দরবেশগণ।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা বিলোপ করেন— কথাটির অর্থ, চন্দ্রিমা বিধৌত নিশি বিলোপ করেন। আর যা ইচ্ছা বহাল রাখেন— কথাটির অর্থ, নিশি শেষে উদ্ভাসন ঘটান দিবাকরের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— আর আমি বিলোপ করে দেই রাত্রির চিহ্ন এবং প্রকাশ করি দিবসের নিদর্শন।

রবী বিন আনাস বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটি আত্মা সম্পর্কীয়। মানুষ নিদ্রিত হলে আল্লাহ্ তার আত্মা আপন অধিকারে নিয়ে নেন। ওই সময় তার মৃত্যু ঘটাতে চাইলে আত্মাকে আটক করেন। আর জীবিত রাখতে চাইলে ফিরিয়ে দেন সেই আত্মাকে। এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় আত্মাগুলোকে আপন অধিকারভূত করেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হলে সেগুলোকে গ্রহণ করেন নিদ্রার সময়।' কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, প্রদর্শনপ্রবণ আমলগুলোকে আল্লাহ্পাক আমল লেখক ফেরেশতাদের দপ্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আর বিশুদ্ধ-উদ্দেশ্য-সম্বলিত কার্যকলাপগুলোকে বহাল রাখেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার বলেছেন, ধরিত্রীবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ্পাক নিশ্চিহ্ন করে দেন। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়কে করেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাঁর নিকট আছে কিতাবের মূল।' এখানে 'উম্মুল কিতাব' অর্থ কিতাবের মূল বা মূল গ্রন্থ। আর মর্মার্থ — আল্লাহ্র জ্ঞান। হজরত ইবনে আব্বাস একবার হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন উম্মুল কিতাব অর্থ কি? তিনি বললেন, ইলমুল কিতাব। অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞান। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকটে রয়েছে দু'টি গ্রন্থ। একটির বিষয়বস্তু স্থায়ী ও অস্থায়ী। অর্থাৎ এই কিতাবের কিছু কিছু বিষয় মুছে ফেলা হয় এবং কিছু কিছু বিষয় বহাল রাখা হয়। অপর গ্রন্থটি হচ্ছে উম্মুল কিতাব বা মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কোনো কিছুই রূপান্তরিত হয় না।

বাগবী লিখেছেন, উম্মুল কিতাব হচ্ছে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ফলক। ওই ফলকে লিপিবদ্ধ বিষয়ের রূপান্তর সাধিত হয় না। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে একটি সংরক্ষিত ফলক, যার ব্যাপ্তি পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান। শ্বেত মুক্তায় নির্মিত ওই ফলকের দু'টি প্রান্ত আবার নির্মিত ইয়াকুত মর্মর দ্বারা। আল্লাহ্ ওই সংরক্ষিত ফলকটির প্রতি প্রতিদিন তিনশত তিরিশ বার দৃষ্টিপাত করেন। অভিপ্রায়ানুসারে সেখানকার কিছু কিছু বিবরণ অপসারিত করেন এবং কিছু কিছু রেখে দেন অবিকল পূর্বাবস্থায়।

ইসলামের বিজয় ও অবিশ্বাসীদের ধ্বংস সাধনের যে শুভসংবাদ আল্লাহ্পাক দিয়েছিলেন, তার বিলম্ব ঘটতে দেখে অবিশ্বাসীরা প্রায়শঃই রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। তাদের বিদ্রূপবানে জর্জরিত রসুল স. তাই মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। বিষণ্নচিত্ত রসুলকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে তাই অবতীর্ণ হলো—

وَاِنۡ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِىۡ نَعِدُهُمۡ اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ وَعَلَيۡنَا الۡحِسَابُ ۝ اَوَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا نَاۡتِى الۡاَرۡضَ نَـنۡقُصُهَا مِنۡ اَطۡرَافِهَا‌ ؕ وَاللّٰهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهٖ‌ ؕ وَهُوَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ۝

❒ উহাদিগকে যে শাস্তির কথা বলি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা যদি ইহার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাইয়াই দিই— তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

❒ উহারা কি দেখে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

ইতোপূর্বে আল্লাহ্পাক শুভসংবাদবাহী এক আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন— 'তারা সমষ্টিগতভাবে পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে' সেদিকে ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে 'তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি।' অর্থাৎ কাফেরদেরকে শাস্তি দিবো বলে যে অংগীকার আমি করেছি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই অংগীকারটি বাস্তবায়িত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন কেউ কেউ হয়েছিলো নিহত এবং কেউ কেউ হয়েছিলো বন্দী। অবশিষ্টরা কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলো।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দিবো বলে যে অংগীকার আমি করেছি, তার কিছু কিছু আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদেরকে আমি শাস্তি দিতে পারি, আপনার মহাপ্রস্থানের পর। অর্থাৎ আমি কখন তাদেরকে শাস্তি দিবো সে ভাবনা আমার, আপনার নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কেবল আপনার কর্তব্যকর্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা কেবল নিবদ্ধ রাখুন সত্যধর্ম প্রচারের দিকে। অবাধ্যদের প্রতি শাস্তি আপতিত হলো কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আমার প্রিয় বার্তাবাহক। সুতরাং আমার বার্তা প্রচার করাই আপনার মূল কর্তব্য। আর আমার কর্তব্য হচ্ছে,

বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে যথাসময়ে সকলের যথোপযুক্ত হিসাব গ্রহণ করা। একথা নিশ্চিত যে, শাস্তি তাদের হবেই। হয় পৃথিবীতে অথবা আখেরাতে। কিংবা পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে।

পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে — 'তারা কি দেখে না যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি?' বাগবী লিখেছেন, 'আরদ্ব' অর্থ পৃথিবী। কিন্তু এখানে কথাটির অর্থ হবে দেশ বা অবিশ্বাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। আর সংকুচিত করার অর্থ মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধীরে ধীরে কোনঠাসা করে ফেলা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ক্রমাগত প্রভাবহীন হয়ে পড়ছে। ইসলামের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমি তাদেরকে দিন দিন দুর্বল করে ফেলছি। এ বিষয়টি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অনুধাবন করে না কেনো? একটু ভালো করে চিন্তা করলেই তো বুঝা যায় যে, তাদের আধিপত্য ক্রমশঃ খর্ব হতেই থাকবে। আর অব্যাহত থাকবে ইসলামের জয়যাত্রা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের এখনো সত্যোপলব্ধি ঘটছে না কেনো? আলোচ্য বাক্যের এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং অধিকাংশ প্রখ্যাত তাফসীরবিদ।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকোচন করার অর্থ— ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দেখতে পাচ্ছে না কেনো, আমি তাদের বিভিন্ন জনপদ ধুলিসাৎ করে ফেলছি! ক্রমাগত উৎখাত করে চলছি তাদেরকে তাদের বসবাস থেকে? মুজাহিদ ও শা'বীও এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করবার কেউ নেই।' এ কথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টিজগত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। তাঁর আদেশেই সকল কিছু চলে। তিনিই একমাত্র বিধান ও সিদ্ধান্তদাতা। এমন কেউই নেই যে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। 'আক্বব্' অর্থ কাউকে বা কোনো কিছুকে পিছনে হটিয়ে দেয়া। আর যিনি এভাবে সকল কিছুকে পিছনে হটিয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন 'মুয়াক্বিব্'। তাই এখানে বলা হয়েছে— লা মুয়াক্বিবা লিহুক্মিহী (তাঁর আদেশ রদ করবার কেউ নেই)। অর্থাৎ ইসলামকে বিজয়ী করবার যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন, সে সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।' এ কথার অর্থ— সত্বর তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধবাদিতার জবাব দান করবেন। ফলে তাদের কেউ কেউ নিহত হবে। কেউ কেউ হবে বন্দী। আবার কেউ কেউ হবে দেশান্তরিত। এরপর হাশরের ময়দানে তিনি কঠোরভাবে গ্রহণ করবেন তাদের হিসাব।

রসুল স. এর অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা প্রয়োগ করেছিলো বিভিন্ন কুটকৌশল ও ষড়যন্ত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টির উল্লেখ করে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা ও সাহস।

সুরা রা'দ ঃ আয়াত ৪২, ৪৩

❒ উহাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহের এখ্তিয়ারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদিগের জন্য।

❒ যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বলে, 'তুমি আল্লাহের প্রেরিত নহ।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাহাদিগের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তাহারা আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও চক্রান্ত করেছিলো কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র এখতিয়ারে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা যেভাবে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে, বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের নিকট প্রেরিত নবী-রসুলের বিরুদ্ধে এ রকম চক্রান্ত করেছিলো। এটা তাদের চিরন্তন স্বভাব। কিন্তু তারা তো জানে না যে, সকল শুভ ও অশুভের একমাত্র নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো চক্রান্ত কখনোই কার্যকর হয় না। এখানে 'মকর' অর্থ চক্রান্ত, গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে কাউকে ক্লেশ দেয়া। কোনো কোনো আলেম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাকই তাদের এবং অন্য সকলের চক্রান্তের স্রষ্টা। ভালো ও মন্দ উভয়ই তাঁর অধীন। লাভ ও ক্ষতির সৃজকও তিনি। তাই তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কার জন্য।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনা সতত সচল। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দিকভ্রান্ত।

তাই সত্যপোলব্ধি তাদের ঘটছে না। কিন্তু হাশর প্রান্তরে যখন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে একত্র করা হবে তখন চিরতরে দূর হয়ে যাবে তাদের ভ্রান্তি। সীমাহীন শাস্তি দর্শনে তারা তখন হয়ে পড়বে বিহ্বল, চঞ্চল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দেখবে, যে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ তারা করেছিলো তারাই আজ চলে যাচ্ছে চির সুখময় বেহেশতের দিকে। এভাবে আল্লাহ্পাক চূড়ান্ত জবাব দিবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চক্রান্তের।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নও। বলো, আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা অথবা মদীনার ইহুদীরা বলে, আপনি আমার রসুল নন। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি যেহেতু আল্লাহ্র রসুল, তাই আল্লাহ্র সাক্ষ্যই আমার জন্য যথেষ্ট। আর রয়েছে ওই সকল লোকের সাক্ষ্য যারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। যেমন, ইহুদী থেকে ধর্মান্তরিত বিজ্ঞ সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। সুতরাং এ বিষয়ে অজ্ঞ ও মূর্খ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সাক্ষ্যের কোনো মূল্যই নেই। কারণ তারা হিংসুক ও প্রবৃত্তিপরায়ণ। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই সুরার সকল আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। শা'বী এবং আবুল বাসীর এই ব্যাখ্যাটির বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ছিলেন মদীনাবাসী। আর তিনি ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন মদীনায়। সুতরাং মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ কোনো আয়াত সন্নিবেশিত থাকতে পারে না।

আমি বলি, এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হলেও এর মধ্যে ইহুদীদের সম্পর্কে উল্লেখ না থাকার তো কোনো যুক্তি নেই। বিষয়টি আসলে এরকম— আল্লাহ্পাক এখানে মক্কার অংশীবাদীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, মোহাম্মদের নবুয়ত সম্পর্কে যদি তোমরা দ্বিধান্বিত হও তবে, যারা ইহুদী তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে দেখতে পারো? তাদের মধ্যে যারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সত্য কথা বলে, তারা নিশ্চয় মোহাম্মদের নবুয়তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

হাসান ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আল কিতাব' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আর 'ওয়ামান ইনদাহু ইলমুল কিতাব' অর্থ আল্লাহ্পাক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট যিনি উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত। আর সংরক্ষিত ফলক সম্পর্কিত জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারো নেই। মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে তিনিই শাস্তি দান করবেন। সে মিথ্যাবাদী যে কেউ হোক না কেনো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হাসান 'মান্ ইনদাহু' কথাটিকে পাঠ করতেন 'মিন ইন্দিহী'। মুজাহিদও এই উচ্চারণরীতির সমর্থক।

সুরা ইব্‌রাহীম

সাত রুকু এবং বায়ান্ন আয়াত সম্বলিত এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল আটাশ ও উনত্রিশ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইব্‌রাহীম অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নূহ্ এর পরে।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ
وَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ ۢ بَعِيْدٍ

❒ আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, বাহির করিয়া নিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।

❒ আল্লাহ্— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য,

❒ যাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহের পথ হইতে এবং আল্লাহের পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে— আলিফ লাম রা। কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রথমে এ ধরনের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোকে বলে হরূফে মুকাত্তায়াত। এগুলোর মর্ম দুর্জ্ঞেয়। এ সকল অক্ষরের মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন) তাঁরাও এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এই কোরআন আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এ কারণে, যাতে আপনি আপনার পালনকর্তার অনুমতিক্রমে মানব জাতিকে বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে সত্যের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে আসতে পারেন। অর্থাৎ নিয়ে আসতে পারেন তাঁর পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশংসার্হ।

এখানে 'জুলুমাত্' অর্থ পথভ্রষ্টতার অন্ধকার। আর 'নূর' বা আলো অর্থ হেদায়েত, সুপথ। 'ইজন্' অর্থ সামর্থ্য। অর্থাৎ কোনো বিষয় কার্যকর করার সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন। যেমন অতিথিকে গৃহস্বামী কর্তৃক গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান। এ রকম অনুমতি পেলে গৃহে প্রবেশ করা সহজতর হয়। বাধা-বিপত্তি আর থাকে না।

'তাঁর পথে' অর্থ আল্লাহর পথে, যে পথ গৌরবের, সাফল্যের। যে পথের যাত্রীরা হয় নন্দিত ও প্রশংসিত। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্র পথের পথিক কখনো বিভ্রান্ত হয় না। বিপথে চলে না।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁরই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।' মন্দ কোনো কিছুর অবতারণাকে বলে 'ওয়াইল'। বায়যাবী লিখেছেন, ওয়াইল এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াল'। 'ওয়াল' অর্থ পরিত্রাণ। অতএব 'ওয়াইল' অর্থ হবে ধ্বংস। শব্দটি একটি ধাতুগত শব্দ। এরকম শব্দ থেকে অন্য কোনো শব্দের বুৎপত্তি ঘটে না। বায়যাবীর ব্যাখ্যার আলোকে বলতে হয়, শব্দটি তিরস্কার প্রকাশক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিরস্কার করা হয়েছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে সম্মত হয়নি।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষদেরকে নিবৃত্ত করে এবং আল্লাহর পথ বক্র করতে চায়; তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' এখনে 'ইয়াস্তাহিব্বুনা' অর্থ ভালো মনে করে। কোনো কিছুকে সাগ্রহে গ্রহণ করাকে বলে 'ইস্তিহ্বাব'। অর্থাৎ কোনো কিছুকে প্রিয় জ্ঞান করা। 'ইহজীবন' অর্থ পার্থিব জীবনের আস্বাদ। 'আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে' অথ রসুল স. এর অনুসরণে প্রতিবন্ধকতা না করে। 'আল্লাহ্র পথ বক্র করতে চায়' অর্থ অহমিকাবশতঃ সত্য পথের আহ্বানের মধ্যে সন্ধান করে দোষত্রুটি। অথবা পশ্চাদপসারণ করে সত্য থেকে। অর্থাৎ বক্রপথে তারা আল্লাহ্কে পেতে চায়। কিন্তু তারা জানে না যে, আল্লাহ্পাকের প্রতি বৈমুখ্য তাদেরকে কখনোই সফল করতে পারবে না। এ রকমও বলা যায় যে, আল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পার্থিবতায় মগ্ন হওয়ার অর্থ অবৈধ সম্পদ কামনা করা।

'তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে' কথাটির অর্থ তারা রয়েছে সত্য থেকে যোজন যোজন দূরে। পথভ্রষ্ট জনগোষ্ঠীকে সাধারণতঃ এভাবেই চিহ্নিত করতে হয়।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

❑ আমি প্রত্যেক রসুলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি' এখানে উল্লেখিত 'ক্বাওমিহি' কথাটির অর্থ ওই জাতিগোষ্ঠী যাদের মধ্যে নবী রসুল জন্মগ্রহণ করেন। আবদ্ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'লিসানু ক্বওম' অর্থ জাতির ভাষা। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলেন। রসুল স. কথা বলতেন আরবীতে। কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা ছিলো আরবী। তাঁর পূর্বে প্রেরিত নবী রসুলগণও তাঁদের স্ব স্ব জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতেন। সত্য প্রচার সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ্পাকই এই নিয়মটি বেঁধে দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য' এ কথার অর্থ— যেনো নিজস্ব ভাষায় অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহ তিনি স. সম্প্রদায়ের লোকজনকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। 'বুঝতে পারছিনা' 'দুর্বোধ্য' 'অস্পষ্ট' ইত্যাদি বলে লোকেরা যেনো সত্যের আহ্বানকে এড়িয়ে যেতে না পারে। উল্লেখ্য যে, বিগত যুগের নবী-রসুলগণ আদিষ্ট হয়েছিলেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু রসুল স. আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বমানবতাকে পথপ্রদর্শনের জন্য। স্বজাতিকে পথ প্রদর্শন ছিলো তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তাঁর পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যেমন—১. 'আর আপনি আপনার নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করুন। ২. মক্কাবাসী ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ....। ৩. সেই জাতিকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যাদের পিতৃ-

পুরুষগণকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। প্রথমোক্ত আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, দ্বিতীয় আয়াতে মক্কাবাসী ও মক্কাসন্নিহিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসী এবং তৃতীয় আয়াতে সমগ্র আরব ও অনারব জনতাকে পথ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়েছে রসুল স. এর কর্তব্যকর্মের সীমানা। বলা বাহুল্য যে, তিনি স. এই কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। তাই আমরা দেখি ধীরে ধীরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মক্কায়, মদীনায়, সমগ্র আরবে, সারা দুনিয়ায়। অনারবেরাও ক্রমান্বয়ে এই সত্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কোরআনের বাণী-বৈভবকে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছেন। এই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে রসুল স. বলেছেন, সকল সৎ ও অসৎ কর্মে মানবজাতি কুরায়েশদের অনুসারী। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও মুসলিম। হাদিসটির মর্মার্থ এ রকম— কুরায়েশরাই সর্বপ্রথম রসুল স. এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অনুসারী। আবার কুরায়েশরাই সর্বপ্রথম রসুল স. এর প্রতি ইমান এনেছেন। তাই পরবর্তী সময়েই সকল ইমানদার তাঁদের অনুসারী। এভাবে ভালো ও মন্দ উভয় বিষয়ে সকল মানুষ কুরায়েশদের অনুসারী।

হজরত জারীরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো সৎ পদ্ধতির প্রচলন ঘটাবে, সে লাভ করবে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব। অনুসারীদের সওয়াব এতে বিন্দু পরিমাণ কমবে না। আবার যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো অসৎ পদ্ধতি প্রচলন করবে, সে পাবে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপ। কিন্তু অনুসারীদের পাপও এতে করে বিন্দু পরিমাণ কমবে না। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী শিথিল সূত্র সহযোগে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, হে মদীনাবাসী! জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সকল মানুষ তোমাদের অনুগামী। এখানে 'মদীনাবাসী' অর্থ আনসার ও মুহাজির। অর্থাৎ সকল মানুষ আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী। আর খেলাফতের ব্যাপারে আনসারগণও মুহাজিরগণের অনুসারী। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই।

হজরত আবু রাফে' কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তি যেমন, উম্মতগণের মধ্যে নবীও তেমনি। ইবনে নাজ্জার। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আপন উম্মতের মধ্যে

নবী-রসুলগণ গৃহবাসীদের মধ্যে গৃহকর্তার মতো। ইবনে হাব্বান তাঁর জুয়াফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে কাসীর ইবনে কইস সূত্রে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেন, হে মদীনাবাসী! সকল লোক তোমাদের অনুগামী। ধর্মশিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের লোক তোমাদের কাছে আসে। তোমরা তাদের সঙ্গে শিষ্টাচার কোরো। সদুপদেশ দিয়ো। তিরমিজি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'কান্নাবিয়্যু ফী ক্বওমিহী' (যেমন নবী তাঁর স্বজাতির মধ্যে) কথাটির মধ্যে 'নবী' অর্থ শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। হাদিসটির মর্মার্থ এরকম— সকল আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হতো। হজরত জিবরাইল সে সকল নভজ বাণীবৈভবকে নবীগণের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে তাঁদেরকে জানাতেন। কালাবীর মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইলের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হতো আরবী ভাষায়। হজরত জিবরাইল সেগুলোকে অনুবাদ করে দিতেন নবীগণের মাতৃভাষায়।

ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, সুফিয়ান সওরী বলেছেন, সকল নবীর উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিলো আরবী ভাষায়। প্রচারের সুবিধার্থে নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিলেন সেই প্রত্যাদেশগুলোকে। তিনি আরো বলেছেন, হাশর প্রান্তরে কথাবার্তা হবে সুরিয়ানী ভাষায়। আর বেহেশতবাসীদের ভাষা হবে আরবী।

আমি বলি, 'কান্নাবিয়্যু ফী ক্বওমিহী' কথাটির অর্থ, রসুল স. এর এরকম মন্তব্য সংগত নয়। এরকম অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি চলে যাবে লিতুবাইয়্যিনা লাহুম বিলিসানি ক্বওমিহী (স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি) কথাটির বিরুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন' এ কথার অর্থ— ভ্রান্তি ও পথপ্রাপ্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়-নির্ভর। অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— তিনি মহাপরাক্রান্ত। তাই তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ কারো নেই। আর তিনি মহাপ্রজ্ঞাধিকারী। কাউকে পথভ্রষ্ট করা এবং কাউকে পথ প্রদর্শন করার বিষয়টি তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার একটি রহস্যময় নিদর্শন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

❐ মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর এবং উহাদিগকে অতীতের ঘটনাসমূহ স্মরণ করাইয়া দাও।' ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

❐ স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরাউনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তোমাদিগের পুত্রগণকে জবাই করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত; এবং ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা।

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'আইয়্যামিল্লাহ্' কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামতসমূহ। হজরত ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কা'ব, মুজাহিদ এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ ওই সকল ইতিবৃত্ত , যা ঘটেছিলো আদ্, ছামুদ ও হজরত নুহের যুগে। প্রচলিত একটি প্রবাদ— অমুক ব্যক্তি আইয়্যামুল আরবের আলেম। এ কথার অর্থ, লোকটি আরববাসীদের যুদ্ধের ইতিহাস জানেন। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্বজাতিকে ওই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিন, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিলো তাদের পূর্বসুরীদের জামানায়— কখনো অনুকম্পারূপে, আবার কখনো দুর্বিপাকরূপে। যেমন, নবী মুসার ঘটনা। তাঁকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো।

এরপর বলা হয়েছে—'এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' একথার অর্থ— ওই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের এককত্ব ও শক্তিমত্তার বিস্ময়কর নিদর্শন। যারা সহিষ্ণু ও

কৃতজ্ঞচিত্ত, তারাই কেবল ওই সকল ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এখানে 'স্বাব্বার' ও 'শাকূর' (ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ) শব্দ দু'টো উল্লেখের কারণে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বাসীদের জন্য এ দু'টো গুণের অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। বায়হাকী তার শো'বুল ইমান গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম আবু জুবিয়ান সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলকামা ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ধৈর্য হচ্ছে ইমানের অর্ধাংশ। আর দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে পূর্ণ ইমান। আলা বিন বদরের সম্মুখে একথা বলার পর তিনি আরো বলেছেন, তুমি কি শোনোনি আল্লাহ্‌পাকের এই আয়াত— 'এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য' এবং 'অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী।' উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের একটিতে ইমানদারদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞচিত্তরূপে। আরেকটিতে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে ইমানদাররূপে। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ওই ব্যক্তিই মুমিন, যে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, দু'টো বিষয়ের সমষ্টির নাম ইমান। একটি ধৈর্য ও অপরটি কৃতজ্ঞতা। তিবরানী তাঁর মুকারিমুল আখলাখ গ্রন্থে এবং আবু ইয়া'লী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন সহনশীলতা ও বিনয়ের সমষ্টি হচ্ছে ইমান।

হজরত সুহাইব থেকে মুসলিম ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের সকল কিছুই বিস্ময়কর। তাদের সকল কাজ কল্যাণে ভরপুর। তারা সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর দুঃখের সময় অবলম্বন করে সহিষ্ণুতাকে। এভাবে সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় তারা কল্যাণের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, মুমিনদের অবস্থা দেখে অবাক মানতে হয়। বিপদের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে পুণ্যাভিলাষী হয়। আর সুখের সময় আল্লাহ্‌র প্রতি জানায় সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা। এভাবে আনন্দ ও বিষাদ উভয় অবস্থায় লাভ করে কেবল কল্যাণ আর কল্যাণ। এমন কি আহারের যে গ্রাস সে মুখে তুলে নেয়, তার জন্যও সে পুণ্য লাভ করে।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ একবার হজরত ঈসাকে বললেন, হে ঈসা! তোমার পরে আমি বিশেষ এক উম্মতের অভ্যুদয় ঘটাবো। কাংখিত বিষয় হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করবে। আর প্রতিকূল অবস্থায় তারা পুণ্যের আশায়

ধৈর্যধারণকারী হবে। তারা বিপদ সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু কী করা উচিত, তা বুঝতেও পারবে না। নবী ঈসা বললেন, 'সহ্য করতে পারবে না, আবার বুঝতেও পারবে না'— এটা কি করে সম্ভব? আল্লাহ্ বললেন, তখন আমার পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে জ্ঞান দান করবো। বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রগণকে জবাই করতো ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখতো; এবং এতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।' এখানে 'অনুগ্রহ' (নি'মাত্) অর্থ বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাশি। কিন্তু 'আ'জাব' (শাস্তি) অর্থ এখানে সন্তান হত্যা নয়। বরং এখানে 'আ'জাব' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তাদের শ্রমভারাক্রান্ত ও বন্দীপ্রায় জীবনকে। কারণ 'ইয়ুজাব্বিহুনা' কথাটির সংযোগ রয়েছে 'ইয়াসুমুনা' কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য যে, অন্বয় ও অন্বয়ী শব্দাবলীর মধ্যে বৈপরীত্য বিধেয়। তবে হ্যাঁ, সুরা বাকারা এবং সুরা আ'রাফে উল্লেখিত 'আ'জাব' শব্দের মাধ্যমে সন্তান হত্যাকে বুঝানো হয়েছে।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৭, ৮

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ○ وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

❑ স্মরণ কর, 'তোমাদিগের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।'

❑ মূসা বলিয়াছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও— তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আরো স্মরণ করুন, আপনার পালনকর্তা নবী মুসাকে বলেছিলেন, আমার এই ঘোষণাটি

সকলকে জানিয়ে দাও— হে জনতা! তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অত্যধিক দান করবো। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। এখানে 'তাআজ্‌জানা' অর্থ জ্ঞাপন, প্রজ্ঞাপন। এখানে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'শাকার্‌তুম' (কৃতজ্ঞ হলে) এবং 'কাফার্‌তুম' (অকৃতজ্ঞ হলে)। কৃতজ্ঞতার অর্থ ইমান আনা ও রসুলের আজ্ঞা-নুসারে চলা। নেয়ামতের আধিক্য কৃতজ্ঞতাকে অপরিহার্য করে। নেয়ামতকেও করে প্রলম্বিত। আবার উজ্জ্বল করে অনর্জিত নেয়ামত প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ যাকে দেয়া হয়েছে, সে কখনো বঞ্চিত হয় না।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার বক্তব্যটি এ রকম— তোমরা যদি যথা আনুগত্যের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো অত্যধিক সওয়াব।

'ইন্না আ'জাবী লা শাদীদ্' অর্থ অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি কেড়ে নিবো তোমাদের সুখের উপকরণসমূহ। আর আখেরাতেও প্রদান করবো কঠিন শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও অকৃতজ্ঞতার শাস্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে কৃতজ্ঞচিত্তদেরকে প্রচুর নেয়ামতের অধিকারী করে দেয়ার বিষয়টি যেমন অবশ্যম্ভাবী, শাস্তির বিষয়টি তেমন অবশ্যম্ভাবী নয়। অর্থাৎ শাস্তির বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নির্ভর। তিনি অকৃতজ্ঞদেরকে ইহকালে, অথবা ইহ-পরকালে অথবা শুধু পরকালে শাস্তি দিবেন। কিংবা তাদেরকে মাফ করে দিবেন।

পরের আয়াতের (৮) মর্মার্থ হচ্ছে—নবী মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা এবং পৃথিবীর সকল লোক কৃতঘ্ন হলেও আল্লাহ্‌র কোনো কিছু যাবে আসবে না। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী ও চির প্রশংসিত। তাঁর প্রকৃত প্রশংসা বর্ণনা করতে পারেন তিনি নিজে। তাছাড়া ফেরেশতাকুল নিরন্তর উচ্চারণ করে চলেছে তাঁর স্তবস্তুতি। সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অণুপরমাণু অহরহ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং হে নির্বোধ জনতা! মনে রেখো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে তোমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي
أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا
إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

❒ 'তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের, নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও সামূদদের এবং তাহাদিগের পরবর্তীদিগের? উহাদিগের বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রসূল আসিয়াছিল; উহারা তাহাদিগকে কথা বলিতে বাধা দিত এবং বলিত, 'যাহা সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে-বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।'

❒ উহাদিগের রসূলগণ বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে? —যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার দিকে আহ্বান করেন তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য।' উহারা বলিত, 'তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।'

❒ উহাদিগের রসূলগণ উহাদিগকে বলিত, 'সত্য বটে আমরা তোমাদিগেরই মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহের অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদিগের কাজ নহে। বিশ্বাসীগণের আল্লাহেরই উপর নির্ভর করা উচিত।

❒ 'আমরা আল্লাহের উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং যাহারা নির্ভর করিতে চাহে আল্লাহেরই উপর তাহারা নির্ভর করুক।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নুহের সম্প্রদায়ের, আদের ও ছামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের?' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাইল জনতা! তোমরা কি জানো না বিগত যুগের অবাধ্য আদ, ছামুদ, নবী নুহ্, ইব্রাহিম, লুত, মাদিয়ানবাসী, আইকাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতির কথা?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।' বাক্যটি আপেক্ষিক। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এই বাক্যটি পাঠ করার পর বলতেন, বংশলতিকার বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা জানে না। ইমাম মালেকও বংশলতিকার বিবরণ প্রদান করা সমর্থন করেন না। অর্থাৎ হজরত আদম পর্যন্ত বংশপরম্পরা বর্ণনা করা তাঁর মনোপুত নয়। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, হজরত আদম পর্যন্ত রসুল স. এর বংশধারা বর্ণনা করাও ঠিক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুল এসেছিলো; তারা তাদেরকে কথা বলতে বাধা দিতো'। এখানে 'আইদিইয়াহুম ফী আফওয়াহিহিম' কথাটির অর্থ তারা তাদের হস্তসমূহ স্থাপন করতো মুখে। অর্থাৎ তারা তাদের নবীগণকে কথা বলতে বাধা দিতো। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, নবীগণের কথা শুনে তারা রাগে তাদের হাতের আংগুল কামড়াতো। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়াআদ্বু আলাইকুমুল আয়ানিলু মিনাল গইদ্বি' (তোমাদের উপর রেগে গিয়ে তারা দাতে আংগুল কাটছিলো)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী-রসুলগণের মুখে আল্লাহ্র বাণী উচ্চারিত হতে শুনে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবাক হয়েছিলো। শুরু করে দিয়েছিলো হাসি-ঠাট্টা। আর হাসি চাপা দেয়ার জন্য হাত দ্বারা মুখ ঢেকেছিলো। কালাবী বলেছেন, তারা ঠোটে আংগুল রেখে নবী-রসুলগণকে ইঙ্গিতে নিশ্চুপ থাকতে বলেছিলো। মুকাতিল বলেছেন, তারা তাদের হস্ত স্থাপন করতো নবীগণের মুখের উপর। কথা বলতে না দেয়াই ছিলো তাদের এমতো আচরণের উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায়

'আফওয়াহিহিম' কথাটির 'হিম' (তাদের) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে নবীগণের সঙ্গে। কোনো কোনো আলেম 'আইদি' শব্দটির অর্থ করেছেন— নবীগণের উপদেশাবলী, শরিয়তের বিধান, প্রত্যাদেশ। অর্থাৎ তারা নবী-রসুলগণ কর্তৃক প্রচারিত শরিয়তের বিধানাবলীকে মুখের উপর ফিরিয়ে দিতো। মুজাহিদ এবং কাতাদা এ রকম বলেছেন। যেমন প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, আমি তার কথা তার মুখে ফিরিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তার কথা আমি গ্রহণ করিনি। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফী আফওয়াহিহিম' কথাটির অর্থ তারা নিজ মুখে নবীগণের বিধানসমূহ অস্বীকার করেছিলো। নবীগণের সদুপদেশের কোনো মূল্যই তারা দেয়নি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলতো যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছো তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছো।'

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'তাদের রসুলগণ বলেছিলো, আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে? —যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।' এ কথার অর্থ— তাদের রসুলগণ তাদের সন্দেহের প্রত্যুত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করে বসেছিলেন, আমরা তো সেই এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি তো তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব সম্পর্কে সোচ্চার। বিষয়টি সন্দেহের অতীত। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সম্পর্কেও তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে চাও? উল্লেখ্য যে, এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন (ইসতেফহামে ইনকারী)।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্য' এ কথার অর্থ— হে অদূরদর্শী জনতা! আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। পরম ক্ষমাপরবশ তিনি। তাই তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন মার্জনা করবার জন্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'মিন্ জুনুবিকুম' কথাটির 'মিন্' অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করার জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে। হজরত আমর বিন আস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, ইসলামের স্বীকৃতি পূর্ববর্তী পাপরাশিকে বিলীন করে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মিন' অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের কোনো কোনো পাপ ক্ষমা করার জন্য। কেন না ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্র অধিকার খর্ব বিষয়ক পাপগুলো ক্ষমা করা হয়। কিন্তু মানুষের অধিকার খর্ব বিষয়ক পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় না। জনৈক

বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন, কোরআন মজীদে যে সকল স্থানে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে সাবধান করা হয়েছে, সে সকল স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন' অব্যয়টি। কিন্তু মুমিনদের ক্ষেত্রে 'মিন' ব্যবহৃত হয়নি। এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, মার্জনার ভিত্তি হচ্ছে ইমান। ইমানদারদের এই ভিত্তি আগে থেকেই রয়েছে। তাই তাদের মার্জনার ভিত্তি হবে আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরতি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়া ও পাপ থেকে মুক্ত থাকাই তাদের ক্ষমার উপলক্ষ। মানুষের অধিকার খর্ব করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। তাই মুমিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অধিকার ও মানুষের অধিকার পরস্পরসম্পৃক্ত। কিন্তু নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের বিষয়টি এরকম নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার জন্য' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যতদিন আয়ু নির্ধারণ করেছেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে থাকতে পারবে। এর মধ্যে তোমরা ক্রমাগত সত্যপ্রত্যাখ্যান করে চললেও তোমাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন না। একথায় প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী জামানার অবাধ্য উম্মতকে ধ্বংস করা হয়েছিলো পরিবর্তনীয় অদৃষ্টলিপি অনুসারে। অর্থাৎ অদৃষ্টলিপিতে এরকম লেখা ছিলো যে, ইমান গ্রহণ করলে তারা বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত আয়ুষ্কাল অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে। আর ইমান গ্রহণ না করলে সত্যপ্রত্যা-খ্যানপ্রবণতার চরম পর্যায়ে তাদের সকলকে একই সময়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাই হয়েছিলো। যথাসময়ে ইমান না আনার কারণে পূর্ববর্তী অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলতো তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলেছিলো, আমরা যেমন মানুষ তেমনি তোমরাও। মানুষ আবার কখনো মানুষের নবী হতে পারে না কি? তোমরা যদি অতিমানব হতে, অথবা হতে কোনো ফেরেশতা, তবে হয়তো আমরা তোমাদেরকে মান্য করতাম। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো মনোভাবের উল্লেখ করা হয়েছে অপর এক আয়াতে এভাবে— 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন, তবে ফেরেশতাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করতেন।'

শেষে বলা হয়েছে— 'আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করতো তোমরা তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করো।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আরো বলেছিলো, তোমাদের উদ্দেশ্য কি তা আমরা বুঝেছি। তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে

চাও। তারা যাদের উপাসনা করতো, তাদের উপাসনা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও। ঠিক আছে। আল্লাহ্‌র নবী যদি তোমরা হয়েই থাকো, তবে অলৌকিক কোনো কিছু করে দেখাও। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো কেনো?

এর পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তাদের রসুলগণ তাদেরকে বলতো, সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।' এ কথার অর্থ— তাদের রসুলগণ বলেছিলেন, এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমরাও তোমাদের মতো মানব সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুকম্পা করেন। নবুয়ত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকম্পা। এই অনুকম্পা দান করে তিনি ধন্য করেন কোনো কোনো মানুষকে। এই নির্বাচন সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায় নির্ভর।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। বিশ্বাসীগণের আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা উচিত।' এ কথার অর্থ— অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের বিষয়টিও সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র অনুমোদন নির্ভর। অতএব শোনো হে অবিবেচক সম্প্রদায়! আমরা ইচ্ছে করলেই মোজেজা প্রদর্শন করতে পারি না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আর আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করাই বিশ্বাসীগণের মূল কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, নবী-রসুলগণের একনিষ্ঠ অনুসারীদের এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো ইমানদারই কখনো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি নির্ভরশীল হতে পারে না। এটাই ইমানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই ইমানদারেরা অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত থাকে।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবো না কেনো? তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন।' এ কথার অর্থ— আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল তো হবোই। তিনিই তো আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। দান করেছেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের জ্ঞান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছো আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবো।' কথাটি একটি অনুক্ত শপথের প্রত্যুত্তর। নবীগণ প্রথমে আল্লাহ্ নির্ভরতার ঘোষণা দিয়েছেন। পরান্মুখ হয়েছেন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দিক থেকে। শেষে আলোচ্য বাক্য দ্বারা তাঁদের মনোভাবকে করেছেন অধিকতর সুদৃঢ়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা নির্ভর করতে চায় আল্লাহ্‌রই উপর তারা নির্ভর করুক।' এ কথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ নির্ভরতার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে চায়, তারা যেনো নির্দ্বিধায় কেবল আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরশীল হয়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

❒ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা উহাদিগের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিব, অথবা তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' অতঃপর রসূলগণকে তাহাদিগের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করিলেন, 'সীমালংঘনকারীদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব।'

❒ উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই; ইহা তাহাদিগের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।'

❒ উহারা বিজয় কামনা করিল; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের রসুলগণকে বলেছিলো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে।' এখানে 'আমাদের ধর্মে ফিরে আসতেই হবে' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, নবী-রসুলগণ পূর্বে কাফেরদের ধর্মাদর্শভূত ছিলেন। এরকম হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। নবুয়তপূর্ব জীবনেও কোনো নবী কাফের ছিলেন না। তাই এখানে ফিরে আসা অর্থ হবে ধর্মান্তরিত হওয়া। 'সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করে অবিশ্বাসীদের ধর্মমতকে গ্রহণ করা' কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করা যায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা বলেছিলো নবী ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তাদের সম্বোধনটি প্রযোজ্য হবে নবীর সহচরবৃন্দের প্রতি। তাঁরা ইমান আনয়নের পূর্বে কাফেরদের ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। তাই 'তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে' কথাটির অর্থ হবে— হে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগকারীরা! তোমাদেরকে পূর্ব ধর্মে ফিরে আসতেই হবে। আবার এমনো হতে পারে যে— এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটির অর্থ হবে 'ইল্লা' (ব্যতীত) কিংবা 'ইলাআন' (এমনকি) যদি তাই হয়, তবে তাদের হুমকিটি প্রযোজ্য হবে কেবল বহিষ্কারের ব্যাপারে এবং মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমরা তোমাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দিবো, যদি না তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসো। অথবা মর্মার্থ হবে— এমনকি তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর রসুলগণকে তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন সীমালংঘনকারীদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করবো।'

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবোই' এ কথার অর্থ— আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিনাশ করার পর সেখানে বসবাস করতে দিবো নবীগণ ও তাঁদের অনুচরবর্গকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।' এ কথার অর্থ— আমার এই অনুগ্রহসম্ভার কেবল তাদের ভাগ্যে জোটে, যারা বিশ্বাস রাখে পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং আমার শাস্তির কথা স্মরণ করে যারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়। এখানে 'মাক্বামী' অর্থ পুনরুত্থান দিবসে বিচারের জন্য আল্লাহ্পাক সকাশে দণ্ডায়মান হওয়া। অপর এক আয়াতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন— ওয়ালিমান খাফা মাক্বামা রব্বিহি জান্নাতান্ (আর তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে যে ভীত, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত)। অথবা 'মাক্বাম' অর্থ 'ক্বিয়াম'— কৃতকর্মের সংরক্ষণ। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— যারা কৃতকর্মের সংরক্ষণ করে। আর প্রতিটি কর্মের পর্যবেক্ষক আমিই। মুমিনেরা একথা বিশ্বাস করে বলেই আমার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাক্বাম' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে প্রয়োগিত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে—যে আমাকে ভয় করে।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে—'তারা বিজয় কামনা করলো' এ কথার অর্থ— নবীগণ তাঁদের শত্রুদের উপর বিজয়ের প্রার্থনা জানায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা ক্বওমিনা বিল হাক্ব (হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আমাদের সম্প্রদায়ের উপরে বিজয়ী করে দাও)। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানকার 'ওয়াস্তাফ্তাহু' (বিজয় কামনা করলো) কথাটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ১৩শ সংখ্যক আয়াতের 'আওহা' (প্রত্যাদেশ করলেন) কথাটির সঙ্গে। এভাবে 'ওয়াস্তাফ্তাহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হয়েছে নবীগণের সঙ্গে। এ রকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম। কাতাদা বলেছেন, নবীগণ যখন স্বসম্প্রদায়ের ইমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা বিজয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হজরত নুহ্ বলেছিলেন—'রব্বি লা তাজার্ আলাল্ আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়ারা'। হজরত মুসা দোয়া করেছিলেন—'রব্বানা লা আত্বমিস্

আ'লা আম্ওয়ালিহিম'। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, 'ওয়াস্তাফ্তাহু' (তারা বিজয় কামনা করলো)। কথাটির 'হু' সর্বনামটি সংযুক্ত হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে। কারণ তারাও বিজয় কামনা করে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আল্লহুম্মা ইন্কানা হাজা হুয়াল হাক্ক মিন্ ইন্দিকা ফাম্ত্বির আ'লাইনা হিজ্বারাতাম্ মিনাস্ সামায়ী (হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তবে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো)। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'তারা' সর্বনামটি উভয় দিকের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ অনুসারী সহকারে নবী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী উভয় দলই বিজয় কামনা করেছিলো। কারণ উভয় পক্ষই ছিলো পরস্পরের দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহী। তাই উভয় দলই চেয়েছিলো তাদের প্রতিপক্ষ যেনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল্লু হিজ্বিম বিমা লাদাইহিম ফারিহুন' (উভয় দলই আপনাপন মতবাদের প্রতি ছিলো প্রসন্ন)।

শেষে বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হয়।' এ কথার অর্থ— গর্বিত স্বৈরাচারীদের পরাজয় অবশম্ভাবী। আলোচ্য বাক্যটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। ওই উহ্য বাক্য সহকারে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— ধ্বংস হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা, বিজয়ী হলো মুমিনগণ। তারা তখন বল্লো, দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারীরা এভাবেই অসফল হয়। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'জাব্বার' অর্থ প্রতিপক্ষ এবং 'আ'নীদ্' অর্থ অহংকারী। 'তাজাব্বুর' অর্থ আত্মম্ভরিতা। আল্লাহ্পাক স্বয়ং 'জাব্বার'। কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে গর্ব করার যোগ্যতা। এ রকম যোগ্যতা কোনো সৃষ্টির নেই। অথবা 'জাব্বার' বলা যায় এমন লোককে, যার হৃদয়ে কোমলতার কণা মাত্র নেই। এ ধরনের লোকেরাই অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটায়। কিংবা 'জাব্বার' বলে ওই ব্যক্তিকে যে দম্ভবশতঃ অন্যের অধিকারগুলোকে নস্যাৎ করে দেয়। অপরের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব থাকে— একথা সে স্বীকারই করে না।

বাগবী লিখেছেন, ওই ব্যক্তি 'জাব্বার', যে নিজের চেয়ে অন্য কাউকে শ্রেষ্ঠ মনে করে না। শব্দটি এসেছে 'জাব্রিয়্যাতুন্' থেকে, যার অর্থ— সর্বোচ্চ সম্মান লাভের অভিলাষ। যেহেতু সর্বোচ্চ সম্মান লাভের যোগ্যতা মানুষের নেই, তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে এই বিশেষণটি মানায় না। তাই এই বিশেষণের দাবিদারেরা অভিসম্পাতগ্রস্ত ও বিনাশযোগ্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই মহান ব্যক্তিত্বের নাম জাব্বার, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর নির্দেশ মতো চলতে বাধ্য করেন।

'আ'নীদ্' অর্থ সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, সত্যের অপলাপ। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, শব্দটির অর্থ সত্যের প্রতিপক্ষ হওয়া, প্রত্যক্ষভাবে সত্যের বিরোধিতা করা। হজরত ইবনে আব্বাস সত্যের বিরুদ্ধপক্ষকে আ'নীদ্ বলেছেন। মুকাতিল আ'নীদ্ বলেছেন, অহমিকামগ্নদেরকে। কাতাদা বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার অস্বীকারকারীকে বলে আ'নীদ্।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ১৬, ১৭

مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ
يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۭ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝

❒ উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হইবে গলিত পুঁজ,

❒ যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সর্বদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যুযন্ত্রণা কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে' মুকাতিল বলেছেন, এ কথার অর্থ— জাহান্নাম হবে তাদের মৃত্যুপরবর্তী ঠিকানা। এ রকমও বলা যেতে পারে যে— জাহান্নাম তাদের অতি সন্নিকটে। যেনো তারা পৃথিবীতে জাহান্নামের পাড়েই দণ্ডায়মান। মৃত্যুর পরেই তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সেখানে। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'ওয়ারাআ' অর্থ আড়াল, অন্তরাল। শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক— সম্মুখে ও পশ্চাতে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ'। 'সদীদ্' অর্থ তরল বর্জ্য, যা নির্গত হবে নরকবাসীদের চামড়া ও পেট থেকে। ওই তরল পদার্থের মধ্যে মিশ্রিত থাকবে পুঁজ ও রক্ত। ওই পুঁজ ও রক্তকে এখানে বলা হয়েছে গলিত পুঁজ। মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, ব্যভিচারীদের শরীর বিধৌত পানি জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে। বায়হাকী ও মুজাহিদ বলেছেন, রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত পানীয়ের নাম 'সদীদ্'। হজরত আবু উমামা থেকে স্বসূত্রে হাকেম, সিফাতুন্নার গ্রন্থে ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া এবং বিশুদ্ধসূত্রে আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির, বায়হাকী ও বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীদেরকে পান করতে দেয়া হবে 'সদীদ্'। তারা সেটার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারবে না। তবু তাদেরকে সেটার নিকটবর্তী করা হবে। তারপর তাদেরকে যখন সদীদ্ পান করানো হবে তখন তাদের শরীর ফুলে উঠবে, মাথার চুল খসে পড়বে এবং নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যাবে

পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন—'আর তারা পান করবে তপ্ত পানি, যা বিচ্ছিন্ন করে দিবে নাড়িভুঁড়ি। যদি তারা প্রার্থনা করে.........'।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে—'যা তারা অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।' এ কথার অর্থ—চরম দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওই গলিত পুঁজ পান করবে জাহান্নামবাসীরা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তা পান করতে বাধ্য হবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পান করা হয়ে পড়বে প্রায় অসম্ভব। বার বার রুদ্ধ হয়ে যাবে কণ্ঠনালী। তাই তারা থেমে থেমে একটু একটু করে পান করতে থাকবে। তাদের ওই শাস্তি হবে অন্তহীন। কণ্ঠনালী দিয়ে সহজে পানীয় প্রবিষ্ট হওয়াকে বলে 'সাউগুন'। শব্দটি একটি মূল শব্দ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সাগাশ্ শারাবা সাওগান' (অতি সহজে পানীয় গলাধঃকরণ করেছে)। আলোচ্য বাক্যে শব্দটির পূর্বে বসানো হয়েছে 'লা ইয়াকাদু' (অতিকষ্টে)। অর্থাৎ জাহান্নামীরা 'সদীদ্' গিলবে অতিকষ্টে।

এরপর বলা হয়েছে—'সব দিক থেকে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা' এ কথার অর্থ— শাস্তি এমন তীব্র আকার ধারণ করবে যে, মনে হবে যেনো সবদিক থেকে এগিয়ে আসছে বীভৎস মৃত্যু। 'কুল্লি মাকান' অর্থ দেহের সকল অংশ। অর্থাৎ দেহের প্রতিটি অংশে সে অনুভব করবে মৃত্যু যাতনা। ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, ইব্রাহিম তায়েমী বলেছেন, প্রতিটি লোমকূপে সে অনুভব করবে মৃত্যুর মর্মন্তুদ আঘাত।

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না' এ কথার অর্থ— মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, তার প্রশ্বাস আটকে থাকবে কণ্ঠনালীতে। নাক মুখ দিয়ে তা নির্গত হবে না। অথবা ভিতরেও প্রবেশ করবে না। ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ফুজাইল ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— কণ্ঠদেশে নিঃশ্বাস আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।' এ কথার অর্থ— বিরতিহীনভাবে শাস্তির পর শাস্তি আপতিত হবে তার উপর। পরবর্তী শাস্তি হবে পূর্ববর্তী শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর বীভৎস। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কঠোর শাস্তি অর্থ চিরস্থায়ী শাস্তি, যে শাস্তি থেকে কস্মিনকালেও তাদের নিষ্কৃতি নেই।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ১৫শ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত নবীগণের বিজয় কামনার সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পৃথক একটি আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। তারা একবার রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত

হয়েছিলো। তারা বার বার আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষমুক্ত হতে পারছিলো না। ওই সময় আল্লাহ্ নরকবাসীদের গলিত পুঁজ গলাধঃকরণ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করেন (আয়াত ১৬, ১৭)।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ﴿۲۰﴾ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

❒ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম, যাহা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদিগের কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাই ঘোর বিভ্রান্তি।

❒ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারেন,

❒ এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য কঠিন নহে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত ভস্ম, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' এখানে 'মাছাল' অর্থ বিরল উপমা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত।' আসুফ' অর্থ দুরন্ত বাতাস। দিবসের তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাসকে এখানে বলা হয়েছে 'আসেফ'। ব্যবহার রীতিটি রূপক অর্থসম্পন্ন। যেমন বলা হয়—'নাহারুহু সয়িমুন্' (তার দিনটি রোজাদার), 'লাইলুহু নায়িমুন' (তার রাত্রিটি নিদ্রিত)। এ কথাগুলোর শাব্দিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। কারণ দিন কখনো রোজাদার হয় না, আর রাত্রিও কখনো ঘুমায় না। কথা দু'টোর প্রকৃত অর্থ হবে যথাক্রমে— দিবসে সে রোজা রাখে, রাত্রিতে ঘুমায়। এরূপ শব্দ ব্যবহারের রীতিটি সর্বজনস্বীকৃত। এখানে 'আ'মাল' কথাটির অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পুণ্যকর্মসমূহ। কারণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও পৃথিবীতে দান খয়রাত, স্বজনদের উপকার, ক্রীতদাসমুক্তি

ইত্যাদি পুণ্য কর্মসমূহ করে। কিন্তু এ সকল পুণ্যকর্মের কোনো প্রতিদানই তারা পাবে না। কেননা এ সকল কর্ম তারা করে কেবল আত্মপ্রসাদ ও খ্যাতির জন্য। এগুলোর নেপথ্যে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি সম্মান অথবা আল্লাহ্র পরিতোষ সাধনের উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। বরং অংশীবাদীরা এ সকল পুণ্য করে তাদের দেব-দেবীদের পরিতোষ সাধনার্থে। তাদের ওই দেব-দেবীদের বিগ্রহগুলো জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু তো নয়। ওগুলো আবার তাদের উপাসকদেরকে পুণ্যের প্রতিদান দিবে কীভাবে? তাই এখানে আল্লাহ্পাক তাদের পুণ্যকর্মগুলোকে তুলনা করেছেন ভস্মরাশির সঙ্গে, যা ঝড়ো বাতাসে প্রচণ্ড বেগে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এরপর বলা হয়েছে—'যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না।' এ কথার অর্থ— তাদের পার্থিব অর্জন পরবর্তী পৃথিবীতে কোনো কাজেই আসবে না। সেখানে তারা না পাবে সওয়াব, না পাবে নিষ্কৃতি।

শেষে বলা হয়েছে—'এটাই ঘোর বিভ্রান্তি।' এ কথার অর্থ— তারা পুণ্যকর্ম ভেবে যে কাজগুলো করেছে, তার কোনো ভিত্তিই নেই। তাই তাদের সকল কিছু বরবাদ। তাদের পাপগুলো তো ভ্রান্তিই। কিন্তু পুণ্যকর্মগুলোও বিভ্রান্তি। সেদিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— এটাই ঘোর বিভ্রান্তি।

পরের আয়াতে (১৯) প্রথমে বলা হয়েছে—'তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন?' এখানে 'হাক্ব' অর্থ সত্য। আর মর্মার্থ হচ্ছে— নিপুণ কুশলতার সঙ্গে, যথাবিধি। এই বিশাল রহস্যময় গগন ও বৈচিত্রপূর্ণ ধরণী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। আর এ সকল কিছু মহা বিজ্ঞানময় স্রষ্টার একক অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়! আল্লাহ্ এই মুহূর্তে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নতুন কোনো সৃষ্টি, যারা হবে আল্লাহ্র একান্ত অনুগত।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে—'এবং এটা আল্লাহ্র জন্য কঠিন নয়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিধর। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এরূপ অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী যিনি, তিনিই তো একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। আশা করতে হবে তাঁর পুরস্কারের এবং ভয় করতে হবে তাঁর অসন্তোষের।

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ○

❒ সকলে আল্লাহের নিকট উপস্থিত হইবেই। তখন দুর্বলেরা যাহারা অহংকার করিত তাহাদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদিগের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারিবে?' উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখন আমাদিগের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে—'সকলে আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবেই।' এ কথার অর্থ— মহাবিচারের দিন তারা সকলে আপনাপন সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে বিচারানুষ্ঠানের জন্য আল্লাহ্তায়ালা সকাশে উপনীত হবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করতো তাদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কি কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? এ কথার অর্থ— তখন পৃথিবীতে যে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জ্ঞানে ও সম্পদে দুর্বল ছিলো তারা তাদের প্রতাপশালী ও অহংকারী নেতাদেরকে বলবে তোমরা তো তখন আমাদেরকে নবীগণের অনুসারী হতে নিষেধ করেছিলে। আমরা তখন তোমাদেরকে নেতা বলে মেনেছি। তোমাদের হুকুম মতোই জীবন যাপন করেছি। আর এই কঠিন শাস্তির সময়ে এখন আমাদের উপায় কী হবে? তোমরা কি আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে? আল্লাহ্র শাস্তিকে কিঞ্চিত পরিমাণ লাঘব করবার সুযোগ কি তোমাদের আছে? নেই। এখানে 'মিন আ'জাবিল্লাহ্' (আল্লাহ্র শাস্তি থেকে) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বর্ণনামূলক। আর 'মিন শাইয়িন' (কিছু মাত্র) কথাটির 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলবে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম।' এ কথার অর্থ— নেতারা তখন বলবে আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত। তাই তোমাদেরকেও আমরা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছি। আমরা সৎপথের পথিক যদি হতাম, তবে

তোমাদেরকেও সৎপথেই পরিচালিত করতাম। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আমরা তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি নরকের উপকণ্ঠে। আমরা তো এখন নিরুপায়। শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় যদি আমাদের জানা থাকতো, তবে তোমাদেরকেও বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেয়া হয়নি।

এরপর বলা হয়েছে— এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এখানে 'মাহীস্' শব্দটি ক্রিয়ার আধার। এর শব্দমূল হচ্ছে 'হাইসুন্'। এর অর্থ পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্থান। অথবা এর শব্দমূল হচ্ছে 'মাইস্'। যেমন শব্দমূল 'মাগিস'। আলোচ্য বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অহংকারী নেতৃবর্গের উক্তির অংশ। সম্মিলিতভাবে তাদের নেতা ও জনতার উক্তি। মুকাতিল বলেছেন, নরকবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পাঁচশত বৎসর ধরে পরিত্রাণের জন্য করুণ প্রার্থনা জানাতে থাকবে। কিন্তু তা ফলদায়ক হবে না। এর পরের পাঁচশত বৎসর ধরে অবলম্বন করবে ধৈর্য। কিন্ত তাতেও তাদের কোনো উপকার হবে না। তখনই তারা বলবে— ধৈর্যচ্যুতি ও ধৈর্যাবলম্বন দু'টোই আমাদের জন্য সমান। অনন্ত শাস্তি থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই।

হজরত কা'ব থেকে মারফু সূত্রে ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, এবং ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীরা একে অপরকে ডেকে বলবে, এসো আমরা ধৈর্য অবলম্বন করি। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের উপর করুণাপরবশ হবেন। একথা বলে তারা পাঁচশত বছর ধরে ধৈর্যধারণ করে অবশেষে দেখবে সবই বৃথা। তখন তারা বলবে, আমাদের ধৈর্য ও ধৈর্যচ্যুতি সমার্থক।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, আমার নিকটে এই মর্মে একটি হাদিস পৌঁছেছে যে, নরকবাসীরা নরকের প্রহরীকে বলবে, দয়া করে আপনার পালনকর্তাকে বলুন, তিনি যেনো অনুগ্রহ করে মাত্র একদিনের জন্য আমাদের নরক যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করে দেন। প্রহরী বলবে, তোমাদের রসুলগণ কি তোমাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ উপস্থিত হননি? নরকবাসীরা বলবে, হয়েছিলেন। প্রহরী বলবে, তাহলে তোমরা নিজেরাই দোয়া করো। কিন্তু অবিশ্বাসীদের দোয়া মূল্যহীন। একথা শুনে তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। এরপর দোজখের অধিকর্তাকে বলবে, হে মালেক! আপনার পালনকর্তাকে বলুন, তিনি যেনো আমাদেরকে মৃত্যুদান করেন। কিন্তু দীর্ঘ আশি বছর যাবৎ দোজখের অধিকর্তা মালেক তাদের সঙ্গে কথাই বলবে না। সেখানকার বৎসর হবে তিনশত ষাট দিনেরই। তবে এক একটি দিন হবে হাজার বছরের সমান। এভাবে আশি বছর গত হওয়ার পর মালেক বলবে, তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, শাস্তি যখন আমাদের লাঘব হবেই না, তখন আর কথা বলে কাজ কি। ধৈর্যাবলম্বনই উত্তম।

সম্ভবতঃ ধৈর্যের ফল কিছুটা শুভ হতেও পারে। আমরা পৃথিবীতে দেখেছিলাম, বিপদে একদল লোক ছিলো সহিষ্ণু। তারাই এখন সফলকাম। একথা বলে তারা একযোগে ধৈর্যধারণ করবে। শাস্তির মধ্যেও দীর্ঘকাল থাকবে অবিচল। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। আবার তারা শুরু করবে কথোপকথন। এভাবে পালাক্রমে কখনো তারা হবে ধৈর্যবিচ্যুত। আবার কখনও হবে ধৈর্যধারী। শেষে চিৎকার করে বলবে, এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। এরপর ইবলিস দাঁড়িয়ে বলবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। কিন্তু আমি তো তোমাদের উপরে কোনো বল প্রয়োগ করিনি। প্ররোচিত করেছিলাম মাত্র। আমার সে প্ররোচনাকেই সেদিন তোমরা মাথা পেতে নিয়েছিলে। অতএব আজ তোমরা আমাকে তিরস্কার কোরো না। তিরস্কার যদি করতেই হয়, তবে তিরস্কার করো নিজেদেরকে। ইবলিসের একথা শুনে লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। তখন নেপথ্যে আওয়াজ উত্থিত হবে— আজ তোমরা যেরূপ আত্মগ্লানি অনুভব করছো, এর চেয়েও বেশী অপ্রিয়বোধ করেছি আমি তখন, যখন তোমাদেরকে ইমান আনতে বলা হয়েছিলো, অথচ তোমরা করেছিলে প্রত্যাখ্যান। এই আওয়াজ শুনে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! নবীগণের আহ্বান ও তোমার অংগীকার যে সত্য, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রব্বানা আবসারনা ওয়া সামি'না ফারজি্'না না'মাল্ সলিহান্ ইন্না মু'ক্বিনূন (এবার আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দাও আমরা সেখানে কেবল পুণ্যকর্ম করবো, আমাদের এবার প্রকৃত প্রতীতি জন্মেছে)। আল্লাহ্পাক বলবেন— ওয়ালাও শি'না লাআতাইনা কুল্লা নাফ্সিন হুদাহা (যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেককেই সুপথ প্রদর্শন করতাম)। তারা পুনরায় চিৎকার করে বলবে— 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এবার তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো, তোমার রসুলেরও অনুসরণ করবো। তুমি শুধু আমাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য অবকাশ দাও।' আল্লাহ্ বলবেন— 'তোমরা কি শপথ করে এ রকম বলোনি যে আমাদের বিনাশ নেই?'তারা বলবে, হে আমাদের জীবনাধিপতি! তুমি আমাদেরকে এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য বের করে দাও। অতীতে আমরা পাপ করেছিলাম। এবার করবো পুণ্য। আল্লাহ্ বলবেন, 'পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম দীর্ঘ জীবন। তখন কেউ কেউ উপদেশ গ্রহণ করেছিলে। তোমাদের নিকট কি ভীতি প্রদর্শনকারী প্রেরিত হয়নি?' এ কথার পর কিছু কালের জন্য কথোপকথন বন্ধ থাকবে। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, আমার বাণী কি তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শোনানো হয়নি? তোমরা কি তা প্রত্যাখ্যান করোনি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের প্রতি কি আর কখনো অনুকম্পাপরবশ হবে না? পুনরায় চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনাধিপতি! আমাদের উপর দুর্ভাগ্য প্রবল হয়েছিলো। তাই আমরা হয়েছিলাম বিভ্রান্ত। হে আমাদের পালয়িতা! আমাদেরকে

এখান থেকে বের করে দাও। পুনরায় আমরা যদি তোমার অবাধ্য হই, তবে অবশ্যই আমরা হবো আত্ম-অত্যাচারী। আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের জন্য এখানে নির্ধারণ করা হয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক বসবাস। সুতরাং তোমরা আর আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এবার তারা হয়ে পড়বে পুরোপুরি নৈরাশ্যভারাক্রান্ত। এরপর থেকে তারা আর প্রার্থনাও জানাতে পারবে না। শুরু হবে তাদের অনন্ত রোদন। স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করে দেয়া হবে দোজখের সকল দরজা।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ২২, ২৩

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ
وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ
مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ
فِيْهَا سَلٰمٌ ۝

❐ যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না, তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহের শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। সীমালংঘনকারীদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।'

❐ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে; সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে 'সালাম'।

বিচার কার্য সমাপনের পর বিশ্বাসীগণ চলে যাবে বেহেশতে। আর অবিশ্বাসীরা গমন করবে দোজখে। শয়তানকেও দোজখে প্রবেশ করানো হবে তখন। সে দোজখবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে। সে কথাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে

এভাবে—'যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে.....।' মুকাতিল বলেছেন, শয়তানের জন্য দোজখে স্থাপন করা হবে একটি আগুনের মঞ্চ। দোজখবাসী জ্বিন ও মানুষ সেখানে সমবেত হবে। তখন শয়তান তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবে।

হজরত উকবা বিন আমের থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী হাতেম, বাগবী, তিবরানী ও ইবনে মোবারক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন সকলের বিচার সমাপনের পর মুমিনগণ বলবে, আমাদের মহান বিচারক তো বিচার মীমাংসা করেই দিয়েছেন। এখন আমাদের প্রয়োজন একজন সুপারিশকারীর, যিনি আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। কেউ কেউ বলবে, আমাদের সকলের পিতা আদমই সুপারিশ করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁকে তৈরী করেছেন স্বহস্তে। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন। সকলে মিলে তখন উপস্থিত হবে আদমের নিকট। বলবে, আমাদের প্রভুপালনকর্তা আমাদের বিচার সমাপন করেছেন, এখন আপনি আমাদের জন্য তাঁর দরবারে সুপারিশ করুন। আদম বলবেন, তোমরা নুহের নিকটে যাও। সকলে তখন নুহ্ নবীর নিকটে যাবে। তিনি বলবেন, ইব্রাহিম এর কাছে যাও। লোকজন তাই করবে। তিনি সকলকে মুসার নিকটে যাওয়ার পরামর্শ দিবেন। সকলে তাঁর নিকটে গেলে তিনি তাদেরকে যেতে বলবেন ঈসার নিকটে। তখন সকলে সদলবলে উপস্থিত হবে ঈসার কাছে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মী) আরবী নবীর কাছে যেতে বলি। তিনি হচ্ছেন নবীকুলের গৌরব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তিনিই তোমাদের আবেদন রক্ষা করতে পারবেন। এরপর সকলে উপস্থিত হবে আমার কাছে। আল্লাহ্ আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তখন আমার সুপারিশ করার স্থানকে করা হবে সুরভিত, যে অতুলনীয় সুরভি ইতোপূর্বে কারো নাসিকারন্ধ্রে কোনো দিনও প্রবেশ করেনি। আমার আপাদমস্তক থেকে তখন উত্থিত হবে জ্যোতির জোয়ার। আমি আল্লাহ্ সকাশে শাফায়াত করবো। মহান করুণাময় আমার শাফায়াত গ্রহণ করবেন। ওই দৃশ্য দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলাবলি করবে, বিশ্বাসীরা তো শাফায়াত পেয়ে গেলো, এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কে? আপন মনে তারা আরো বলবে আমাদের জন্য রয়েছে ইবলিস। সে-ই আমাদেরকে বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত করেছে। তারা সকলে তখন ইবলিসের কাছে গিয়ে বলবে, বিশ্বাসীরা তো সুপারিশকারী পেয়েছে, এবার তুমি গাত্রোত্থান করো। তুমিই আমাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলে। এবার রক্ষা করো। ইবলিস উঠে দাঁড়াবে। তখন তার চতুর্দিকে এমনই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, যে দুর্গন্ধ এর আগে কেউ কোনো দিন পায়নি। ইবলিস সকলকে নিয়ে অগ্রসর হবে জাহান্নামের দিকে। সেখানে দোজখীদের উদ্দেশ্যে শুরু করবে বক্তৃতা।

এরপর বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি।' একথার অর্থ— ইবলিস তার বক্তৃতায় বলবে, পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছিলেন তা সত্য। আমি বলেছিলাম পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এসব কিছুই নয়। তোমাদের দেব-দেবীরাই হবে তোমাদের সুপারিশকারী। আমার ওই প্রতিশ্রুতিটি ছিলো মিথ্যা। দেখতেই পাচ্ছো, আমি যা বলেছিলাম আজ তার বিপরীত ঘটনা ঘটে চলেছে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিলো না'। একথার অর্থ— আমি তো তোমাদেরকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য বল প্রয়োগ করিনি; পাপকর্ম করতে বাধ্য করিনি। অথবা এখানে 'সুলত্বান' কথাটির অর্থ হবে প্রমাণ। যদি তাই হয় তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে আহ্বানের পক্ষে তো কোনো প্রমাণ পেশ করিনি। নবীগণের মতো স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা ছিলো আমার সাধ্যের বাইরে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কোরো না, তোমাদের নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ করো।' একথার অর্থ— আমি তো তোমাদেরকে অবাধ্যতার দিকে ডাক দিয়েছিলাম মাত্র। সেটা ছিলো আমার প্রতারণা। আর সে প্রতারণাও ছিলো দলিল-প্রমাণ বিবর্জিত। তবুও তো তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। প্রত্যাখ্যান করেছিলে নবী-রসুলগণের স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ সম্ভূত আহ্বান। সুতরাং এখন আমাকে আর দোষ দেয়া ঠিক হবে না। বরং এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকো। মুতাজিলা সম্প্রদায় এই আয়াত থেকে প্রমাণ করে যে, বান্দারা নিজেরাই তাদের কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু তাদের এই মতবাদটি ভ্রান্ত। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অন্তরে অভিপ্রায় লালনের ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। তার ওই অভিপ্রায় যখন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের অনুমোদন লাভ করে, তখনই তার ভালো অথবা মন্দ অভিপ্রায়ের অনুকূল কর্ম আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দেন। তাই সৃজন আল্লাহ্র এবং নির্মাণ মানুষের। অতএব মানুষ তার কর্মের নির্মাতা। আর তার কর্ম ও অন্য সকলের সকল প্রকার কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্ স্বয়ং। আশায়েরা সম্প্রদায় তাই মানুষের অর্জনকে বলে 'কাস্‌ব'। অর্থাৎ সৃষ্টি আল্লাহ্র এবং অর্জন বান্দার।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও।'

এরপর বলা হয়েছে—'তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' একথার অর্থ— তোমরা পৃথিবীতে আমাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করেছিলে। আজ আমি তোমাদের সে ধারণাকে অস্বীকার করছি। এখানে 'বিমা' শব্দের 'মা' হচ্ছে ধাতুমূল। 'মিন্ ক্ববলু' কথাটির 'মিন্' অব্যয়টি 'আশরক্তুমুনি (আমাকে শরীক করেছিলে) কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— পৃথিবীতে উপাসনায় ও আনুগত্যে তোমরা আমাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করেছিলে। আজ তোমাদের ওই অপরাধপ্রবণতাকে আমি অস্বীকার করছি। তোমাদের সঙ্গে এখন আমার আর কোনো সংশ্রব নেই। অন্য এক আয়াতেও এ রকম কথা এসেছে। যেমন— আর বিচারের দিন সে তোমাদের অংশীবাদকে অস্বীকার করে বসবে। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'মা' (যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান্' (যে) অর্থে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—'ওয়া নাফসিঁও ওয়ামা সাওওয়াহা' এবং 'ওয়া সুবাহানা ইয়াস্খারাফুন্না'। এ দু'টো ক্ষেত্রেও 'মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে 'মান্' অর্থে। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিন্' অব্যয়টি সম্পর্কযুক্ত হবে 'কাফারতু' (আমি অস্বীকার করছি)— কথাটির সঙ্গে। এমতো বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— তোমরা যে আল্লাহ্র আনুগত্যের সঙ্গে আমার আনুগত্যের অংশীদারীত্ব নির্ণয় করেছো, আমার প্ররোচনানুসারে দেব-দেবীর পূজা করেছো, সেটাই তো ছিলো তোমাদের প্রারম্ভিক সত্যপ্রত্যাখ্যান। এভাবে শুরুতেই তোমরা হয়ে গিয়েছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমাকেও দেয়া হয়েছিলো আদমকে সেজদা করার নির্দেশ। আমি তা মানিনি। তাই আমিও ছিলাম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আমার সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রকৃতি তোমাদের মতো নয়। অতএব তোমাদের সঙ্গে আজ আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

শেষে বলা হয়েছে—'সীমালংঘনকারীদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।' এ উক্তিটি ইবলিসের, অথবা আল্লাহ্র। শ্রোতাদেরকে সচেতন করার মানসে এ ধরনের উক্তি ব্যবহৃত হয়। এরকম কথা শুনলে তারা আত্মবিশ্লেষণে লিপ্ত হয় এবং পরিণাম সম্পর্কে হয় সচেতন।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।' লক্ষণীয় যে, এখানে 'তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে' বলা হয়েছে। এতে করে বোঝা যায় বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণগণ স্বেচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নিয়োজিত থাকবে একদল ফেরেশতা। তারাই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করাবে জান্নাতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।' একথার অর্থ— জান্নাতবাসীরা একে অপরকে সালাম বিনিময় করবে। ফেরেশতারাও 'সালাম' বলে তাদেরকে অভিবাদন জানাবে। কেউ কেউ বলেছেন, ওই শুভ অভিবাদনের সূচনা হবে আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

❐ তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত,

❐ যে প্রত্যেক মৌসুমে তাহার ফলদান করে তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

❐ অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

'দ্বরাবা মাছালান্' অর্থ দৃষ্টান্ত বা উপমা বর্ণনা করা। তুলনা করা। 'মাছাল' হচ্ছে ওই উক্তি, যা উপমা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। 'কালিমাতান্ ত্বয়্যিবাতান্' অর্থ আল্লাহ্র এককত্ব প্রকাশক বাক্য, যা উচ্চারিত হয় বিশুদ্ধতার সঙ্গে। 'শাজ্বারাতিন্ ত্বয়্যিবাতিন' অর্থ শক্তিশালী, উন্নত, উৎকৃষ্ট ও ফলন্ত বৃক্ষ। এখানে আল্লাহ্র এককত্ব প্রকাশক বাক্য বা সৎবাক্যের তুলনা করা হয়েছে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুউন্নত ও উৎকৃষ্ট ফলন্ত বৃক্ষের সঙ্গে। অথবা এখানকার 'আস্লুহা ছাবিতুন' (যার মূল সুদৃঢ়) বাক্যাংশটি 'মাছাল' (তুলনা) শব্দের বদল। অর্থাৎ ওই বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। আর তার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বদেশে সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত। 'ফার্উ'হা' অর্থ তার শাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। শব্দটি এখানে নামপদ হিসেবে ব্যবহৃত। সম্বন্ধপদ হওয়ার জন্য এতে নিমজ্জনপ্রবণতা সুপ্রকট। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি কি দেখছেন না, আল্লাহ্ কতো সুচারুরূপে উপমা দিয়ে থাকেন? আল্লাহ্র

এককত্ব প্রকাশক পবিত্র বাক্যের তুলনা তিনি করেছেন সুউন্নত ও উৎকৃষ্টতম এক বৃক্ষের সঙ্গে, যা মাটির ভিতরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং যার শাখা-প্রশাখাসমূহ অতি উন্নত ও সুবিস্তৃত।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'যে প্রত্যেক মৌসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।' এ কথার অর্থ— যে বৃক্ষ আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ফল প্রদান করে। কলেমায়ে তুইয়্যিবা বা পবিত্র বাক্যের অবস্থা এ রকমই। এই কলেমা ইমানদারের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত থাকে। আর যখন তা মুখে উচ্চারিত হয়, তখন তা বিনা প্রতিবন্ধকতায় পৌঁছে যায় আল্লাহ্ সকাশে।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, সুব্হানাল্লহ্ পাঠ করলে তা বিচারের দিনে ওজনের পাল্লার অর্ধাংশ পূরণ করবে। আলহামদু লিল্লাহ্ পাঠ করলে পাল্লা হবে পূর্ণ। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বিনা বাধায় পৌঁছে দিবে আল্লাহের দরবারে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে পঠিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্র' জন্য আকাশ মার্গের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই কলেমা পৌঁছে যায় আরশে। কবীরা গোনাহ্ থেকে যারা মুক্ত কেবল তাদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটে। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'উৎকৃষ্ট বৃক্ষ' বলে খর্জ্জুর বৃক্ষকে এবং 'অসার বৃক্ষ' (আয়াত ২৬) বলে বুঝানো হয়েছে মাকাল ফলের গাছকে

'হীন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সময়। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হীন' শব্দটির অর্থ প্রত্যেক মৌসুমে বা সারা বছর। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ ও ইকরামা। খেজুর গাছে সারা বছর ফল ধরে। তাই খেজুর গাছকে বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট বৃক্ষ। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেছেন, 'হীন' অর্থ অর্ধ বৎসর। অর্থাৎ গুচ্ছ বের হওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সময়। হজরত ইবনে আব্বাসও এই অভিমতের প্রবক্তা। কারো কারো মতে এই সময়সীমা চার মাস— ফলবান হওয়ার পর থেকে পেকে ওঠার সময় পর্যন্ত। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, দুই মাস— খেজুর ভক্ষণের উপযোগী সময় থেকে সংগ্রহ করা সময় পর্যন্ত। রবী বিন আনাস বলেছেন, 'কুল্লাহীন' অর্থ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা। কারণ খেজুর সর্বকালে, সকল ঋতুতে ও সকল সময়ে আহার করা যায়। সকাল-সন্ধ্যায়। সকল ঋতুতে। গুচ্ছ থেকে ছিঁড়ে, আহরিত অবস্থায়, অর্ধপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ সকল অবস্থায় খেজুর ভক্ষণযোগ্য। বিশ্বাসবানগণের অবস্থাও এ রকম। তারা সকাল-সন্ধ্যায়, দিবা-

রাত্রির যে কোনো সময়ে— সকল অবস্থায় পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে। তাদের ইমান ও পুণ্যকর্মের বরকত কখনো নিঃশেষ হয় না। সর্বক্ষণই তা উত্থানোন্মুখ।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. তাঁর উপস্থিত সহচরবৃন্দকে বললেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ চির হরিৎ। মুসলমানের মতো ওই বৃক্ষটির পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। বলো দেখি সেটা কোন বৃক্ষ? আমার মনে হচ্ছিলো সবাই প্রান্তরস্থিত কোনো বৃক্ষের কথা ভাবছেন। আমার মনে হচ্ছিলো বৃক্ষটি খেজুর গাছই হবে। কিন্তু আমি বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলে সে কথা উচ্চারণ করলাম না। সকলে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিই বলুন। তিনি স. বললেন, খর্জুর বৃক্ষ। বাগবী লিখেছেন, একটি বৃক্ষ তার পূর্ণাবয়ব লাভ করে তিনটি বস্তুর সমন্বয়ে—মূল, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা। তেমনি ইমানের পূর্ণরূপ প্রকাশ পায় তিনটি বিষয়ের সমাহারে—হৃদয়ের স্বীকৃতি, মুখের উচ্চারণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাস্তবায়ন।

আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে জান্নাতের একটি বৃক্ষ। হজরত জাবের থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে 'সুব্‌হানাল্লহি ওয়া বিহামদিহি' বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।' শব্দার্থের চিত্র অংকনের নাম 'তাম্‌ছীল'। অননুভূত কোনো কিছুকে উদাহরণের মাধ্যমে বোধগম্য করাকেও বলে 'তাম্‌ছীল'। উপমা বা তুলনার মাধ্যমে কোনো কিছু হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হয়। ফলে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা যায় অনায়াসে।

এর পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে—'অসার বাক্যের তুলনা এক অসার বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন।' তওহীদ ও রেসালতের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বাক্যকে বলে অপবিত্র বা অসার বাক্য। কপটদের বাক্যও এ রকম। কারণ তারা মুখে ভালো কথা বললেও তাদের অন্তর থাকে আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্য থেকে শূন্য। আর অপবিত্র বা অসার বৃক্ষ বলে সেগুলোকে, যেগুলো নিষ্ফলা অথবা যেগুলোর ফল বিস্বাদযুক্ত, অকেজো। ওই অকেজো বৃক্ষগুলোর মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত নয়। ওগুলোর শিকড় মাটির উপরেই ছড়ানো থাকে এবং সেগুলোকে অতি সহজে উৎপাটিত করা যায়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটদের কথা ওই সকল আগাছার মতো।

শেষে বলা হয়েছে—'যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' একথার অর্থ, ওই বৃক্ষগুলোর ভিত্তি দৃঢ় নয়। অনায়াসে সেগুলোকে উপড়ে ফেলা যায়। অসার বা অপবিত্র বাক্যও তেমনি উন্মূল, অনিকেত, অস্থায়ী। হাব্বান বিন শু'বার মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক একবার

বললেন, অসার বৃক্ষ বলে শারবানাকে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, শারবানা কি? তিনি বললেন, মাকাল ফল। আমি বলি, উৎকৃষ্ট বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত যেমন খেজুর গাছ, তেমনি মাকাল ফলের গাছও অসার বৃক্ষের অর্ন্তভুক্ত। সুনির্দিষ্টরূপে খেজুর ও মাকাল গাছ যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অসার গাছ নয়। হাদিস শরীফেও খেজুর ও মাকালের উল্লেখ এসেছে উপমা হিসেবে।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ২৭

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۚ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

❐ যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

'ক্বওলিছ্ ছাবিত্' (শাশ্বত বাণী) কথাটির অর্থ, তওহীদের বাণী। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'। যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী তাদের হৃদয়ে এই বাণী চিরস্থায়ী হয়। আর আল্লাহ্পাকের নিকটে এর প্রতিদানও নির্ধারিত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্তায়ালাই তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের বিশ্বাসের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাই দেখা যায় প্রকৃত ইমানদারেরা পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হলেও ইমান থেকে এক চুলও এদিক ওদিক সরেন না। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে নবী জাকারিয়া, ইহাহ্ইয়া ও জারজিসের জীবনে। হজরত শামউন ও আসহাবে উখদুদের ঘটনায়। আসহাবে উখদুদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো অগ্নি গহ্বরে। ওই মর্মান্তিক নির্দেশটি দিয়েছিলো ইয়েমেনের রাজা জুনাওয়াস্। রসুল স. এর প্রিয় সহচর হজরত খুবায়েব ও তাঁর সঙ্গীসাথীগণকে বীরে মাওনার অধিবাসীরা চক্রান্ত করে ডেকে নিয়ে গিয়ে শহীদ করে ফেলেছিলো। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁরা বিশ্বাসচ্যুত হননি। পরকালের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ— এ বিশ্বাস ছিলো তাঁদের সত্তাসন্নিহিত। আল্লাহ্তায়ালা প্রকৃত ইমানদারকে কবরের সওয়াল জবাবের সময়ও ইমানের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী (কাফের ও মুনাফিক) তারা কখনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুস্থির থাকতে পারে না। তাদের বিভ্রান্তি অনিবার্য। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে বিবৃত হয়েছে এভাবে—'যারা শাশ্বতবাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন।'

হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ষষ্ঠক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কবরে প্রশ্ন করা হলে ইমানদারেরা সাক্ষ্য দেয়— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল। ওই সময়েই বাস্তবায়িত হয় এই আয়াত 'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কবর জীবনের প্রশ্নোত্তর ও শাস্তির দিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কবরবাসীকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার প্রভুপালক কে? বিশ্বাসীরা জবাব দিবে, আল্লাহ্ আমার প্রভুপালক এবং মোহাম্মদ আমার নবী। বোখারী, মুসলিম।

বর্ণিত হাদিসটি আবু দাউদ ও আহমদের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— কবরবাসীর নিকট উপস্থিত হবে দু'জন ফেরেশতা। তারা তাকে উপবেশন করিয়ে বলবে, তোমার প্রভুপালয়িতা কে? সে বলবে, আল্লাহ্। ফেরেশতাদ্বয় বলবে, তোমার ধর্ম কি? সে বলবে, ইসলাম। ফেরেশতাদ্বয় পুনরায় জিজ্ঞেস করবে, যাকে তোমাদের নিকট রসুল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিলো তিনি কেমন ছিলেন? সে বলবে, তিনি তো ছিলেন আল্লাহ্র সত্য রসুল। তোমরা কি তা জানো না? আমি আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করেছি এবং তা মান্য করে চলেছি। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার কথাই বলা হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, এরপর আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে— আমার বান্দা ঠিক কথা বলেছে। তার জন্য জান্নাতের শয্যা রচনা করো। পরিধান করাও জান্নাতের পরিচ্ছদ। তার দিকে উন্মুক্ত করে দাও জান্নাতের একটি বাতায়ন। রসুল স. আরো বলেছেন, ওই বাতায়ন বেয়ে বেহেশত থেকে আসতে থাকবে সুবাসিত বাতাস। তার দৃষ্টিসীমা জুড়ে পরিদৃশ্যমান হবে বেহেশত। এরপর রসুল স. বললেন, অবিশ্বাসীদের দুরবস্থার কথা। বললেন, ফেরেশতাদ্বয় এসে উঠিয়ে বসাবে অবিশ্বাসী কবরবাসীকে। জিজ্ঞেস করবে, তোমার প্রভুপ্রতিপালক কে? সে বলবে, হায় হায়! আমি তো জানি না। তারা বলবে, তোমার ধর্ম কি? সে বলবে, হায় হায়! তাও তো জানি না। তারা বলবে, তোমাদের নিকট একজন রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো তুমি কি তা জানো? সে বলবে, হায় হায়! জানি না জানি না। তখন আকাশ থেকে আওয়াজ উত্থিত হবে— তার কথা অসত্য। তার জন্য বিছিয়ে দাও আগুনের বিছানা। পরিয়ে দাও অনলের বসন। আর খুলে দাও নরকের দুয়ার। এরপর তার কবরে আসতে শুরু করবে দোজখের বহ্নি-বাতাস। আর তার কবর এমনভাবে সংকুচিত হবে যে, শরীরের এক পাশ মিশে যাবে অপর পাশের সঙ্গে। অন্ধ ও বধির এক ফেরেশতা এসে তখন তাকে শাস্তি দিতে শুরু করবে। তার হাতে

থাকবে লৌহদণ্ড, যার একটি আঘাতে পাহাড় হয়ে যাবে মাটি। ওই লৌহদণ্ড দিয়ে সে আঘাত করতে থাকবে কবরবাসীকে। তার মুহুর্মুহুঃ আর্তনাদ জ্বিন ও মানুষ ছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকলেই শুনতে পাবে। লৌহদণ্ডের আঘাতে ওই কবরবাসী পরিণত হবে ধূলিকণায়। পুনরায় তাকে দেয়া হবে পূর্বের আকার। এভাবে পালাক্রমে চলতে থাকবে তার শাস্তি।

হজরত ওসমান জুন্নুরাইন একবার একজনকে সমাধিস্থ করার পর রসুল স. এর দরবারে এসে চুপচাপ বসে পড়লেন। রসুল স. বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করো। তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আবু দাউদ। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর তার গৃহগামী সঙ্গী-সাথীদের পায়ের আওয়াজ বিলীন হওয়ার আগেই দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসায়। জিজ্ঞেস করে, ওই ব্যক্তি (মোহাম্মদ) সম্পর্কে তুমি কিরূপ ধারণা রাখো? সে জবাব দেয়, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। এরপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই দেখানো হবে এবং তার জন্য নির্ধারণ করা হবে জান্নাত। মুনাফিক ও কাফেরকে এরকম জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, আমি তো কিছুই জানি না। তবে লোকে যা বলাবলি করতো, আমিও তাই বলতাম। ফেরেশতা বলে, না তুমি জানতে। তবু তুমি কোরআন পাঠ করোনি। একথা বলেই ফেরেশতা তাকে লোহার লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করবে। সে চিৎকার করতে থাকবে। মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায় সেই চিৎকার। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কবরস্থ ব্যক্তির নিকটে আসে কৃষ্ণবর্ণ ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা। তাদের নাম মুনকির ও নকির। তারা বলবে, তুমি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? সে বলবে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল। ফেরেশতাদ্বয় বলবে, আমি জানি তুমি এরূপ বলবে। এরপর তার কবরকে প্রশস্ত করা হবে সত্তর বর্গহাত। পুরো কবরকে করা হবে আলোকোদ্ভাসিত। তারপর বলা হবে, এবার নিদ্রাভিভূত হও। সে বলবে, আমি আমার পৃথিবীবাসী স্বজনদেরকে এ সংবাদটা দিয়ে আসি। তারা বলবে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও নতুন পরিণয়াবদ্ধ বরের মতো, যাকে তার জীবনসঙ্গিনী ছাড়া অন্য কেউ জাগাতে আসে না। সে ঘুমিয়ে পড়বে। অবশেষে এক সময়

তাকে জাগাবে তার পালনকর্তা আল্লাহ্। আর সে যদি কপটচারী হয়, তবে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাবে বলবে, জনগণ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। কিন্তু আসলে আমি তার সম্পর্কে কিছু জানি না। তারা বলবে, আমরা জানি, তুমি এরকমই বলবে। এরপর মাটিকে নির্দেশ দেয়া হবে, একত্র হও। সঙ্গে সঙ্গে মাটি তাকে এমন চাপ দিবে যে, তার পাঁজরের অস্থিগুলো ঢুকে পড়বে একে অপরের মধ্যে। এরকম শাস্তি চলতে থাকবে বিরতিহীনভাবে। শেষে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাক তাকে শাস্তিরত অবস্থায় ওঠাবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন।' একথার অর্থ, আল্লাহ্পাক কাউকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দান করেন, কাউকে দান করেন না। কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন বিশ্বাসে, কাউকে রাখেন না। তাঁর এই চিরস্বাধীন অভিপ্রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার অধিকার কারো নেই।

হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত স্পর্শ করলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারে পরিদৃশ্যমান হলো তাঁর পরবর্তী শুভ্রবর্ণ বংশধরগণ। এরপর আল্লাহ্ তাঁর হাত রাখলেন আদমের বাম কাঁধে। বেরিয়ে এলো তাঁর কৃষ্ণবর্ণ বংশধরেরা। তারা অবস্থান গ্রহণ করলো বাম পাশে। ডান পাশের দলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বললেন, এরা জান্নাতি। আর বাম পাশের দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা জাহান্নামী। আর এদের সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন নই।

হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী সকলকেই শাস্তি দিতে পারেন। এরকম করলে তাঁকে অত্যাচারী বলা যাবে না। আবার ইচ্ছে করলে সকলকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তাদের কৃতকর্মাপেক্ষা তাঁর অনুকম্পাই হবে প্রধান। মনে রেখো তকদীরে যার বিশ্বাস নেই, তার উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণরৌপ্য দানও আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না। আরো মনে রেখো, তাঁর নিকট থেকে তোমাদের উপরে যা আপতিত হয়, তা প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই। আর যা তিনি প্রেরণ করবেন না, তা আনয়নের সামর্থ্যও কারো নেই। এই বিধানের বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে সে অবশ্যই হবে জাহান্নামী। আহমদ, ইবনে মাজা। হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত হুযায়ফা ও হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝

❒ তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে উহা অস্বীকার করে এবং উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে

❒ জাহান্নামে, যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল।

❒ এবং উহারা আল্লাহের সমকক্ষ উদ্ভাবন করে মানুষকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল 'ভোগ করিয়া লও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করো না, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তা অস্বীকার করে।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! অকৃতজ্ঞদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য কেমন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্লাহ্‌পাকের দানের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ নয়। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নেন। তবু তারা নির্বিকার। তাদেরকে দেখে মনে হয় কৃতজ্ঞতার বদলে অকৃতজ্ঞতাই তাদের মনোপূত।

বোখারী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ উল্লেখিত অকৃতজ্ঞরা ছিলো কুরায়েশ সম্প্রদায়ের। হজরত ওমর বলেছেন, তারা ছিলো কুরায়েশী। রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বই ছিলো তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকেরা এই আয়াতের লক্ষ্য। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে পবিত্র হেরেমের অধিবাসী করেছিলেন। দিয়েছিলেন নির্বিঘ্ন জীবন-যাপনের অবকাশ। সেখানে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা ছিলো পর্যাপ্ত। হস্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন জীবনোপকরণের বহুমুখী উপায়। বাণিজ্য ব্যাপদেশে তারা সহজে গমনাগমন করতে পারতো দূরদূরান্তের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে। এরপর পরম কৃপাপরবশ আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রেরণ করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসুলকে। তিনি তাদেরকে কোরআন আবৃত্তি করে শোনান। পবিত্র করেন তাদের ভিতর-বাহির। কোরআন ও

কোরআনানুগ প্রজ্ঞার আলোকে তাদেরকে আলোকিত করেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে মক্কাবাসী! ইসলাম গ্রহণ করো। তাহলে তোমরা হবে সকল মানুষের অনুসরণীয়। কিন্তু তারা রসুলের এই উদাত্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। বিরুদ্ধে দাঁড়ালো সত্য রসুলের। এভাবে তারা কৃতজ্ঞতার বদলে হলো অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। আল্লাহ্পাক তাই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপসারিত করলেন। শুরু হলো অকৃতজ্ঞতার শাস্তি। এলো দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ। বদর প্রান্তরে নিহত হলো অনেকে। কেউ কেউ হলো বন্দী। পলাতকদের জন্য নির্ধারিত হলো লাঞ্ছনাদায়ক জীবন। কুরায়েশ নেতৃবর্গ এভাবেই তাদের অনুসারীদেরকে নামিয়ে আনলো ধ্বংসের পটভূমিতে। তাই শেষে বলা হয়েছে—'এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।'

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে—'জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট ওই আবাসস্থল।' একথার অর্থ— অবিশ্বাসী কুরায়েশ নেতা ও জনতা যে লাঞ্ছনাকর জীবন বেছে নিলো, তার পরিণামে তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আর জাহান্নাম কতোইনা নিকৃষ্ট আবাস। অবিশ্বাসী নেতা ও জনতা সকলেই হবে ওই জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী। এখানে 'জাহান্নাম' শব্দটি বর্ণনামূলক সংযোজন অথবা কর্মপদ হিসেবে ব্যবহৃত।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাস খলিফা হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! যারা অবিশ্বাস-বশতঃ আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে পরিবর্তন করে ফেলেছে, তারা কে? তিনি বললেন, কুরায়েশ সম্প্রদায়ভূত দু'টি উন্নাসিক গোত্র—বনী মুগীরা ও বনী উমাইয়া। বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তাদের শক্তি খর্ব করে তোমাদেরকে নিরাপদ করেছেন। তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগের অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। বাগবীও হজরত ওমরের এরকম উক্তি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সূত্রে। হজরত আলীরও অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, হাকেম ও ইবনে মারদুবিয়া।

আমি বলি, বনী উমাইয়াকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগের অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। এমন কি হজরত আবু সুফিয়ান, হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আমর বিন আস প্রমুখকে দেয়া হয়েছিলো রসুল স. এর বিশিষ্ট সহচর হবার মর্যাদা। কিন্তু পরবর্তী সময় এজিদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহ্র এই অপার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলো। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রসুল পরিবারের শত্রু। এ কারণেই ইমাম হোসাইনকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিলো। মহাপাতক এজিদ ক্ষুণ্ন করেছিলো মক্কা-মদীনার সম্মান। রসুল স. এর

প্রিয় দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসাইনের শাহাদত লাভের পর সে গর্বভরে পাঠ করেছিলো একটি কবিতা, যার অর্থ—তুমি যদি হতে আমার পূর্বসুরী, তবে দেখতে পেতে কীভাবে আমি বদর প্রান্তরে আমার পূর্বপুরুষদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। মোহাম্মদ ও বনী হাশেমের উপর সেই প্রতিশোধ যদি আমি গ্রহণ করতে না-ই পারি, তবে আমি আর জুন্দুব বংশদ্ভূত হয়েছি কেনো? সে শরাবকে হালাল করে দিয়েছিলো। শরাবের প্রশংসায় সে কবিতা পাঠ করতো এভাবে— মোহাম্মদের ধর্মে যদি মদ্য অবৈধ হয়, তবে আমি ঈসার ধর্মমতকে বৈধ বলে ভাববো। উল্লেখ্য যে, ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়ার পর এজিদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আনন্দ উল্লাসে অতিবাহিত করেছিলো দীর্ঘ একটি মাস। এভাবে তার আত্মপ্রসাদের এক হাজার মাস অতিবাহিত হতে পেরেছিলো। তারপর?

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে—'এবং তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে মানুষকে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য।' এখানে 'তারা আল্লাহ্র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে' কথাটির অর্থ মুশরিক নেতারা অসমকক্ষ আল্লাহ্র ইবাদতের সঙ্গে তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের ইবাদতকে যুক্ত করে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তারা এ রকম করে। লক্ষণীয় যে, এখানকার 'লিইয়ুদ্বিল্লু' (বিভ্রান্ত করবার জন্য) কথাটির 'লাম' অব্যয়টি হেতুবাচক নয়। কারণ নিজে বিভ্রান্ত হওয়া অথবা অপরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা শিরিক করতো না। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, তাদের কার্যকলাপ অংশীবাদিতা বা শিরিক ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। তাই এখানকার 'লাম' হবে পরিণতি প্রকাশক। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— মূর্তিপূজার পরিণতিতে তাদের নেতা ও জনতা হয়ে গিয়েছিলো পথভ্রষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে—'বলো, ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়েছে, সেই অবকাশের মধ্যে তোমরা পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ করে যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের অংশীবাদিতাকন্টকিত জীবনের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। জাহান্নামের আগুনই তোমাদের অবশেষ গন্তব্য। জুন্নুন মিসরী বলেছেন, 'তামাত্তাউ' অর্থ যতখানি সম্ভব প্রবৃত্তির আকাংখা পূরণে বিভোর থাকো। কথাটি অনুজ্ঞাসূচক হলেও আল্লাহ্ পাকের আদেশ নয়। বরং এর মধ্যে রয়েছে তিরস্কার ও শাস্তির সংকেত। সে শাস্তির কথা পরক্ষণেই উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

❒ আমার দাসদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে বল 'সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে— সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

❒ তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্বারা তোমাদিগের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জল-যানকে তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন যাহাতে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে তাঁহার বিধানে এবং যিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন নদীসমূহকে।

❒ তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'আমার দাসদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলো সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে'। এখানে বিশ্বাসীগণকে বিশেষভাবে নামাজ পাঠ ও আল্লাহ্‌র পথে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বিশেষভাবে 'ইবাদী' (আমার দাস) সম্বোধন করে তাদেরকে করা হয়েছে সম্মানিত। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাস বা আবদ্। আল্লাহ্‌র উপাস্য হওয়ার অধিকারকে তারাই সমুন্নত রাখে, পালন করে তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ।

আলোচ্য আয়াতে 'কুল' (বলো) ক্রিয়াটির কর্ম কিন্তু 'সালাত কায়েম করো' নয়। বরং এই ক্রিয়াটির কর্মপদ এখানে উহ্য। তাই প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে আদেশ দিন যেনো তারা নামাজ পাঠ করে এবং দান করে। উল্লেখ্য যে, একটি অনুক্ত শর্তের প্রতিফলন ঘটেছে এখানকার 'ইয়ুক্বিমু' (কায়েম করতে) এবং 'ইয়ুন্‌ফিকু' (ব্যয়

করতে) কথা দু'টোর মধ্যে অর্থাৎ হে রসুল! আপনি যদি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা তা পালন করবে। এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমানদারগণ রসুল স. এর আদেশ পালনে বাধ্য। যারা প্রকৃত বিশ্বাসী বা মুমিন তারা কখনোই তাঁর আদেশের অন্যথা করবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।' এ কথার অর্থ— নামাজ, দান-খয়রাত করতে হবে এই পৃথিবীতে। পৃথিবী পরিত্যাগের পর এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তখন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব কোনো কিছুর দ্বারা চিরকালীন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে আর পরিবর্তন করা যাবে না।

একটি সংশয়ঃ একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একজন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী (মুত্তাকী) সুপারিশ করতে পারবেন। তাই পুনরুত্থান দিবসে কোনো কোনো বিশ্বাসী হবে অপর বিশ্বাসীদের সুপারিশকারী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— 'বন্ধুরা আজ পরস্পর পরস্পরের শত্রু, তবে সাবধানীরা (মুত্তাকীরা) এর ব্যতিক্রম।' অর্থাৎ মুত্তাকীগণ একে অপরের শত্রু হবেন না। যদি তাই হয়, তবে এখানে একথা বলা হলো কেনো যে— যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না? বিষয়টির সমাধান কী?

সংশয়ের অপনোদনঃ তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত প্রদানের আদেশ দেয়া হয়। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বলিত নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে লাভ হয় তাকওয়া বা আল্লাহ্র ভয়জনিত সাবধানতা। যেখানে তাকওয়া নেই সেই বন্ধুত্বেরও কোনো মূল্য নেই। তাই যার নামাজ ও জাকাত নেই তার তাকওয়াও নেই। ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও নেই। আর যেখানে বন্ধুত্ব নেই সেখানে সুপারিশেরও কোনো অবকাশ নেই।

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তা সমুদ্রে বিচরণ করে তাঁর বিধানে এবং যিনি তোমাদের অধীন করেছেন নদীসমূহকে।' এখানে 'রিজিক' (জীবিকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ অর্থে। অর্থাৎ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী— সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী'। একথার অর্থ— তিনিই মানুষের কল্যাণের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে নির্ধারিত কক্ষপথে পরিক্রমণ করান।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রি ও দিবসকে।' কামুস অভিধানে রয়েছে, 'দাআবুন্' অর্থ চেষ্টা ও শ্রম। ধাতুগত অর্থ দ্রুত পরিচালনা করা। এখানে 'দাইবাইনি' অর্থ দিবা-রাত্রি। অর্থাৎ দিবস ও রজনী দ্রুত আবর্তিত হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ সূর্য-চন্দ্র, দিবস ও রজনীকে তাঁর নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী করে রেখেছেন। দিবস ও রজনীকে করেছেন মানুষের সেবক, যাতে করে দিবসের শ্রমজনিত শ্রান্তি রাতের মাধ্যমে বিদূরিত হয়।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৩৪

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۟

❒ এবং তোমাদিগের যাহা প্রয়োজন তিনি তোমাদিগকে তাহা দিয়াছেন। তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া আতাকুম্ মিন্ কুল্লি মা সাআল্তুমুহু' (এবং তোমাদের যা প্রয়োজন তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছেন)। এখানকার 'মিন্' অব্যয়টি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দান করেছি তোমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কিঞ্চিত।

বায়যাবী লিখেছেন, সম্ভবতঃ আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এ রকম—আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনানুসারে দিয়েছি— তোমরা তা চাও অথবা না চাও। প্রাচুর্য প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় 'কুল' শব্দটি, যদিও এর শাব্দিক অর্থ সবকিছু বা সকল কিছু। যেমন, বলা হয়— অমুক ব্যক্তি সবকিছুই জানে। একথার প্রকৃত অর্থ হবে— অমুক ব্যক্তি অনেক কিছুই জানে। কোরআন মজীদেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ফাতাহ্না আ'লাইহিম আব্ওয়াবা কুল্লা শাইইন (তাদের জন্য আমি প্রতিটি বস্তুর দ্বারসমূহ উন্মোচন করেছি)। অর্থাৎ তাদের জন্য আমি উন্মোচন করেছি অনেক কিছু।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির সংখ্যা, প্রকার ও শ্রেণী গুণে শেষ করতে পারবে না। কারণ তাঁর অনুগ্রহসম্ভার সুবিপুল ও অসংখ্য। তোমরা সেগুলোর যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের অক্ষমতাবোধকেই কৃতজ্ঞতা বলে গ্রহণ করে থাকেন। যাদের এই অক্ষমতাবোধ নেই তারা কৃতজ্ঞ নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।' একথার অর্থ— বিপদে পড়লেই মানুষ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। হয়ে যায় ধৈর্যচ্যুত। অকৃতজ্ঞ। তাদের তখন একথা মনে থাকে না যে, আল্লাহ্‌র সকল কার্যকলাপই রহস্যময়, প্রজ্ঞামিশ্রিত। ধৈর্য সম্বলিত বিপদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌ই একমাত্র দাতা ও করুণাপরবশ। সুখের সময় আবার মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। এভাবে তারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সীমালংঘন করে। হয়ে যায় জালেম বা সীমালংঘনকারী। 'জুলুম' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— কোনো কিছুকে অপাত্রে রাখা। বিপদে ধৈর্য কাম্য। অধৈর্য অনভিপ্রেত। তাই বিপদে অভিযোগ উত্থাপন করলে তা হবে অপাত্রে স্থাপনের মতো সীমালংঘন বা জুলুম। তাই এখানে সীমালংঘনের রূপক অর্থ হবে অধৈর্য। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, প্রকৃত অর্থে পাপীরা তাদের আপন আত্মার উপরে অত্যাচার করে। এভাবে তারা নিজেরাই সঞ্চয় করে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির উপকরণসমূহ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করায় অধিকতর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়। এটাও আত্মার উপরে অত্যাচার। এভাবে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি তার নিজস্ব অধিকারের উপর জুলুম করে। হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমার এবং মানব-জ্বিনের সম্পর্কটি অদ্ভুত। আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অথচ তারা উপাসনা করে অন্যের। আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়েছি। অথচ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অপরের। হজরত আবু দারদা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী ও হাকেম।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۞ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

❒ স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও।

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! এইসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, ইব্রাহিম বলেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে নিরাপদ কোরো।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনার উর্ধ্বতন পিতৃ-পুরুষ নবী ইব্রাহিমের কথা স্মরণ করুন। তিনি এই মক্কা নগরীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমার প্রভুপালক! এই মক্কাকে করে দিন শান্তিধাম। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিম মক্কায় আগমনের পূর্বে স্থানটি ছিলো লতা-গুল্মহীন পাহাড়বেষ্টিত একটি জনমানবহীন উপত্যকা। সেই বিজন উপত্যকায় দাঁড়িয়ে তিনি মক্কাকে নিরাপদ জনপদ বানিয়ে দেয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো।' এই প্রার্থনাংশটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীগণকে নিষ্পাপ রাখা হয় নিরাপদ পরিবেশে। সৃষ্টিগতভাবে সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের অবয়ব ভূতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের আনুকূল্যবেষ্টিত। তাই তাঁরা পাপাচরণ থেকে সুরক্ষিত।

এখানে 'বানিন' অর্থ আপন ঔরসজাত সন্তান। সন্তানের সন্তান নয়। অর্থাৎ এখানে শব্দটির দ্বারা বংশ পরিচয় তুলে ধরা হয়নি, যেমন বংশ পরিচয় বিধৃত হয় বনী আদম, বনী ইসরাইল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে। অতএব বুঝতে হবে 'আমার পুত্রগণকে' বলে হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর পুত্র হজরত ইসহাক ও হজরত ইসমাইলের জন্য। তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য নয়। তাই দেখা যায় হজরত ইসমাইলের উত্তর পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সুফিয়ান বিন ওয়াইনার বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, হজরত ইসমাইলের বংশের কেউই পৌত্তলিক ছিলো না। তবে তারা পাথর প্রদক্ষিণ করতো এবং বলতো, কাবা শরীফ তো পাথরই। তাই আমরা পাথর দেখলে কাবা ভেবে প্রদক্ষিণ করি। দুর্‌রে মানসুর গ্রন্থে রয়েছে, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়াকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হজরত ইসহাক ও হজরত ইসমাইলের বংশধররেরা কেউই পৌত্তলিক নয় আপনি এ রকম কথা বলেন কেনো? তিনি বললেন, হজরত ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন 'আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো।' তখন মক্কাবাসীরা সকলেই ছিলো হজরত ইসমাইলের সন্তান-সন্ততি। তাঁরা সেখানে বসবাস শুরু করার পর মক্কার নিরাপত্তার জন্য তিনি দোয়া করেছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। অতএব হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর দুই পুত্রের বংশধরেরা কখনোই মূর্তিপূজারী হতে পারেন না।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার ব্যাখ্যাটি কোরআন, সুন্নাহ্ ও এজমার বিপরীত। কোরআন মজীদে 'মুশরিক' বলে মক্কাবাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন 'ওয়া ক্বালাল্লাজীনা আশরাকু লাও শাআল্লহু মা আশরাক্না ওয়ালা আবাউনা ওয়ালা হার্রামনা মিন্দুনিহী শাইয়ুন' (যারা সমকক্ষ স্থির করেছে তারা বললো, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে আমরা ও আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ শিরিক করতাম না। আর তিনি ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না)। এ রকম আরো আয়াত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবাসী ও তাদের পিতৃ-পুরুষ পৌত্তলিক ছিলো।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এখানে 'হুন্না' সর্বনামটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই প্রতিমাগুলোকে, যেগুলো ছিলো তাদের পূজকদের পথভ্রষ্টতার কারণ। 'যে আমার অনুসরণ করেছে' অর্থ যার সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক পরকালেও ছিন্ন হবে না। এই সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণেই সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। সুদ্দী বলেছেন, 'তুমিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' কথাটির অর্থ, সে আমাকে অমান্য করলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়ো। তুমিতো গফুরুর রহীম। মুকাতিল বলেছেন, কথাটির অর্থ, সে যদি শিরিক ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে আমার অবাধ্য হয়, তবে তুমি তাকে মার্জনা করে দিয়ো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, এখানকার 'আ'সানী' শব্দটির মধ্যে শিরিকও অন্তর্ভুক্ত। 'শিরিকের পাপ ক্ষমার অযোগ্য' এ কথা জানানোর আগে হজরত ইব্রাহিম এই দোয়া করেছিলেন। পরে যখন একথা জানলেন, তখন দোয়া করলেন 'ওয়ারযুক আহ্লাহু মিনাছ্ ছামারাতি মান্ আমানা মিন্হুম বিল্লাহ্'(আর এই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র উপর ইমান এনেছে, তাদেরকে ফল-মূল দ্বারা উপজীবিকার ব্যবস্থা কোরো)। এই দোয়ায় কেবল ইমানদারদের জন্য উপজীবিকা যাচ্ঞা করা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়াটিও ছিলো অযথার্থ। কারণ পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহ্পাক উপজীবিকা দান করেন। কিন্তু অংশীবাদীদেরকে তিনি পরকালে মার্জনা করবেন না। তাই তাঁর প্রতি পুনঃ-প্রত্যাদেশ হলো— 'আর যে অবিশ্বাস করবে, তাকে (এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত) জীবনোপভোগ করতে দিবো। অতঃপর তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো দোজখের দিকে।' এ কথার অর্থ— পার্থিব উপজীবিকা থেকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আমি বঞ্চিত করবো না, কিন্তু পরকালে তাদেরকে মার্জনা করা হবে না।

رَبَّنَآ اِنِّیٓ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ ○

❑ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদিগের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই জন্য যে উহারা যেন সালাত কায়েম করে। এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদিগের জীবিকার ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এখানে 'আমার বংশধরদের কতককে' অর্থ হজরত ইসমাইল ও তাঁর বংশধরকে। তিনি ও তাঁর বংশধরেরাই বসবাস করতেন মক্কায়।

'ওয়াদিন্ গইরি জী জারই'ন্' অর্থ অনুর্বর উপত্যকা। পাহাড় বেষ্টিত একটি প্রস্তরময় ও অনুর্বর সমতল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মক্কা নগরী। তাই এখানে বলা হয়েছে 'গইরি জী জারই'ন্' (চাষের অযোগ্য বা অনুর্বর)।

'তোমার পবিত্র গৃহের নিকট' অর্থ কাবা শরীফের নিকট, যে কাবা গৃহের অস্তিত্ব ছিলো হজরত নুহের মহাপ্লাবনের পূর্বেও। মক্কা বিজয়ের দিন রসুল স. ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে এই নগরীকে মহিমান্বিত করেছেন। তাই মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। এখানে যুদ্ধ বৈধ নয়। আজ কেবল আমার জন্য কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এর আগে ও পরে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে যেমন যুদ্ধ করা যাবে না, তেমনি কর্তন করা যাবে না এখানকার বৃক্ষ, তাড়িয়ে দেয়া যাবে না এখানকার শিকার, আত্মসাৎ করা যাবে না পরিত্যক্ত বস্তু— কিন্তু হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে কোনো হারানো বস্তু নিজের কাছে রাখা যাবে। এখানকার কোনো তৃণও উচ্ছেদ করা যাবে না। এই ঘোষণা শুনে হজরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানকার এজখর নামক তৃণকে ব্যতিক্রম বলে ঘোষণা করুন। কারণ এই তৃণটি এখানকার অধিবাসীদের সাংসারিক কাজে লাগে। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, এজখর এই নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত নয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

আমের বিন সাঈদের পদ্ধতিতে ওয়াকেদি ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের প্রথম পত্নী হজরত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী হজরত হাজেরা যখন জননী হলেন, তখন তাঁর অন্তরে জেগে উঠলো নারীসুলভ বিবমিষা। তিনি শপথ করে বসলেন, সপত্নীর নাক ও কান কেটে দিবেন, যাতে তার সৌন্দর্য খর্ব হয়। স্বামীর নিকটে হয়ে পড়ে অপ্রিয়। হজরত ইব্রাহিম বললেন, সত্যি কি তুমি তোমার শপথ পূরণ করতে চাও? হজরত সারা বললেন, তাতো চাই, কিন্তু কীভাবে করবো? হজরত ইব্রাহিম বললেন, তার কান দু'টো ফুটো করে দাও এবং তার খতনা করে দাও। হজরত সারা তাই করলেন। তখন হজরত হাজেরা তাঁর দুই কানে পরলেন দুল। এতে করে তাঁকে আরো বেশী সুন্দর দেখাতে লাগলো। হজরত সারা বললেন, এযে দেখছি আরো রূপসী হয়ে গেলো। এরপর থেকে হজরত হাজেরার উপস্থিতি একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠলো হজরত সারার। হজরত ইব্রাহিম ঠিক করলেন, প্রিয় পত্নীকে তিনি এবার রেখে আসবেন দূরে কোথাও।

একদিন হজরত হাজেরা ও তার শিশু পুত্রকে নিয়ে তিনি চললেন মক্কা অভিমুখে। হজরত হাজেরার পরিধানে ছিলো মাটি পর্যন্ত প্রলম্বিত পরিচ্ছদ। তাই স্বামীর অনুগমনকালে দু'জনের পদচিহ্নই মুছে যাচ্ছিলো। পদচিহ্ন ধরে সপত্নী সারা যেনো তাঁর কাছে যেতে না পারে, সে কারণেই হজরত হাজেরা করেছিলেন এই পরিকল্পনাটি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটি স্বসূত্রে উপস্থাপন করেছেন বাগবী ও বোখারী।

দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে তাঁরা উপস্থিত হলেন মক্কার বিজন উপত্যকায়, কাবা শরীফের পাশে। কিন্তু কাবা গৃহের অস্তিত্ব তখন ছিলো না। শিশু ইসমাইলকে কোলে নিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন হজরত হাজেরা। স্তন্যদান করলেন শিশুকে। হজরত ইব্রাহিম সঙ্গে আনা ভুট্টাসহ একটি থলি ও এক মশক পানি রেখে দিলেন তাঁর পাশে। তারপর প্রস্থানোদ্যত হলেন। হজরত হাজেরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি চলে যাচ্ছেন কেনো? হজরত ইব্রাহিম জবাব দিলেন না। থামলেনও না। হজরত হাজেরা বলে উঠলেন, এটা কি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত? হজরত ইব্রাহিম যেতে যেতে জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হজরত হাজেরা বললেন, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। স্বামীর গমনপথের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। নবীপ্রবর অদৃশ্য হয়ে গেলে হজরত হাজেরা দৃষ্টি ফেরালেন। দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমি এখন আমার শিশু সন্তান নিয়ে তোমার মহিমান্বিত গৃহের অধিবাসী। প্রিয় পত্নী হাজেরাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন হজরত ইব্রাহিম। তাই তিনি মাঝে মাঝে মক্কায় এসে স্ত্রী-পুত্রের খবরাখবর নিয়ে যেতেন। খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলো কয়েকদিনের মধ্যে।

শুকিয়ে যেতে লাগলো জননীর বুকের দুধ। মাতা ও পুত্র দু'জনেই হয়ে পড়লেন তৃষ্ণার্ত। এই প্রস্তরিত প্রান্তরে পাহাড়ে পানির চিহ্ন মাত্র নেই। হজরত হাজেরা একবার সাফা পাহাড়ে উঠলেন। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কোথায় পানি? যেদিকে তাকান সেদিকে দেখেন দিকচক্রবালে একাকার হয়ে রয়েছে কেবল মরুভূমি ও আকাশ। আকাশ ও মরুভূমি। একরাশ নৈরাশ্য নিয়ে তিনি নেমে এলেন। চঞ্চল বিহ্বল পদে দ্রুত গিয়ে আরোহণ করলেন মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায়। ঘুরে ঘুরে তাকালেন চতুর্দিকে। নেই। কোথাও কিছু নেই। উপায়হীনা জননী আবার এসে দাঁড়ালেন পিপাসার্ত পুত্রের নিকটে। ভেবে পেলেন না, কী করবেন। কোথায় যাবেন। কী করে বাঁচাবেন প্রিয়তম আত্মজকে। আবার তিনি দৌড় দিলেন সাফা পাহাড়ের দিকে। সেখানে থেকে আবার মারওয়ায়। এভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন তিনি। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত হাজেরার অনুসরণেই হাজীগণকে সাফা ও মারওয়ায় সাতবার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আল্লাহ্ এভাবেই ওই মহীয়সী রমণীর স্মৃতি জীবন্ত করে রেখেছেন।

সপ্তম দৌড়ের পরে তিনি যখন মারওয়ায়, তখন শুনতে পেলেন একটি আওয়াজ। উৎকর্ণ হলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, আবির্ভূত হয়েছেন এক ফেরেশতা। তিনি এক স্থানে পদাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো জলোচ্ছ্বাস। হজরত হাজেরা দ্রুত নেমে গিয়ে সেই জলোচ্ছ্বাসের চারপাশে বাঁধ বেঁধে দিলেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি তুলে ভরতে লাগলেন মশক। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক ইসমাইল-জননীর উপর। তিনি বাঁধ বেঁধে না দিলে ও আঁজলা ভরে পানি না ওঠালে জমজম হয়ে যেতো একটি স্রোতস্বিনী।

হজরত হাজেরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন অলৌকিক কূপের পানি। দুগ্ধ পান করালেন প্রিয় পুত্রকে। ফেরেশতা বললেন, আপনি কোনোরূপ ক্ষতির আশংকা করবেন না। এখানেই রয়েছে আল্লাহ্র মহিমান্বিত গৃহ। আপনার স্বামী ও আপনার কোলের এই শিশু বিলীন গৃহকে পুনঃনির্মাণ করবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ্র গৃহের পাশে যারা বসবাস করে, তারা নিরাপদ। উল্লেখ্য যে, কাবা গৃহের চিহ্ন হিসেবে তখন সেখানে ছিলো কেবল একটি উঁচু ভিটি। উপরের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো হজরত নুহের মহাপ্লাবনের সময়।

বয়ে চলে সময়। মক্কার বিজন উপত্যকায় কেটে যায় আল্লাহ্র অতিথিদ্বয়ের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। একদিন মক্কার কাছাকাছি এসে তাঁবু ফেললো জুরহাম গোত্রের একটি অভিযাত্রী দল। তারা এপথ দিয়ে কখনো কখনো যাতায়াত করতো । হঠাৎ তারা দেখলো আকাশে ওড়াউড়ি করছে এক ঝাঁক পাখি। এ দৃশ্য দেখে তারা

বুঝতে পারলো, নিশ্চয় নিকটে কোথাও পানি রয়েছে। কিন্তু বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, ইতোপূর্বে তো এখানে কোনো পানির অস্তিত্ব ছিলো না। পানি সন্ধান করতে করতে তারা এসে পড়লো হজরত হাজেরার নিকটে । বললো, এই পানির সন্নিকটেই তারা বসবাস করতে চায়। হজরত হাজেরা তাদেরকে অনুমতি দিলেন। শর্ত আরোপ করলেন, এই পানির উপরে কারো কর্তৃত্ব থাকবে না। অভিযাত্রী দল তাঁর এ শর্ত মেনে নিলো। সেখানে গড়ে তুললো তাদের স্থায়ী আবাস। হজরত হাজেরা এরকমই চেয়েছিলেন। মনে-প্রাণে কামনা করেছিলেন, আল্লাহ্র ঘরের পাশে গড়ে উঠুক একটি জনপদ। আর তিনি হবেন এই পানির একক অধিকর্ত্রী। জুরহাম গোত্রের অন্য লোকেরাও একে একে এসে ঠাঁই নিলো এখানে। দিন দিন বেড়ে চললো মক্কাবাসীদের বংশধারা। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলেন হজরত ইসমাইল। আরবী হলো তাঁর মাতৃভাষা। কারণ জুরহাম গোত্রের ভাষা ছিলো আরবী। মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়। হজরত হাজেরাও একদিন চলে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে। যাবার আগে তিনি জুরহাম গোত্রের এক মেয়ের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ করে দিয়ে গেলেন প্রিয় পুত্রকে। শুরু হলো হজরত ইসমাইলের সংসার-জীবন। সুরা বাকারায় এই কাহিনীটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে তারা যেনো সালাত কায়েম করে।' একথার অর্থ হজরত ইব্রাহিম আরো প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রতিপালক! এই অনুর্বর উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে আমি আমার পরিবার পরিজনকে রেখে যাচ্ছি এ জন্যই যে, তারা যেনো তোমার শূন্য গৃহে কেবল তোমার উদ্দেশ্যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বার বার উল্লেখিত হয়েছে 'রব্বানা' (হে আমার প্রতিপালক) শব্দটি। আর আলোচ্য বাক্যের শুরুতে 'রব্বানা' সম্বোধনটি উল্লেখিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, হজরত ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের জন্য বিশেষভাবে এখানে আল্লাহ্র নিকট নামাজ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র গৃহ নামাজের মাধ্যমে আবাদ করার জন্যই তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়তম পুত্রকে এখানে রেখে যাচ্ছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'লিইয়ুক্বিমু' কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম পরোক্ষভাবে তাঁর সন্তানদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নামাজ প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্যও কামনা করেছেন আল্লাহ্র নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে — 'এখন তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও।' এখানে 'মিনান্নাসি' কথাটি যদি 'মিন' অব্যয় ব্যতীত ব্যবহৃত হতো, তবে অর্থ হতো— সারা দুনিয়ার সকল মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তাহলে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক

সকলেই আল্লাহ্‌র ঘরে হজ করতে শুরু করতো। সেরকম করা হয়নি বলে কাবা গৃহের হজ করে কেবল মুসলমানেরা। এরপরের কথাটি 'তাহবী ইলাইহিম', যার অর্থ, দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়। সুদ্দী বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— কিছু লোকের মন যেনো তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কোরো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' বলা বাহুল্য, হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়া কবুল করা হয়েছে। তাই দেখা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সকল ঋতুতে সকল প্রকার ফলমূল দ্বারা মহিমান্বিত ও মহাশান্তির আলয় মক্কা ভরপুর।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ○ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ○ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ○

❒ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা আমরা প্রকাশ করি ; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহের নিকট গোপন থাকে না।

❒ প্রশংসা আল্লাহেরই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মাইল ও ইস্‌হাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন।

❒ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদিগের কতককেও। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

❒ 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে-দিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা করিও।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জানো যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থাই তোমার জানা। আমরা যা যাচ্‌ঞা করি, তার চেয়েও তুমি অনেক বেশী দান করো আমাদেরকে। আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন কোনো প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, মক্কার পাহাড় পরিবেষ্টিত প্রস্তরিত উপত্যকায় প্রিয়তমা ভার্যা ও প্রাণাধিক পুত্রকে রেখে যাওয়ার সময় হজরত ইব্রাহিমের হৃদয়ে যে শোকোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিলো, সে শোকোচ্ছ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এখানকার 'নুখফী'(গোপন করি) এবং 'নু'লিন্'(প্রকাশ করি) শব্দ দু'টোর মাধ্যমে। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে 'নুখফী' কথাটির অর্থ বিরহ-বেদনা এবং 'মা নু'লিন' অর্থ বিনয় বা নম্রতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক সত্তাগতভাবে সর্বজ্ঞ। তাই আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। কেউ কেউ মনে করেন, উক্তিটি আল্লাহ্‌পাকের। আবার কেউ কেউ মনে করেন, হজরত ইব্রাহিমের ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন।' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বললেন, আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা তিনিই আমাকে বৃদ্ধ বয়সে করেছেন দুই সন্তানের জনক। এটা তাঁর প্রবল পরাক্রমের বিরল বহিঃপ্রকাশ। প্রিয় পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক তাঁরই মহান দান।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম নব্বই বছর বয়সে হজরত ইসমাইলের জনক হন। আর একশত বারো বছর বয়সে জনক হন হজরত ইসহাকের। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এক শত সতের বছর বয়সে হজরত ইব্রাহিমকে দেয়া হয়েছিলো হজরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন ।' এখানে 'শুনে থাকেন' অর্থ কবুল করেন বা কার্যকর করেন। যেমন বলা হয় 'সামিয়াল্ মালিকুল কালামা' (সম্রাট আমার কথা মেনে নিয়েছেন)। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের সন্তান লাভ সম্পর্কিত প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন।

এর পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার বংশধরদের কতককেও।' এখানে 'মুক্বীমাস্ সলাত' (সালাত কায়েমকারী করো) অর্থ— নামাজের শর্তাবলী, সময়, সীমারেখা, নিয়ম ইত্যাদিসহ একাগ্রচিত্তে নামাজ প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য দান করো। 'ওয়া মিন্ জুর্‌রিয়্যাতী' অর্থ— এরকম সামর্থ্য দান করো আমার বংশধরদের অনেককে। এখানে 'মিন্' অব্যয়টি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সামর্থ্য দান

করো আমার উত্তরপুরুষদের কাউকে কাউকে। সকলের জন্য তিনি এরকম দোয়া করেননি। কারণ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁকে জানানো হয়েছিলো যে, তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কেউ কেউ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হবে। ইতোপূর্বে একবার তিনি তাঁর সকল অধঃস্তন পুরুষদের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন। জবাবে আল্লাহ্পাক বলেছিলেন — 'লাইয়ানামু আহ্দিজ জলিমীন' (আমার অনুগ্রহ সত্যপ্রত্যাখান-কারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপালক! আমার ইবাদত কবুল করো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে আবু ইয়ালী, হজরত নোমান বিন বশীর থেকে হাকেম এবং আহমদ, বোখারী, সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দোয়া অর্থ ইবাদত। তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থনা হচ্ছে উপাসনার নির্যাস।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কোরো।' এখানে হজরত ইব্রাহিম তাঁর নিজের জন্য, তাঁর পিতা-মাতার জন্য এবং সকল ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাঁর এই প্রার্থনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ইমানদার। কাফেরদের জন্য ইমানদারগণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, আজর তাঁর পিতা ছিলেন না, ছিলেন পিতৃব্য। তাঁর পিতার নাম ছিলো তারেখ। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'আব্' (পিতা) শব্দটি পিতৃব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে 'ওয়ালিদাইয়া' এর পরিবর্তে যদি 'আবাইয়া' কথাটি উল্লেখিত হতো, তবে তাঁর পিতৃব্যও এই ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত বলে সন্দেহ করা যেতো। কিন্তু সে সন্দেহের অবকাশ এখানে নেই। আজর ছিলো পৌত্তলিক। সুতরাং সে হজরত ইব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আবার আজরকে হজরত ইব্রাহিমের পিতা ধরে নেয়া হলেও হজরত ইব্রাহিমকে অভিযুক্ত করা যাবে না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে এরশাদ করেছেন— 'ওয়ামা কানাস্ তিগ্ফারু ইব্রাহীমা লিআবীহি ইল্লা আম্মাওয়িদাতিউ ওয়াদাহা ইয়্যাহু ফালাম্মা তাবাইয়্যানালাহু আন্নাহু আদুউল্ লিল্লাহি তাবার্রাআ মিন্হু' (ইব্রাহিম তার পিতার মার্জনার নিমিত্তে এজন্যই দোয়া করেছিলো যে, সে ছিলো তার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু যখন তাকে জানানো হলো যে, তার পিতা আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে নিবৃত্ত হলো)।

'ইয়াওমা ইয়াকুমূল হিসাব্' অর্থ যেদিন হিসাব হবে, সেইদিন। 'ইয়াকুমু' অর্থ প্রকাশ পাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কথাটি এসেছে ধনাত্মক 'ক্বিয়াম আলার্ রিজ্‌লি'থেকে। পায়ের উপরে দণ্ডায়মান হলে যেমন পরিপূর্ণ অবয়ব সুস্পষ্ট বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি সুস্পষ্ট বা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বিচারের দিবস। যেমন বলা হয়— 'ক্বামাতিল হারবু আলাস্ সাক্ব' (যুদ্ধ তার উরুদেশে দণ্ডায়মান)। অর্থাৎ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। অথবা এখানে হিসাব শব্দের পূর্বে একটি সম্বন্ধ পদ উহ্য রয়েছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। ওই উহ্য সম্বন্ধ পদটি হচ্ছে 'আহল'। এভাবে 'আহ্‌লুল হিসাব্' অর্থ হবে, হিসাব দাতা। তখন মর্মার্থ হবে— সে দিন হিসাবদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে। যেমন বলা হয়— 'ওয়াস্‌আলিল্ কুরইয়াতা' (গ্রামকে জিজ্ঞেস করো)। এ কথার অর্থ— গ্রামবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রূপকভাবে দণ্ডায়মান হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়েছে হিসাবের সঙ্গে। অর্থাৎ সকল মানুষ দণ্ডায়মান হবে হিসাবের লক্ষ্যে।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۙ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ؕ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ

❐ তুমি কখনও মনে করিও না যে, আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীরা যাহা করে সে বিষয়ে অনবধান, তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন যে দিন তাহাদিগের চক্ষু হইবে স্থির।

❐ হীনতায় আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটাছুটি করিবে, উহাদিগের নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি থাকিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে বিকল।

❐ যে দিন তাহাদিগের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন সীমালংঘনকারীরা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রসূলগণের অনুসরণ করিব।' তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদিগের কোন পরজীবন নাই?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ্ সীমালংঘন-কারীরা যা করে সে বিষয়ে অনবধান।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো জানেন আমি সর্বজ্ঞ। এই ধারণার উপরেই আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকুন। একথাও জেনে রাখুন যে, সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। যথাসময়ে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে রসুল স.কে সম্বোধন করা হলেও এই সম্বোধনের লক্ষ্য সকল মানুষ, যারা ত্বরিৎ শাস্তি অবতীর্ণ না হতে দেখে আল্লাহ্র সর্বজ্ঞ হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মধ্যে রয়েছে অত্যাচারিত জনতার জন্য সান্ত্বনা এবং অত্যাচারীদের জন্য শাস্তির হুমকি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবে তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।' একথার অর্থ— হিসাব দিবসের ভয়াবহতা দর্শনে নিস্পলক হয়ে যাবে তাদের চোখ। অথবা সেদিন ভয়ে তাদের চোখের মনি বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'হীনতায় আকাশের দিকে চেয়ে তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে ছুটা ছুটি করবে, তাদের নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকবে না।' মাথা তুলে সামনের দিকে যে তাকায় তাকে বলে 'মুক্বনিয়ী'। হাসান বলেছেন, বিচার দিবসে মানুষের দৃষ্টি থাকবে উর্ধ্বমুখী। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করার ফুরসত তারা পাবে না। কাতাদা বলেছেন, তখন হিসাবের জন্য যাদেরকে নাম ধরে ডাকা হবে, তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াদৌড়ি করবে। মুজাহিদ বলেছেন, মানুষ তখন এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে হিসাব গ্রহণের দৃশ্যের প্রতি। নিরীহ ও নিস্পলক নেত্রে যে দৃষ্টিপাত করে, তাকে বলে 'মুহ্তিয়ীন'। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে 'মুহ্তিয়ীন' বলে, যে কৃপা প্রার্থনা করে অসহায় চোখের ভাষায়। উল্লেখ্য যে, ওই দিন নিজেদের প্রতিও মানুষ দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— ওই ভয়াবহ বিচারের দিবসে অসহায় মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্তচিত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। নিজেদের দিকে তাকাবার সুযোগও তাদের থাকবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অন্তর হবে বিকল।' এখানে 'হাওয়া' অর্থ বিকল, উদাস বা হতাশ। অর্থাৎ বিচার দিবসের ভয়ংকর অবস্থা দেখে তারা নির্বোধের মতো চেয়ে থাকবে কেবল। যেমন নির্বোধদেরকে বলা হয় 'ক্বল্‌বুহু হাওয়া।' অর্থাৎ তার অন্তর বোধশূন্য। উল্লেখ্য যে, সেদিন যেহেতু তাদের অন্তর হবে বোধশূন্য, তেমনি তাদের মস্তিষ্কও হবে অচল। কাতাদা বলেছেন, তখন তাদের বক্ষদেশ থেকে তাদের অন্তর বের হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু পারবে না।

আটকে যাবে কণ্ঠদেশে । না পারবে বের হতে, না পারবে নিচে নামতে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, তখন তাদের অন্তঃকরণগুলো হবে বিহ্বল, চঞ্চল, হতাশ। তাই কোনোক্রমেই তারা স্বস্তি লাভ করতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকেও এ কারণেই বলে হাওয়া। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হচ্ছে— তখন তাদের হৃদয় হবে বিচলিত, বিচ্যুত, ভীত, স্তব্ধ, হতাশাগ্রস্ত ও ঊর্ধ্বমুখী।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন তাদের শাস্তি আসবে, সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক করো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মৃত্যুর দিন যখন শাস্তি শুরু হবে অথবা এর পরের পর্যায়ের কবর, পুনরুত্থান কিংবা মহাবিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিন মহাপ্রলয় দিবস সম্পর্কে, যখন সর্বগ্রাসী শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করে ফেলা হবে সকল কিছুকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন সীমালংঘনকারীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রসুলগণের অনুসরণ করবো।' একথার অর্থ— তখন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে ও সত্যের সীমানা লংঘন করে আপন আত্মার উপর অত্যাচার করেছে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদের উপর আপতিত এই পৃথিবীর শাস্তি পিছিয়ে দাও। অথবা আখেরাতের শাস্তি স্থগিত করো। পৃথিবীতে আর একবার আমাদেরকে সুযোগ দাও। অথবা আখেরাতের শাস্তি স্থগিত রেখে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা আর ভুল করবো না। তোমার ও তোমার রসুলের আহ্বানের প্রতি আমরা অবশ্যই সাড়া দিবো। যথারীতি ইমান আনবো ও পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকবো। অপর একটি আয়াতেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো উক্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'যদি তুমি আমাদেরকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও, তাহলে আমরা সত্যের স্বীকৃতি দিবো এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পরজীবন নেই!' একথার অর্থ— তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে তো অবকাশ দেয়া হয়েছিলোই । কিন্তু তোমরা তখন শপথ করে অবজ্ঞাভরে বলতে, পরকাল বলে কিছু নেই। তোমাদের ওই দম্ভোক্তি আজ কোথায়? এরকমও অর্থ হতে পারে যে, পৃথিবীতে তোমরা নির্মাণ করেছিলে বিরাট বিরাট অট্টালিকা। মৃত্যুর কথা তোমাদের মনেই ছিলো না। ভেবেছিলে, পৃথিবীবাসের পর আর কিছুই নেই। তোমাদের সেই অপবিশ্বাসের অস্তিত্ব আজ কোথায়?

এখানে 'যাওয়াল' অর্থ অন্তহীন পরকালের দিকে যাত্রা। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই অনন্ত যাত্রাকে অস্বীকার করতো। শপথ করে বলতো, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ— কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ় শপথ করে বলেছিলো, যারা মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে আর জীবিত করবেন না।

সুরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ
ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ○ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن
كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ○

❒ যদিও তোমরা বাস করিতে তাহাদিগের বাসভূমিতে যাহারা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদিগের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।

❒ উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহের নিকট উহাদিগের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিল না, যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।

❒ তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ড-বিধায়ক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যদিও তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' এ কথার অর্থ— হে পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যা-বর্তনকামী মানুষ! যে পৃথিবীতে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায় এবং আদ্ ও ছামুদ্ জাতির মতো সীমালংঘনকারীরা বসবাস করতো, তোমরা তো ছিলে সেই পৃথিবীরই অধিবাসী। অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের ওই শোচনীয় পরিণতির কথা জানতে পেরেও তোমরা সতর্ক হতে পারোনি কেনো? কেনো বুঝতে পারোনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কতো ভয়াবহ?

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম, তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিলো এবং তোমাদের নিকট আমি দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।' একথার অর্থ— আমি কি তখন আমার বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে

অবাধ্যদের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানাইনি? তোমাদেরকে কি বারবার সাবধান করে দেইনি? তবুও কেনো তোমরা জেনে-শুনে-বুঝে অবাধ্যদের অনুসরণ করেছিলে? এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমার প্রেরিত পুরুষগণের প্রচারের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা ছিলো তোমাদের কাছে সুবিদিত। তবুও তোমরা সতর্ক হওনি কেনো? অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমাদেরকে তখন সতর্ক করার জন্য কোরআনের মাধ্যমে আমি অবাধ্যদের বিভিন্ন শাস্তির কাহিনী দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছিলাম। তবুও তোমরা তখন সংশোধিত হওনি কেনো?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিলো' একথার অর্থ— মক্কার অংশীবাদীরা রসুল স. এর বিরুদ্ধে ভীষণ চক্রান্ত করেছিলো। তাঁকে করতে চেয়েছিলো দেশান্তরী, বন্দী, অথবা হত্যা। চক্রান্ত সফল করার জন্য তারা ব্যবহার করেছিলো তাদের সকল বুদ্ধি ও শক্তি। এভাবে অর্থ করলে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের আর কোনো যোগসূত্র থাকে না। কিন্তু আমি বলি, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে— পূর্ববর্তী আয়াতের 'সাকান্‌তুম' (তোমরা বাস করতে) কথাটির সঙ্গে। এভাবে 'মাকারূ' (তারা চক্রান্ত করেছিলো) কথাটির 'তারা' সর্বনামটি যুক্ত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। আর 'মাকরূহুম' (তাদের চক্রান্ত) কথাটির 'তাদের' সর্বনামটি যুক্ত হয়েছে আগের আয়াতের 'আল্‌লাজীনা জলামু' (যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো) কথাটির 'যারা' কথাটির সঙ্গে। এই 'যারা' অর্থ অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলো। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতীতের অবাধ্যরা যেমন চক্রান্তপ্রবণ ছিলো, তেমনি চক্রান্ত শুরু করেছে এখন মক্কার মুশরিকেরা।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত আছে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যথাসময়ে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তি দিবেন। এরকমও বলা যেতে পারে যে— তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণার শাস্তি দেয়ার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাকের নিকটে সংরক্ষিত রয়েছে এক গোপন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রগুলোকে করে দেয়া হবে নিষ্ক্রিয়, নিষ্ফল, অকেজো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের চক্রান্ত এমন ছিলো না, যাতে পর্বত টলে যায়।' এখানে 'ইন্' অব্যয়টি না সূচক। 'লিতাযুলা' (টলে যেতো) কথাটির 'লাম' অব্যয়টি দৃঢ়তা প্রকাশক। এভাবে না সূচকতাকে করা হয়েছে সুদৃঢ়। ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে— পর্বত টলিয়ে দেয়া ছিলো অসম্ভব। এখানে 'জ্বিবাল' অর্থ পর্বত । এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— রসুল স. এর রেসালত, শরিয়ত ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী অটল পর্বতসদৃশ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শত সহস্র চক্রান্ত, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সেই পাহাড়কে এক চুলও এদিক ওদিক সরাতে

পারবে না। অথবা এখানকার 'ইন্' অব্যয়টি 'ইন্না' (নিশ্চয়) অব্যয়ের সংক্ষিপ্তরূপ। একথা মেনে নিলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্পাকের বিধান ও মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর নবুয়ত সুনিশ্চিত, চির অচঞ্চল গিরিরাজের মতো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কুটকৌশলের মাধ্যমে সেই গিরিরাজের মূলোৎপাটন করতে চায়। কিন্তু তা যে অসম্ভব। মহাসত্য কি কখনো টলে?

হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ, চক্রান্তের মাধ্যমে তারা সত্যকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। ইবনে জুরাইজ এখানে 'লিতাযুলা' কথাটিকে পাঠ করতেন 'লিতাযুলু'। 'ইন্' অব্যয়টি হ্রস্ব এবং 'লামে তাগীদ' এখানে দু'টি শব্দের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির মর্মার্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চক্রান্ত এমনই জঘন্য যে, পর্বত পর্যন্ত টলটলায়মান হয়। অর্থাৎ অংশীবাদিতার মতো কদর্যতম পাপের কারণে পর্বতও কম্পমান হয়। এরকম বক্তব্য এসেছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'অবনমিত হয়েছে পর্বত শ্রেণী, কারণ, তারা বলছে আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততির কথা।'

হজরত আলীর উক্তি উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বিতর্কে পরাস্ত হয়ে সম্রাট নমরুদ বললো, ঠিক আছে আমি আকাশে গিয়ে দেখবো সেখানে কে আছে। সে সংগ্রহ করলো চারটি শকুন-শাবক। সেগুলোকে পেলে পুষে বড় করে তুললো। এরপর নির্মাণ করলো একটি চার পায়া বিশিষ্ট কাঠের বাক্স। তার চার পায়ায় বেঁধে দিলো শকুন চারটিকে। একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লো বাক্সটির মধ্যে। শকুনগুলোর উপরের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হলো গোশতের চারটি বড় বড় টুকরা। গোশতের লোভে শকুনগুলো উঠতে শুরু করলো উপরের দিকে। গোশতের নাগাল তারা পায় না। কিন্তু তাদের ওড়াও ক্ষান্ত হয় না। এভাবে একদিন একরাত ওড়ার পর নমরুদ তার সঙ্গীকে বললো, উপরের ঢাকনা খুলে দেখো, আমরা আকাশে পৌঁছে গেলাম কিনা। সঙ্গীটি ঢাকনা খুলে উপরের দিকে তাকিয়ে বললো, না। আকাশ যতদূরে ছিলো, এখনো ততদূরে। নমরুদ বললো, নিচের দিকে তাকাও। সঙ্গীটি নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, একটি বড় জলাশয়ের মতো পৃথিবী পরিদৃষ্ট হচ্ছে। নমরুদ বললো, ঠিক আছে আরো উপরে যাওয়া যাক। গোশতের লোভে শকুনগুলো বিরতিহীনভাবে উড়েই চললো। গত হলো আর একদিন। শকুনদের ওড়ার গতি হয়ে এলো শ্লথ। নমরুদ বললো, এবার উপরে নিচে তাকিয়ে দেখো, আমরা এখন কোথায়। সঙ্গীটি উপরে নিচে তাকিয়ে বললো, আকাশ যেমন ছিলো তেমনি আছে। আর পৃথিবীকে মনে হচ্ছে একটি কালো পিণ্ড। হঠাৎ আওয়াজ ভেসে এলো, হে দুরাচার! থামো। ইকরামা বলেছেন, সঙ্গীটির কাছে ছিলো তীর ধনুক। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো উপরের দিকে । একটু পরে ওই তীরটি ফিরে এলো তার কাছে। নমরুদ ও তার সঙ্গী দেখলো তীরটির অগ্রভাগ রক্তরঞ্জিত। নমরুদ বললো, আকাশের আল্লাহ্কে আমরা হত্যা করেছি। এবার ফিরে চলো

পৃথিবীতে। গোশতের টুকরোগুলো এবার নিচের দিকে ঝুলিয়ে দাও। তাই করা হলো। শকুনগুলো এবার নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। আমি বলি, বর্ণনাটি অসংগত ও অতিরঞ্জিত। প্রকৃত ঘটনা নিশ্চয় এরকম নয়।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রসুলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো জানেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আল্লাহ্ কোনো কিছু করতে বাধ্য নন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, তিনি প্রতিশ্রুতি ভংগকারীও নন। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি একথা কখনো মনে করবেন না যে, রসুলগণকে সাহায্যের যে অংগীকার তিনি করেছেন, তা ভঙ্গ করবেন। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আয়াতে এরকম সাহায্যের অংগীকার বিবৃত হয়েছে। যেমন— ১. 'আমি অবশ্যই আমার রসুলদেরকে সাহায্য করবো।' ২. 'আমি অবশ্যই সীমালংঘনকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। তদস্থলে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো তোমাদেরকে।'

এখানে 'রসুলুল্লহ্' (তাঁর রসুলগণের প্রতি) কথাটির পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়ায়্দিহী' (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি) কথাটি। এভাবে 'প্রতিশ্রুতি'কে করা হয়েছে অধিকতর গুরুত্ববহ এবং এতে করে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ কখনোই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না। অন্য এক আয়াতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন— 'ইন্নাল্লহা লা ইয়ুখ্লিফুল মীয়াদ' (নিশ্চয় আল্লাহ্ অংগীকার ভংগ করেন না)। এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ড বিধায়ক।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র মহাপরাক্রমের প্রতিপক্ষরূপে কোনো চক্রান্তকারীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তিনিই সকল অপরাধীর দণ্ড-বিধায়ক, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। চক্রান্তকারীদেরও।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৮

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

❐ যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশ-মণ্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহের সম্মুখে,— যিনি এক, পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও।' এখানকার 'তুবাদ্দালু' (পরিবর্তিত হবে) কথাটির আগের আয়াতের 'ইন্তিক্বাম' (প্রতিশোধ) এর কর্মপদ। অর্থাৎ যেদিন সুসম্পন্ন হবে প্রতিশোধ গ্রহণের কর্মটি। অথবা মনে করতে হবে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে অনুক্ত রয়েছে 'উজ্কুরু' (স্মরণ করো) সহকর্মপদটি।

পরিবর্তন দু'ধরনের। রূপগত পরিবর্তন ও গুণগত পরিবর্তন। একটি বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত অথবা নিশ্চিহ্ন করে তদস্থলে নতুন কোনো বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম রূপগত পরিবর্তন। যেমন কেউ বললো— আমি দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করলাম। এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে— 'ওয়াবাদ্দালনা জুলুদাহুম জুলুদান গররহা' (আমি তাদের চামড়ার স্থলে নতুন চামড়া দান করেছি)। আর রূপগত পরিবর্তন হচ্ছে মূল বস্তু ঠিক রেখে তার অবস্থা বা অবয়বের পরিবর্তন সাধন। যেমন বলা হয়— 'বাদাল্তুল হালাকাতা বিলখাতায়ি' (আমি বালাটিকে অংগুরীয়তে পরিবর্তন করলাম)।

আবদুর রাজ্জাক, আবদ্ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম তাঁদের স্ব স্ব তাফসীরে এবং বিশুদ্ধসূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, এই পৃথিবীর বদলে সৃষ্টি করা হবে একটি রৌপ্য-নির্মিত নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ ও রক্তপাতহীন পৃথিবী। বায়হাকী কর্তৃক মারফুসূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কথাটি স্বয়ং রসুল স. এর। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের নয়।

আমি বলি, এক্ষেত্রে হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিটিও মারফু পর্যায়ের। কারণ মহাপ্রলয় সম্পর্কিত কোনো কথা সাহাবায়েকেরাম নিজেরা চিন্তাভাবনা করে বলতেন না। কারণ প্রসঙ্গটি বিশ্বাস্য বিষয়ের অন্তর্ভূত। সুতরাং পৃথিবী-পূর্ববর্তী ও পৃথিবী-পরবর্তী ঘটনাসমূহ, ফেরেশতামণ্ডলী, জান্নাত-জাহান্নাম অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোনো বিষয় সম্পর্কে সাহাবায়েকেরাম যদি কোনো কিছু বলেন, তবে বুঝতে হবে, তাঁরা বিষয়গুলো রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেই বলেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি। কিন্তু অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনার্থে অথবা অন্য কোনো কারণে তাঁরা রসুল স. এর সঙ্গে সরাসরি হাদিসগুলোর সম্পর্ক ঘটাননি। অতএব বুঝতে হবে হজরত ইবনে মাসউদের উপরে বর্ণিত বক্তব্যটি আসলে রসুল স. এর।

অপর এক সূত্রে ইবনে জারীর ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই নতুন পৃথিবী হবে অভ্রসদৃশ। হজরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত আনাস থেকে কেবল ইবনে জারীর মূলতবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বিচার দিবসের পৃথিবী হবে রৌপ্য-নির্মিত। আর ওই পৃথিবী হবে অপরাধবিমুক্ত। হজরত জায়েদ থেকে আবু হামজার পদ্ধতিতে ইবনে জারীর বলেছেন, তখন এই পৃথিবীর স্থলে দেয়া হবে একটি চাঁদির মতো শুভ্র পৃথিবী। ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া তাঁর সিফাতুল জান্নাত গ্রন্থে লিখেছেন, তখনকার পৃথিবী হবে রূপার এবং আকাশ হবে সোনার।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, তখন পৃথিবী ও আকাশ দু'টোই হবে রূপার। আবদ্ বিন হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। সৃষ্টি করা হবে নুতন একটি পৃথিবী। এ পৃথিবীর সকল মানুষকে স্থানান্তরিত করা হবে ওই পৃথিবীতে। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে ধূসর বর্ণের এক নতুন পৃথিবীতে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। পিষ্ট আটার মতো বর্ণবিশিষ্ট ওই পৃথিবী হবে সমতল। সেখানে বাড়ী-ঘরের কোনো চিহ্ন থাকবে না। আবু সালেহ থেকে সগীর সূত্রে কালাবীর মাধ্যমে বায়হাকী ও সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ এর মধ্যে ঘটানো হবে সংযোজন ও বিয়োজন। মুছে ফেলা হবে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, উপত্যকা ও তরুলতাসমূহ। ওকাজ মেলার চামড়ার মতো টেনে প্রশস্ত করা হবে ওই পৃথিবীকে। তারপর ওই পৃথিবী হবে শুভ্র অভ্রের মতো উজ্জ্বল, যার উপরে কোনো রক্তপাত অথবা অপরাধ সংঘটিত হয়নি। আর তখন বিলীন করে দেয়া হবে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ।

হাকেম লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, বিচার দিবসের পৃথিবীকে চামড়ার মতো টেনে প্রশস্ত করা হবে। আর সেখানে একত্র করা হবে প্রাণীকুলকে। উত্তমসূত্রে হজরত জাবের থেকে হাকেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচারের দিন চামড়া টানার মতো করে পৃথিবীকে টেনে প্রশস্ত করা হবে। প্রতিটি মানুষ সেখানে পা রাখার জায়গা ব্যতীত অতিরিক্ত জায়গা পাবে না। প্রথমে ডাকা হবে আমাকে। আমি দণ্ডায়মান হয়ে বলবো, হে আমার প্রভুপালক! এই হচ্ছে জিব্রাইল। তখন জিব্রাইলের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাত হবে আল্লাহ্র। আমি বলবো, এই জিব্রাইলকে আপনি আমার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। জিব্রাইল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, সে ঠিকই বলেছে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে দান করবেন শাফায়াতের দায়িত্ব। ওই অমূল্য দায়িত্ব পেয়ে আমি বলবো, হে আমার পালনকর্তা! এটাই কি তবে সেই প্রশংসিত স্থান! সেই প্রশংসিত স্থানের চতুষ্পার্শ্বে তখন দাঁড়িয়ে থাকবে অসংখ্য সেবক।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবস হবে একটি রুটি সদৃশ। স্বর্গবাসীদের আতিথেয়তার জন্য আল্লাহ্ তা স্বহস্তে প্রস্তুত করবেন, যেমন তোমরা রুটি প্রস্তুত করে থাকো ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্বে। হাদিসের 'নুযুলাল্ লি আহলিল্ জান্নাত' কথাটির অর্থ, স্বর্গবাসীদের আতিথেয়তার জন্য। আতিথেয়তা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'নুযুলান্' শব্দটি। দরওয়ারদি বলেছেন, 'নুযুল' বলে ওই আহার্য বস্তুকে, যা অতিথি-আপ্যায়নের পূর্বে সৌজন্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়। অর্থাৎ স্বর্গধামে প্রবেশের পূর্বে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে বা অতিথিশালায় অবস্থানের সময় পরিবেশন করা হবে পার্থিব রুটি । এভাবে একসময় তারা পৌঁছে যাবে স্বর্গে।

ইবনে মারজান তাঁর আল ইরশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তখন ভূমিকে রূপান্তরিত করা হবে একটি রুটিতে। মুমিনগণ তাদের পায়ের নিম্নদেশ থেকে ওই রুটির টুকরা উঠিয়ে আহার করবেন। আর পান করবেন আবে কাউছার অথবা তাসনীমের স্বচ্ছ সলিল। ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, সুতরাং আশা করা যায় যে, হাশর প্রান্তরে বিশ্বাসীগণকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। কারণ তখন মৃত্তিকাকে দেয়া হবে আহার্যের রূপ। আর ওই আহার্য ভক্ষণ করবেন বিশ্বাসীগণ। এই অভিমতের পোষকতা রয়েছে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের হাদিসে। হাদিসটি এই— পায়ের নিচের মাটি হবে শাদা রুটির মতো। বিশ্বাসীরা তা ওঠাবে ও ভক্ষণ করবে। মোহাম্মদ বিন কা'বও এরকম বলেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, তখন মাটি হবে শাদা রুটির মতো। বিশ্বাসীরা হিসাবপর্ব সমাপনের পূর্ব পর্যন্ত তা ভক্ষণ করতে পারবে। অপর এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু জাফরের উক্তিও এরকম।

খতিব বাগদাদীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষ হবে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও বিবস্ত্র। তাদের ওই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিবস্ত্র অবস্থা হবে অভূতপূর্ব। তারা তখন হয়ে পড়বে ক্লান্ত ও অবসন্ন, যা ইতোপূর্বে তারা কখনো হয়নি। যারা পৃথিবীতে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেছিলো, আল্লাহ্ সেদিন তাদেরকে দান করবেন আহার্য। যারা তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছিলো, আল্লাহ্ তখন পানি পান করাবেন তাদেরকে। যারা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়েছিলো, আল্লাহ্ তাদেরকে দান করবেন বস্ত্র। কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য সেদিন আল্লাহ্ই হবেন যথেষ্ট।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, সেদিন আকাশসমূহ হয়ে যাবে স্বর্গোদ্যান আর মহাসাগরগুলো হয়ে যাবে নরকানল। ভূপৃষ্ঠও হবে রূপান্তরিত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বিচার দিবসে সমগ্র ভূখণ্ড পরিণত হবে অগ্নিতে। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, মহাসাগরগুলো তখন হয়ে যাবে অথৈই আগুনের লেলিহান শিখা। হজরত ছাওবান থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ইহুদী পণ্ডিত রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক পৃথিবী হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি স. বললেন, পুলসিরাতের পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে? তিনি স. বললেন, পুলসিরাতের সন্নিকটে। বায়হাকী বলেছেন, পুলসিরাতের কথা বলা হয়েছে এখানে রূপকভাবে। কারণ সকল মানুষকে তখন পুলসিরাত অতিক্রম করার আদেশ দেয়া হবে। লক্ষণীয় যে, জননী আয়েশা ও হজরত ছাওবানের হাদিসদ্বয়ের প্রেক্ষিত এক। আরো একটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট যে, পরিবর্তিত পৃথিবীতে মানুষের স্থানান্তরের ঘটনাটি ঘটবে মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালে।

'ওয়া হুমিলাতিল্ আরদ্বু ওয়াল জিবালু ফাদুক্কাতা দাক্কাতাঁও ওয়াহিদাহ্' এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন অবিশ্বাসীরা দেখবে পর্বতগুলো হয়ে গিয়েছে মাটির মতো সমতল। কিন্তু বিশ্বাসীরা এরকম দেখতে পাবে না। বায়হাকী। 'উজুহুইঁ ইয়াওমাইজিন্ আলাইহা গবারাহ্ তারহাক্বুহা ক্বতারাহ্' আয়াতের বক্তব্যও অনুরূপ। অর্থাৎ সেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের মুখমণ্ডল হবে ধূলিধূসরিত, মলিন ও কৃষ্ণাভ।

পূর্ববর্তী জামানার আলেমগণের মধ্যে পরিবর্তিত পৃথিবীর ধরন সম্পর্কে মতপৃথকতা বিদ্যমান। ওই পরিবর্তন রূপগত হবে, না গুণগত— এই পৃথিবী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে নতুন কোনো পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে, না কেবল পরিবর্তন করা হবে অবস্থা, রঙ ও পরিবেশ, সে সম্পর্কে রয়েছে তাঁদের ঘোরতর মতানৈক্য। ইবনে আবী হামজা বলেছেন, বিচার দিবসের অবস্থানস্থল হবে সম্পূর্ণ নুতন। এই পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরতরে। ইবনে হাজার লিখেছেন, রূপান্তরিত ও প্রসারিত পৃথিবী সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। কারণ মহাপ্রলয়ের আওতায় রয়েছে এই পৃথিবী। বিচার দিবসের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ পৃথক। মহাপ্রলয় শুরু হলে এখানকার সকল লোককে স্থানান্তর করা হবে ওই পৃথক পৃথিবীতে। ইবনে হাজার আরো লিখেছেন, ওই হাদিসগুলোর মধ্যেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে রুটি, মৃত্তিকা ও অগ্নির কথা। কারণ ভূপৃষ্ঠের কিছু অংশ রুটি, কিছু অংশ মৃত্তিকা এবং জলমগ্ন অংশ অর্থাৎ মহাসাগরসমূহ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। হজরত উবাই বিন কা'বের বক্তব্যেও একথার প্রমাণ রয়েছে।

আমি বলি, সেদিন বিশ্বাসীদের পদতলে থাকবে রুটি এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পদতলে থাকবে মৃত্তিকা ও অগ্নি। কুরতুবী লিখেছেন, আক্সাহ্ প্রণেতা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হাদিসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন এভাবে— পৃথিবী ও আকাশ পরিবর্তিত হবে দু'বার। শিংগায় ফুৎকার প্রদানের পূর্বেই খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি। আর চন্দ্রসূর্য হবে আলোকহীন। আকাশ হবে তাম্র বর্ণ। দেখা দিবে ভূমিধস। তুলার মতো উড়তে থাকবে পাহাড় পর্বতগুলো। সকল জলধি পরিণত হবে অগ্নিকুণ্ডে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবী হয়ে পড়বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এমন সময় ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। অবস্থা হয়ে পড়বে আরো অধিক ভয়াবহ। আকাশসমূহ দুমড়ে মুচড়ে করা হবে স্তুপীকৃত। প্রকাশিত হবে নতুন আকাশ। থেত্লে যাওয়া পৃথিবীকে টেনে প্রসারিত করা হবে আগের মতো। তখন ওই সুবিস্তৃত পৃথিবীতে কেবল পরিদৃষ্ট হবে মরদেহ ও সমাধি।

এরপর ধ্বনিত হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। শুরু হবে দ্বিতীয় পর্বের পরিবর্তন। নতুন পৃথিবীতে সমবেত করা হবে সকল মানুষকে। আকাশও হবে সম্পূর্ণ নতুন। ওই নতুন পৃথিবী হবে রৌপ্য-নির্মিত, শুভ্র অভ্র সদৃশ— সেখানে কখনো ঘটেনি শোণিতপাত। সংঘটিত হয়নি কোনো অপরাধও। পুলসিরাত নামক

সেতুর প্রান্তদেশে উপনীত হবে সকলে। ওই সেতু স্থাপিত থাকবে জাহান্নামের উপর। জাহান্নামের অবস্থা হবে তখন বরফের চেয়েও বেশী হিমশীতল। হজরত আবদুল্লাহ্র বর্ণনায় এসেছে ভূপৃষ্ঠ তখন থাকবে উত্তপ্ত অবস্থায়। ফলে সকলে হয়ে পড়বে পিপাসিত। বিশ্বাসীরা তাদের আপনাপন নবীর হাউজে কাওসার থেকে পানি সংগ্রহ করে পান করবে এবং পরিতৃপ্ত হবে। লাভ করবে অপার করুণাপরবশ আল্লাহ্র আতিথ্য। তাদের পদতলের মাটিকে করে দেয়া হবে রুটির স্তূপ। ব্যঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকবে । ব্যঞ্জন হবে ভাজা মাছ অথবা কোনো প্রাণীর ভুনা করা কলিজা। জান্নাত যাত্রীরা ওই উপাদেয় রুটি ও ব্যঞ্জন আহার করবে শান্তির সঙ্গে।

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে ইবনে আদীর শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তখন পৃথিবীর মসজিদগুলো ছাড়া অন্য সকল কিছুই হারিয়ে যাবে চিরতরে। একত্র করা হবে কেবল মসজিদগুলোকে।

আমি বলি, বর্ণনাটি যদি প্রামাণ্য হয়, তবে তার মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— মসজিদসমূহের জমিনগুলোকে মিশিয়ে দেয়া হবে জান্নাতের সঙ্গে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমার প্রকোষ্ঠ ও মসজিদের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের একটি উদ্যান। হাদিসটি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসায়ী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।' একথার অর্থ— আপনাপন কবর থেকে উত্থিত হয়ে পুরস্কার অথবা তিরস্কার লাভের নিমিত্তে বিচারের ময়দানে মহাপরাক্রমশালী ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সম্মুখে তখন উপস্থিত হবে সকল মানুষ। এখানে 'ওয়াহিদ' অর্থ এক বা অদ্বিতীয়। আর 'কাহ্হার' অর্থ মহাপরাক্রমশালী। এখানে আল্লাহ্র এ দু'টো নামের উল্লেখ থাকায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, সেদিনের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুরা ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪৯, ৫০

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

❒ সেই দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায়,

❒ উহাদিগের জামা হইবে আল্কাত্রার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদিগের মুখমণ্ডল;

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! সেদিন আপনি দেখবেন সকল অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের হাত ও পা শৃংখলাবদ্ধ করা হয়েছে। সাঈদ ইবনে মানসুরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, সেদিন পুণ্যবানদেরকে পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হবে জান্নাতে। আর জাহান্নামে মিলিয়ে দেয়া হবে অপরাধীদের সঙ্গে অপরাধীদেরকে। অথবা তাদেরকে মিলিয়ে দেয়া হবে শয়তানের সঙ্গে । 'শৃংখলিত' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, তখন তাদের পৃথিবীতে সম্পাদিত অসৎ বিশ্বাস ও কর্মসমূহের সঙ্গে তাদেরকে করে দেয়া হবে চিরশৃংখলিত। এভাবে তারা হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী অথবা তাদের হাত ও পা একত্র করে তাদের কাঁধের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে শিকল দিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। এখানে উল্লেখিত 'আসফাদ্' শব্দটি 'সফ্দ' এর বহুবচন। এর অর্থ শিকলসমূহের বেড়ি।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তাদের জামা হবে আল্‌কাত্‌রার।' একথার অর্থ— দাহ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত আল্‌কাত্‌রার মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের তরল ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ধরনের বস্তু দ্বারা গঠিত হবে জাহান্নামীদের পোশাক। ঘা পাঁচড়ায় আক্রান্ত উটের গায়ে যে তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ মলম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, জাহান্নামীদের গায়ে লেগে থাকবে সেরকমই ঘোর কালো ও তেজস্ক্রিয় পরিচ্ছদ। ক্বারী ইয়াকুব ও ইকরামা 'মিন্‌ক্বাত্বিরান্' কথাটিকে পড়তেন 'মিন্ ক্বিত্বরিন আসিন।' 'আসিন' অর্থ ফুটন্ত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— ফুটন্ত বা গলিত তামা বা পিতল। অর্থাৎ জাহান্নামীদের গাত্রাবরণ হবে গলিত তামা বা পিতলের।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।' মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে মুখমণ্ডলই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, যেমন, অপ্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কলব্ বা হৃদয়।

এখানে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের মুখাবয়ব হবে অনলাচ্ছাদিত। তেমনি অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়াতাত্ত্বালিউ' আ'লাল আফ্‌য়িদাহ্ (আর তা প্রকট হবে তাদের অন্তঃকরণে)। তাই এরকম বলা যায় যে, যারা পৃথিবীতে তাদের জ্ঞান ও চিন্তার অশ্বে আরোহণ করে সত্যের শহরে উপনীত হয়নি, তাদের মুখমণ্ডল অনলাবৃত করে দেয়াই সমীচীন। অজ্ঞতার আগুনে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ। আখেরাতে ধর্মবোধ-শূন্যতার ওই আগুনই আচ্ছাদন করবে তাদের মুখমণ্ডলকে।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

❐ ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❐ ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এটা এজন্যে যে আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।' এখানে কুল্‌লা নাফসিন্ (প্রত্যেকের কৃতকর্মের) বলে প্রত্যেক পাপীর কৃতকর্মের কথা বলা হয়েছে। আবার কথাটির মাধ্যমে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কারণ পাপীদের প্রতিফল যখন দেয়া হবে, তখন পুণ্যবানদেরও প্রতিফল দেয়া হবে নিশ্চয়। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে 'লিইয়াজ্‌জিয়া' (প্রতিফল দিবেন) কথাটি সম্পৃক্ত হবে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'মুক্বার্‌রানীন' (হস্ত-পদ শৃংখলিত অবস্থায়) অথবা 'তাগ্‌শা' (অগ্নি আচ্ছাদন করে) কথাটির সঙ্গে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে কথাটি সম্পর্কিত হবে পরের আয়াতে উল্লেখিত 'বালাগুন' (এক বার্তা) কথাটির সঙ্গে। কারণ ওই বার্তার লক্ষ্যস্থল সকল মানুষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।' আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, এ কথার অর্থ— সেদিন একজনের হিসাব গ্রহণের কারণে অন্যজনের হিসাব গ্রহণ বিলম্বিত হবে না। অনেক লোকের হিসাব নেয়া হবে এক মুহূর্তে। তিনি আরো লিখেছেন, পৃথিবীর অর্ধদিবস কাল সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্‌পাক সকলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করবেন। এক বর্ণনানুসারে ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, সাহাবায়েকেরাম বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর অর্ধদিবস সময়ের মধ্যেই সকলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে। তাঁরা এরকমও বলতেন যে, এরপর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়ে কাইলুলা (দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম) করবে। একই সময়ে জাহান্নামীরা উপনীত হবে জাহান্নামে। আবু নাঈম ইবনে মুবারক।

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুবারকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই দিন দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই বেহেশত-বাসী বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে গিয়ে উপস্থিত হবে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিচারের কাজ চলবে দুপুর পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহভাজনেরা মিলিত হবে বেহেশতের আয়তআখিঁনী হুরগণের সঙ্গে। আর আল্লাহ্র দুশমনেরা মিলিত হবে শয়তানের সঙ্গে। আমি বলি, হজরত সাহাবায়েকেরামের বর্ণিত বাণীসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সেদিনের অর্ধদিবস আখেরাতেরই অর্ধদিবস, দুনিয়ার নয়।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয়।' একথার অর্থ— এই কোরআন অথবা এই সুরা কিংবা ইতোপূর্বে আলোচিত দোজখীদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মানুষের জন্য সতর্ক-বার্তা, যাতে তারা যথাসময়ে সতর্ক হয় এবং পদবিক্ষেপ করে সত্যের পথে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনের মাধ্যমে যেনো সকলে জানতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র উপাস্য। আর যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, তারা যেনো এই কোরআনের মর্মস্পর্শী উপদেশসমূহ অনুধাবন করে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এতক্ষণ ধরে আলোচিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সকল আকাশজ গ্রন্থ অবতরণের মূল উদ্দেশ্যসমূহ এক। আর সেগুলো হচ্ছে— ১. নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানব জাতিকে সতর্কীকরণ, যা আল্লাহ্পাকের নিকট সংরক্ষিত থাকবে দলিল হিসেবে। ২. মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পূর্ণত্বদান। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালার পরিচিতি লাভই হচ্ছে চিন্তা-চেতনার পূর্ণত্ব। ৩. সত্তা ও সত্তাসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ সমূহের পরিশুদ্ধি, যা অর্জিত হতে পারে কোরআনে বর্ণিত উপদেশামৃতের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, যাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে ও ভয়ে পরিপূর্ণ, কথিত পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারেন কেবল তাঁরাই।

সুরা হিজর

সুরা হিজর অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৮৭ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। সুরা ইউসুফের পরে অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৬ রুকু ও ৯৯ আয়াত।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১

❒ আলিফ-লাম-রা, এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।

প্রথমে উল্লেখিত আলিফ লাম র হচ্ছে হরুফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। এগুলোর মর্ম রহস্যাচ্ছন্ন। আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক রসুল-প্রেমিক এগুলোর রহস্য সম্পর্কে অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কোরআনের।' এখানে 'তিলকা' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য সুরার প্রতি অথবা সুরার আয়াতসমূহের প্রতি। আর 'আলকিতাব' দ্বারা বুঝানো হয়েছে এই সুরাকে অথবা সম্পূর্ণ কোরআনকে। মহামর্যাদার প্রতীক হিসেবে এখানে 'কোরআন' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তানভিন। এভাবে এখানে 'কোরআন' কথাটি হয়েছে 'কোরআনিন'। আর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এই কোরআন সুস্পষ্ট, বৈধ-অবৈধ ও সুপথ-বিপথের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণায়ক।

চতুর্দশ পারা

সুরা হিজর ঃ আয়াত ২

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

❒ কখনও কখনও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা চাহিবে যে, তাহারা মুসলিম হইলে ভাল হইত।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ— মহাবিচারের দিবসে মুসলমানদের মহাসফলতা দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে কখনো কখনো একথার উদয় হবে যে, হায়! পৃথিবীতে আমরাও যদি তাদের মতো ইমানদার হতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো।

'রুব্‌বা' শব্দটি স্বল্পতাপ্রকাশক, কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন প্রায় সবসময়, অর্থাৎ যতক্ষণ হাশরের প্রান্তরে উপস্থিত থাকবে ততক্ষণ এই কামনাই করবে যে, পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করলে কতোই না উত্তম হতো। কিন্তু স্বল্পতা ও আধিক্য বিপরিতধর্মী। এরকমও বলা যায় যে— ওই সময় প্রায় সারাক্ষণ তারা এই চিন্তাই করতে থাকবে যে, পৃথিবীতে এক মুহূর্তের জন্যও যদি তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো তবে কতো ভালোই না হতো। অথবা এখানে 'আধিক্য' কথাটির এরকম মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এখানকার মতো ইসলামের প্রতি এরকম প্রবল আগ্রহ যদি পৃথিবীতে থাকতে তাদের অন্তরে উদয় হতো, তবে তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীই বা থাকতো কেমন করে? এসকল ব্যাখ্যা লক্ষ্য করলে মনে হয় 'রুব্‌বা' শব্দটির অর্থ এখানে 'স্বল্পতা' গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। বঙ্গানুবাদে তাই বলা হয়েছে কখনো কখনো। তাছাড়া কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা এখানকার 'রুবামা' কথাটি 'স্বল্পতা' অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কারণ বিচারদিবসের ভয়াবহতা দর্শনে তারা তখন থাকবে অত্যধিক আতংকগ্রস্ত। তাই জ্ঞানের ক্রিয়া হবে রুদ্ধপ্রায়। ওই অবস্থায় হঠাৎ কখনো জ্ঞান কার্যকর হলে তাদের মনে হতে থাকবে যে, পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করলে কতো ভালোই না হতো।

'রুবামা' শব্দটির 'মা' অক্ষরটি পূর্ণতা প্রকাশক। একারণেই অক্ষরটি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে। নতুবা যের প্রদানকারী অব্যয় সংযুক্ত হতে পারে কেবল নামপদের সঙ্গে। লক্ষণীয় যে, অতীতকালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গেই কেবল এরকম বর্ণের সংযোগ ঘটে। অথচ এখানে অক্ষরটির সংযোগ ঘটেছে বর্তমান ও ভবিষ্যত কালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গে। এর কারণ হচ্ছে, পুনরুত্থান দিবসে বিচার কার্য সংঘটিত হবেই। বিষয়টি অতীতকালে সংঘটিত ঘটনার মতো স্থিরনিশ্চিত। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচারকার্য এসকল কিছু ঘটবেই ঘটবে।

ইবনে জারীর, ইবনে মুবারক ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত আনাস বলেছেন, যখন জাহান্নামে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপী বিশ্বাসীগণকে একত্র করা হবে, তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে, তোমরা না বিশ্বাসী। কিন্তু এখন যে দেখছি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তাদের একথা শুনে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে বের করে আনবেন জাহান্নাম থেকে। হান্নাদ, সাঈদ ইবনে মানসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন আল্লাহ্ পাপী বিশ্বাসীদের জন্য রসুল স. এর শাফায়াত মঞ্জুর করবেন। এভাবে তাদের অনেককে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। শাফায়াতপর্ব শেষ হলে বর্ষণ করবেন বিশেষ করুণা। এভাবে নিষ্কৃতি দিবেন অনেক পাপীকে। পরিশেষে এমনও বলবেন, সকল গোনাহ্গার ইমানদারেরা বের হও। প্রবেশ করো জান্নাতে। এসকল দৃশ্য দেখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আক্ষেপ করতে থাকবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হতাম, কতোই উত্তম হতো— আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে, রসুল স. একবার বললেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তাদের জাহান্নামবাসের সময়সীমা হবে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায় নির্ভর। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে তখন তিরস্কার করে বলবে, ইমান এনেও তোমাদের তো কোনো কল্যাণ হলো না। এরপর আল্লাহ্ সকল ইমানদারকে সেখান থেকে বের করে আনবেন, একজন বিশ্বাসীও আর দোজখে থাকবে না। একথা বলে রসুল স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াত।

তিবরানী, ইবনে আসেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারে চিরস্থায়ী নরকবাসীদের সঙ্গে নরকে প্রবেশ করবে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসী। অবিশ্বাসীরা তাদেরকে দেখে বলবে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? তারা বলবে ছিলামই তো। অবিশ্বাসীরা বলবে, তবে ইসলাম তো তোমাদের কোনো উপকারে এলো

না। তোমরাও এখন আমাদের সঙ্গী। বিশ্বাসীরা বলবে, আমরা কিছু পাপ করেছিলাম তাই আমাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছে এখানে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের এরকম কথা-বার্তা চলাকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হবে, সকল বিশ্বাসীকে নরক থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ কার্যকর করা হবে। তখন চিরস্থায়ী নরকবাসীরা বলবে, আমরা বিশ্বাসী হলে কতোই না ভালো হতো। আমাদেরকেও এভাবে দেয়া হতো পরিত্রাণ। এরপর রসুল স. আলোচ্য আয়াতটি আবৃত্তি করলেন। বাগবীর বর্ণনায় এই হাদিসের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অতিরিক্ত এই কথাটুকু— আল্লাহ্ সকল বিশ্বাসীকে নরক থেকে বের করে আনবেন। ওই সময় 'মুসলমান হলে কতো ভালো হতো'— একথা বলে আক্ষেপ করতে থাকবে কাফেরেরা।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত আবু সাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রসুলের প্রিয় সহচর! আপনি কি রসুল স.কে এই আয়াত সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় কিছু সংখ্যক মুসলমানকেও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলবে, তোমরা তো পৃথিবীতে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতে। তবে তোমরা এখন আমাদের মতো দোজখবাসী হলে কেনো? তাদের একথা শুনে আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীগণ ও ফেরেশতামণ্ডলী তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ্‌র বাসনানুসারে ওই সকল পাপী মুসলমানকে দোজখ থেকে বের করে আনা হবে। এই দৃশ্য দেখে অবিশ্বাসীরা আপন মনে বলে উঠবে, আহ্! আমরা যদি মুসলমান হতাম, তবে কতোই না উত্তম হতো, এরকম সুপারিশ আমাদের ভাগ্যেও ঘটতো।

দোজখ থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত মুসলমানদের মুখমণ্ডল হবে কালাভ। তাদের ওই কালো মুখ দেখে বেহেশতবাসীরা তাদেরকে বলবে দোজখী। তারা তখন নিবেদন করবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোজখী নাম মুছে দিন। আদেশ দেয়া হবে, বেহেশতের নদীতে গোসল করো। তারা গোসল করবে। মুছে যাবে তাদের মুখাবয়বের কালো আভা। মিটে যাবে তাদের দোজখী নাম।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কাফেরেরা মুসলমান হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করবে তখন, যখন পাপী মুসলমানদেরকে দোজখ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে বেহেশতের দিকে। হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, যারা পৃথিবীতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা দোজখে প্রবেশ করলেও একসময় নিষ্কৃতি পাবে।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ○ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ○ وَقَالُوْا يَآأَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ○ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

❒ উহারা যাহা করে করুক— খাইতে থাকুক, ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক— পরিণামে উহারা বুঝিবে।

❒ আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি না।

❒ কোন জাতি তাহার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

❒ উহারা বলে, 'ওহে যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে! তুমি তো নিশ্চয় উম্মাদ।

❒ তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগের নিকট ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?'

❒ আমি ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করি হুকুম জারি করিবার জন্যই; ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি পৃথিবীপূজক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ইমান আনয়নের আশা পরিত্যাগ করুন। আল্লাহ্ সকলের আদি-অন্তের সকল কিছুই জানেন। তাই তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন যে, অদৃষ্টলিপি অনুসারে তারা চির অবিশ্বাসী। সুতরাং তাদের দিকে আর আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তাদের কর্মকাণ্ড, আহার-বিহার, ভোগ-সম্ভোগ ও কামনা-বাসনার প্রতি দৃকপাত মাত্র করবেন না। মোহগ্রস্ত অবস্থাতেই তাদেরকে দিনাতিপাত করতে দিন। একসময় তারা তাদের ভয়াবহ পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে।

পরের আয়াতের (৪) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আরো শুনুন, কোনো জনপদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমি ধ্বংস করি না। আমার এই নির্ধারণ লিপিবদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজে)।

এর পরের আয়াতের (৫) মর্মার্থ হচ্ছে— শাস্তির নির্ধারিত সময়কে কেউ এগিয়ে আনতে পারে না। আবার পিছিয়েও দিতে পারে না।

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৬,৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা কি বলে, তা আমি জানি। হিংসাবশতঃ তারা উপহাসার্থে বলে, হে মোহাম্মাদ! তুমি বলো, তোমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। উন্মাদ ছাড়া এরকম কথা কি কেউ বলে? নিশ্চয় তুমি উন্মাদ। তোমার কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে তোমার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতাদের আনছো না কেনো? অথবা এই যে আমরা ক্রমাগত তোমাকে অস্বীকার করে চলেছি, তার জন্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে এনে আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারছো না কেনো? যেমন তারা শাস্তি দিয়েছিলো বিগত যুগের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে। উল্লেখ্য যে, অপর এক আয়াতেও কাফেরদের এরকম কথার উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'তার স্বপক্ষে ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয় না কেনো? তারা তো তার সঙ্গে হতে পারে ভীতি প্রদর্শনকারী।'

এর পরের আয়াতের (৮) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য, যে শাস্তি সুনির্ধারিত। আর যখন আমার আদেশে ফেরেশতারা শাস্তি কার্যকর করতে শুরু করে, তখন তাদের পরিত্রাণের সকল পথ হয়ে যায় রুদ্ধ।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْأَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

❒ আমিই কুর্‌আন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষণ করিব।

❒ তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল পাঠাইয়াছিলাম।

❒ তাহাদিগের নিকট আসে নাই এমন কোন রসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত না।

❒ এইভাবে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে বিদ্রূপ-প্রবণতা সঞ্চার করি,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমিই অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। আর আমিই এর সংরক্ষক। কোরআন অস্বীকারকারীদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই আয়াতে। এখানে 'সংরক্ষক' কথাটির অর্থ— এই কোরআন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সকল প্রকার বিকৃতি থেকে

চিরমুক্ত। কারণ আমি স্বয়ং এর সংরক্ষক। উল্লেখ্য যে, এ কারণেই শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কোরআনের বাণী-বৈভব রয়েছে অবিকৃত। অথচ হতভাগা রাফেজীরা বলে, এই কোরআন ছিলো চল্লিশ পারা। তিরিশ পারা রেখে বাকী দশ পারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন হজরত ওসমান। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের এই আয়াতের উপরে তাদের বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে কোরআনের সংরক্ষক বলে তারা মানে না। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'লাহু' (এর বা তার) কথাটির 'হু' সর্বনাম রসুল স. এর সঙ্গে সম্বন্ধিত। অর্থাৎ এখানে রসুল স. এর সংরক্ষণ বা হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতেও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— ওয়াল্লহু ইয়া'সিমুকা মিনান্‌নাসি (আর আল্লাহ্ আপনাকে হিফাজত করেন মানুষের অকল্যাণ থেকে)।

পরের আয়াতের (১০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসুল পাঠিয়েছিলাম। এখানে উল্লেখিত 'শীয়ায়্' শব্দটি 'শীয়াতুন' শব্দের বহুবচন। এক মতাদর্শে বিশ্বাসী দলকে বলে শীয়াহ্। 'শাআহু' অর্থ, সে তার অনুসরণ করেছে। হালকা জ্বালানীর সহায়তায় ভারী কোনো দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করার নাম 'শীয়ায়্।'

এর পরের আয়াতের (১১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! অবিশ্বাসীদের অপমন্তব্য শুনে আপনি ব্যথিত হবেন না । সকল যুগের অবিশ্বাসীদের আচরণ এরকমই। আপনার পূর্বে আমি যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকেও তারা এভাবেই বিদ্রূপবানে জর্জরিত করেছিলো। এভাবে এই আয়াতে রসুল স.কে শোনানো হয়েছে সান্ত্বনার বাণী।

এর পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করি।' একথার অর্থ— বিদ্রূপপ্রবণতা হচ্ছে সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব। আর তাদের অন্তরে ওই বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করি আমিই। উল্লেখ্য যে, এই আয়াত কদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে। তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। অথচ এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে বিদ্রূপপ্রবণতা সঞ্চার করেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

'মুজ্‌রিমীন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে। এখানকার 'নাস্‌লুকু' শব্দটি এসেছে 'সিল্‌ক' থেকে। এর অর্থ সঞ্চার করা, সঞ্চালন করা বা এক বস্তুর মধ্যে অপর কোনো বস্তু অনুপ্রবেশ করানো। যেমন, সূচের মধ্যে সুতা, আহত স্থানে প্রবিষ্ট বল্লমের অগ্রভাগ ইত্যাদি। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— এমনি করে আমি মক্কার মুশরিকদের অন্তরে পরিহাসপ্রবণতা সঞ্চারিত করেছি।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ○ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ○

❒ ইহারা কুরআনে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এই আচরণ ছিল।

❒ যদি উহাদিগের জন্য আকাশের এক দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা দিনের বেলা উহাতে আরোহণ করে,

❒ তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদিগের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হইয়াছে; নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! আপনি তাদেরকে যতই বোঝান না কেনো তারা বুঝবে না। কিছুতেই তারা স্বীকার করবে না কোরআনকে। এটাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরন্তন আচরণ। আল্লাহ্ও তাই তাদের সঙ্গে এরকম আচরণই করেন। যেহেতু তারা অবিশ্বাসে অনড়, সেহেতু আল্লাহ্ তাদের অবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করে দেন।

পরের আয়াতদ্বয়ের (১৪, ১৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আমি যদি তাদেরকে আকাশের একটি দরজা উন্মুক্ত করে দেই এবং তারা প্রকাশ্য দিবালোকে সেখানে আরোহণ করে তবুও তারা বলবে, যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমাদেরকে নজরবন্দী করা হয়েছে। আমরা এখন যাদুগ্রস্ত, মোহাবিষ্ট।

হাসান বলেছেন, 'তারা দিনের বেলা তাতে আরোহণ করে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশমার্গে আরোহণ করে এবং প্রত্যক্ষ করে সেখানকার রহস্যাবলী। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সুক্কিরাত' শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'সকর'। এর অর্থ, নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করা। হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। হাসান বসরী বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে, যাদুর প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে, আমাদের চোখগুলো বসিয়ে দেয়া হয়েছে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে। কালাবী কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমাদের চক্ষুগুলোকে করে দেয়া হয়েছে দৃষ্টিহীন। কামুস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সুক্কিরাত আব্সারুনা' অর্থ— হরণ করা হয়েছে দর্শনশক্তি।

'আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়' কথাটির অর্থ মক্কার কাফেরেরা বলতো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাদুগ্রস্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, তারা কোনো মোজেজা দেখলে এরকম বলতো। এখানকার 'ইন্না' এবং 'বার' শব্দ দু'টোর কারণে প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কাফেরেরা কোরআনকে নিশ্চিত যাদু বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো। মনে করতো কোরআন তাদের চিন্তা-চেতনাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ○ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ○ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ○

❒ আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত— দর্শকদিগের জন্য;

❒ প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি;

❒ আর কেহ চুরি করিয়া আকাশের সংবাদ জানিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি।' 'বুরুজ' অর্থ রাশিচক্র । শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে 'তাবার্‌রুজ' থেকে । এর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। বলা হয় 'তাবার্‌রাজাতিল মারআতু' অর্থ, স্ত্রী লোকটির অভ্যুদয় ঘটেছে। তেমনি বৃহৎ নক্ষত্রের অভ্যুদয় বা উদয়কে বলে 'বুরুজ'। আতিয়া বলেছেন, আকাশমার্গে রয়েছে বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ। তবে আলোচ্য বাক্যের 'বুরুজ' বা রাশিচক্র ওই রাশিচক্র নয়, যার অবতারণা করেছে ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা। তাদের রাশিচক্র তাদের নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার ফসল। তাদের ধারণা, আকাশগুলো পরস্পরজড়িত। একটি অপরটির দ্বারা আবৃত। এভাবে নয়টি আকাশ সতত পরিক্রমণরত। এই নয় আকাশের পরিক্রমণের জন্য রয়েছে একটি বৃত্ত ও দু'টি প্রান্ত। অষ্টম আকাশটি আবার স্থির ও শূন্য, তার জন্য রয়েছে একটি কেন্দ্র ও দু'টি মেরু। সূর্যের অবস্থান ওই অষ্টম আকাশের বৃত্তে। বর্ণিত বৃত্ত দু'টো আবার পরস্পরবিচ্ছিন্ন। চারটি মেরুপ্রান্তের মধ্যখানে যদি একটি রেখা টানা যায়, তবে সৃষ্ট হবে চারটি উপবৃত্ত। ওই উপবৃত্ত চতুষ্টয়ে রয়েছে তিনটি করে রাশি। এ সকল অলীক মতবাদ শরিয়ত সমর্থিত নয়। আকাশসমূহের পরিক্রমণও শরিয়ত বিরোধী। আকাশ স্থির, কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের পরিক্রমণ শরিয়তসমর্থিত। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব পাচঁশত বছর পথের দূরত্বের সমান। আর শরিয়তের নির্ধারণ এই যে, আকাশের সংখ্যা সাতটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য।' একথার অর্থ— বিশাল আকাশকে আমি করেছি নয়নাভিরাম, চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি।' একথার অর্থ— অভিশপ্ত শয়তানদের কবল থেকে আমি আকাশের রহস্য, ব্যবস্থাপনা ও আকাশবাসীদেরকে রক্ষা করি। সুরক্ষিত রাখি সেখানে তার অনধিকার প্রবেশ থেকে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইতোপূর্বে শয়তানেরা অবাধে আকাশে গমনাগমন করতে পারতো। আকাশে গিয়ে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনে এসে জ্যোতিষদেরকে জানাতো। হজরত ঈসা রুহুল্লাহ্র আবির্ভাবের পর উপরের তিনটি আকাশে তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হলো। শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর আবির্ভাবের পর তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলো সকল আকাশ। তখন থেকে তাদের কেউ আকাশের দিকে যেতে চেষ্টা করলেই তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় উল্কাপিণ্ড। শয়তানের দল তখন তাদের নেতা ইবলিসকে জানায়, নিশ্চয় পৃথিবীতে নতুন কিছু ঘটেছে। ইবলিস বলে, খুঁজে দেখো, কোথায় কার আবির্ভাব ঘটেছে। তারা অনুসন্ধান করে দেখতে পায় মাটির পৃথিবীতে শুভাগমন ঘটেছে শেষ রসুলের। আর তিনি শুরু করেছেন কোরআনের প্রচার। শয়তানেরা তখন বলতে থাকে, আল্লাহ্র শপথ! পৃথিবীতে ঘটেছে অভিনব এক ঘটনা।

এর পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আর কেউ চুরি করে আকাশের সংবাদ জানতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।' এখানে 'শিহাব্' অর্থ প্রদীপ্ত শিখা, যা বিচ্ছুরিত হয় নক্ষত্র থেকে। ব্যাপারটি এরকম— শয়তানেরা একে অপরের কাঁধে ভর করে আকাশ পর্যন্ত উঠে যায়। চুপিসারে শুনতে চেষ্টা করে আকাশের ফেরেশতাদের আলাপচারিতা। কিন্তু তারা সফল হয় না। কারণ ফেরেশতারা তাদেরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে আগুনের গোলা। ওই আগুনের গোলাকেই এখানে বলা হয়েছে প্রদীপ্ত শিখা। বলা বাহুল্য যে, ফেরেশতাদের ওই অগ্নিবান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ফলে শয়তানদের কেউ কেউ হয় ছিন্নহস্ত, দগ্ধমুখ অথবা ভগ্নপঞ্জর। ওই পঙ্গু, বিকলাংগ ও প্রায়োন্মাদ শয়তানেরা শেষে আশ্রয় গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অরণ্যে। পথিকদেরকে করে বিব্রত, বিভ্রান্ত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আকাশবাসী ফেরেশতাদের নিকটে কোনো বিষয়ের সমাধান দান করেন, তখন আল্লাহ্র অপার পরাক্রমের প্রভাবে তারা ডানা

ঝাপটাতে শুরু করে। ফলে ধ্বনিত হয় ঝম ঝম আওয়াজ। মনে হয় যেনো কোনো পাথুরে প্রান্তরে শত সহস্র লোহার শিকল আছড়ানো হচ্ছে। ফেরেশতাদের চঞ্চল বিহ্বল অবস্থা প্রশমিত হয়ে আসে এক সময়। বন্ধ হয়ে যায় ঝম ঝম আওয়াজ। কথাবার্তা শুরু হয় এভাবে— প্রশ্নঃ আমাদের পালনকর্তা কতো সুন্দর সমাধান দিলেন। নয় কি? উত্তরঃ তাঁর সকল সমাধান সত্য ও মহান। এরপর শুরু হয় মূল বিষয়ের আলাপ, শয়তান ঘাপটি মেরে সে কথা শোনে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেয় তার পদতলস্থিত শয়তানকে। সে জানিয়ে দেয় তার নিম্নস্থিত শয়তানকে। এভাবে শয়তানের সিঁড়ি বেয়ে আল্লাহ্‌র গোপন সিদ্ধান্তের সংবাদ চলে আসে ভূপৃষ্ঠে। ভূপৃষ্ঠের শয়তানেরা তখন যাদুকর ও গণৎকারকে বিষয়টি অবগত করায়। কখনো কখনো এমনো হয়, শয়তান প্রদত্ত সংবাদ পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসার আগেই নিক্ষিপ্ত হতে থাকে অগ্নিশর। তখন যাদুকর ও গণৎকারেরা পুরো তথ্য আর পায় না। যা পায় তার সঙ্গে তারা তখন স্বকপোলকল্পিত অনেক কিছু সংযোজন করে এবং তা প্রচার করে লোকসমক্ষে অলৌকিকত্বের দাবিদার হয়।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র ফয়সালা জেনে নিয়ে ফেরেশতারা মেঘপুঞ্জের উর্ধ্বদেশে অবতরণ করে এবং নিজেদের মধ্যে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। শয়তান সে কথাগুলো আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করে এবং যাদুকর ও গণৎকারের হৃদয়ে সে কথা প্রতিভাসিত করে দেয়। তারা তখন ওই সত্য সংবাদের সঙ্গে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে প্রচার করে। বোখারীও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে বাগবী ও বোখারীর বর্ণনাসূত্র পৃথক।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ১৯, ২০

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ۝

❒ পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, এবং উহাতে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি; আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি সুপরিমিতভাবে,

❒ এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের জন্য আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যও।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— প্রথমে আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি পানির উপরে। তারপর পৃথিবীর উপর পর্বতমালা স্থাপন করে দূর করে দিয়েছি

দোদুল্যমানতা। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ হয়েছে সুস্থির। এরপর পৃথিবীতে অথবা পর্বতে কিংবা উভয় স্থানে প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতরূপে।

এখানে 'মাওযুন' অর্থ সুপরিমিতরূপে। অর্থাৎ সৃষ্টির যথাযোগ্যতানুসারে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যানুসারে। অথবা যথাপরিমাপ অনুযায়ী। যেমন— সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সুরমা ইত্যাদি ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থসমূহ এবং পর্বতস্থিত ইয়াকুত, জবরজদ, ফিরোজা ইত্যাদি।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য।' একথার অর্থ— ওই পৃথিবী ও পর্বতেই আমি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছি জীবনোপকরণের। তোমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা— সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে পৃথিবীতে। এখানকার 'মায়ায়িশা' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'মায়িশাহ্'। এর অর্থ রিজিক, জীবিকা বা জীবনোপকরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।' এ কথার অর্থ— পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্ব মানুষের উপরে নেই। আল্লাহ্ সেগুলোকে রিজিক দান করেন মানুষের মাধ্যম ছাড়াই। এই পৃথিবী থেকেই তারা সকলে রিজিকপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, কেবল বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীদের জন্য ব্যবহৃত হয় 'মান' (যে) কথাটি। যেমন মানুষ, ফেরেশতা, জ্বিন ইত্যাদি। কিন্তু এখানকার 'মান' কথাটি 'মা' (যার, যাদের) অর্থে ব্যবহৃত । যেমন এক আয়াতে এসেছে— ফামিনহুম মাঁইইয়ামশি আ'লা বাত্নিহী (তন্মধ্যে যেগুলো পেটের উপরে ভর দিয়ে চলে)। এখানেও 'মাঁইইয়ামশি' কথাটির 'মান' (যে) শব্দটি 'মা' (যাদের) এর অর্থ প্রকাশক।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'মান' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শিশুসন্তান, চাকর-বাকর, অনুচর, দাস-দাসী ও গৃহপালিত পশুকে। অবিশ্বাসীরা মনে করে এগুলোর রিজিক তারাই দিয়ে থাকে। তাদের এমতো ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— হে মানুষ! তোমরা যাদের রিজিকদাতা মনে করো এবং যাদেরকে মনে করো না, তাদের সকলের জন্যই আমি এই পৃথিবীতে ও পৃথিবীর পর্বতসমূহে রিজিক সৃষ্টি করে রেখেছি।

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ وَاَرْسَلْنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَیْنٰكُمُوْهُ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِیْنَ ۝ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْیٖ وَنُمِیْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

❒ আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

❒ আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই; উহার ভাণ্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।

❒ আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমার নিকটে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার' একথার অর্থ— আমার সৃজনভাণ্ডার অফুরন্ত। তাই আমি করতে পারি প্রতিটি বস্তুর অসংখ্য সংস্করণ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, অপরিমেয় ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করে এখানে উপমা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের। অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে যতো খুশী ততো ব্যয় করলেও ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষ হয় না। তেমনি বিরামহীনভাবে সৃষ্টি করলেও আল্লাহ্‌র অফুরন্ত সৃজনভাণ্ডারে স্বল্পতা দেখা দেয় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।' একথার অর্থ— আমার অপার প্রজ্ঞাবলে সৃষ্টির যে অদৃষ্টলিপি আমি প্রস্তুত করেছি, সেই অদৃষ্টলিপি অনুসারে আমি সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করি।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানকার 'ভাণ্ডার' কথাটির অর্থ সৃষ্টির আদি রূপ। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) আদি ও অদৃশ্য রূপরেখা, যার অস্তিত্ব রয়েছে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে। আর এখানকার 'প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করে থাকি' কথাটির অর্থ হবে— ওই আদি ও অদৃশ্য রূপরেখাকে আমি অস্তিত্বের জগতে প্রয়োজনানুসারে প্রতিভাত, প্রতিভাসিত অথবা প্রতিবিম্বিত করি। সুফী দার্শনিকগণের ভাষায় এ অবস্থার নাম অজুদে জিল্লি বা প্রতিবিম্বজ অস্তিত্ব। এই পরিদৃশ্যমান জগতের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অতুলনীয় জ্ঞানে রক্ষিত ওই নিরাবয়ব আদিরূপ। বাগবী লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, সকল সৃষ্টির

আদিরূপ আল্লাহ্‌র আরশে বিদ্যমান। 'আমার নিকটে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার' কথাটির মর্মার্থ এরকমই। আমি বলি, ইমাম জাফর সাদেকের 'আরশে বিদ্যমান' কথাটির অর্থ— উপমার জগতে (আলমে মেসালে) বিদ্যমান। মানুষের চিন্তাশক্তির মূল কেন্দ্র যেমন মস্তিষ্ক, তেমনি এই বিশাল সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হচ্ছে উপমার জগত। আর উপমার জগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আরশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'খাযাইন্' বা ভাণ্ডার অর্থ বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে সকল বস্তুর ভাণ্ডার। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'আর আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।' হাদিস শরীফে এসেছে, আকাশ থেকে বর্ষিত প্রতিটি বারি বিন্দুর সঙ্গে থাকে একজন করে ফেরেশতা । ওই বারি বিন্দুকে সে নির্দেশপ্রাপ্ত স্থানে পৌঁছে দেয়।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি।' একথার অর্থ— আমি জলবাহী মেঘ সঞ্চালনের জন্য বাতাসকে নির্দেশ দান করি। এখানে 'লাওয়াক্বিহ্' শব্দটি 'লাক্বিহাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ পরিপূরক। রসুল স. 'মুলাক্বিহ্' বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। মাতৃগর্ভস্থিত উষ্ট্রশাবককে বলে 'মুলাক্বিহ্'। মাতা ব্যতীত এরকম শাবককে বিক্রয় করা নিষেধ। অথবা 'লাওয়াক্বিহ্' শব্দটি 'লকুহ্' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ দুগ্ধবতী উষ্ট্রী । যাই হোক না কেনো, এখানে 'লাওয়াক্বিহ্' অর্থ বৃষ্টিবাহী মেঘমালা সঞ্চালনকারী মৌসুমী বায়ু। বায়যাবী লিখেছেন, ঘনীভূত মেঘমালা বহনকারী বাতাসকে বলে 'লাওয়াক্বিহ্'। অপরপক্ষে 'আক্বিম' বা বন্ধ্যাবায়ু বলে ওই বাতাসকে যা বর্ষণযোগ্য মেঘ বহন করে না।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করেন। বায়ু পানি উত্তোলন করে। ওই পানি সংরক্ষণ করে মেঘ এবং তা বাতাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শেষে উষ্ট্রীর দুগ্ধদানের মতো বৃষ্টি ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়।

আবু উবাইদ বলেছেন, 'লাওয়াক্বিহ্' শব্দটির অর্থ, 'মালাক্বিহ্'। 'মালাক্বিহ্' এর একবচন হচ্ছে 'মালকাহাতুন'। এর অর্থ গর্ভসঞ্চারক বায়ু। বৃক্ষ ছড়িয়ে দেয় তার ফুলের রেণু। ফলে বৃক্ষসকল হয় অন্তঃসত্ত্বা। উবাইদ বিন উমায়ের বলেছেন, আল্লাহ্ প্রথমে পাঠিয়ে দেন সুসংবাদবাহী সমীরণ। সে সমীরণ পরিচ্ছন্ন করে ভূপৃষ্ঠকে। এরপর তিনি প্রেরণ করেন মেঘপুঞ্জবাহী মলয়। ফলে আকাশে ভেসে আসে মেঘের পরে মেঘ। এরপর আল্লাহ্ এমন এক বাতাস প্রবাহিত করেন, যা একত্র করে বিক্ষিপ্ত মেঘগুলোকে। তারপর ওই বাতাস মেঘগুলোকে স্তরে স্তরে সাজিয়েও দেয়। এরপর তিনি প্রেরণ করেন বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু। শুরু হয় বৃষ্টিপাত। সে বৃষ্টিতে ভিজে পৃথিবীর তরুরাজিতে জাগে পুষ্পের সম্ভার। যেনো অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় বৃক্ষকুল।

আবু বকর বিন আইয়াম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চার ধরনের বায়ু তাদের কর্তব্য শেষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। পূবাল হাওয়ায় ভেসে আসে মেঘ। পানি ঘনীভূত হয় উত্তুরে বাতাসে। দক্ষিণা বাতাসে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। আর পশ্চিমা বাতাস মেঘকে সঞ্চারিত করে এদিকে ওদিকে।

এক হাদিসে এসেছে, দক্ষিণা বাতাসকে বলে 'লাওয়াক্বিহ্।' সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যে এসেছে, দক্ষিণা বাতাস প্রবাহিত হলে আংগুর সংগ্রহের হিড়িক পড়ে যায়। বন্ধ্যাবাতাস আনে শাস্তি। কিন্তু ফল জন্মে না।

ইমাম শাফেয়ী ও তিবরানী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঝঞ্ঝা বায়ু শুরু হলে রসুল স. হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্! এই বাতাসকে করে দাও রহমত। শাস্তি নয়। হে আমার আল্লাহ্ ! এ সমীরণকে করে দাও করুণাবাহী। আযাব নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'রীহ্' অর্থ ওই বায়ু যা উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে এভাবে— আরসালনা আ'লাইহিম রীহান্ সরসরান্ (আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করেছি) এবং এই আয়াতে— আরসালনা আ'লাইহিম রীহাল আক্বীম (আমি তাদের উপর বন্ধ্যা হাওয়া সঞ্চালন করেছি)। আর 'রীয়াহ্' অর্থ ওই বাতাস, যার উল্লেখ এসেছে এই আয়াতে— আরসালনার্ রীয়াহা লাওয়াক্বিহা (আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি) এবং এই আয়াতে— ওয়া ইয়ুর্সিলুর রীয়াহা মুবাশ্শিরাতি (আর সঞ্চারিত হয় সুসংবাদবাহী সমীরণ)।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই।' এ কথার অর্থ— মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটাই আমিই। আর মেঘজ সলিলকে আমি তোমাদের জন্য করেছি পানোপযোগী। আরবী প্রবাদে বলা হয়— সাকাইতুর্ রজুলা মাআন আও লাবানান (আমি লোকটিকে পান করিয়েছি, দুধ অথবা পানি)। অর্থাৎ আমি লোকটিকে দুধ অথবা পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছি। আর 'আস্কাইতুর্ রজুলা' অর্থ আমি তাকে পানি দিয়েছি, যেনো সে তার ভূমি ও জন্তু-জানোয়ারদেরকে পান করায়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তার ভাণ্ডার তোমাদের নিকটে নেই।' এ কথার অর্থ— জীবন-প্রদায়ক পানির অনন্ত ভাণ্ডারের মালিকও আমি। তোমরা নও। অথবা কূপ ও জলাশয়ে পানি সঞ্চয় করে রাখাও তোমাদের কর্ম নয়। সেটাও আমার অভিপ্রায়ভূত। আল্লাহ্পাকের সকল কিছুর মধ্যে যেমন রয়েছে মানুষের কল্যাণ, তেমনি কল্যাণ রয়েছে বৃষ্টিবর্ষণের মধ্যেও। এ সকল কিছু হচ্ছে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। পানির স্বভাব নিম্নগামী। উর্ধ্বারোহণের যোগ্যতা তার মধ্যে নেই । অথচ আল্লাহ্র কী অপার মহিমা! তিনি

আকাশে প্রতিনিয়ত ভাসিয়ে চলেছেন জলবতী মেঘের ভেলা। এই বিস্ময়কর নিদর্শনটির মাধ্যমে একথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, আল্লাহ্, কেবল আল্লাহ্ই মহাবিশ্বের একক নিয়ন্তা?

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আমিই তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্-পরিচিতি দান করে ও শরীরে ভূতচতুষ্টয়কে ও আত্মাকে একত্র করে তোমাদেরকে দান করি জীবন। আবার এ সকল কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে ঘটাই তোমাদের মৃত্যু।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' একথার অর্থ— আমি চিরঞ্জীব। সদাবিদ্যমান। মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাদের সাময়িক মালিকানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মালিকানা চিরস্থায়ী। উল্লেখ্য যে, সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী থাকবেন কেবল আল্লাহ্। তাই এখানে বলা হয়েছে— ওয়ানাহ্নুল্ ওয়ারিছুন। অর্থাৎ আমিই হবো তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। এরকম বলা হয়েছে শক্যার্থে। কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— চূড়ান্ত মালিকানা আমারই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ২৪, ২৫

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

❐ তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং তোমাদিগের পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি।

❐ তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে একত্র সমবেত করিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং তোমাদের পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।' একথার অর্থ— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সকল মানুষের সকল কিছু সম্পর্কে আমি সম্যক পরিজ্ঞাত। উল্লেখ্য যে, আগের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র অতুলনীয় শক্তিমত্তার কথা। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানের কথা। এভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মুসতাক্বদিমীন' অর্থ পূর্বসূরী। আর 'মুসতা'খিরীন' অর্থ উত্তরসূরী। শা'বী বলেছেন, শব্দ দু'টোর অর্থ— পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সকল মানুষ। ইকরামা বলেছেন, 'মুসতাক্বদিমীন' অর্থ যারা পিতৃপৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৃষ্ট

হয়েছে। আর 'মুসতা'খিরীন' অর্থ যারা এখনো তাদের পিতৃপৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত হয়নি। অর্থাৎ যারা এখনো সৃজিত হয়নি। মুজাহিদ বলেছেন, বিগত যুগের জাতিগোষ্ঠীগুলো 'মুসতাক্বদিমীন'। আর উম্মতে মোহাম্মদী হচ্ছে 'মুসতা'খিরীন'। হাসান বসরী বলেছেন, আনুগত্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অনুগামী হচ্ছে যথাক্রমে 'মুসতাক্বদিমীন' ও মুসতা'খিরীন'।

কেউ কেউ বলেছেন, নামাজের জামাতের সামনের সারির লোকেরা 'মুসতাক্বদিমীন' এবং পেছনের সারির লোকেরা 'মুসতা'খিরীন'। ইবনে মারদুবিয়া বলেছেন, একবার দাউদ বিন সালেহ্ হজরত সহল বিন হানিফ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলেন, মুসতাক্বদিমীন ও মুসতা'খিরীন শব্দ দু'টোর মাধ্যমে কি রণপ্রান্তরের পুরোগামী ও অনুগামী যোদ্ধাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, না। শব্দ দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, নামাজের জামাতের সম্মুখের ও পশ্চাতের মুসল্লিদেরকে । মুকাতিল বলেছেন, শব্দ দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সম্মুখবর্তী সৈনিক ও পশ্চাদ্বর্তী সৈনিকদেরকে। ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'পূর্বগামী' ও 'পরগামী' বলে যারা ইতোমধ্যে মুসলমান হয়েছে তাদেরকে এবং যারা এখনো মুসলমান হয়নি তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আওজায়ী বলেছেন, ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামাজ পাঠকারীরা হচ্ছে মুসতাক্বদি-মীন। আর ওয়াক্তের শেষভাগে নামাজ পাঠকারীরা হচ্ছে মুসতা'খিরীন।

এক রূপবতী রমণী জামাতে নামাজ পাঠ করছিলেন। ইমাম ছিলেন রসুলপাক স. স্বয়ং। তখন ওই রমণীকে দেখে কিছু লোক সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মধ্যে দু'একজন রুকুর সময় বগলের ফাঁক দিকে ওই রমণীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলো। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হাকেম বলেছেন হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— তিনি পুনরুত্থান দিবসে সকল মানুষকে একত্র করবেন। পুরস্কৃত করবেন পুণ্যবানদেরকে। আর তিরস্কৃত করবেন পাপিষ্ঠদেরকে। অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ সুনিশ্চিত।

হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্ তাকে পুনরুত্থিত করবেন তেমনি অবস্থায়।

এখানে 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি একথাই প্রমাণ করে যে, পুনরুত্থান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র ক্ষমতায়ত্ত ও দায়িত্বভূত। তিনি হাকীম (প্রজ্ঞাময়)। তাই তাঁর প্রতিটি কর্মই প্রজ্ঞামণ্ডিত। আর তিনি আলীম (সর্বজ্ঞ)। তাই তাঁর সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝

❏ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হইতে,

❏ এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি প্রগাঢ় কর্দমজাত বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। এখানে 'আল-ইনসান' অর্থ মানুষ । 'আল্' অব্যয়টি জাতিবাচক। এখানে 'আল ইনসান' এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতিকে। হজরত আদমকে ইনসান বলা হয় একারণে যে— ১. শব্দটির ধাতুমূল হচ্ছে 'ইনস্' । এর অর্থ পরিদৃশ্যমান, দৃষ্টিগোচর । মানুষ দৃষ্টিগোচর, তাই মানুষকে বলে ইনসান। ২. 'ইনস্' শব্দের আরেকটি অর্থ— সৌহার্দ, সম্প্রীতি। মানুষ পারস্পরিক প্রীতি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ বলে তার নাম ইনসান। ৩. 'নিস্ইয়ান' থেকেও 'ইনসান' শব্দটি পরিগঠিত হয়ে থাকতে পারে। 'নিস্ইয়ান' অর্থ বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিপ্রবণতার কারণেই মানুষকে বলা হয় ইনসান।

'সল্সল্' অর্থ বিশুষ্ক মৃত্তিকা বা শুকনো ঠন্‌ঠনে মাটি। অর্থাৎ সেই মাটি, যা আগুনে না পোড়ানো সত্ত্বেও বাড়ি খেলে ঠন্‌ঠন্ আওয়াজে বেজে উঠে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই বিশুষ্ক কর্দমকে 'সল্সল্' বলে, যাতে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং যা ঠোকা দিলে টঙটঙ আওয়াজ করে। মুজাহিদ বলেছেন, দুর্গন্ধযুক্ত কর্দমকে বলে সল্সল্। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়— সল্সলাল লাহাম (গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে)। 'হামা' অর্থ ওই মৃত্তিকা যা পানিতে অধিককাল নিমজ্জিত থাকার কারণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আর 'মাস্নূন' অর্থ আকৃতি বা অবয়ব। শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'সানান্তুল ওয়াজহা' থেকে। এভাবে মানুষের অবয়ব গঠনের প্রক্রিয়াটি এরকম— প্রথমে মাটি মেশানো হয় পানির সঙ্গে। কিছুকাল এভাবে রাখার পর তা পরিণত হয় প্রগাঢ় কর্দমে। অর্থাৎ পচাগলা মাটিতে। ওই পচাগলা মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিয়ে তাকে করা হয় 'সুলালাহ্'। এরপর ওই মাটির নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত করা হয় মানুষের অবয়ব। এই অবয়বের নাম মাস্নূন। মাস্নূনকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিলে তার নাম হয় সল্সল্।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, পুঁতিগন্ধময় পদার্থের নাম মাসনূন। যেমন বলা হয়— সানান্তুল হাজারা আলাল হাজারি (পাথরের উপরে পাথর চাপিয়ে দিয়ে আমি দুর্গন্ধ নিপাত করেছি)। আবু উবাইদা বলেছেন, 'মাসনূন' শব্দ গঠিত হয়েছে

'সাননুন' থেকে। সাননুন অর্থ প্রবাহিত করা । আর মাসনূন অর্থ প্রবাহিত। গলিত ধাতু যেমন বিভিন্ন রকমের ছাঁচে ঢেলে দেয়া হয়, তেমনি বিগলিত কর্দমকে নির্ধারিত ছাঁচে ঢেলে গঠন করা হয়েছে মানুষের আদিমূর্তি। তারপর ওই মূর্তিকে এমনভাবে শুকিয়ে নেয়া হয়েছে যে, তাতে ঠোকা দিলে ধ্বনিত হয় ঠন্ঠন্ শব্দ। ওই মূর্তিকে দীর্ঘকাল ধরে করা হয় অধিকতর মসৃণ ও সুন্দর। তারপর ওই মূর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় আত্মাকে। আত্মপ্রকাশ করে পূর্ণ মানব।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জ্বিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে।' 'আলজ্বান' অর্থ জ্বিন। এখানকার 'আল' অব্যয়টিও জাতিবাচক। এভাবে 'আলজ্বান' কথাটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে সমগ্র জ্বিন জাতিকে। সকল মানুষ যেমন জাতিগত দিক থেকে প্রথম মানুষের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সকল জ্বিনও গোষ্ঠীগত ধারাবাহিকতার দিক থেকে প্রথম জ্বিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে বলা হয়েছে জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। অর্থাৎ অগ্নিশিখা থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইনসান' বলে যেমন মানুষের প্রথম পিতা হজরত আদমকে বুঝানো হয়, তেমনি 'আলজ্বান' বলে বুঝানো হয় জ্বিনদের আদি পিতাকে। কাতাদা বলেছেন, 'আলজ্বান' অর্থ ইবলিস। এমনো বলা হয়েছে যে, জ্বিনদের আদি পিতা আলজ্বান। আর শয়তানদের আদি পিতা ইবলিস। জ্বিনদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান, আবার কেউ কেউ কাফের। তাদের মধ্যে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করে, আবার কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু শয়তানেরা সকলেই কাফের। আর জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিকতাও তাদের নেই । অর্থাৎ কেউ জন্মেও না, কেউ মরেও না। ইবলিস যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার সকল অনুসারীরাও মৃত্যুবরণ করবে।

ওয়াহাব বলেছেন, জ্বিনেরা মানুষের মতো পানাহার করে ও সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। আবার কোনো কোনো জ্বিন বায়ুসদৃশ। তারা পানাহার করে না । তাদের বংশ বিস্তারও ঘটে না।

এখানে 'মিন্ক্বলু' অর্থ ইতোপূর্বে। অর্থাৎ জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের পূর্বে। 'আস্সামুন' অর্থ অত্যুষ্ণ বায়ু বা লু হাওয়া— যা লোমকূপ ভেদ করে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়। বাগবী লিখেছেন, 'আস্সামুন' অর্থ ওই তপ্ত বাতাস, যা লোমকূপের মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করে মানুষকে দুর্বল করে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, দিবাভাগের উত্তপ্ত হাওয়াকে বলে 'সামুম'। আর রাত্রিভাগের উত্তপ্ত হাওয়াকে বলে 'হারুব্'। কালাবীর বর্ণনায় এসেছে, আবু সালেহ্ বলেছেন, আকাশ ও ওজন স্তরের মধ্যবর্তী অংশের ধুম্রবিবর্জিত অগ্নির নাম 'সামুম'। এই 'সামুম' থেকেই সৃষ্টি হয় 'সাইক্বাহ্' (বজ্রধ্বনি বা বজ্রপাত)। আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও নির্দেশানুসারে সেখান থেকে সৃষ্টি হয় বজ্র। কেউ কেউ বলেছেন, 'নারে সামুম'

অর্থ জাহান্নামের আগুন। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিস ফেরেশতাগণের একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত। ওই শাখাগোত্রভূত-দেরকে বলে জ্বিন। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা থেকে। অপর এক আয়াতে জ্বিনদেরকে প্রজ্জ্বলিত আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি একই বস্তু। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণের মূলগোত্র সৃষ্টি করা হয়েছে নূর বা আলোকপ্রভা থেকে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ۝ إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰٓى أَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

❒ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, 'আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি;

❒ 'যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও',

❒ তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজ্‌দা করিল,

❒ কিন্তু ইবলিস করিল না, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (২৮, ২৯) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আমি প্রগাঢ় কর্দমজাত বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে মানুষ সৃষ্টি করবো। তার সুঠাম ও সুন্দর দেহ সৃজনের পর তাতে সঞ্চার করবো আমার সৃষ্ট আত্মাকে। এভাবে সৃজিত শ্রেষ্ঠ মানুষকে তোমরা তখন সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কোরো।

এখানে 'নাফখুন' শব্দটির অর্থ শূন্য পাত্রে কোনো কিছু প্রবেশ করানো । এভাবে মানব-অবয়বের প্রতি রূহ বা আত্মা-সম্পাতের কথা বলা হয়েছে এখানে। রূহ বা মানবাত্মা দু'ধরনের— ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী। ঊর্ধ্বমুখী আত্মা অবয়বহীন, আকার ও প্রকারবিহীন। অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে চর্মচক্ষু দ্বারা আত্মা-দর্শন সম্ভব নয়। এই আত্মার মূল অবস্থান আল্লাহ্‌র আরশের উপরে। ঊর্ধ্বমুখী আত্মা পাঁচটি— কলব্, রূহ, সের, খফি, আখফা। এগুলোকে বলে আলমে আমরের লতিফা পঞ্চক বা নির্বাহী জগতের সূক্ষ্মপঞ্চক। আর অধোমুখী আত্মা সৃষ্ট হয়েছে

আগুন, পানি, মাটি, বাতাস— এই ভূতচতুষ্টয় থেকে। মানবদেহও এই ভূতচতুষ্টয় থেকে সৃষ্ট। অধোমুখী আত্মাকে বলা হয় নফস বা প্রবৃত্তি। আল্লাহ্পাক এই আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী আত্মার আয়না হিসেবে মনোনীত করেছেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ যেমন সূর্যের আলো ও উত্তাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তেমনি অধোমুখী আত্মা ঊর্ধ্বমুখী আত্মার প্রভাবে হয় জীবন্ত। হয় বোধ ও বুদ্ধির আকর। প্রাথমিক অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী আত্মার আলো প্রতিফলিত হয় মানুষের হৃৎপিণ্ডে। তারপর সেখান থেকে পৌঁছে যায় শিরা উপশিরায়, ধমনীর সকল শাখা-প্রশাখায়। এভাবে শরীরের সকল অংশ হয় ঊর্ধ্বমুখী আত্মার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই প্রক্রিয়াকে এখানে 'রূহ সঞ্চার করবো' কথাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। শূন্যস্থান যেমন বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তেমনি আত্মা দ্বারা জীবন্ত ও পরিপূর্ণ করা হয় মানুষের জড়-অস্তিত্বকে।

'রূহী' অর্থ আমার রূহ বা আত্মা। মর্যাদা প্রদানার্থে মানবাত্মাকে এখানে আল্লাহ্ 'আমার আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। এভাবে 'আমার আত্মা' কথাটির অর্থ হবে মৌল কোনো কিছু ব্যতিরেকেই আমার বিশেষভাবে সৃষ্ট আত্মা। কেবল মানবাত্মার আয়নাতেই আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর অত্যুজ্জ্বল বিকিরণ বা তাজাল্লি প্রতিবিম্বিত হতে পারে। এই অনন্য যোগ্যতার কারণেও আল্লাহ্পাক মানবাত্মাকে 'আমার আত্মা' বলে সম্বোধন করেছেন— এরকমও বলা যেতে পারে।

যে সকল উপাদানের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে মৃত্তিকা। তাই বলা হয়, মানুষ মৃত্তিকাজাত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দশটি উপাদানের দ্বারা। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং এই ভূতচতুষ্টয়ের সমন্বয়ে গঠিত নফস। এই পাঁচটি উপাদানের সম্মিলিত নাম নিম্নমুখী আত্মা বা প্রবৃত্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী আত্মার পাঁচটি অংশ। নির্বাহী জগতজাত সেই উপাদানগুলির নাম কলব, রূহ, সের, খফি, আখফা। এই দশটি উপাদানে গঠিত হওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহ্র খলিফা বা প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। হয়েছে মারেফাত ও ইশ্কের আধার। আর এরূপ যোগ্যতাই তাকে করেছে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন। এই নৈকট্যভাজনতা ও আল্লাহ্র প্রতিবিম্বিত নূরের বাহক হওয়ার কারণে প্রথম মানুষ হজরত আদমকে সেজদার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীকে। হাদিস শরীফেও এসকল বিষয়ের আলোচনা এসেছে।

'ফাক্বাউ' অর্থ সেজদাবনত হয়ো। কথাটি অনুজ্ঞাসূচক। আর 'লাহু' শব্দের 'ল্যাম' অব্যয়টি এখানে 'ইলা' (দিকে, প্রতি) অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে মর্মার্থটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা আদমের দিকে বা প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণিপাত কোরো, যেমন নামাজ পাঠকালে কাবার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ কাবাকে করা হয় কেবলা। আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় জ্যোতিসম্পাতের

সঙ্গে কাবা শরীফের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। তেমনি হজরত আদমও আল্লাহ্র বিশেষ জ্যোতিসম্পাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কাবাকে যেমন কেবলা বা লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে, তেমনি হজরত আদমকে ওই সময় করা হয়েছিলো ফেরেশতামণ্ডলীর কেবলা বা লক্ষ্যস্থল।

এর পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সেজদা করলো।' উল্লেখ্য যে, হজরত আদম আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নূরের বাহক— একথা বুঝতে পেরে সকল ফেরেশতা তাঁকে সেজদা করেছিলো। অথবা তারা সেজদা করেছিলো কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে।

'ফেরেশতাগণ সকলেই'— একথা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'কুল্লুহুম আজমাউ'ন'। এখানে 'কুল্লু', 'হুম' এবং আজমাউ'ন'— তিনটি শব্দই বহুবচন-বোধক। ফেরেশতাদের কেউই তখন সেজদা থেকে বিরত থাকেনি— এ কথাটি অধিকতর নিশ্চিত করনার্থেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এই ত্রয়ী বহুবচনবোধক শব্দ। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে 'আজমাউ'ন' এর স্থলে 'আজমাইন' প্রয়োগই ছিলো ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু তা করা হয়নি। এর কারণ অবোধ্য। ওয়াল্লহু আ'লাম।

এর পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'কিন্তু ইবলিস করলো না, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।' উল্লেখ্য যে, ইবলিস ছিলো অদূরদর্শী। তাই সে আল্লাহ্র জ্যোতিসম্পাতপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজরত আদমের বিশেষ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। এ কথারও গুরুত্ব দেয়নি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ কখনো প্রজ্ঞাময়তার রহস্য থেকে মুক্ত নয়। তাই সকল ফেরেশতাকে সেজদাবনত দেখেও সে সেজদা করতে প্রবৃত্ত হয়নি।

ইবলিস ফেরেশতা ছিলো না। ছিলো জ্বিন। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কানা মিনাল্ জ্বিন্নি' (সে ছিলো জ্বিন সম্প্রদায়ভূত)। এ কারণে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ব্যতিক্রম বোধক 'ইল্লা' শব্দটি বিকর্তিত। ব্যতিক্রম না হয়ে যদি মিলিত হতো, তবে বুঝা যেতো যে, সে ফেরেশতাদের সমগোত্রীয়। কিন্তু সে ফেরেশতা নয়। তাই এখানে 'ইল্লা' শব্দটির অর্থ হবে 'লাকিন্না' (কিন্তু)। বঙ্গানুবাদে অবশ্য এরকমই করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'ইল্লা' ব্যতিক্রমী নয়, মিলিত। কারণ ইবলিস ছিলো ফেরেশতাদের একটি শাখাগোত্রভূত। ওই শাখাগোত্রের নাম জ্বিন। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— ব্যতিক্রম কেবল ইবলিস। সে সেজদা করেনি। সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে সে অস্বীকার করেছে।

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ইবলিস! তোমার কী হইল যে তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?'

❒ সে বলিল, 'আপনি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজ্‌দা করিবার নহি।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত;

❒ 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল অভিশাপ'

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে,

❒ অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলিস! কেনো তুমি আদমকে সেজদা করলে না। আমার নির্দেশ যে অবশ্য মান্য, এ কথা জেনেও তুমি নির্দেশ লংঘন করলে কেনো?

পরের আয়াতে (৩৩) মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, মাটি হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের পদার্থ। আদমকে তুমি বানিয়েছো শুষ্ক ও ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে। আর আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে— যা মাটি অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদামণ্ডিত। সুতরাং অনলজাত আমি মৃত্তিকাজাত আদমকে সেজদা করতে যাবো কেনো?

এর পরের আয়াতের (৩৪) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, তবে তুমি বের হয়ে যাও এই স্বর্গোদ্যান থেকে। আজ থেকে তুমি কল্যাণচ্যুত, অভিশপ্ত।

'রজুম' শব্দের অর্থ প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হরণ করা। অর্থাৎ পাথরের প্রহারে মেরে ফেলা। উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহ্র মহান দরবার থেকে বিতাড়িত হয়, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা যায়। কারণ তারা অভিশপ্ত। 'অভিশপ্ত' কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— আর কখনো তুমি এই জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। যদি আকাশের দিকে কখনো আসতে চেষ্টা করো, তবে তোমার দিকে ছুঁড়ে মারা হবে উল্কাপিণ্ড। যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়, সেভাবে তোমার উপর করা হবে উল্কাপাত। কারণ তুমি বিতাড়িত, অভিশপ্ত।

ইবলিসের যুক্তি ছিলো আগুন মাটি অপেক্ষা উত্তম। নির্দেশ লংঘনের বিরুদ্ধে তার এই যুক্তিটি ছিলো নিতান্তই অচল, অসংগত ও অসার। মৃৎমূর্তি, অগ্নিশিখা— সকল কিছুই সৃষ্টি হিসেবে সমগুরুত্বসম্পন্ন। এগুলোর কোনো কিছুর মধ্যেই কল্যাণ নেই। কল্যাণ রয়েছে কেবল আল্লাহ্র আনুগত্যে। তাই যারা অনানুগত, তারা কল্যাণবঞ্চিত, বিতাড়িত ও অভিশপ্ত।

এর পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইলো অভিশাপ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক আরো বললেন, হে ইবলিস! মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত তোমাকে অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। বিচারকার্য সমাপনের পর তোমার উপরে আপতিত হবে পারলৌকিক অভিসম্পাতের বোঝা। ওই অভিসম্পাত হবে চিরস্থায়ী। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— হে ইবলিস! ইহজগতের অভিশাপ তোমার উপরে বলবৎ থাকবে মহাবিচারের দিবস পর্যন্ত। তারপর তোমার উপরে আপতিত হবে নতুনতর শাস্তি— যে শাস্তি তোমাকে ভুলিয়ে দেবে তোমার এখনকার অভিসম্পাতের স্মৃতি।

কেউ কেউ বলেছেন— 'কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইলো অভিশাপ' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, কর্মফল দিবসের পরে ইবলিসের অভিশাপ শেষ হয়ে যাবে। বরং কথাটির অর্থ হবে, এই অভিশাপ বলবৎ থাকবে চিরস্থায়ীরূপে। বিচারদিবসের আগে ও পরে।

বাগবী লিখেছেন, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সর্বত্রই ইবলিস অভিশপ্ত। জান্নাতবাসীরাও তাকে অভিসম্পাত দিবে। আমি বলি, শুধু তাই নয়, তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্। তাই এখানে বলা হয়েছে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল অভিশাপ।

এর পরের আয়াতে(৩৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' একথার অর্থ— হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যখন স্বর্গভ্রষ্ট করলে, তখন আমার একটি প্রার্থনা অন্ততঃ পূরণ করো। আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত দাও মৃত্যুহীন জীবন। উল্লেখ্য যে, তার এই প্রার্থনা ছিলো প্রতারণাপূর্ণ। সে ভেবেছিলো মৃত্যু আগমন করতে থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। এরপর আর কারো মৃত্যু হবে না। তাই প্রার্থিত অবকাশ পেলে সে হয়ে যাবে চিরঞ্জীব। আল্লাহ্ তার এই প্রতারণাপূর্ণ আবেদনও মঞ্জুর

করলেন। করুণাপরবশ হয়ে নয়, বরং বীতশ্রদ্ধ হয়ে। তাকে অবকাশ দিলেন এ কারণে, যাতে সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে সে আরো অনেক পাপকর্ম করে অধিকতর ভয়াবহ গজবের শিকার হতে পারে।

পরের আয়াতদ্বয়ের (৩৭, ৩৮) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ বললেন, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হলো। ইসরাফিলের শিংগার ফুৎকার ধ্বনিত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে দেয়া হলো অবকাশ। অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুৎকারের সময় যখন সমগ্র সৃষ্টি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন তুমিও ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ দেয়া হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, শিংগার প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর হবে চল্লিশ বছর। ইবলিসের মৃত্যু ঘটবে ওই সময়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ○

❒ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমার সর্বনাশ করিলে তাহার শপথ' আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিব,

❒ 'তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত দাসগণকে নহে।'

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! অভিশাপ দিয়ে যে ক্ষতি তুমি আমার করলে, সেই ক্ষতির শপথ! আমি আদমের পরবর্তী বংশধরদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবো। তাদের দৃষ্টিতে আমি পৃথিবীকে করবো লোভনীয়। ফলে তারা পৃথিবীর প্রতি প্রলুব্ধ হবে এবং তোমার কথা ভুলে গিয়ে আমারই মতো হয়ে যাবে অভিসম্পাতগ্রস্ত। এখানে 'বিমা' শব্দের 'বি' অব্যয়টি শপথমূলক। আর 'মা' অব্যয়টি শব্দমূল।

পরের আয়াতের (৪০) মর্মার্থ হচ্ছে— ইবলিস বললো, তবে হ্যাঁ। তোমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদেরকে আমি পৃথিবীর প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারবো না। আমি জানি যে, বিশুদ্ধচিত্তদের প্রতি আমার প্ররোচনা ও প্রলোভন কার্যকর হবে না।

এর পরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছবার সরল পথ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার প্রকৃত প্রেমিকেরা সরলপথের পথিক। তাই তুমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারো না। আমিই এই পথের সন্ধান তাদেরকে দিয়েছি। বক্রতামুক্ত এই পথের নামই সিরাতুল মুসতাক্বিম।

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— এই সরল ও সত্য পথ পৌঁছেছে আল্লাহ্ পর্যন্ত। এই পথের পথিকদের তাই বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। আখফাশ কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— সত্যপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। একথায় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর মনোনীত দাসদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেন না। কারণ তিনি তাঁদের প্রতি করুণাপরবশ। কাসায়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইবলিসকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। যেমন, কেউ তার প্রতিপক্ষকে বলে, ভেবেছো কী? তোমার চলার পথ তো আমারই উপর দিয়ে। একথার অর্থ— নিশ্চিত জেনো, আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। যেমন, এক আয়াতে এসেছে— নিশ্চয় আপনার প্রভুপালক প্রতিটি ঘাঁটিতে বিদ্যমান।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪২, ৪৩, ৪৪

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

❑ 'বিভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার দাসদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না;

❑ 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম;

❑ 'উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাক আরো বললেন, পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা ব্যতীত আমার দাসগণের উপর তুমি কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না।

এখানে 'ইবাদী' (আমার দাসগণের) কথাটির মধ্যে সকল স্তরের ইমানদারগণ অন্তর্ভুক্ত। 'ইবাদ' বা দাসগণের সম্বন্ধ যদি বক্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়, অর্থাৎ 'আমার দাসগণ' বলে যদি কেবল ইমানদারদেরকে বুঝানো হয়, তবে মানিত্ তাবাআকা (যারা তোমার অনুসরণ করবে) বলে ইমানদারগণ থেকে তাদেরকে পৃথক করা ব্যাকরণসম্মতভাবে শুদ্ধ হবে না। বরং 'ইবাদী'র মধ্যে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার পর পথভ্রষ্টদেরকে পৃথক করলে তা হবে ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ। আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্‌পাক বললেন, তোমাকে কেবল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পথভ্রষ্টদের উপর। মুমিনগণের উপর তোমার কোনো আধিপত্য কার্যকর হবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে (৪০) ইবলিস নিজেই বলেছে 'তবে

তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত দাসগণকে নয়।' আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্-তায়ালার অনুমোদন পেয়ে কথাটি হয়েছে অধিকতর দৃঢ় ও অকাট্য। অপর এক আয়াতেও কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'যারা বিশ্বাস করেছে তাদের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই।' কারণ তারা নির্ভরশীল হয়েছে কেবল আল্লাহ্র উপর। মোট কথা, আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণকে সুরক্ষিত রাখেন। তাই তাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব ফলপ্রসূ হয় না। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয়টি বিকর্তিত ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যে ব্যতিক্রমকৃতদের অন্তর্ভুক্তি সিদ্ধ নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'ইবাদী' বলে আল্লাহ্তায়ালার বিশিষ্ট বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত) অব্যয়টির অর্থ হবে 'লাকিন্‌না' (কিন্তু)। এরকম হলে ধরে নিতে হবে বাক্যটির বিধেয় এখানে অনুক্ত। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— কিন্তু যারা তোমার অনুসরণ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবলিস বললো, আমি তাদের সকলের সর্বনাশ করবো, তোমার নির্বাচিত বান্দাগণ ছাড়া। তার ওই বক্তব্যের বিরোধিতা ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— বিভ্রান্তদের উপরেও তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি তওবা না করে এবং আমার দিকে প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা তোমার অনুসারী হওয়াকেই উত্তম মনে করে, তবে তুমি তাদেরকে প্ররোচিত করতে পারো মাত্র। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এটাই। অপর এক আয়াতেও কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে এভাবে— (বিচারের দিবসে ইবলিস স্বগোক্তি করবে) তোমাদের উপর আমার তো কোনো আধিপত্যই ছিলো না। আমি তো কেবল ডেকেছিলাম। আর তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।' এখানে কেবল 'হুম' উল্লেখ করলেই ইবলিসের সকল অনুসারীকে বুঝানো হতো। কিন্তু কথাটিকে আরো অধিক গুরুত্ববহ ও সুনির্দিষ্ট করার জন্যই এরপরে বসানো হয়েছে 'আজমাঈন'। অর্থাৎ জাহান্নাম হবে ইবলিসের সকল অনুসারীর নির্ধারিত আবাস।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'তার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক দল।'

হান্নাদ ইবনে মোবারক ও আহমদ 'জুহুদ' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া 'সিফাতুন্‌নার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী একবার তাঁর এক হাতের উপর অন্য হাত স্থাপন করে আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রেখে বললেন, নরকের দরজাগুলো এরকম। অর্থাৎ একটি দরজার উপরে রয়েছে আরেকটি দরজা। এরকম স্তর রয়েছে সাতটি। প্রতিটি স্তরে রয়েছে একটি করে দরজা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, স্বর্গ সুবিস্তৃত। আর নরক একটির উপরে একটি। সিফাতুন্নার গ্রন্থে ইবনে জারীর ও ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া উল্লেখ করেছেন, নরকের প্রথম স্তরের নাম জাহান্নাম। তার পরের স্তরগুলো যথাক্রমে— লাজা, হুতামাহ্, সায়ীর, সাক্বার, জাহীম এবং হাবীয়াহ।

বাগবী আরো লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, প্রথম স্তরে প্রবেশ করবে ওই সকল ইমানদার, যারা পাপী। কিছুকাল শাস্তিভোগের মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর তারা নিষ্কৃতি পাবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রবিষ্ট হবে খৃষ্টান । তৃতীয় স্তরে ইহুদী। চতুর্থ স্তরে সাবাইয়া। পঞ্চম স্তরে অগ্নিপূজক। ষষ্ঠ স্তরে মূর্তিপূজক। সপ্তম ও সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে থাকবে কপটচারী বা মুনাফিকেরা। এখানে খৃষ্টান অর্থ ওই সকল খৃষ্টান, যারা হজরত ঈসার মহাতিরোধানের পর শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে স্বীকার করেনি। আর ইহুদী অর্থ ওই সকল ইহুদী যারা হজরত মুসার মহাপ্রস্থানের পর হজরত ঈসাকে নবী বলে মানেনি এবং এরপর মানেনি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্কে। সাবাইয়া হচ্ছে তারা, যারা নিজেদেরকে এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী বলে দাবী করা সত্ত্বেও কোনো নবী রসুলের শরিয়ত মানে না। শোনা যায় তারা হজরত নুহের অনুসারী বলে দাবি করে থাকে। অগ্নিপূজারী ও মূর্তিপূজারীরা যথাক্রমে আগুন ও বিগ্রহের উপাসক। আর মুনাফিকেরা দৃশ্যতঃ বিশ্বাসী, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অবিশ্বাসী। তাদের সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাল মুনাফিক্বীনা ফিদ্দারকিল আস্ফালি মিনান্নার' (মুনাফিকেরা অবস্থান করবে নরকের সর্বনিম্ন স্তরে)।

বাগবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, দোজখের স্তর সাতটি । দরজাও সাতটি। তার মধ্যে একটি স্তর ওই লোকদের জন্য যারা আমার উম্মতের উপর অসিচালনা করেছে। কুরতুবী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, সবচেয়ে লঘু শাস্তিসম্বলিত নরকের নাম জাহান্নাম। ওই নরক তার অধিবাসী ও অধিবাসিনীদের মুখাবয়ব বিবর্ণ করে দিবে ও ভক্ষণ করবে তাদের রক্তমাংস। তাই তার নাম জাহান্নাম। আমার বিশ্বাসী ও পাপী উম্মতেরা প্রবেশ করবে সেখানে।

নিকৃষ্টতম ও গভীরতম নরক হচ্ছে হাবীয়া । হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায্যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, নরকের এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করবে কেবল ওই সকল লোক, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব-গজব সম্পর্কে ছিলো নির্ভয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সাতটি স্তর রয়েছে দোজখের। সবচেয়ে বেশী শাস্তিসম্বলিত দোজখে প্রবেশ করানো হবে ওই সকল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে যারা জেনে শুনে অবলীলাক্রমে চালিয়ে যায় তাদের অপকর্ম। খলিল বিন মাররাহ্ থেকে অসমর্থিত সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. কখনো 'তাবারাকাল্লাজী' ও 'হা মিম

সেজদা' সুরাদ্বয় পাঠ না করে শয্যাগ্রহণ করতেন না। বলতেন, হামিম সম্বলিত সুরা রয়েছে সাতটি। দোজখের স্তরও সাতটি— জাহান্নাম, হুতামাহ, লাজা, সাক্বার, সায়ীর, হাবীয়াহ্ ও জাহীম। হা মিম সম্বলিত সুরা সাতটি প্রতিফল দিবসে দোজখের সাতটি দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে বলবে, হে আমার চির-অমুখাপেক্ষী পাক পরোয়ারদিগার। যে সকল বিশ্বাসী আমাকে নিয়মিত আবৃত্তি করেছে, আমি তাদেরকে কিছুতেই দোজখে প্রবেশ করতে দিবো না।

সা'লাবীর বর্ণনায় এসেছে, 'ওয়াইন্না জাহান্নামা লামাওই'দুহুম আজমাঈন' (৪৩) — এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে উন্মাদের মতো ছুটে পালিয়েছিলেন হজরত সালমান ফারসী। তিনদিন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। শেষে তাকে রসুল স. সকাশে হাজির করা হলো। তিনি স. আত্মগোপনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, 'অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলের নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম'— এই আয়াতের আবৃত্তি শুনলে মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ○ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

❒ 'সাবধানীরা থাকিবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে।'

❒ তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।'

❒ 'আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখামুখী হইয়া আসনে অবস্থান করিবে,'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা মুত্তাক্বী বা সাবধানী, অর্থাৎ যারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়নি, তারা প্রবেশ করবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য সেখানে থাকবে একটি অথবা অনেক প্রস্রবণ।

পরের আয়াতের (৪৬) মর্মার্থ হচ্ছে— জান্নাতীদের ওই জান্নাতবাস হবে চিরস্থায়ী। কোনোদিন আর তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। সেখানে কোনোদিন আর উপস্থিত হবে না রোগ, শোক, জরা অথবা বার্ধক্য। জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে, তোমরা চিরসুখময় জান্নাতে প্রবেশ করো চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে বিশ্বাসীরা মানবিক বৃত্তির প্রভাবে পারস্পরিক যে ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেই ঈর্ষা বিদ্বেষ আমি তাদের হৃদয় থেকে চিরদিনের জন্য অপসারিত করে দিবো তাদের জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালেই। কারণ জান্নাত হবে ঈর্ষা বিদ্বেষের প্রভাব থেকে চিরমুক্ত। এখানকার বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে অতীতকালবোধক ক্রিয়া সহযোগে। বিষয়টি ভবিষ্যৎকালের হলেও স্বতঃসিদ্ধ ও সুনিশ্চিত। যেনো তা সংঘটিত হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের ক্রিয়া।

আবু নাঈমের 'ফিতান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য আমি, ওসমান, তালহা ও যোবায়ের। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বক্ষণে আমাদের পারস্পরিক প্রতিহিংসা দূর করে দেয়া হবে। আমি বলি, সম্মানিত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিলো হজরত ওসমানের খেলাফতকালে। পরিণামে শহীদ হয়েছিলেন হজরত আলী। তৎপূর্বে জামাল যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর 'জওয়াইদুজ জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবদুল করিম বিন রশীদ বলেছেন, জান্নাতের তোরণে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিশ্বাসীরা রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করবেন একে অপরের প্রতি। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর তাঁরা দেখবেন তাঁদের বক্ষদেশে বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। আল্লাহ্পাক তা অপসারিত করে তাঁদেরকে বেঁধে দিয়েছেন চিরস্থায়ী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে।

'গিল্লুন' শব্দটির অর্থ বিষণ্ণতাও হতে পারে। অর্থাৎ নিম্নমর্যাদাধারী জান্নাতীরা আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন জান্নাতীদের মর্যাদা দেখে সেখানে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ হবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই এমতো বিষণ্ণতার চির অবসান ঘটাবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে।' হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সেখানে কেউ কাউকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। সবাই থাকবে মুখোমুখি। এরকম কতিপয় উক্তি উল্লেখ করে বাগবী বলেছেন, জান্নাতীরা তাদের সতীর্থদের সাক্ষাতাভিলাষী হবেন। তাঁদের পালংকই তাঁদেরকে পৌঁছে দিবে কাঙ্খিত জনের সম্মুখে। মুখোমুখি সাক্ষাত হবে তাদের। হবে আলাপন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আলী বিন হোসাইন একবার বললেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে

লক্ষ্য করে। তখন অনেকেই প্রশ্ন করলো, তাঁদের মধ্যে কি পারস্পরিক সংক্ষোভ ছিলো? হজরত আলী বিন হোসাইন বললেন, মূর্খতার যুগে বনী তামীম, বনী আদী এবং বনী হাশেম গোত্রত্রয়ের মধ্যে ছিলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। যখন গোত্রত্রয় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থলে প্রবাহিত হতে শুরু করলো প্রীতি ও প্রেমের পীযূষ ধারা। একদিন হজরত আবু বকর তাঁর কটিদেশে সামান্য বেদনা অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী একটি পট্টি যোগাড় করে সেঁক দিতে শুরু করলেন তাঁর কোমরে। সহমর্মিতার ওই অবাক দৃশ্য লক্ষ্য করে তখন অবতীর্ণ হলো ওই আয়াত। এই ঘটনাটি যদি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— মূর্খতার যুগে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে অন্তর্কলহ ছিলো, শেষ রসুলের উপস্থিতির মাধ্যমে তা অপসারণ করা হলো। ঈর্ষা বিদ্বেষের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হলো ভ্রাতৃসুলভ প্রেম ও ভালোবাসা। প্রতিষ্ঠিত হলো চিরস্থায়ী ঐক্য ও সাম্য।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ○ نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ○

❒ সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

❒ আমার দাসদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ এবং আমার শাস্তি— সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।' এ কথার অর্থ— ক্লান্তি, শ্রান্তি, অবসাদ এসকল কিছু থেকে বেহেশতবাসীরা থাকবে মুক্ত। তাদের ওই নিরুপদ্রব জীবন হবে স্থায়ী। কারণ সময়ের প্রবাহ সেখানে নেই। সময়ের প্রবাহই তো মানুষকে করে তোলে অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত। এ পৃথিবী ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত করা হবে সময়ের প্রবহমানতাকে। তাই বেহেশতে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে কেবল বর্তমান। চিরবর্তমান। তাই বেহেশতবাসীদের সুখ ও শান্তি হবে অবসাদবিমুক্ত। আর বেহেশতবাসীরা সেখান থেকে আর কখনো বহিষ্কৃতও হবে না।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, একবার একস্থানে কতিপয় সাহাবী জটলা করে হাসাহাসি করছিলেন। সহসা আবির্ভূত হলেন রসুল স. স্বয়ং। বললেন, তোমাদের সম্মুখে রয়েছে নরকের লেলিহান আশংকা। অথচ তোমরা হাস্যকৌতুকে মত্ত। সঙ্গে সঙ্গে হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনার মহান প্রভুপালক জানাচ্ছেন, আপনি তাঁর দাসগণকে তাঁর অনুকম্পা থেকে নিরাশ করছেন কেনো? তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হলো— 'আমার দাসদেরকে বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমার বিশ্বাসী দাসদেরকে বলুন, আমি তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র। আমি তো কঠোর ও দণ্ডদাতা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য।

ইবনে মারদুবিয়া কতিপয় সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, একবার রসুল স. বনী শায়বার তোরণ দিয়ে এসে আমাদেরকে হাস্য-কৌতুক অবস্থায় দেখলেন। বললেন, আমি তোমাদেরকে আমোদ প্রমোদে মত্ত দেখছি কেনো? একথা বলেই তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। একটু পরেই পুনরাবির্ভূত হয়ে বললেন, শোনো, হাজরে আস্ওয়াদ পর্যন্ত না পৌঁছতেই ভ্রাতা জিবরাইল এসে আমাকে জানালেন, আল্লাহ্ জানিয়েছেন, আপনি আমার বিশ্বাসী বান্দাগণকে নির্মল আনন্দ থেকে নিরাশ করছেন কেনো? উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে বিশ্বাসীগণকে মার্জনার প্রতিশ্রুতি। আবার পরবর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তির কথা— যা নির্ধারিত রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য। এখানকার 'গফুরুর রহীম' কথাটির অর্থ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, 'মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে' (আয়াত ৪৫)। এতে করে বুঝা যায় যারা মুত্তাকী, সংযমী বা শিরিক থেকে মুক্ত, তাদের লঘু ও গুরু পাপরাশি আল্লাহ্ দয়া করে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি গফুরু ররহীম। যদি এরকম অর্থ করা না হয়, অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সাবধানীদের কোনো পাপ যদি না-ই থাকে, তবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের অবকাশই বা কোথায়।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র ক্ষমাশীলতার বৈরাট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারতো, তবে তারা অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতো না। আর যদি শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুমুখে পতিত হতো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন,

বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তির কঠোরতা অনুধাবন করতে পারতো, তবে তারা জান্নাতের আশা আর করতো না। আর অবিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র অপার কৃপা সম্পর্কে বুঝতে পারতো, তবে তারা জান্নাতপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করতো না।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, করুণা সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন একশতটি রহমানি করুণা। তার মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের কাছে রেখে বাকি একটি দান করেছেন সমগ্র সৃষ্টিকে। অবিশ্বাসীরা যদি ওই নিরানব্বইটি করুণার কথা জানতে পারতো, তবে বেহেশত লাভ করার ব্যাপারে নিরাশ হতো না। আর বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান পেতো, তবে দোজখ সম্পর্কে নিঃশঙ্কচিত্ত হতো না।

হজরত সালমান ফারসী থেকে আহমদ ও মুসলিম এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টির দিনে আল্লাহ্ সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন একশতটি রহমতের। এক একটি রহমতের ব্যাপ্তি বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান। ওই শত রহমতের একটি দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। ওই রহমতের কারণেই জননী ভালোবাসে তার আত্মজ-আত্মজাকে। পশু-পাখিদের স্নেহ মমতার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় ওই রহমতের প্রভাব। আর বাকী নিরানব্বইটি রহমত তিনি রেখে দিয়েছেন নিজস্ব সংরক্ষণে। ওই সংরক্ষিত রহমত সহ একশত রহমতের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে তখন, যখন তাঁর রহমত ব্যতিরেকে মানুষের আর কোনো উপায় থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন কেবল তাঁর ক্ষমা ও দয়ার কথা। এর সঙ্গে তাঁর শাস্তির কথা একেবারেই উল্লেখ করেননি। শাস্তির প্রসংগ বিবৃত করেছেন পরবর্তী আয়াতে পৃথকরূপে। এতে করে বুঝা যায়, তাঁর আযাব ও গজব অপেক্ষা তাঁর রহমত ও ক্ষমা অধিকতর প্রবল।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'এবং আমার শাস্তি, সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি!' উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র অতি মর্মন্তুদ শাস্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী পৃথিবীতে। আরো উল্লেখ্য যে, পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁর রহমত ও গজবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলেও এই পৃথিবীতেও তার দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সে কারণেই যুগে যুগে ধ্বংস হয় অবাধ্য আদ ও ছামুদ নরগোষ্ঠীভূত লোকেরা। আবার তাঁর একান্ত নৈকট্যভাজন হয় নবী-রসুলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা। পরবর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও গজবের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত। যেমন—

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ○ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

❒ এবং উহাদিগকে বল, 'ইব্‌রাহীমের অতিথিদিগের কথা,'

❒ যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম', তখন সে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে ভয় করিতেছি।'

❒ উহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি।'

❒ সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?'

❒ উহারা বলিল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি; সুতরাং তুমি হতাশ হইও না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে নবী ইব্রাহিমের অতিথিবৃন্দ সম্পর্কে অবহিত করুন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে আলোচিত ৪৯ ও ৫০ সংখ্যক আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছিলো— আমার দাসদেরকে বলে দাও যে, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তি, অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। একথার আলোকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— আমি আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিমকে অতিবৃদ্ধ বয়সে দান করেছি পুত্র সন্তান, এটা আমার রহমতের একটি অনন্য নিদর্শন। আর আমার প্রিয় নবী লুতের অবমাননাকারীদেরকে করেছি নিশ্চিহ্ন। সেটা ছিলো আমার মর্মন্তুদ শাস্তির একটি দৃষ্টান্ত।

এখানকার 'দ্বইফ' শব্দটি একবচন ও বহুবচন দু'ভাবেই ব্যবহার্য। এর অর্থ অতিথি বা অতিথিবর্গ। এখানে কথাটির অর্থ হবে অতিথি ফেরেশতাবৃন্দ, যারা নিয়ে এসেছিলো হজরত ইব্রাহিমের পুত্রলাভের শুভসংবাদ এবং হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বার্তা।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সালাম। তখন সে বলেছিলো, আমি তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি।' উল্লেখ্য

যে, অতর্কিতে কয়েকজন অতিথি এসে পড়ায় হজরত ইব্রাহিম শংকিত হয়েছিলেন। অথবা তাঁর শংকাগ্রস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, আপ্যায়নের নিমিত্তে পরিবেশিত ভাজা গরুর গোশত তারা খেতে রাজি হয়নি। তাই তিনি মনে করেছিলেন এদের নিশ্চয় কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। শত্রুগৃহে আহার্য ভক্ষণ না করাই ছিলো তখনকার রীতি। তাই পরিবেশিত আহার্যবস্তু ভক্ষণে তাদেরকে অনীহ দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি। এখানে 'ওয়াজল' শব্দটির অর্থ আসন্ন বিপদের ভয়ে ভীত হওয়া। শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়া।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, ভয় কোরো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভসংবাদ দিচ্ছি।' একথার অর্থ— ফেরেশতারা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র খলিল! ভীত হবেন না। আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের জনক হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি। পরিণত বয়সে আপনার ওই সন্তান হবে অতি বিজ্ঞ ও সম্মানার্হ।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'সে বললো, তোমরা কি আমাকে শুভসংবাদ দিচ্ছো। আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভসংবাদ দিচ্ছো?' একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার অতিথিবর্গ! আপনারা যে আমাকে এক অসম্ভব সংবাদ শোনাচ্ছেন। আমি বার্ধক্যকবলিত। আর আমার পত্নী সন্তান জন্মদানের বয়স পেরিয়েছে অনেক আগেই। তাই আপনাদের প্রদত্ত সুসংবাদ কি আদৌ কোনো শুভসংবাদ?

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমরা সত্যসংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' একথার অর্থ— অতিথি ফেরেশতারা বললো, আমরা আপনাকে জানাচ্ছি আল্লাহ্‌প্রদত্ত সত্যসংবাদ, যা অন্যথা হবার নয়। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান অকার্যকর করার সাধ্য কারো নেই। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বন্ধু! আপনি আল্লাহ্‌র বিধান-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করবেন না। যে আল্লাহ্‌ যৌবনদীপ্ত দম্পতিকে সন্তান দান করতে সক্ষম, তিনি বার্ধক্যগ্রস্ত দম্পতিকেও নিশ্চয় সন্তান দিতে পূর্ণসক্ষম। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র বিধান-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী। ছিলেন খলিলুল্লহ্‌ (আল্লাহ্‌র বন্ধু)। তাই তিনি একথা ভালো করেই জানতেন যে, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিধর। তিনি কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন একথা ভেবে যে, বিষয়টি আল্লাহ্‌র সাধারণ বিধানের প্রতিকূল। তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا
لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۝

❒ সে বলিল, 'যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়?'

❒ সে বলিল, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কী কাজ আছে?'

❒ উহারা বলিল, 'আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে—

❒ 'লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা করিব,

❒ কিন্তু লূতের স্ত্রীকে নহে; আমরা জানিয়াছি যে, যাহারা ধ্বংস হইবে সে অবশ্যই তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত।'

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, যারা পথভ্রষ্ট, আল্লাহ্‌র অপার দয়া, জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা ছাড়া আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে কে? হে অতিথিবৃন্দ! আমিতো আল্লাহ্‌র খলিল। তাই আমি একথা ভালো করেই জানি যে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে হতাশ হওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়াও পাপ। আমিতো তোমাদের কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেছি মাত্র। তাঁর সাধারণ বিধানের স্থলে তাঁরই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার সংবাদ বিস্ময়কর নয় কি? আমার এই বিস্ময়কে তোমরা হতাশা ভাবলে কেনো?

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কী কাজ আছে?' এ কথার অর্থ— এতক্ষণের আলাপচারিতায় হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, অতিথিবৃন্দ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। তাঁরা এসেছেন তাঁকে সুসংবাদ জানাতে। নবীসুলভ প্রজ্ঞাবলে তিনি একথাও অনুমান করতে পারলেন যে, সুসংবাদ প্রদান ছাড়াও তাদের অন্য কোনো বিশেষ কাজ থাকতে পারে। তাই বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আর কী কাজ করতে আদিষ্ট হয়েছো তোমরা?

এর পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।' একথার অর্থ— এক অপরাধী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে। হে নবী! আপনি

নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভাগিনেয় নবী লুতের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, নবী লুতের পরিবারবর্গ ছাড়া সকল অবাধ্যদের বিনাশ সাধনার্থে আমরা প্রেরিত হয়েছি।

এর পরের আয়াতদ্বয়ের (৫৯, ৬০) মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরেশতারা আরো বললো, হে আল্লাহ্‌র খলিল! নবী লুত ও তাঁর পরিবারের সকলকে আমরা রক্ষা করবো। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করবো না। কারণ সে অবিশ্বাসিনী। তাই অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা তার ললাটলিখন। আমাদেরকে একথা জানানোও হয়েছে। সুতরাং তার ধ্বংস অনিবার্য।

এখানে উল্লেখিত 'তাক্বদীর' (ক্বদদারনা) শব্দটির অর্থ সমাধান। ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাটি যুক্ত হওয়ার ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমরা জেনে শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা সমাধান দিয়েছি যে, নবী লুতের অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে অবশ্যই অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ধ্বংস করা হবে। 'তাক্বদীর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অবশ্য এরকম— কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর অনুকরণে নির্মাণ করা। উল্লেখ্য যে, তাক্বদীর সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন। ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য-ভাজন এবং তাক্বদীরের বাস্তবায়ন কর্মের সঙ্গে জড়িত। তাই এখানে তাক্বদীর কথাটি যুক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝

❒ ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসিল

❒ তখন লূত বলিল, 'তোমরা তো অপরিচিত লোক।'

❒ তাহারা বলিল, 'না, উহারা যে শাস্তি সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি;

❒ 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী;

❒ 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না চাহে; তোমাদিগকে যেথায় যাইতে বলা হইতেছে তোমরা সেথায় চলিয়া যাও।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের (৬১, ৬২) মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিমের গৃহ থেকে অতিথি ফেরেশতাবৃন্দ উপস্থিত হলো সাদুমবাসীদের অঞ্চলে হজরত লুতের নিকটে। হজরত লুত দেখলেন, আগন্তুক অতিথিরা সৌম্যকান্ত, সুদর্শন। পথশ্রান্তির কোনো চিহ্ন তাদের অবয়বে নেই। চেহারা, বেশবাস সবকিছুই কী সুন্দর পরিপাটি। তাদের দেখে দূরদেশী মুসাফির বলে মনেই হয় না। আবার তারা স্থানীয়ও নয়। হলে তো চেনাই যেতো। তাই তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, আপনারা তো দেখছি একেবারে অপরিচিত। তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো এক ধরনের আশংকা। আপন মনে ভাবলেন তিনি, এদের দ্বারা কি কোনো বিপদ ঘটতে পারে।

এর পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা বললো, না, তারা যে শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলো, আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি।' একথার অর্থ— ফেরেশতারা বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! বার বার আল্লাহ্‌র গজব সম্পর্কে সাবধান করা সত্ত্বেও আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আপনার সাবধানবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেনি। সেই গজব নিয়েই আমরা আবির্ভূত হয়েছি।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।' একথার অর্থ— তারা আরো বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা যা বললাম তা সত্য। এতে অণুপরিমাণ মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। অবাধ্যদের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পিছন দিকে না চায়। এখানে 'ক্বিত্বই'ম্ মিনাল্ লাইল' কথাটির অর্থ— রাতের কোনো এক সময়ে। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ রাতে। এখানে হজরত লুতকে তাঁর পরিবারবর্গকে সামনে রেখে যাত্রা করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি যেনো তাদেরকে চোখের সামনে রেখে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন।

'লা ইয়ালতাফিত্' অর্থ কেউ যেনো পিছনে না তাকায়। অর্থাৎ কেউ যেনো পিছনে তাকিয়ে অবাধ্যদের উপরে আপতিত ভয়াবহ শাস্তি অবলোকন না করে। এতে করে গজব কবলিত আত্মীয়স্বজনের জন্য অন্তরে মমতার উদ্রেক হতে পারে। সেই সূত্রে তারাও হতে পারে আল্লাহ্‌র আক্রোশ ও গজবের লক্ষ্যস্থল। কেউ কেউ বলেছেন, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে যাত্রা বিলম্বিত যাতে না হয়, তাই বলা হয়েছে— তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পিছনে না তাকায়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ এরকম— রাতের একাংশে অত্যন্ত

দ্রুততার সঙ্গে সকলে যেনো গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। চলার পথে কেউ যেনো থমকে না দাঁড়ায়। অযথা পিছনে তাকিয়ে সময় ক্ষেপণ না করে। আসন্ন আযাব থেকে অতিদ্রুত পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে, সেখানে চলে যাও।' একথার অর্থ—গজবের এলাকা ছেড়ে আল্লাহ্‌পাক যে স্থানে তোমাদেরকে চলে যেতে বলেছেন, সেখানেই তোমরা চলে যাও। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত লুত ও তাঁর পরিবারবর্গকে সিরিয়ায় চলে যেতে বলা হয়েছিলো। মুকাতিল বলেছেন, তাঁদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছিলো জামার নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন, জর্দানে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ○ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ○ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ○

❒ আমি লূতকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানাইয়া দিলাম যে, প্রত্যুষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

❒ নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

❒ লূত বলিল, 'উহারা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করিও না।'

❒ 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।'

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় নবী হজরত লুতকে এইমর্মে প্রত্যাদেশ করলেন যে, সকাল হওয়ার আগেই আমি তোমার অবাধ্য ও পাপাসক্ত সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করবো। তাদের একজনকেও আস্ত রাখবো না। এখানে 'দাবির' অর্থ মূল বা শিকড়।

পরের আয়াতের (৬৭) মর্মার্থ হচ্ছে— শ্মশ্রু ও গুম্ফবিহীন অনিন্দ্যসুন্দর কিশোর অতিথিদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। উল্লসিত হলো নগরবাসী। তারা ছিলো সমকামী। বিকৃত কাম চরিতার্থ করার জন্য তারা একে একে সমবেত হলো হজরত লুতের গৃহাঙ্গনে।

এর পরের আয়াতের (৬৮) মর্মার্থ হচ্ছে— কামোন্মাদ নগরবাসীকে লক্ষ্য করে হজরত লুত বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! ক্ষান্ত হও। এরা আমার সম্মানিত মেহমান। তোমরা এদেরকে অবমাননা করে আমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত কোরো না।

এর পরের আয়াতের (৬৯) মর্মার্থ হচ্ছে— তিনি আরো বললেন, হে আমার স্বজাতি! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নির্লজ্জ অপকর্ম থেকে বিরত হও। পাপের শাস্তি নিশ্চিত। সুতরাং সংযত হও। সম্মানিত মেহমানগণের সম্মুখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। এখানে 'লা তুখজুনি' অর্থ আমাকে হেয় প্রতিপন্ন কোরো না। শব্দটি এসেছে 'খিজ্ইয়ুন্' থেকে। এর অর্থ দুঃখ, ক্লেশ, লাঞ্ছনা অথবা যাতনা। কেউ কেউ বলেছেন, লজ্জা।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

❑ উহারা বলিল, 'আমরা কি দুনিয়ার লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই ?'

❑ লূত বলিল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাহ তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।'

❑ তোমার জীবনের শপথ! উহারা মত্ততায় বিমূঢ় হইয়াছে।

❑ অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল;

❑ এবং আমি নগরগুলিকে উল্‌টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিলাম।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— উদ্ধত সাদুমবাসীরা বললো, হে লুত! সারা দুনিয়ার লোককে তুমি আশ্রয় দিবে নাকি? এটা তোমার অনধিকার চর্চা। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও। তুমি থাকো তোমার কাজে। এভাবে যাকে তাকে আশ্রয় দিতে আমরা কি নিষেধ করিনি?

আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে উহ্য একটি ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়া সহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— পাপাচারীরা বললো, হে লুত! তোমার কথামতো আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না। কারণ ইতোপূর্বে তুমি কথা দিয়েছিলে আমাদের কোনো কাজে তুমি আর নাক গলাবে না। আমাদের প্রতিপক্ষ আর কাউকে তোমার গৃহে আশ্রয় দিবে না। তোমার অতিথিদের নিকটে আমাদের কিছু পাওনা আছে। আমরা তা আদায় করবোই । উল্লেখ্য যে, সমকাম ছাড়াও আরো একটি জঘন্য দোষ ছিলো সাদুমবাসীদের । তারা যত্রতত্র করতো ডাকাতি ও ছিনতাই। লুণ্ঠন করতো পথচারীদের সম্মান ও সম্পদ। হজরত লুত অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি ওই দোষ দু'টো থেকে।

পরের আয়াতে (৭১) বলা হয়েছে— 'লুত বললো, একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।' একথার অর্থ— হজরত লুত বললেন, হে অবিমৃশ্য জনতা! বৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হও। আমার কন্যাগণ রয়েছে। আরো রয়েছে আমার সম্প্রদায়ের কন্যাগণ। তোমরা তাদেরকে বিবাহ করে বাসনা পূর্ণ করতে পারো। এভাবে রক্ষা পেতে পারো আল্লাহ্‌র গজব থেকে।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমার জীবনের শপথ! তারা মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।' 'আসর' ও 'উসর ' শব্দ দু'টো সমার্থক। তবে লঘু শপথের বেলায় ব্যবহৃত হয় 'আসর'। শপথ প্রকাশার্থে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে এই শব্দটি। আবুল জাওজার মাধ্যমে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলের জীবনাপেক্ষা আর কোনো প্রিয় জীবন সৃষ্টি করেননি। তাঁর জীবন ব্যতীত অন্য কারো জীবনের শপথও করেননি। কারণ প্রিয়তম জনের শপথ করাই দস্তুর। 'ইয়া'মাহুন' অর্থ মত্ততায় মুহ্যমান বা বিমূঢ়। শ্রান্ত, ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত। অর্থাৎ সাদুমবাসীরা পাপোন্মত্ত। তাই তাদের কর্ণকুহরে কোনো সদুপদেশ প্রবেশ করেনি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের সম্বোধিতজন হন শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। সম্বোধনবচনটি ফেরেশতাগণেরও হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে সম্বোধিতজন হবেন হজরত লুত। আর মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতিথি ফেরেশতারা বললো, হে লুত! আপনার জীবনের শপথ! এই লোকগুলো কামের নেশায় উন্মত্ত। তাই আপনার উপদেশবাণী এদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হবে না। সুতরাং অরণ্যে রোদন করে কোনো লাভ নেই। আর এখানকার সম্বোধিতজন যদি রসুল স. হন, তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— নবী লুত ও তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়ের কাহিনী বিবৃত করার পর আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে জানাচ্ছেন, হে আমার প্রিয়তম ! আপনার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে লুতের সম্প্রদায় ছিলো অবাধ্য ও উন্মত্ত। তাই নবী লুতের মর্মস্পর্শী বাণী তাদের শ্রুতিকে জাগ্রত করেনি। ফলে তাদের বোধোদয়ও ঘটেনি।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো।' একথার অর্থ— বিকট, বীভৎস ও বিধ্বংসী আওয়াজে সূর্যোদয়কালে ধ্বংস হয়ে গেলো সাদুমবাসীরা। 'সাইহাতু' অর্থ মহানাদ বা বিকট বীভৎস বিধ্বংসী আওয়াজ। কেউ কেউ বলেছেন, ওই বিধ্বংসী মহাধ্বনি ছিলো হজরত জিবরাইলের। উল্লেখ্য যে, ওই মহানাদ শুরু হয়েছিলো অতি প্রত্যুষে এবং শেষ হয়েছিলো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এর পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'এবং আমি নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম।' একথার অর্থ— আমার নির্দেশে জিবরাইল ফেরেশতা সাদুমদের পুরো বসতি ঊর্ধ্বে উঠিয়ে উপুড় করে মৃত্তিকায় প্রোথিত করলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উপর কংকর বর্ষণ করলাম।' একথার অর্থ— মাটিতে প্রোথিত ওই ওল্টানো জনপদগুলোর উপরে আমার নির্দেশে বর্ষিত হলো অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড। এভাবে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো তারা। সুরা হুদে কাহিনীটির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এখানে 'সিজ্জীল' অর্থ ওই মৃত্তিকা, যা রূপান্তরিত হয় কঠিন শিলায়। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'ফা' অব্যয়টি যুক্ত থাকার কারণে বোঝা যায়, ঘটনাটির ধারাবাহিকতা ছিলো এরকম— প্রথমতঃ মহানাদ, তারপর জনপথগুলোকে উল্টিয়ে ফেলা এবং শেষে প্রস্তর বর্ষণ।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ○ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

❑ অবশ্যই ইহাতে পর্যবেক্ষণ-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

❑ যে পথে লোক চলাচল করে তাহার পার্শ্বে উহাদিগের ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান।

❑ অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাসীদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুতাওয়াস্‌সিমীন' অর্থ পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা দর্শক। মুজাহিদ বলেছেন, প্রত্যক্ষকারী বা সনাক্তকারী। কাতাদা বলেছেন, অনুধাবন ক্ষমতাসম্পন্ন। মুকাতিল বলেছেন, চিন্তাশীল। আমি বলি, 'ওসম' শব্দের অর্থ প্রভাব বিস্তার করা বা দাগ দেয়া । 'সিমাতুন' অর্থ, প্রভাব, আঁচড় বা দাগ। অর্থাৎ যারা বাহ্যিক আলামত বা চিহ্ন দেখে অভ্যন্তরীণ মর্ম ও পরিণতি অনুধাবন করতে সক্ষম, তারাই 'মুতাওয়াস্‌সিমীন' বা পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যই নিদর্শন রয়েছে বর্ণিত ঘটনাবলীতে।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'যে পথে লোক চলাচল করে, তার পাশে তাদের ধ্বংসস্তূপ এখনো বিদ্যমান।' একথার অর্থ— মৃত্তিকায় প্রোথিত ও প্রস্তরাবৃত অবাধ্য সাদুমদের জনপথগুলোর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সিরিয়া রাজ্যের গমনপথে এখনো বিদ্যমান। এখানে 'মুক্বীম' শব্দের অর্থ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বা এখনো বিদ্যমান।

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর শেষ রসুলকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য সাদুমবাসীদের মর্মন্তুদ পরিণতির মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ নিদর্শন।

সাদুমদের কাহিনীর ইতিটানা হয়েছে এখানেই। এরপর শুরু হয়েছে আসহাবে আইকা বা অরণ্যবাসীদের কথা। আরব উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে লোহিত সাগরের উপকূলে ছিলো মাদিয়ান নামক নগরী। বিস্তীর্ণ ঘন অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো মাদিয়ান। ওই অরণ্যের অধিবাসীদেরকেই বলা হতো আসহাবে আইকা বা অরণ্যবাসী।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯

وَإِنْ كَانَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

❒ শোয়াইব সম্প্রদায়ও তো ছিল সীমালংঘনকারী,

❒ সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, উহাদিগের উভয়েরই ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'শোয়াইব সম্প্রদায় তো ছিলো সীমালংঘনকারী।' একথার অর্থ— নবী শোয়াইবের সম্প্রদায়ও ছিলো জালেম বা সীমালংঘনকারী। আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্র নবী শোয়াইবকে তারা বিশ্বাস করতো না। এখানে আসহাবে আইকা বলে বুঝানো হয়েছে হজরত শোয়াইবের স্বজাতিকে। গহনবনের অধিবাসী ছিলো তারা। ওই বনে জন্মাতো ধূপের গাছ।

পরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।' একথার অর্থ— তাদের সীমালংঘনের যথোপযুক্ত শাস্তি আমি দিয়েছি। ওই মর্মন্তুদ শাস্তির প্রকৃতি ছিলো এরকম— দীর্ঘ সাত দিন যাবৎ তাদেরকে রাখা হয়েছিলো প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবহাওয়ায়। সাত দিন পর আকাশে ভেসে এলো এক টুকরো মেঘ। অরণ্যবাসীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো । বৃষ্টির আশায় আশ্রয় নিলো মেঘের ছায়ায়। অচিরেই শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। সে অগ্নিবৃষ্টিতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো তারা। ওই শাস্তিকে বলা হয় 'আজাবু ইয়াওমিজ্ জুল্লাহ্' বা ছায়া দিবসের শাস্তি।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের উভয়ের ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত।' একথার অর্থ— সাদুম ও অরণ্যবাসীদের ধ্বংসস্তূপ দু'টো সিরিয়ার প্রবেশ পথের পাশে প্রকাশ্য স্থানে এখনো বিদ্যমান। এখানে 'হুমা' (উভয়েরই) সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সাদুম ও অরণ্যবাসীদের গজবকবলিত জনপদের ধ্বংসাবশেষকে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে মাদিয়ান ও অরণ্যবাসীদের জনপদকে। ওই দুই জনপদের অধিবাসীদের পথ-প্রদর্শনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত শোয়াইব।

'ইমামিম্ মুবীন' অর্থ প্রকাশ্য পথের পাশে, যে পথ দিয়ে মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যপদেশে সিরিয়া গমনাগমন করতো। এখানে 'প্রকাশ্য পথের পাশে' বলে মক্কাবাসীদেরকে ওই ধ্বংসস্তূপ দেখে শিক্ষাগ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যার অনুসরণ করা হয়, তাকে বলে ইমাম। শিল্পকর্মের নমুনাকেও ইমাম বলে। কারণ সেই নমুনার অনুকরণ করা হয়। এভাবে লওহে মাহফুজ, ভবন নির্মাণ কর্মীর পরিমাপক সুতা এবং মানুষের চলার পথকেও ইমাম বলা হয়। কারণ এগুলোও অনুসরণীয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ○ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ○ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

❒ হিজরবাসিগণও রসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল;

❒ আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

❒ উহারা নিশ্চিন্ত হইয়া পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত।

❒ অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

❒ সুতরাং উহারা যাহা করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

আলোচ্য আয়াতপঞ্চকের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হিজরবাসীরাও আমার প্রিয় নবী সালেহ্ ও অন্যান্য নবীকে অস্বীকার করেছিলো। এখানে 'আসহাবু হিজর' অর্থ মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিজর নামক এক পার্বত্য উপত্যকার অধিবাসী। হিজরবাসীদেরকে ছামুদ জাতিও বলা হয়।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিলো।' একথার অর্থ— ওই হিজরবাসী বা ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী সালেহের প্রতি অবতীর্ণ সহীফাসমূহ অস্বীকার করেছিলো। অথবা অবমাননা করেছিলো তাঁকে প্রদত্ত মোজেজার। উল্লেখ্য যে, হজরত সালেহ্‌কে মোজেজা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো প্রস্তরাভ্যন্তরাগত একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। আবির্ভূত হওয়ার পরক্ষণে উষ্ট্রীটি প্রসব করেছিলো তার শাবক।

এর পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো।' একথার অর্থ— ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো গৃহ নির্মাণ কার্যে অত্যন্ত পারদর্শী। পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা সুদৃঢ়, নিরাপদ ও আরামদায়ক গৃহ নির্মাণ করতো। মনে করতো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত। এই ভাবনা তাদেরকে করে তুলেছিলো নিশ্চিন্ত, দুর্বিনীত ও উদাসীন।

এর পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর এক প্রভাতে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করলো।' একথার অর্থ— ছামুদ জাতি তাদের নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলো। অকস্মাৎ এক সকালে ধ্বনিত হলো বিকট, বীভৎস ও বিধ্বংসী আওয়াজ।

এর পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তারা যা করেছিলো তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।' একথার অর্থ — ওই বিরাট আওয়াজে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। তাদের নির্মাণশৈলী, সুদৃঢ় পর্বতাশ্রয় ও সহায় সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

সেই অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। তাবুক অভিযানের সময় উষ্ট্রারোহী রসুল স. চাদরে মুখ ঢেকে অতি দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন ওই স্থানটি। সহচরবৃন্দকে বলেছিলেন, সীমালংঘনকারীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতি অতিক্রম কোরো ক্রন্দনরত অবস্থায়। প্রার্থনা কোরো তোমাদের উপরে যেনো আবার ওইরূপ শাস্তি আপতিত না হয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৫, ৮৬

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই। এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সহিত উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

❐ তোমার প্রতিপালকই মহা স্রষ্টা, মহা জ্ঞানী।

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।' একথার অর্থ— আমি আমার সমগ্র সৃষ্টিকে যথাযথরূপে বিন্যস্ত করেছি। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের কোনো কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই মহাসৃষ্টিই তার স্রষ্টার অস্তিত্ব ও গুণবত্তার প্রমাণ। যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে এই বিশাল সৃষ্টির বহু বিচিত্র শৈলী ও রহস্যরাজির কথা বলে সহজেই বাকরুদ্ধ করে দেয়া যায়। তখন তাদের অজ্ঞতার অজুহাত আর খাটে না। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, এই মহাবিশ্ব আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য আমি বেঁধে দিয়েছি একটি সুন্দর নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো যাবে না। অনিয়ম, অশ্লীলতা ও অবাধ্যতার অবকাশ নেই এখানে। কারণ তা আল্লাহ্‌র বিধানবিরুদ্ধ। এ কারণেই যুগে যুগে অবাধ্য ও অসুন্দর মনোবৃত্তির লোকদেরকে ধ্বংস করে সৃষ্টির মর্যাদা ও সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রবহমান থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তুমি পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে তাদেরকে উপেক্ষা করো।' একথার অর্থ মহাপ্রলয় সুনিশ্চিত। তারপর অবশ্যই সংঘটিত হবে প্রতিফল প্রদান পর্ব। নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার। আর তাঁদের বিরুদ্ধ পক্ষকে দেয়া হবে শাস্তি। অতএব, হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহ হবেন না। তাদের প্রতি আন্তরিক ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা প্রদর্শনই আপনার জন্য শোভন।

পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, আল্লাহ্ মহাস্রষ্টা। আপনাকে যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন আপনার শত্রুদেরকেও। আপনাকে যেমন তিনি প্রতিপালন করেন, তেমনি প্রতিপালন করেন তাদেরকেও। সকলের সকল কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর তিনি মহাজ্ঞানী। তাই সকলের পাপ-পুণ্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। যথাসময়ে তিনি সকলকে প্রদান করবেন যথা প্রতিফল। সুতরাং আপনি আপনার সকল বিষয় তাঁর প্রতি ন্যস্ত করে অচঞ্চল থাকুন।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম এরকমও হতে পারে যে— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, আপনার প্রভুপালক মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী। তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ও ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সকলের পালনকর্তা। আপনার জন্য কী শোভন এবং কী অশোভন— সে সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন, শত্রুদের অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কথায় বিচলিত হবেন না। তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো ধনাঢ্য। সম্পদের বড়াই করা ছিলো তাদের স্বভাব। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে আখেরাতের সম্পদ। পার্থিব বৈভব অবক্ষয়-প্রবণ। কিন্তু আখেরাতের সম্পদ চিরস্থায়ী। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে আখেরাতের সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন অতুলনীয় ও অক্ষয় সম্পদ আল কোরআন। সে কথাই বিধৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ۝

❐ আমি তো তোমাকে দিয়াছি সুরা ফাতিহার সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহা কুরআন।

'মাছনাতুন' শব্দের বহুবচন 'মাছানী'। এর অর্থ পুনঃপুনঃ পঠিত । 'সাবায়ে মাছানী' অর্থ সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়। 'মাছনাতুন' শব্দটি ক্রিয়ার আধার। অথবা 'মাছানী' শব্দটি 'মুছনিয়াতুন' শব্দের বহুবচন। '

'মুছনিয়াতুন' হচ্ছে কর্তৃকারকের শব্দরূপ। এর অর্থ আবৃত্তিকারী। উভয় ক্ষেত্রেই মূল বিষয় 'আয়াত' অথবা 'সুরা' অনুক্ত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর, হজরত আলী ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পুনঃপুনঃ উচ্চার্য আয়াত সপ্তক হচ্ছে সুরা ফাতিহা। কাতাদা, হাসান বসরী, আতা এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরও এরকম বলেছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, সাতটি আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত সুরা ফাতিহা হচ্ছে কোরআনের জননী। এই সুরা নামাজের মধ্যে বার বার আবৃত্তি করতে হয়। আর এটাই হচ্ছে মহান কোরআন। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেছেন, নামাজের প্রতি রাকাতে এই সুরা পাঠ করতে হয় বলে এর নাম মাছানী।

এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সুরা ফাতিহার দু'টি অংশ। প্রথম অর্ধাংশে রয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর গুণবত্তার বিবরণ। তাই এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সঙ্গে। পরের অর্ধাংশ হচ্ছে বান্দার পক্ষ থেকে প্রার্থনা। তাই এর সম্পর্ক বান্দার সঙ্গে। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি সুরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দাগণের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি......। সুরা ফাতিহার তাফসীরে এই হাদিসের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

হোসাইন বিন ফজল 'মাছানী' নামকরণের আর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণটি হচ্ছে— সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে দু'বার। একবার মক্কায়। আরেক বার মদীনায়। প্রতিবার অবতীর্ণ হওয়ার সময় সত্তর হাজার করে

ফেরেশতা উপস্থিত ছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, 'মাছানী' অর্থ নির্বাচিত, পৃথকিত। আল্লাহ্‌তায়ালা শেষ রসুলের উম্মতের জন্য এই সুরাটিকে পৃথক করে রেখেছিলেন। পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকেই এই সুরা দান করেননি। আবু জায়েদ বলখী বলেছেন, 'মাছানী' শব্দটি বুৎপত্তি লাভ করেছে 'মাছনা'তুল ইনানা' (আমি লাগাম ফিরিয়ে দিয়েছি) থেকে। এভাবে 'মাছানী' কথাটির মর্মার্থ হবে— সুরা ফাতিহা দুষ্কর্মশীলদেরকে অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন, 'মাছানী' শব্দটি এসেছে 'ছানা' থেকে। 'ছানা' অর্থ প্রশংসা, প্রশস্তি বা স্তব-স্তুতি । অর্থাৎ সুরা ফাতিহা আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতিতে ভরপুর।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'সাব্‌য়ান' অর্থ সাতটি সুরা। এখানে 'মিনাল মাছানী' কথাটির 'মিন' অব্যয়টি বর্ণনামূলক । আর সাতটি সুরা অর্থ সাতটি দীর্ঘ সুরা । প্রারম্ভিক সুরা হচ্ছে সুরা বাকারা। এভাবে পরপর সাতটি বৃহৎ সুরা। আর সুরা আন্‌ফাল ও তওবা এক্ষেত্রে একটি সুরা হিসেবে গণ্য। কেউ কেউ বলেছেন, সুরা তওবা একটি পৃথক সুরা। এভাবে বৃহৎ সুরা সপ্তকের শেষ সুরা হচ্ছে সুরা তওবা। কারো কারো মতে সুরা ইউনুস।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই সাতটি সুরায় রয়েছে সম্পদ বণ্টন বিষয়ক বিধান, অপরাধের দণ্ডবিধান, পাপ-পুণ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন উদাহরণ।

জ্ঞাতব্যঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, 'সাব্‌য়া মাছানী' অর্থ কোরআনের প্রথমার্ধের সাতটি দীর্ঘ সুরা। হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সুফিয়ান সওরী প্রমুখও একথা বলেছেন। আমি বলি, সম্পূর্ণ কোরআন মজীদই 'মাছানী'। কারণ কোরআন মজীদে বিভিন্ন কাহিনী বারংবার উল্লেখিত হয়েছে।

হজরত আসাকের থেকে মোহাম্মদ বিন নসর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে তওরাতের স্থলে দান করেছেন সাতটি দীর্ঘ সুরা। ইঞ্জিলের স্থলে দান করেছেন আলিফ লাম র সংযুক্ত সুরা থেকে ত্ব সীন সংযুক্ত সুরাসমূহ। আর যবুরের স্থলে দিয়েছেন ত্ব সীন সংযুক্ত সুরা থেকে হা মীম সংযুক্ত সুরাসমূহ। হা মীম সুরাগুলো আমাকে দেয়া হয়েছে অতিরিক্ত দান হিসেবে। আমার পূর্বে কোনো নবীকেই 'মুফাস্‌সলাত্ সুরাসমূহ দান করা হয়নি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিশেষ উপহার হিসেবে রসুল স.কে দেয়া হয়েছে দীর্ঘতর সাতটি সুরা। হজরত মুসাকে দান করা হয়েছিলো ছয়টি সুরা। তুর পাহাড় থেকে ফিরে এসে উম্মতকে বিভ্রান্ত হতে দেখে ক্ষোভবশতঃ তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন তওরাতের ফলকগুলো। পুনঃউত্তোলনের সময় তিনি উঠিয়ে নিয়েছিলেন দু'টি সুরা। বাকী চারটি আর ওঠাননি।

এরকম বর্ণনাও এসেছে যে, কোরআন মজীদে হা মীম সহযোগে গ্রন্থিত হয়েছে সাতটি সুরা। ওই সাতটি সুরাই হচ্ছে 'সাব্‌য়া মাছানী' বা বাণী সপ্তক। স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে তওরাতের স্থলে দিয়েছেন দীর্ঘ সাতটি সুরা। ইঞ্জিলের বদলে দিয়েছেন 'মিআইন' এবং যবুরের বদলে দিয়েছেন 'মাছানী'। আর মুফাস্-সালাত্‌কে দিয়েছেন অতিরিক্ত উপহার হিসেবে।

তাউস বলেছেন 'মাছানী' অর্থ সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহু নায্‌যালা আহ্‌সানাল হাদীসি কিতাবাম্ মুতাশাবিহাম্ মাছানী' (আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী, নিরুপম সুসংগত গ্রন্থ)। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'মিন' অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। সুতরাং 'সাবয়া' বা 'সাত' কথাটির অর্থ হবে এখানে— সাতটি সুরা।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'মাছানী' বলে বোঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদকে। আর 'সাব্‌য়া' কথাটির অর্থ হবে এখানে সাতটি খণ্ড। অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোরআন হচ্ছে সাতটি খণ্ডের সম্মিলিত রূপ। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আয়াতের শেষ কথা 'ওয়াল কুরআনিল আ'জীম (এবং দিয়েছি মহা কোরআন) কথাটি সংযুক্ত হবে বিশেষণের পার্থক্যের কারণে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ○ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ○

❑ আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের কতককে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও লক্ষ্য করিও না। এবং উহারা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না, তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি বিনয়ী হইবে।

❑ এবং বল 'আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কতককে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো লক্ষ্য কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মতো অক্ষয় ঐশ্বর্য আমি আপনাকে দান করেছি। এর তুলনায় পার্থিব ঐশ্বর্যের কোনো মূল্যই নেই। সুতরাং

বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণসমূহ আমি দিয়েছি, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করবেন না। এখানে 'আয্ওয়াজ' অর্থ শ্রেণী। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

ইসহাক ইবনে রহ্ওয়াইহ্ তাঁর মসনদে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, কোরআনপ্রাপ্ত কেউ যদি ঐশ্বর্যশালীদেরকে উত্তম মনে করে, তবে বুঝতে হবে, সে ক্ষুদ্র অনুগ্রহকে বৃহৎ অনুগ্রহ ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছে। কোরআনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন যার জন্য যথেষ্ট নয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূত নয়। এই হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, কোরআনের মতো নেয়ামত পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি পার্থিব ঐশ্বর্য থেকে বিমুখ হয়নি, সে আমার উম্মতের পর্যায়ভূত নয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও বায়হাকী, হজরত সা'দ থেকে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত আবু লুবাবা থেকে ইবনে মুনজিরের মাধ্যমে আবু দাউদ, হজরত ইবনে আব্বাস ও জননী আয়েশা থেকে হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অসৎ লোকের সম্পদদৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হয়ো না। তার জন্য রয়েছে মৃত্যুহীন হন্তারক। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, পৃথিবী প্রেমিকদের অঢেল বিত্ত-বৈভব দেখে লোভাতুর হয়ো না। তোমরা তো জানো না, মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা ঘটবে। আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে তার মৃত্যুহীন হত্যাকারী। সে কি মৃত্যুবরণ করবে না ? ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বার নিকটে হাদিসটি পৌঁছানো হলে তিনি আবু দাউদ আনওয়ারকে প্রেরণ করে জানতে চাইলেন, মৃত্যুহীন হত্যাকারী আবার কে? আবদুল্লাহ্ ইবনে মরিয়ম জবাব দিলেন, মৃত্যুহীন হত্যাকারী হচ্ছে দোজখ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা নিম্নপর্যায়ের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরো। উচ্চপর্যায়ের মানুষের দিকে দৃষ্টি দিয়ো না (তাহলে প্রাপ্ত নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে হবে না)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য তুমি ক্ষোভ কোরো না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! চিরভ্রষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান না আনার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। পার্থিব বিত্ত-বৈভবের মধ্যেই তাদেরকে মগ্ন থাকতে দিন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হয়ো।' এখানে 'আখ্ফিদ্ব জানাহাকা' কথাটির শাব্দিক অর্থ ডানা বা বাহু অবনত কোরো। লিল্ মু'মিনীন্ অর্থ বিশ্বাসীদের প্রতি। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— বিনয়ী হয়ো বিশ্বাসীদের প্রতি। অর্থাৎ 'ডানা অবনত কোরো' কথাটির প্রকৃত অর্থ এখানে, বিনয়ী হয়ো।

পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'এবং বলো, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে বলে দিন, আমি বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তোমাদেরকে একথা বুঝাতে চেয়েছি যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে শাস্তি অবধারিত। এভাবে তোমাদেরকে সতর্ককরণ ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব আমার নেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯০, ৯১

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ۝ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ۝

❒ তোমার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যেভাবে অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাদিগের প্রতি যাহারা এখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত,

❒ যাহারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আমি যেমন কোরআন অবতীর্ণ করেছি, তেমনি আপনার সময়ের মতানৈক্য জর্জরিতদের প্রতিও ইতোপূর্বে অবতীর্ণ করেছিলাম তওরাত ও ইঞ্জিল। আজ তারা কোরআনের কোনো কোনো অংশ মানতে চায়, আবার কোনো কোনো অংশ করতে চায় বর্জন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' অর্থ বিভিন্ন মতে বিভক্ত বা মতানৈক্যসৃষ্টিকারী। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার এক লোক আলোচ্য আয়াতদ্বয় পাঠ করে রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, এখানে 'বিভিন্ন মতে বিভক্ত' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি স. বললেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। লোকটি বললো, এখানে 'ইদ্বীন' কথাটির অর্থ কি? তিনি স. বললেন, কিছু অংশ বিশ্বাস করা এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করা।

'ইদ্বীন' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ইদ্বাতুন'। 'ইদ্বাতুন' অর্থ টুকরা বা খণ্ড। যেমন বলা হয়— ইদ্বাশ্‌শাতা (ছাগলটিকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে)। ইহুদী ও খৃষ্টানেরাও এভাবে কোরআন মজীদকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলো। একভাগের বিবরণ সম্পর্কে তারা বলতো, এগুলো তওরাত ও ইঞ্জিলের অনুরূপ। তাই আমরা এগুলো বিশ্বাস করি। অপরভাগের বিবরণসমূহকে তারা বলতো, এগুলো তওরাত ও ইঞ্জিলের বিরোধী। তাই আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না। এমন বর্ণনাও এসেছে যে, তারা উপহাসচ্ছলে বলতো, সুরা বাকারা আমার। আবার কেউ বলতো, আমার সুরা হচ্ছে সুরা আলে ইমরান।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলে বোঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। আর কোরআন বলে বুঝানো হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থকে। তারা তা অধ্যয়ন করতো। কিন্তু মান্য করতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে যারা কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন কটুকাটব্য করতো। কেউ বলতো কোরআন হচ্ছে যাদুগ্রন্থ। কেউ বলতো কাব্যগ্রন্থ। কেউ বলতো উপাখ্যান। আবার কেউ কেউ বলতো, প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি যারা অশোভন উক্তি করতো, তাদেরকেই এখানে 'আলমুক্বতাসিমীন' বলা হয়েছে। ওই হতভাগ্যদের কেউ কেউ তাঁকে বলতো, যাদুকর। কেউ বলতো, কবি। আবার কেউ বলতো কাহিনীকার।

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, একবার হজের মৌসুমে ওলীদ বিন মুগীরা ষোলজন লোককে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসিয়ে দিলো এবং বললো, তোমরা কাউকে মোহাম্মদের কাছে ভিড়তে দিয়ো না। বিভিন্ন কথা বলে দর্শনার্থীদেরকে নিরস্ত্র কোরো। লোকগুলো তাই করলো। কেউ বললো, মোহাম্মদ তো পাগল। কেউ বললো, সে তো যাদুকর। কেউ বললো, সে তো কাহিনীকার মাত্র। কেউ আবার বললো, সে তো কবিতা রচয়িতা। ওলিদ বিন মুগীরা বসেছিলো কাবা প্রাঙ্গণে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? মোহাম্মদকে কেউ কেউ উম্মাদ বলছে। কেউ বলছে যাদুকর। কেউ আবার বলছে, কবি ও কাহিনী রচয়িতা। তুমি কী বলো? ওলীদ বললো, সবাই ঠিক কথা বলেছে।

এখন কথা হচ্ছে, আলমুক্বতাসিমীন আসলে কারা? তাদের উপরে তো শাস্তি আপতিত হয়েছিলো। ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে যদি আলমুক্বতাসিমীন ধরা হয়, তবে বলতে হয় বনী কুরায়জার নিধনপর্ব ও বনী নাজিরের বিতাড়নই ছিলো সেই শাস্তি। আর ওলীদ বিন মুগীরা ও মক্কার মুশরিকদেরকে যদি আলমুক্বতাসিমীন বলা হয়, তবে তাদের উপরে আপতিত শাস্তি হিসেবে ধরতে হয় বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানিকে। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, 'আলমুক্বতাসিমীন' এর ধাতুমূল হচ্ছে কসম। কসম অর্থ শপথ। এভাবে 'আলমুক্বতাসিমীন' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— শপথকারী। আর শপথকারী হবে তারা, যারা গভীর নিশিথে হজরত সালেহ্‌কে হত্যা করবে বলে শপথ করেছিলো। যথোপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছিলো তারা।

কোনো কোনো অভিধানবেত্তা লিখেছেন, এখানকার 'ইদ্বীন' শব্দটি 'ইদ্বাতুন' এর বহুবচন। এর ধাতুমূল হচ্ছে 'আদ্বহাতুন' । 'আদ্বহাতুন' অর্থ অপবাদ। যেমন, শাফাতুন্ এর ধাতুমূল হচ্ছে 'শাফ্হাতুন'। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'ইদ্বাতুন' অর্থ মিথ্যা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে রসুল স. তাঁর প্রাণপ্রিয় সহচরবৃন্দের নিকট থেকে

বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, ওই বায়াতনামার একটি শর্ত ছিলো— ওয়ালা ইয়াদ্বিহু বা'দ্বুনী বা'দ্বান (কেউ যেনো কাউকে অপবাদ না দেয়)। অপর এক হাদিসে এসেছে— 'ইয়্যাকুম ওয়াল 'ইদ্বতা' (তোমরা অপবাদ প্রদান সম্পর্কে শংকিত হয়ো)। জামাখশারী বলেছেন, 'ইদ্বাতুন' শব্দটির ধাতুমূল 'ইদ্বহাতুন'। এর অর্থ, অপবাদ। নিহায়া।

কোনো কোনো অভিধানবিশারদ লিখেছেন, 'ইদ্বাতুন' অর্থ, যাদু। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'আল আয়দ্বুন' অর্থ যাদু। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— লায়ামাল্লহুল্ আদ্বিহাতা ওয়াল মুস্তা'দ্বিহাতা (যাদুকর ও যাদুকারিণীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত)।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'কামা আন্‌যালনা' (যেমন আমি অবতীর্ণ করেছি) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'ওয়া লাকৃদ্ আতাইনাকা' (এবং অবশ্যই দিয়েছি) কথাটির সঙ্গে আয়াত (৮৭)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— আমি যেমন আপনার উপরে পুনঃপুনঃ উচ্চারণীয় বাণী সপ্তক ও মহাগ্রন্থ কোরআন দান করেছি, তেমনি ইহুদী-খৃষ্টানদের উপরেও অবতীর্ণ করেছি তওরাত ও ইঞ্জিল। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, 'লা তামুদ্দান্না' থেকে বাক্যের শেষ পর্যন্ত (আয়াত ৮৮) অপ্রাসঙ্গিক। আর 'আল্লাজীনা জায়ালুল্ কুরআনা ই'দ্বীন' (যারা কোরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে) বাক্যটি হবে 'আলমুক্বতাসিমীনা' (বিভিন্ন মতে বিভক্ত) কথাটির বিশেষণ। আর 'বিভিন্ন মতে বিভক্ত' বলে হজরত সালেহের হত্যাকারীদেরকে বুঝানো হয়ে থাকলে 'আল্লাজীনা জায়ালুল ক্বুরআনা' বাক্যটি হবে উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী আয়াত হবে এর বিধেয়।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯২, ৯৩

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❐ সুতরাং, শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই

❐ সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং হে আমার রসুল! শপথ আপনার প্রভুপালকের। আমি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবোই। জিজ্ঞাসাবাদ করবো সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অন্যান্য পাপ সম্পর্কে। কোরআনকে বিভক্তিকরণ সম্পর্কে। কোরআন ও আমার রসুলের প্রতি নিক্ষিপ্ত কটুক্তিসমূহ সম্পর্কে। এভাবে যাচাই বাছাই করে আমি তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করবোই এবং এর জন্য শাস্তি প্রদানও করবো।

ইমাম বোখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে 'আম্মা কানু ইয়া'মালূন' (যা তারা করে) কথাটির মর্মার্থ — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার বিষয়ে তাদের অভিমত ও কর্তব্য কী, ছিলো তা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রসুল স.বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র বিষয়ে আমিও জিজ্ঞাসিত হবো।

হজরত আবু বুরদা থেকে মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র বান্দারা চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। প্রথমে প্রশ্ন করা হবে আয়ুষ্কাল সম্পর্কে। বলা হবে, পৃথিবীর জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে শরীর সম্পর্কে। বলা হবে শারীরিক শক্তি ব্যয় করেছো কোন পথে? তৃতীয় প্রশ্ন হবে জ্ঞান সম্পর্কীয়। বলা হবে, জ্ঞানানুসারে কর্ম করেছো কি না? ধন সম্পর্কে উত্থাপন করা হবে চতুর্থ প্রশ্নটি। বলা হবে, ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলে কোন পন্থায়। ব্যয়ই বা করেছো কোন পথে? হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়াও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা রাগেব ইসপাহানী তাঁর 'তারসীব' গ্রন্থে এবং তিবরানী তাঁর 'আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা জ্ঞান বিতরণের বিষয়ে পারস্পরিক শুভেচ্ছাকে কার্যকর করো। জ্ঞান গোপন কোরো না। ধন-সম্পদ আত্মসাৎ অপেক্ষা জ্ঞান আত্মসাৎ অধিকতর অন্যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষ যেদিকেই যাকনা কেনো, আল্লাহ্ তার প্রতিটি পদবিক্ষেপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে লিখেছেন, রসুল স. বলেন, জননেতার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকা অত্যাবশ্যক। মানুষের অধিকার সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতেই হবে। সে তার নেতৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যথার্থ নেতৃত্বের কারণে সে পুণ্যলাভ করবে আর অযথার্থ নেতৃত্বের কারণে হবে অপরাধী। অনুগামীদের নামাজের ত্রুটির কারণেও দায়ী করা হবে তাকে।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে ইবনে আবী হাতেম একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি এই — রসুল স. একবার হজরত মুয়াজকে বললেন, হে মুয়াজ! বিচার দিবসে মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি চোখে ব্যবহৃত সুরমা সম্পর্কেও।

হাসান বসরী থেকে বায়হাকী ও ইবনে আবিদ্‌দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভাষণদাতার বক্তব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হাদিসটির সূত্র অবিন্যস্ত। কারণ এর মধ্যে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই। হাসান বসরী ছিলেন তাবেয়ী (এক বা একাধিক সাহাবীকে যাঁরা দেখেছেন)।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আনফা' ইবনে আবদুল্লাহ্ কালাঈ' বলেছেন, জাহান্নামের উপরে রয়েছে সাতটি সেতু। প্রথম সেতুর নিকটেও আটক করা হবে সকলকে। বলা হবে, থামো। এখন নামাজ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। যথার্থ জবাব যারা দিতে পারবে না, তারা এখানেই নিপাত যাবে। আর যারা কৃতকার্য হবে, তারা প্রথম সেতু অতিক্রম করে পৌঁছবে দ্বিতীয় সেতুর পাড়ে। সেখানে প্রশ্ন করা হবে আমানত সম্পর্কে। বলা হবে, আমানত রক্ষিত হয়েছে, না করা হয়েছে আত্মসাৎ? আমানত আত্মসাৎকারীরা আর অগ্রসর হতে পারবে না। সেতু অতিক্রম করে পরবর্তী সেতুর সন্নিকটে পৌঁছবে কেবল আমানতদারেরা। ওই তৃতীয় সেতু অতিক্রমের পূর্বে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা না করা সম্পর্কে। সেখানে আত্মীয়তা অভিযোগ করবে, হে দয়াময় আল্লাহ্! আমাকে যারা সম্মিলিত রেখেছিলো, তুমিও তাদেরকে তোমার দয়ার সঙ্গে সম্মিলিত করো। আর পৃথক করে দাও তাদেরকে, যারা আমাকে করে দিয়েছিলো পৃথক।

ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি স্বয়ং শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, বিচার দিবসে আল্লাহ্ তাঁর দাসদের কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণ করবেন। এমনও বলবেন, তুমি অমুক অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে বাধা দাওনি কেনো? সে সময় আল্লাহ্ অন্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে যাকে সাহায্য করবেন, সে বলতে পারবে, হে আমার প্রভুপালক! আমিতো তোমার উপরে ভরসা করেছিলাম। তারা ছিলো উচ্ছৃঙ্খল। তাই তাদের প্রতি আমি অন্তরে পোষণ করতাম ভয় ও ঘৃণা।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত। দায়িত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ জিজ্ঞাসিত হবে তার প্রতিপালনাধীন পরিবার সম্পর্কে। স্ত্রীও জিজ্ঞাসিত হবে তার স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও তার সংসার সম্পর্কে। ক্রীতদাসকেও জিজ্ঞেস করা হবে তার মনিবের সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে। হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান, আবু নাঈম ও তিবরানীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা তিবরানী তাঁর 'আল কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত মিকদাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, জনগণের নেতা হয় সে-ই, যে জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। সে তার অনুগামী জনতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অনুগামীরাও জিজ্ঞাসিত হবে তাদের নেতা সম্পর্কে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দশজন লোকের নেতাও তার অধীনস্তদের সম্পর্কে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এরকম হাদিস রয়েছে অনেক।

একটি সন্দেহঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জিজ্ঞাসাবাদ ও এতদ্সম্পর্কিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে একথা সুপ্রমাণিত যে, বিচার দিবসে প্রত্যেকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেই। কিন্তু এক আয়াতে বলা হয়েছে— আজ কোনো মানব-জ্বিনকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী নয় কি?

সন্দেহের নিরসনঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন এরকম প্রশ্ন করা হবে না যে, ওই কর্মটি তুমি করেছিলে কিনা? কারণ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি তো সকল কিছুই জানেন। তাই প্রশ্ন করা হবে, ওই অপকর্মটি তুমি কেনো করেছিলে?

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তালহার মাধ্যমে বায়হাকী উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। জবাবদিহি সম্পর্কিত ওই হাদিসের প্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, প্রশ্ন হবে দুই ধরনের। ১. জ্ঞানার্জন ও অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কিত। ২. হুমকি প্রদান অথবা অভিযুক্ত করবার জন্য। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রশ্ন তো আল্লাহ্ করতেই পারেন না। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আজ কোনো মানুষ-জ্বিনকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আর আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় ক্রমিকে উল্লেখিত অভিযোগসূচক প্রশ্ন। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতি আগাম হুঁশিয়ারী।

ইকরামার এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বিচার দিবস হবে দীর্ঘতম। সেখানে থাকবে অসংখ্য অবস্থান স্থল। থাকবে অসংখ্য পথ। দেখা যাবে কোনো পথে অথবা স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আবার কোনো স্থানে প্রশ্নই নেই। এভাবেই সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে জবাবদিহি সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলোকে। আসল কথা হচ্ছে, স্থান কাল ও পাত্রভেদে তখনকার অবস্থা হবে বিভিন্ন রকম। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আজ এমন দিন, কোনো লোক কিছু বলবে না।' আবার পরক্ষণেই বলা হয়েছে— বিচার দিবসে তোমরা বিতণ্ডা শুরু করে দিবে স্বীয় প্রভুপালকের সম্মুখে। হাকেমও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৪

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

❒ অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদিগকে উপেক্ষা কর।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অতএব হে আমার রসুল! যে বিষয়ে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তা সরবে প্রচার করতে থাকুন। উপেক্ষা করুন অংশীবাদীদের বিরোধিতাকে। আমিই আপনার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক।

এখানে 'ইসুদায়্' অর্থ প্রকাশ করুন। একথা বলেছেন হজরত আব্বাস । এভাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে ইমান ও ইসলামের আমন্ত্রণ উচ্চকিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসুল স. প্রচারকার্য চালাতেন সংগোপনে। প্রকাশ্য প্রচারের নির্দেশপ্রাপ্তির পর তিনি স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ অবতীর্ণ হলেন প্রকাশ্য প্রচারে। হজরত ইবনে আব্বাস এরকমও বলেছেন যে, 'ইস্দায়্ বিমা তু'মারু' অর্থ আমন্ত্রণ জানাতে থাকুন। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ সত্য ধর্মের কথা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিন। আখফাশ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এরকম— কোরআন প্রচারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করুন। সিব্ওয়াইহ্ বলেছেন, মর্মার্থ হবে— আপনাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে তদনুরূপ সমাধান দিন। 'সদ্উন্' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— পৃথক করে দেয়া, চিরে দেয়া, আলাদা করা।

'অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা করুন' কথাটির অর্থ এখানে — অংশীবাদীদের পরওয়া করবেন না। কেউ কেউ বলেছেন, যুদ্ধবিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৫

إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○

❒ আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদিগের বিরুদ্ধে,

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বিদ্রূপকারীদের প্রতি দৃকপাত করবেন না। তাদের চেয়ে আপনাকেই আমি অধিক শক্তিশালী করেছি। আমি অবশ্যই তাদের মূলোৎপাটন করবো। তাদেরকে নিপাত করেই ছাড়বো।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে নির্ভয়ে তাঁর বাণী প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত হবেন না। আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ই আপনাকে সহায়তা করবেন। উল্লেখ্য যে, ওই সময় রসুল স. এর প্রতি বিদ্রূপকারী কুরায়েশ নেতাদের সংখ্যা ছিলো পনেরো। প্রধান নেতা ছিলো ওলীদ বিন মুগীরা মাখজুমী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলো আস বিন উয়াইল সাহ্মী ও আস্ওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন হারেছ, আসাদ বিন আবদুল উজ্জা। আসওয়াদের

জন্য রসুল স. বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি ওকে অন্ধ করে দাও। করে দাও নিঃসন্তান। চতুর্থ দুশমন ছিলো আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ বিন ওয়াহাব বিন মন্নাফ বিন জুহ্‌বাহ্। পঞ্চম শত্রু হারেছ বিন কয়েস বিনত্ তুলালাহ্। একদিনের ঘটনা— রসুল স. এর প্রতি বিদ্রূপপ্রবণ শত্রুরা একদিন কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলো। কাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন রসুল স.। ওলীদ বিন মুগীরা তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলো। এমন সময় আবির্ভূত হলেন হজরত জিবরাইল। রসুল স. এর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! লোকটি কেমন? তিনি স. বললেন, বড়ই মন্দ। হজরত জিবরাইল বললেন, আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে আপনার কাজ করে দেয়া হলো। বলেই তিনি ইঙ্গিত করলেন ওলীদের পাঁজরের দিকে। কয়েকদিন পরের ঘটনা। খাজায়ী গোত্রের এক লোক তার তীরে পালক বাঁধছিলো। মহামূল্যবান ইয়েমেনি উত্তরীয় পরিহিত অবস্থায় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো ওলীদ। তার লুঙ্গি ছিলো ভূলুণ্ঠিত। আর পদবিক্ষেপ ছিলো দর্পিত। হঠাৎ খাজায়ী লোকটির তীর জড়িয়ে গেলো তার ভূলুণ্ঠিত লুঙ্গির সঙ্গে। সে স্বজোরে পদাঘাত করে তীরটিকে দূরে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু কেমন করে যেনো তীরের আঘাতে কেটে গেলো তার পাঁজর, যে পাঁজরের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ওলীদের পাঁজরের জখম আর ভালো হলো না। জখমের ঘা বরং বাড়তে লাগলো দিন দিন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলো সে।

আরেক দিনের ঘটনা — রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো আস্ বিন ওয়াইল্। হজরত জিবরাইল উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! এ লোকটি কেমন? রসুল স. বললেন, অসৎ। হজরত জিবরাইল ইঙ্গিত করলেন তার পদতলের দিকে। বললেন, এর সম্পর্কেও আপনাকে আর ভাবতে হবে না। কিছুদিন পর আস তার দুই পুত্রসহ উষ্ট্রারোহী হয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বের হলো। মক্কার বাইরে এক স্থানে স্থগিত করলো তার যাত্রা। সেখানে একখানি কাপড়ের পুঁটলি দেখে ভাবলো, পুঁটলিটির উপরে পা রেখেই নেমে পড়া যাক। তাই করলো সে। পুঁটলিটির ভিতরে ছিলো কাঁটা। সেই কাঁটা বিঁধে গেলো তার পায়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে। বললো, মনে হয় কোনো বিষাক্ত প্রাণী আমাকে দংশন করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিষাক্ত প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেলো না। পা ফুলতে লাগলো তার। শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই তাকে প্রাণত্যাগ করতে হলো।

আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের উপরেও এভাবে নেমে এসেছিলো অলৌকিক শাস্তি। একদিন তাকে দেখিয়ে হজরত জিবরাইল জানতে চাইলেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! এই লোকটি কী রকম? রসুল স. বললেন, অশুভ। হজরত জিবরাইল ইশারা করলেন তার চোখের দিকে এবং বললেন, ওর সম্পর্কে আপনাকে আর

দুশ্চিন্তা করতে হবে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত জিবরাইল ওই সময় তার চোখে নিক্ষেপ করেছিলেন একটি সবুজ রঙয়ের পাতা। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে শুরু হয়ে গিয়েছিলো অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণার চোটে সে দেয়ালে মাথা ঠুকতো। এভাবে এক সময় সে হয়ে গেলো অন্ধ। অতিসত্বর মৃত্যুও ঘটলো তার।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন অনুচরসহ আস্‌ওয়াদ বসেছিলো এক বৃক্ষমূলে। হঠাৎ হজরত জিবরাইল সেখানে উপস্থিত হয়ে তার মাথা ধরে সজোরে ঠুকতে শুরু করলেন বৃক্ষটির কাণ্ডে। কাঁটা দিয়ে প্রহার করতে থাকলেন তার মুখে। বিকট চিৎকার শুরু করে দিলো আসওয়াদ। সাহায্য চাইলো তার ক্রীতদাসের কাছে। ক্রীতদাস বললো, কই আমি তো কিছুই দেখছি না। আপনি তো নিজে নিজেই গাছে মাথা ঠুকছেন। সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, মোহাম্মদের আল্লাহ্‌ই আমাকে শেষ করে ফেললো। বলতে বলতেই জীবনাবসান ঘটলো তার।

রসুল স. এর পাশ দিয়ে একবার আস্‌ওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ কোথাও যাচ্ছিলো। সে ছিলো রসুল স. এর মামাতো ভাই। প্রায়শঃই সে রসুল স. কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। হজরত জিবরাইল রসুল স. এর নিকট থেকে তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জেনে নিলেন এবং বললেন, ওর সম্পর্কে আপনাকে আর চিন্তিত হতে হবে না। বলেই তিনি ইশারা করলেন আস্‌ওয়াদের উদরের দিকে। অল্পদিনের মধ্যেই সে আক্রান্ত হলো জলাতঙ্ক ব্যাধিতে। ওই রোগেই নির্বাপিত হলো তার জীবন প্রদীপ।

কালাবীর বর্ণনায় ঘটনাটি এসেছে এভাবে— একবার আস্‌ওয়াদ ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো। বাইরে চলছিলো লু হাওয়ার দাপা-দাপি। ওই বিদঘুটে লু হাওয়ার সংস্পর্শে তার গায়ের চামড়া হয়ে গেলো হাবশীদের মতো কুচকুচে কালো। সে গৃহে ফিরে এলো। কিন্তু গৃহবাসীরা কেউই তাকে চিনতে পারলো না। তারা সকলে তাকে জোর করে বাড়ীর বাইরে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো তার আয়ু। মৃত্যুকালে সে-ও চিৎকার করে বলেছিলো, মোহাম্মদের পালনকর্তাই আমাকে হত্যা করলো।

হারেছ ইবনে কায়েস সম্পর্কেও একবার হজরত জিবরাইল জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, সে দুর্হৃদ। হজরত জিবরাইল ইঙ্গিত করলেন তার মস্তকের দিকে এবং বললেন, আপনার কর্তব্য আমিই সমাধা করে দিলাম। কিছুদিন পরেই হারেছের নাক দিয়ে নির্গত হতে শুরু করলো গলিত পুঁজ। এই দুরারোগ্য রোগেই তার প্রাণ-বিয়োগ ঘটলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হারেছ বিন কায়েস উদরস্থ করেছিলো লবণাক্ত মাছ। ফলে সে আক্রান্ত হয়েছিলো প্রাণঘাতি

পিপাসায়। পানি পান করতে করতে অস্বাভাবিক আকারে পেট ফুলে গেলেও পিপাসা মিটতো না তার। এভাবে একদিন পেট ফেটে মারা গেলো সে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে' কথাটির বাস্তবায়ন ঘটেছিলো এভাবেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, আবু নাঈম ও বায়হাকী লিখেছেন, ওলীদ বিন মুগীরা, আস্ বিন ওয়াইল, আদি বিন কায়েস, আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ এবং আসওয়াদ বিন মুত্তালিব— কুরায়েশদের এই পাঁচ জন দলপতি সবচেয়ে বেশী উপহাস করতো রসুল স.কে। হজরত জিবরাইল একবার রসুল স.কে জানালেন, হে ভ্রাতঃ! আপনার পক্ষ থেকে এদের মূলোৎপাটন করবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। একথা বলে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে ওলীদের পাঁজরের দিকে তাকালেন। ওই তির্যক দৃষ্টিপাতের বাস্তব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলো এভাবে— এক লোক তার তীর মেরামত করছিলো। অতর্কিতে তীরটি বিদ্ধ হলো ওলীদের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্রে। নিচু হয়ে তীরটি না খুলে সে অহংকার বশতঃ সজোরে পা ঝাড়া দিলো। এতে করে তার পরিধেয় বস্ত্র তীরমুক্ত হলেও তার পাঁজরের একস্থানে তীরের অগ্রভাগের আঘাতে কেটে গেলো। ওই জখমই হলো তার কাল। কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হলো তাকে। আস বিন ওয়াইলের পায়ের তালুর প্রতি ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ফলে একদিন তার পদতলে বিদ্ধ হলো একটি কাঁটা। ভয়ংকররূপে ফুলে উঠলো তার পা। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যে সে মারা পড়লো। হজরত জিবরাইল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন আদি বিন কায়েসের নাসিকার প্রতি। এর ফলে গলিত পুঁজ নির্গত হতে শুরু করলো তার নাক থেকে। ওই দুরারোগ্য রোগে সে নিপাত হয়ে গেলো। আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছের মস্তকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন হজরত জিবরাইল। ফলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো এভাবে— একবার সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে বসেছিলো একটি গাছের গোড়ায়। হঠাৎ সে উঠে নিজে নিজেই গাছের সাথে ঠুকতে শুরু করলো তার মাথা। কাঁটার প্রহার পড়তে শুরু করলো তার মুখমণ্ডলে। এভাবেই অপমৃত্যু হলো তার। হজরত জিবরাইল রোষতপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন আসওয়াদ বিন মুত্তালিবের চোখে। ফলে সে হয়ে গিয়েছিলো অন্ধ। ওই অনারোগ্য অন্ধত্বই উপলক্ষ হয়েছিলো তার মৃত্যুর।

হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বাযযার ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁর দিকে কটাক্ষ করে বলতে শুরু করলো, এই সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। তখন রসুল স. এর পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত জিবরাইল। তিনি রাগত দৃষ্টি নিবদ্ধ

করলেন লোকগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরে দেখা দিলো নখরাঘাতের চিহ্ন। ওই দাগগুলোই পরিণত হলো ভয়াবহ ফোঁড়ায়। গলিত ফোঁড়াগুলো থেকে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হতে শুরু করলো যে, কেউ আর তাদের কাছে তিষ্ঠাতে পারলো না। আলোচ্য আয়াত বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো এভাবেই।

সুরা হিজর ঃ আয়াত ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

❒ যাহারা আল্লাহের পাশে অপর ইলাহ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে! এবং শীঘ্রই উহারা ইহার পরিণাম জানিতে পারিবে।

❒ আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়;

❒ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও;

❒ তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা আল্লাহ্‌র উপাসনার অংশীদার হিসেবে অপর কোনো উপাস্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের ওই অপকর্মের পরিণাম কতো ভয়াবহ।

পরের আয়াতের (৯৭) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আমি তো জানি অংশীবাদীদের অসংগত কথা শুনে আপনার হৃদয় ব্যথিত হয়।

এর পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার মনোবেদনা প্রশমনার্থে আপনার প্রভুপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন। বিরুদ্ধবাদীদের কথায় কর্ণপাত মাত্র করবেন না। এরকমও অর্থ হতে পারে যে, হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস বিমিশ্রিত উক্তি থেকে আল্লাহ্‌পাককে পবিত্র করুন। তৎসহ এই মর্মে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন যে, আল্লাহ্ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন সত্যপথ। হজরত

ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের 'প্রশংসা' এবং 'পবিত্রতা' কথা দু'টির অর্থ করেছেন নামাজ। কারণ নামাজের মাধ্যমেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেমে আসে প্রশান্তি।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূত হও।' একথার অর্থ— আপনি নামাজ পাঠকারীদের দলভূত হয়ে যান। এখানে 'সাজিদীন' অর্থ— বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শনকারী। জুহাক বলেছেন, নামাজ পাঠকারী। হজরত হুযাইফা বিন ইয়ামানের ভ্রাতা হজরত আবদুল আজিজের উক্তি উল্লেখ করে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে জারীর বলেছেন, রসুল স. কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাজে নিমগ্ন হতেন।

সর্বশেষ আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।' এখানে 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চিতি) অর্থ মৃত্যু, যা সুনিশ্চিত। 'জীবন অর্থই মৃত্যু' বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই যতদিন জীবন থাকে, ততদিন ইবাদতে মগ্ন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ সম্পর্কে কোরআন মজীদে হজরত ঈসার বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'আওসানী বিস্‌সলাতি ওয়ায্ যাকাতি মা দুমতু হাইয়্যা (তিনি আমাকে আজ্ঞা করেছেন, যেনো আমি মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আদায় করি ও জাকাত প্রদান করি)।

হজরত যোবায়ের বিন নাজীর থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে ও ব্যবসায়ী হতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে— সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূত হও; তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, মাসআব বিন ওমায়েরকে একবার মেষচর্ম পরিহিত অবস্থায় আগমন করতে দেখে রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, দ্যাখো, দ্যাখো! আল্লাহ্ তার হৃদয়কে জ্যোতিস্নাত করে দিয়েছেন। আমি দেখেছি তার পিতা-মাতা তাকে কত উপাদেয় আহার্য ভক্ষণ করিয়েছে। তখন তার এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য ছিলো দুইশত দিরহাম। আর আজ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা তাকে কি মনোহররূপেই না সাজিয়েছে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো।

সুরা নাহ্‌ল

সুরা নাহলের আয়াত সংখ্যা ১২৮। রুকুর সংখ্যা ১২। ১২৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। শেষের তিন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। আতা বিন ইয়াসারের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এরকম বলেছেন ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১, ২, ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَتٰۤى اَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ○ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

❐ আল্লাহের আদেশ আসিবেই; সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

❐ 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমাকে ভয় কর' এই মর্মে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহি-সহ ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন।

❐ তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আতা আমরুল্লহ্।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র আদেশ বা বিধান এসেছে। অর্থাৎ সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ইবনে আরাফা বলেন, যা অবশ্যম্ভাবী, আরবীভাষীরা তাকে বলে, হয়েই গিয়েছে। আল্লাহ্‌র বিধানের অন্যথা হয় না বলেই এখানে কথাটি অতীতকালবোধক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটি অতিশীঘ্র ঘটবেই । অর্থাৎ আল্লাহ্ মহাপ্রলয়ের যে বিধান স্থির করেছেন, তা অবশ্যই কার্যকর হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফালা তাসতা'জিলূহু।' একথার অর্থ— সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। অর্থাৎ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ত্বরান্বিত করার জন্য দোয়া কোরো না। এরকম দোয়া নিষ্ফল। যথাসময়েই মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। এক মুহূর্তের জন্যও তার অগ্র-পশ্চাৎ ঘটবে না।

বাগবী লিখেছেন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'ইক্বতারাবাতিস্ সাআতু' (কিয়ামত আসন্ন), তখন কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসী বললো, মোহাম্মদ বলে থাকে, পশ্চাতের দিন সমাগত। ঠিক আছে, কিছুদিনের জন্য তোমরা তোমাদের বিরোধিতা বন্ধ রাখো, দেখি কি হয়। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তারা দেখলো, কিছুই হচ্ছে না। তখন বলতে শুরু করলো, তুমি যার ভয় দেখাচ্ছো, তার তো কোনো নামগন্ধই নেই। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইক্বতারবা লিন্নাসি হিসাবুহুম্' (মানুষের হিসাবের সময় অত্যাসন্ন)। এই আয়াত শুনে অবিশ্বাসীরা পুনরায় আতঙ্কগ্রস্ত হলো। ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো বড় কোনো বিপর্যয়ের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও যখন কিছু ঘটলো না, তখন তারা বলতে শুরু করলো, মোহাম্মদ, তুমি শুধু শুধু আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে চলেছো। আসলে কিছুই তো ঘটছে না। এরপর অবতীর্ণ হলো, 'এসে পড়েছে আল্লাহ্র বিধান' (এই এলো বলে)। অংশীবাদীরা আতংকিত হলো পুনরায়। বার বার তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। ভাবতে লাগলো, কখন যে কি হয়। তখন অবতীর্ণ হলো 'সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।' এরপর জনজীবনে নেমে এলো স্বস্তি।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আতা আমরুল্লহ্' (আল্লাহ্র আদেশ আসবেই) অবতীর্ণ হলে সাহাবায়েকেরাম দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'ফালা তাস্তা'জ্বিলুহু' (সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।)। এখানে 'ইস্তি'জ্বাল' কথাটির অর্থ যথাসময়ের পূর্বে কোনো কিছু আকাংখা করা। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. তাঁর মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয় একত্র করে বললেন, আমাকে ও মহাপ্রলয়কে এভাবে জড়িত করে প্রেরণ করা হয়েছে। একথার অর্থ— মহাপ্রলয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত থাকবে আমার নবুয়ত। আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

মস্তুরাদ বিন শাদ্দাদ সূত্রে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি ও কিয়ামত পরস্পরসম্পৃক্ত। তবে আমি আগে, কিয়ামত পরে। যেমন এই আঙ্গুল দু'টো। একথা বলে রসুল স. তাঁর পবিত্র অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়কে একত্র করে দেখালেন।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর আবির্ভাব হচ্ছে মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। এই তথ্যটি নিয়ে রসুল স. এর নিকটে অবতরণকালে আকাশচারী ফেরেশতারা হজরত জিবরাইলকে লক্ষ্য করে সমস্বরে বলে উঠেছিলো, আল্লাহু আকবার! এবার মহাপ্রলয় সমুপস্থিত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'আমরুল্লহ্' কথাটির অর্থ, নিহত হওয়ার শাস্তি, যা কার্যকর হয়েছিলো নজর বিন হারেসের উপর। সে বলেছিলো, হে আল্লাহ্! কোরআন যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্যি সত্যি অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমার প্রতি আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। এভাবে নজর ও তার সঙ্গীরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শাস্তি পেতে চেয়েছিলো বলেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, নজর নিপাত হয়েছিলো বদর যুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মহীয়ান-গরিয়ান, মহামহিম, মহিমান্বিত, পবিত্রাতিপবিত্র। অংশীবাদীরা যেগুলোর উপাসনা করে, সে সকল বাতিল উপাস্য থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— অংশীবাদীদের অংশীবাদদুষ্ট অপকথন থেকে আল্লাহ্ অনেক অনেক উচ্চে।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, এতো লোক থাকতে মোহাম্মদের উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো কেনো? আল্লাহ্ তো আমাদের নিকটে কোনো ফেরেশতাকেও প্রেরণ করতে পারতেন। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতটি (২)। বলা হয়েছে—

'আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় করো— এই মর্মে সতর্ক করবার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী-সহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন।' এখানে উল্লেখিত 'রূহ্' শব্দটির মর্মার্থ— ওহী (প্রত্যাদেশ) অথবা কোরআন। নিঃসাড় শরীর যেমন রূহ্ বা আত্মার মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়, তেমনি কোরআন দ্বারা জাগ্রত হয় মানুষের অবচেতন অন্তর। রসুলের প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয় ফেরেশতার মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে খুশী তাকে রসুল হিসেবে মনোনীত করেন। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মাধ্যমে মানুষকে একথাই জানিয়ে দিতে চান যে, 'আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করো।'

এখানে 'আন্‌জিরু' অর্থ জানিয়ে দিন, হুঁশিয়ার করে দিন। 'নাজারতু হাজা' অর্থ আমি জেনেছি, অবগত হয়েছি। 'আন' অব্যয়টি এখানে বিবরণমূলক। তাই এখানকার বক্তব্য-বিষয়টি হবে এরকম— ফেরেশতার মাধ্যমে আমি আমার প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করি আমার বার্তাবাহকদের নিকটে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেনো সর্বসমক্ষে সত্য ধর্মের বিশদ বিবরণ উন্মোচিত করেন। অথবা 'আন' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানে একটি যের প্রদানকারী অব্যয় উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য অব্যয়সহ কথাটি দাঁড়াবে এরকম 'বিআন্ আনজিরু'। এভাবে 'আনজিরু' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে ভীতি প্রদর্শন করুন,

আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিন। এভাবে মূল মর্মটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী ও অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। এই মর্মে সচেতন করে তুলুন যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যাদেশের সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের সঙ্গে। ১. তওহীদ বা আল্লাহ্‌র এককত্ববোধকে জাগ্রত করা। এটাই প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ পর্যায়। ২. তাক্বওয়া বা আল্লাহ্‌র ভীতিজনিত সাবধানতা। এই সাবধানতাই পূর্ণত্ব বা কামালিয়াত।

এর পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— অতুলনীয় দক্ষতা ও অনন্য নির্মাণ শৈলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে দিয়েছেন সুসংগত ও নয়নাভিরাম রূপ। অনস্তিত্বকে অস্তিত্বদানের এই মহান কর্মকাণ্ড একথাই প্রমাণ করে যে, এই মহান নির্মাণের নির্মাতা অবশ্যই রয়েছেন, যিনি সকল কিছুর একক সৃজক, প্রাজ্ঞ-কুশলী ও সর্বশক্তিধর।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।' একথার অর্থ— এই মহাকাশ ও মহাপৃথিবীর কেউই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নয়। তাঁর অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যাবলীতে কারো কোনো অংশ মাত্র নেই। থাকতে পারে না। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী। আর সকল সৃষ্টি সকল বিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ○

❒ তিনি শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডা করে!

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল ! জেনে রাখুন, মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি অনুল্লেখ্য শুক্রবিন্দু থেকে। তখন তো তার বোধ, বুদ্ধি, চলচ্ছক্তি— কোনোটিই ছিলো না। আমিই তো ঘটাই তার মানসিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি। অথচ দেখুন, সে কেমন বিতণ্ডাপ্রবণ! স্বতঃসিদ্ধ বিষয়সমূহ সম্পর্কে সে প্রকাশ্যেই অসুন্দর তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এখানে 'খসীম' অর্থ কর্কশভাষী, বিতণ্ডা উপস্থিতকারী, ঝগড়াটে। 'খসীসুম মুবীন' অর্থ প্রকাশ্যে বিতণ্ডা উপস্থিতকারী। উল্লেখ্য যে, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ— এ সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কূটতর্কের অবতারণা করতো। বলতো, মরে গেলে মানুষের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং পুনর্জীবন অসম্ভব। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র অপার জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে প্রকাশ্য তর্কবিতর্ক শুরু করে দিতো।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উবাই বিন খলফ জামুহী সম্পর্কে। সে ছিলো পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। একবার সে অনেক দিন পূর্বে মৃত প্রাণীর একটি অস্থি এনে বললো, এই হাড় নাকি আবার জীবিত হবে। অসম্ভব। তখন অবতীর্ণ হলো— 'ওয়া দ্বরাবা লানা মাছালাঁও ওয়া নাসিয়া খলক্বাহু' (আমার জন্য উপস্থাপন করে দৃষ্টান্ত, আর বিস্মৃত হয় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে)।

আল্লামা সুদ্দী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতের সঙ্গে এই আয়াতটিও সম্পৃক্ত— 'আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খলাক্বনাহু মিন্ নুত্বফাহ্' (মানুষ কি দেখেনি, কীভাবে আমি তাকে শুক্র বিন্দু থেকে পরিগঠিত করেছি)।

একটি বিশেষ ঘটনাকে লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলেও এর বিধানটি সাধারণ। পুনরুত্থান দিবসের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের সকলের উপরেই আলোচ্য আয়াতটি প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি এরকম— পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা কেনো একথা বোঝে না যে, তিনি প্রাণহীন শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ ও পরিণত মানুষ। এটা যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নিষ্প্রাণ অস্থি থেকে পুনরায় তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না কেনো? প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অবশ্যই সহজতর।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

❒ তিনি আন্‌আম সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাদিগের জন্য উহাতে শীত বস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং ইহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

❒ এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

❐ এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

❐ তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

❐ সরল পথের নির্দেশ আল্লাহের দায়িত্ব, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন।

'আলআন্আম' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু— গরু, ছাগল, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। 'লাকুম' অর্থ তোমাদের অভাব মোচনে, উপকারার্থে। সকল প্রকার উপকারই কথাটির অন্তর্ভুক্ত। এরপর দেয়া হয়েছে উপকারসমূহের বিবরণ। যেমন, 'দিফ্উন' (শীত-বস্ত্রের উপকরণ বা পশমী বস্ত্র), 'মানাফিউ' (বহু উপকার) ও 'তা'কুলূন' (আহার্য)। উল্লেখ্য যে, 'বহু উপকার' কথাটির মধ্যে কৃষি শিল্পে ও বাহনরূপে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার ও আহার্যরূপে দুগ্ধ ও গোশতের ব্যবহার— সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর আমিষ জাতীয় খাদ্য এসকল পশু থেকে গৃহীত হয় বলে এখানে 'তা'কুলূনা' (তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো) কথাটির পূর্বে বসানো হয়েছে 'মিনহা' (তা থেকে)। অন্যান্য হালাল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ এরকম জরুরী কিছু নয়। সেগুলো হয় সৌখিন আহার, অথবা কোনো বিশেষ প্রতিষেধক। এভাবে প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্ হালাল পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে। মানুষ সেগুলো থেকে সংগ্রহ করে শীত-বস্ত্রের উপকরণ, দুগ্ধ, গোশত ও চামড়া। আবার সেগুলোকে ব্যবহার করে কৃষিকার্যে, ভার বহণের কাজে অথবা বাহনরূপে।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যখন গোধূলী লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ করো।' একথার অর্থ— যখন সূর্য অস্তমিত হয়, গোধূলীর রক্তিমাভায় রঞ্জিত হয় দিনান্তের আকাশ, তখন রাখাল ও তার পশুপালের গৃহাগমনের দৃশ্য কতোইনা নয়নাভিরাম। তখন গোধূলীর রঙ লেগে পশুগুলোও হয়ে যায় সুচিত্রিত ও সুন্দর। এই পরিতৃপ্ত প্রত্যাবর্তন কতোইনা আনন্দদায়ক। আবার তাদের প্রত্যুষের আলো ঝলমল প্রান্তরের দিকে যাত্রার দৃশ্যটিও আনন্দের। হ্রেষা-ধ্বনি, হাম্বা-হাম্বা রব ও অন্যবিধ আওয়াজেও তখন

জীবন্ত হয়ে ওঠে রিজিক অনুসন্ধানের ছন্দময় অভিযাত্রাটি। হে মানুষ! উদয়াচল ও অস্তাচলের পশুপালের এই গমন ও প্রত্যাগমনের সৌন্দর্য তো পরিতৃপ্ত করে তোমাদেরকেই।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে, যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! দ্যাখো, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কতোইনা করুণাপরবশ। কতোইনা দয়ার্দ্র। ভারবাহী পশুগুলো ব্যতিরেকে তোমরা কি দূরদেশে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে? পারতে না।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ।' একথার অর্থ— হে মানুষ! আরো অনুধাবন করো, সৌন্দর্য পিপাসা প্রশমনার্থে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তোমরা তো সেগুলোতে আরোহণও করো।

ঘোড়ার গোশত ভক্ষণ হারাম না মাকরূহ্ সে সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা এই আয়াত থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, এখানকার ৭ ও ৮ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর করুণা ও দয়ার কথা বিবৃত করেছেন। এই করুণার মধ্যে রয়েছে দু'টি বিষয়— বাহন ও সৌন্দর্য। লক্ষণীয় যে, বাহন অপেক্ষা আহার্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অশ্ব ও অশ্বসম্প্রদায়ভূত অশ্বতর ও গর্দভের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রধানত ভারবহন ও শোভা-সৌন্দর্যের কথা। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্ব ও অশ্বসম্প্রদায়ভূত পশুগুলোকে গোশত ভক্ষণের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। যদি হতো, তবে গোশত ভক্ষণের প্রসংগটিই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হতো।

আমি বলি, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা, মুরগী-হাঁস ইত্যাদি সহজলভ্য ও এগুলোর গোশত অধিকতর উপাদেয়। এগুলোর তুলনায় ঘোড়া, গাধা, খচ্চর যেমন সহজলভ্য নয়, তেমনি এগুলোর গোশতও উপাদেয় নয়। আবার এগুলো অন্য পশুর তুলনায় আরোহণের অধিক উপযোগী। বোঝা বহনের কাজেও এগুলো অধিকতর যোগ্য। আর হেদায়া প্রণেতার বক্তব্যও সঠিক নয়। কারণ ঘোড়া ও গাধার গোশত খাদ্য হিসেবে উপকারী। কিন্তু বাহন ও ভারবাহী হিসেবে ওগুলো আরো অধিক উপকারী, অন্য অনেক পশু দ্বারা যা সম্ভবই নয়। আরেকটি বিষয় প্রণিধাননীয় যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন গাধার গোশত ভক্ষণ ছিলো বৈধ। গাধার গোশত অবৈধ হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে। আর সে সময় ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করাও সহজ কাজ নয়। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে সুরা মায়িদায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।' একথার অর্থ— হে মানুষ! বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতে এবং অবিশ্বাসীদের জন্য দোজখে কী অকল্পনীয় স্বস্তি ও শাস্তির ব্যবস্থা করা রয়েছে তা তোমরা জানো না।

এর পরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'সরল পথের নির্দেশ আল্লাহ্‌র দায়িত্ব।' এখানে 'আলা' (উপর) অব্যয়টি 'ইলা' (দিকে, পর্যন্ত) অর্থে ব্যবহৃত । অর্থাৎ সরলপথের গতি আল্লাহ্‌র দিকে। এই পথই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায়। আর সরল পথের নির্দেশ দান করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। এর পাশাপাশি বক্র পথও রয়েছে। কিন্তু সে পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় না। এখানে 'ক্বস্‌দুস্ সাবীল' অর্থ সরল পথ। আর 'জায়িরুন' অর্থ বক্র। উল্লেখ্য যে, এখানে সরল পথের বিবরণ প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বক্র পথের কথা এসেছে এখানে প্রসংগত। সরল পথ হচ্ছে রসুল প্রদর্শিত পথ। আর বক্র পথ হচ্ছে বেদাত, কুফরী ও নফসানিয়াতের পথ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ সরল পথের নির্দেশ দান করেন। কিন্তু সকলকে এই পথের পথিক হবার সৌভাগ্য দান করেন না। কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে সবাইকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারতেন। এই কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছাময়। ইচ্ছাপ্রয়োগের ব্যাপারে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০, ১১

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

❒ তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

❒ তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতে বিবৃত হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃজন-বিধানের ধারাবাহিকতার কথা। যেমন— আকাশে মেঘপুঞ্জের সমাবেশ। তারপর সেই মেঘপুঞ্জ থেকে বারি বর্ষণ। এভাবে মেটানো হয় প্রাণীকুলের পিপাসা। আর এই বৃষ্টিপাতের ফলে মাটিতে জন্মায় উদ্ভিদ ও তৃণ-গুল্ম। ওই তৃণ-গুল্ম-শোভিত প্রান্তরে চরে বেড়ায় গৃহপালিত পশুর পাল।

এখানে 'মিনহু শারাবুন' অর্থ পানীয় জল। ঝর্ণা, কূপ, সরোবর, নদী-নালা সব কিছুই ভরে ওঠে বৃষ্টির পানিতে। এই পানির দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ করে প্রাণীকুল। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাকে আমি ঝর্ণা পথে প্রবাহিত করেছি'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে ধরণীপৃষ্ঠে স্থান দিয়েছি।' 'মিনহু শাজারুন' কথাটির মাধ্যমে এখানে বুঝানো হয়েছে, বৃক্ষকুলের জীবনও পানির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টির পানি উদ্ভিদেরাও পান করে থাকে।

'তুসীমূনা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— তোমরা তোমাদের পশুপালকে চারণ করে থাকো। যেমন বলা হয়, 'সামাতিল্ মাশিয়াতু' অর্থ পশুপাল চরে। আর 'আসামাহা সাহিবুহা' অর্থ পশুপালের মনিব তা চরায় ।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য তার দ্বারা জন্মান শস্য, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল।' একথার অর্থ— বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটিতে জন্মলাভ করে শস্য, জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও সকল প্রকার ফল। এভাবে হে মানুষ! তোমাদের পরম করুণাপরবশ আল্লাহ্ তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

'মিন কুল্লিছ ছামারাত' (সর্ব প্রকার ফল) কথাটির 'মিন' অব্যয় এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সম্ভাব্য জগতের ফলমূল সমূহের কিয়দংশ দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। ফলমূলের প্রকৃত ভাণ্ডার রয়েছে বেহেশতে। পৃথিবীর ফলমূল বেহেশতের সেই অতুলনীয় ফলমূলের নমুনামাত্র । আল্লাহ্‌পাক সকল প্রাণী সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিজিক প্রস্তুত করে রেখেছেন। পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখি আগমনের পূর্বেই তাই সৃষ্টি করা হয়েছে তৃণগুল্ম ও উদ্ভিদরাজি। এসকল কিছু নিয়েই মানুষ পরবর্তীতে তার নিজের এবং অন্য প্রাণীদের রিজিকের ব্যবস্থাপনাকে সম্প্রসারিত করেছে। মানুষের এমতো বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাও আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ করুণা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।' একথার অর্থ, যারা চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু, তারা সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব রক্ষার এই মহা আয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অবাক হয়ে তারা দেখে, কীভাবে অঙ্কুরোদগম ঘটে একটি বীজের। তারপর কীভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তার মূলের, কাণ্ডের, শাখা-প্রশাখার ও পত্র-পল্লবের। অতি ক্ষুদ্র এই বৃক্ষই একদিন পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে। এভাবেই বিভিন্ন মৌসুমে অরণ্যে বাগানে

প্রান্তরে বিকশিত হয় ফল ও ফসলের বিপুল সমাহার। একই মাটিতে জন্মলাভ করে এবং একই আলো হাওয়া ও পানিতে পরিপুষ্ট হয়েও এ পৃথিবীর ফল ও ফসলের সমাহার স্বাদে গন্ধে ও বর্ণে কতো বিচিত্র, সচিত্র। আল্লাহর এই সৃজন নৈপুণ্যের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল মানুষের জন্য বিশেষ নিদর্শন। তারা এই বিস্ময়কর সৃজনপ্রক্রিয়া থেকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, এ সকল কিছুর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। তিনিই তো এক, একক, দয়াময়, প্রেমময় ও পালনকর্তা আল্লাহ্।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১২, ১৩

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝

❒ তিনিই তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

❒ এবং তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন বিবিধ প্রকার বস্তু যাহা তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে' একথার অর্থ— হে মানুষ! পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের কল্যাণের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্রকে। সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের নিয়মিত বিবর্তনের ফলে পালাক্রমে পৃথিবীতে আসে দিন ও রাত। দিবা-রাত্রির এই বিবর্তনের মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে।' এখানে 'বিআমরি' কথাটির 'আমর' অর্থ উদ্ভাবন, পরিমিতি নির্ধারণ অথবা আদেশ। প্রকৃতিবাদীরা মনে করে, উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি হয় নক্ষত্রপুঞ্জের পরিক্রমণ ও রাশিচক্রের বিবর্তণের মাধ্যমে। তাদের ধারণা ভুল। তারা কি মনে করে, নক্ষত্রপুঞ্জ বা রাশিচক্র অস্তিত্ব ও গুণবত্তার দিক দিয়ে সম্ভাব্য জগতের (দায়রায়ে এমকানের) বৃত্তভূত নয়? তাদের ধারণা অলীক ও অবাস্তব। প্রকৃত কথা হচ্ছে, অন্য সকল সৃষ্টির মতো নক্ষত্রপুঞ্জসমূহও সত্তা ও গুণগত দিক থেকে সৃষ্ট ও অপূর্ণ। সকল সৃষ্টিই সেই স্বয়ম্ভু স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। চির অমুখাপেক্ষী কেবল

আল্লাহ্। তিনিই সকল সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে না মানলে চিন্তা-চেতনা আটকে পড়বে বিবর্তনবাদের ফাঁদে। এভাবে জ্ঞানের অনন্ত গতি হয়ে পড়বে অবরুদ্ধ। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই মহাবিশ্বের সকল আবর্তন-বিবর্তনের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক অবশ্যই রয়েছেন। তিনিই অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব । সৃষ্টির ভাঙাগড়া ও আবর্তন বিবর্তনের কারণ অবশ্যই রয়েছে। তিনি ওই কারণসমূহেরও স্রষ্টা। কারণগুলো কখনোই কোনো পরিণতির উদ্ভাবক নয়। সেগুলোও সৃষ্ট এবং সম্ভাব্য জগতের অন্তর্ভূত। সুতরাং যা নিজেই অনস্তিত্বজাত, তা অপরকে অস্তিত্ব প্রদান করবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— এই বিশাল সৃষ্টির নির্মাণশৈলী, নিয়মানুবর্তিতা ও বহুধাবিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশের মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ প্রকার বস্তু, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন।' এখানে 'আলওয়ান' অর্থ রঙ বা বর্ণরাজি। মর্মার্থ— শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— হে মানুষ! আল্লাহ্ই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর বা প্রকারের বস্তু। ওই বস্তুগুলো তিনি তোমাদের কল্যাণের নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।' একথার অর্থ— যারা সত্যান্বেষী ও সদুপদেশ অভিলাষী, তারা বহুধাবিচিত্র এই সৃষ্টির আকার প্রকার ও বিকাশ দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এগুলোর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিণতি-প্রদাতা নিশ্চয় কেউ রয়েছেন। তিনিই তো এক, অবিভাজ্য, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর স্রষ্টা আল্লাহ্।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৪

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

❑ তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যদ্দারা তোমরা অলংকৃত হও; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া

জলযান চলাচল করে এবং ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনিই সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মৎস্যাহার করতে পারো।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! সাগরসমূহকে আল্লাহ্ এভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তা থেকে লাভ করতে পারো প্রভৃত কল্যাণ। যেমন আহার্য বস্তুরূপে তোমরা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারো তাজা মৎস্য। উল্লেখ্য যে, সকল প্রকার গোশতের মধ্যে মাছের গোশতই মানুষের জন্য অধিক উপাদেয় ও উপকারী। মাছের গোশত ভক্ষণের সাথে সাথে পাকস্থলীতে মিলিয়ে যায়। তাই এতে করে পিপাসা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অন্য সকল প্রাণী ও পশুর গোশত উৎকট, নিরস ও অগ্নিউৎপাদক। এতে করে তৃষ্ণারও কোনো কারণ ঘটে না। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সমুদ্রের লবণাক্ত ভারী পানিতে আল্লাহ্ সৃষ্টি করে রেখেছেন সহজপাচ্য তাজা ও সুস্বাদু আমিষ জাতীয় আহার্য।

ইমাম মালেক এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শরিয়তের পরিভাষায় মাছও গোশতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি এইমর্মে শপথ করে যে, আমি গোশত ভক্ষণ করবো না এবং এরপর যদি সে মৎস্য আহার করে, তবে তার শপথ ভেঙে যাবে। হানাফীগণ বলেন, শপথের বেলায় সাধারণ্যে প্রচলিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সাধারণ জনতা কিন্তু মাছকে গোশত বলে না। এরপর লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদের সম্পর্কে 'শার্‌রাদ দাওয়াব্বি' বা চতুষ্পদ জন্তু কথাটি ব্যবহার করেছেন। এখন কেউ যদি এইমর্মে শপথ করে বসে যে, আমি চতুষ্পদ জন্তুর উপরে আরোহণ করবো না এবং এরপর যদি সে কোনো কাফেরের উপরে আরোহণ করে, তবে কি সে শপথ ভঙ্গকারী হবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পারো রত্নাবলী যদ্দারা তোমরা অলংকৃত হও' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের রমণীদেরকে তোমরা অলংকৃতা করার উদ্দেশ্যে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করো মনিমুক্তা। এখানে 'তাল্‌বাসূনাহা' (অলংকৃত হও) কথাটি পুরুষদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও এর মর্মার্থ হবে— তোমাদের স্ত্রী-কন্যারা অলংকৃতা হয়। এখানে 'হিল্‌ইয়াতান্' অর্থ অলংকারপাতি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে জলযান চলাচল করে' এখানে 'মাওয়াখিরা ফীহি' অর্থ— সাগরের বুক চিরে জলযান চলাচল করে। কাতাদা অর্থ করেছেন— চলাচলকারী। অর্থাৎ চলাচলকারী জলযানগুলো কোনোটি যায়, কোনোটি আসে। অথচ তখন বায়ু প্রবাহিত হয় একই দিকে। এতে করে বোঝা যায়, কোনো কোনো জলযান হয় পালবাহী এবং কোনোটি হয় পালহীন। এভাবে পরিদৃশ্যমান হয় সেগুলোর বিপরীতমুখী চলাচল।

হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, ভর্তি অর্থাৎ জলযানভর্তি সমুদ্র। ফাররা এবং আখফাশ বলেছেন, কথাটির অর্থ পানি বিদীর্ণ করে ধাবমান জলযান। 'সখার' অর্থ পানি ভেদকারী। অথবা নৌকা ও জাহাজ চলার শব্দ। আবু উবায়দা বলেছেন, প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকেই বলে 'সখার'। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ, যে তরণী চলে অগ্রভাগে পানি ভেদ করে ও বায়ু বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ বায়ুর বিরুদ্ধে চলমান জলযান। এরকম অর্থ লিখেছেন কামুস রচয়িতা। কল্লোলিত শরীরের আওয়াজকে বলে 'সখারাস্ সাবিহ্'। কারণ বাত্যাতাড়িত অর্ণবযান ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে সশব্দে অগ্রসর হয়। হাদিস শরিফে এসেছে— 'ইজা আরদা আহাদুকুমুল বাওলু ফাল ইয়াতাসখ্খারিররীহ্' (যদি তোমরা প্রস্রাব করার ইচ্ছা করো তাহলে বায়ু ছেদ করো)। অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের অনুকূলে উপবেশন করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এটা এজন্যে যে তোমরা যেনো তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।' একথার অর্থ— তোমরা যেনো জলযান যোগে বিভিন্ন বন্দরে গমনাগমন করে করতে পারো সফল বেসাতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— তোমাদের সামনে রয়েছে তরঙ্গসংক্ষুব্ধ বিশাল সাগর। আল্লাহ্পাক তাঁর অপার কৃপাবশে ওই উত্তাল জলরাশিকে করে দিয়েছেন তোমাদের অধীন। আরো করেছেন উপার্জনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। সুতরাং হে মানুষ! অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও যে, তোমাদের উপরে তাঁর অনুগ্রহ সমুদ্র অপেক্ষাও বিশাল। অতএব কৃতজ্ঞচিত্ত হও। প্রকাশ করো হৃদয়োৎসারিত কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এতক্ষণ ধরে বর্ণিত আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের কথা জেনে নেয়ার পর শোকরের মাকাম বা কৃতজ্ঞতার স্তরে উন্নীত হওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদানার্থে শেষে এভাবে বলা হয়েছে — এবং তোমরা যেনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। বলা বাহুল্য যে, এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে ইহকালের প্রচুর কল্যাণ ও পরকালের প্রতুল পুণ্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশই হচ্ছে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৫

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

❑ এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং তিনি স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঢলে না পড়ে।' একথার অর্থ— মহাশূন্যে ভাসমান এই মেদিনী অথৈ পাথারে ভাসমান তরণীতুল্য। ভারহীন তরণী যেমন এদিকে ওদিকে ঢুলতেই থাকে, এই ধরিত্রীও তেমনি এদিকে ওদিকে ঢলে পড়তো। কিন্তু তাকে সে সুযোগ আল্লাহ্তায়ালা দেননি। মানুষের স্বস্তি নিশ্চিতকরণার্থে তিনি ভূপৃষ্ঠে চাপিয়ে দিয়েছেন সুদৃঢ় ও সুবিশাল পর্বতমালা। এ যেনো কীলক, যা কেন্দ্রসম্পৃক্ত। এভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রোথিত পর্বতমালাই পৃথিবীকে করে রেখেছে অচঞ্চল ও মানুষের বাসোপযোগী। এতে করে বুঝা যায় মানুষ কতইনা অসহায়, আল্লাহ্ কতই না দয়ার্দ্র।

বাগবী লিখেছেন, পৃথিবীকে সৃষ্টি করার পর সে সভয়ে কাঁদতে শুরু করলো। ফেরেশতাগণ বললেন, ইয়া ইলাহি! এতো দেখছি তার পিঠে কাউকে থাকতেই দিবে না। আল্লাহ্ তখন ভারপদার্থরূপে ধরাপৃষ্ঠে স্থাপন করলেন পাহাড়-পর্বত। ফেরেশতারা তখন পর্যন্ত জানতো না, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করা হয়েছে কী কারণে।

কাতাদার মাধ্যমে হোসাইন সূত্রে কায়েস বিন উব্বাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। বক্তব্যটি এই— আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। কিন্তু গোলাকৃতি হওয়ার কারণে তা আন্দোলিত হতে লাগলো। ফেরেশতারা বললো, এতো দেখছি অতি চঞ্চল। এতো তার পিঠে কাউকে রাখবেই না। রাত হলো। নিশি অবসানের পর এলো প্রত্যুষ। ফেরেশতারা বিস্ময়ের সাথে দেখলো, পৃথিবী পৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠত হয়েছে গিরি-শ্রেণীসমূহ। তারা জানতেই পারলো না, এরকম করা হলো কেনো? বললো, হে পরোয়ারদিগার! আপনার সৃষ্টিজগতে পর্বতের চেয়েও কঠিন কোনো কিছু কি আছে? আল্লাহ্পাক বললেন, হ্যাঁ। লোহা পর্বতাপেক্ষা অধিকতর কঠিন। ফেরেশতারা পুনঃনিবেদন করলো, লোহার চেয়ে কঠিন কি? আল্লাহ্পাক বললেন আগুন। ফেরেশতারা বললো, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কে? তিনি বললেন, পানি। ফেরেশতারা বললো, তার চেয়ে অধিকতর বলশালী কে? তিনি বললেন, বাতাস। তারা বললো, বাতাস অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখে কে? তিনি বললেন, পুরুষ মানুষ। তাদের শেষ প্রশ্নটি ছিলো এরকম, পুরুষের চেয়ে অধিক দৃঢ়তা কার? আল্লাহ্ বললেন, নারীর।

আমি বলি, এ ধরনের প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। আল্লাহ্পাকই শক্তিধর। সৃষ্টি মূলতঃ অনস্তিত্ব নির্ভর। আল্লাহ্তায়ালার শক্তিমত্তার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টি কিছুই নয়। তাঁর শক্তিমত্তার ছায়া-প্রতিচ্ছায়া যে সৃষ্টি ধারণ করে, অন্য সৃষ্টি অপেক্ষা সে-ই হয় অধিকতর শক্তিশালী। যদি সে ছায়া হাতির উপরে পড়ে, তবে হাতি হবে অন্য সকলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। যদি পিপীলিকার উপরে পড়ে, তবে

পিপীলিকাই হবে অন্য সকলের চেয়ে শক্তিশালী। এভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, সৃষ্টির কেউই অপর অপেক্ষা সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্টির শক্তি হয় একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব একথা মানতে হবে যে, সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্‌র, অন্য কারো নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে তোমাদের মনোস্কামনা পূরণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে নদ-নদীসমূহ ও পথ। তাই জলপথ ও স্থলপথে তোমরা পৌঁছে যেতে পারো তোমাদের উদ্দিষ্ট গন্তব্যে।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১৬

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

❑ এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পথনির্ণায়ক চিহ্ন-সমূহ এবং উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথনির্ণায়ক চিহ্নসমূহ।' একথার অর্থ— তাঁর সৃজিত তরুরাজি, পর্বতমালা, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী, দুর্গ, প্রাসাদমালা মানুষের পথনির্দেশিকা। পথচারীরা এসকল কিছু দেখে খুঁজে নিতে পারে তাদের পথের নিশানা। আর এ সকল চিহ্নরাজি শরিয়তের বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তও। যেমন নামাজ-রোজার নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সময় একটি নিমিত্ত। যেমন নিষিদ্ধ পানীয় নিমিত্ত হচ্ছে মত্ততার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাবসিদ্ধ ও জ্ঞানগত প্রমাণাদিও মানুষের চলার পথের দিশারী। যেমন নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন প্রমাণ করে শরীরে জ্বরের উপস্থিতিকে। তেমনি এই মহাবিশ্বের উপস্থিতি একথা প্রমাণ করে যে, এর স্রষ্টা নিশ্চয় একজন রয়েছেন। এভাবে নবীগণের মোজেজাও প্রমাণ করে একজন সত্য নবীর নবুয়তকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।' একথার অর্থ রাতের আঁধারে স্থলে অথবা জলে পথ হারিয়ে ফেললে নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি লক্ষ্য করে পথিকেরা খুঁজে নিতে পারে তাদের পথের সন্ধান।

এখানে 'আন্‌নজমু' অর্থ সাধারণ নক্ষত্র। 'আ'লামাত' অর্থ নক্ষত্ররাজি। কতকগুলো তারার অবস্থান চিহ্নরূপে বিদ্যমান। আবার কতকগুলো তারা দেখায় পথের দিশা। সুদ্দী বলেছেন, 'আন্‌নজমু' অর্থ ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষদ্বয় ও জুদী তারা। এগুলো দেখে মানুষ পথ চিনে নিতে পারে। নির্ণয় করতে পারে কেবলা। আমি বলি, এটা এ কারণে সম্ভব যে, ওই তারাগুলো ধ্রুবতারার নিকটবর্তী। এদের পরিক্রমণ গতিও অত্যন্ত শ্লথ। তাই এগুলোর অবস্থানস্থল

থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। আয়াতের শেষ কথা হচ্ছে 'ইয়াহ্‌তাদূন'। এর পূর্বের কর্তৃবাচক সর্বনামটি (হুম) কুরায়েশদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারা ছিলো সাধারণতঃ বণিক। বাণিজ্যব্যপদেশে তাদেরকে রাতের বেলায় জলপথে অথবা স্থলপথে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করতে হতো। তখন আকাশের নক্ষত্র দেখেই তাদেরকে নির্ণয় করতে হতো তাদের গন্তব্য। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আলামত বা চিহ্ন' কথাটির পরে 'আন্‌নজমু' বা নক্ষত্রের উল্লেখের মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যটি এই— মানুষ যেহেতু আল্লাহ্‌র বিশেষ সৃষ্টি নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যমে তাদের পথের দিশা পায়, সেজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। মানুষের জন্য নিশীথের আকাশে তাঁর একি অবাক আয়োজন!

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১৭

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

❒ সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মতো যে সৃষ্টি করে না?' একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার পরেও কি তোমরা তোমাদের নিষ্প্রাণ জড় প্রতিমাগুলোকে আঁকড়ে থাকবে? কী মনে করো তোমরা? যে মহান আল্লাহ্ একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃজক, তিনি কি তাদের সমতুল, যাদের সৃষ্টি করার সামর্থ্য মাত্র নেই?

এখানে 'মান্ লা ইয়াখলুক্বু' বলে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদের পূজিত জড় প্রতিমাগুলোকে। বিবেকবানকে বিবেকহীনের উপরে প্রাধান্য প্রদানার্থেই এখানে 'মা' (যারা) এর স্থলে বসানো হয়েছে 'মান' (যে) অব্যয়টি। অথবা এখানে 'মান' দ্বারা কেবল তাদের বিগ্রহগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পৌত্তলিকেরা তাদের মনগড়া মাবুদগুলোকেই প্রকৃত মাবুদ বলে মনে করে। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার রীতি অনুসারে বিবেকবানের জন্য 'মান' এবং বিবেকহীনের জন্য 'মা' ব্যবহৃত হয়। 'আফামান' কথাটির 'আ' (কি) এখানে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। আর 'ফা' (অতঃপর) কথাটি এর অনুগামী। এভাবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— এতক্ষণের আলোচনায় যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌তায়ালা অতুলনীয় সৃজক, মহাজ্ঞানী, করুণাপরবশ ও সর্বশক্তিধর, তবে কেনো আর জড়পদার্থের উপাসনা? হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদের জ্ঞান ও বিবেক বলে কিছুই কি আর অবশিষ্ট নেই? তোমরা এখনও কি মনে করো প্রস্তর মূর্তিগুলো ওই মহামহিম আল্লাহ্‌র সমতুল, যিনি সমগ্র সৃষ্টির একক স্রষ্টা ও পালনকর্তা?

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' একথার অর্থ দিবালোক অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল প্রমাণাদি উপস্থাপনের পরেও কি তোমাদের বোধোদয় ঘটবে না? মূর্খতার আঁধার বিবর থেকে এখনো কি তোমরা বেরিয়ে আসবে না সত্যের সমুদ্ভাসিত সাম্রাজ্যে?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

❒ তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ তোমরা যাহা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

❒ উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হয়।

❒ তাহারা অপ্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন চেতনা নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' একথার অর্থ— হে মানুষ! ভেবে দেখো কতো অসংখ্য নেয়ামত আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, তোমরা তো তাঁর নেয়ামতের সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারবে না। নেয়ামত দাতাই উপাসনা লাভের যোগ্য। তোমরা প্রতিনিয়ত তাঁর অসংখ্য নেয়ামত উপভোগ করছো, অথচ তাঁর ইবাদত থেকে রয়েছো বিমুখ। অতএব তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, এই মুহূর্তেই নিজেকে সমর্পণ করো। অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করো । কেবল তাঁরই সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— একথা অতি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু। (গফুরুর রহীম)। প্রমাণ এই যে, প্রতিনিয়ত অবাধ্যতা প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি

তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেননি। অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদেরকে শাস্তিও দেননি। তবে এবার ভাবতে শুরু করো, তাঁর মহানুভবতা ও উদারতা কতো অবাধ, কতো অপার।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ্ তা জানেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা, মনোযোগ-অমনোযোগ, সমর্পণেচ্ছা-আত্মম্ভরিতা, শুভ-অশুভ, উদারতা-অনুদারতা সবকিছুই আল্লাহ্ জানেন। আবার তোমাদের প্রকাশ্য কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। তাই যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি দিবেনই। হয় পুরস্কৃত করবেন। না হয় করবেন তিরস্কৃত।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিধর প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্র উপাসনা ত্যাগ করে জড়প্রতিমাগুলোর উপাসনা করে। কীভাবে করে? একটি তুচ্ছতম বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। বরং তারা নিজেরাই আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য জড়সৃষ্টির মতো এক বা একাধিক সৃষ্টি। নির্জীব, নিশ্চেতন, নির্বিবেক।

এর পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তারা অপ্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে, সে সম্পর্কে তাদের চেতনা নেই।' একথার অর্থ— ওই প্রতিমাগুলো জীবন্ত তো নয়ই। মৃতও নয়। জীবিতরাই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ওই প্রস্তর প্রতিমাগুলো তো কখনোই জীবন্ত ছিলো না। সব সময়ই সেগুলো জীবনের স্পন্দনচ্যুত। জীবনশেষের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কবিবর্জিত। তাই তারা জীবন-মৃত্যুর জ্ঞান যেমন রাখে না, তেমনি অবশ্যম্ভাবী পুনরুত্থান সম্পর্কেও কোনো প্রকার বোধ তাদের নেই। সুতরাং তারা তাদের উপাসকদেরকে পুরস্কৃত করবে কিভাবে? কীভাবেই বা তাদেরকে অস্বীকারকারীদেরকে করবে তিরস্কৃত। সুতরাং অংশীবাদী জনতার কী হলো? তারা কি এখনো সত্য ধর্ম ইসলামকে স্বীকার করবে না?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ২২, ২৩

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

❐ এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদিগের ইলাহ্; সুতরাং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তাহারা অহংকারী।

❐ ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যাহা উহারা গোপন করে এবং যাহা উহারা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এক ইলাহ্, তিনিই তোমাদের ইলাহ্।' একথার অর্থ জ্ঞান, বিবেক ও দলিল প্রমাণাদি দ্বারা এ বিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য উপাস্য। আর তিনিই তো তোমাদের আপনতম উপাস্য। কেউ বা কোনোকিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ। একথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ আস্বাদন করে। কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তাই আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বঞ্চিত করেছেন তত্ত্বজ্ঞান থেকে। ফলে তারা দূরদর্শিতাবিচ্যুত। সত্যবিমুখ। পরলোকের প্রতি বিশ্বাস তাদের নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন ঘোর কৃষ্ণ, স্থূল ও অজ্ঞ অবস্থায়। তারপর তার প্রতি নিক্ষেপ করেছেন তাঁর জ্যোতির একটি ঝলক। যে ব্যক্তি সেই জ্যোতিসম্পাতে আলোকিত হয়েছে, সেই পায় হেদায়েত। তাই আমি বলি, আল্লাহ্র কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞানে যাদের সুপথ পাওয়ার কথা তারা ঠিকই সুপথ পায়। আর যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা, সে ঠিকই পথভ্রষ্ট হয়। এই সমাধানটি অদৃষ্টলিপিতে লিপিবদ্ধ। কলম আর নতুন কিছু লিখবে না। আহমদ, তিরমিজি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা অহংকারী।' একথার অর্থ— তারা সত্যকে ছেড়ে গ্রহণ করেছে অহমিকাকে। অবমাননা করেছে তাঁর বিপুল অনুগ্রহরাজির। দর্প ও অকৃতজ্ঞতাই তাদের নিত্য সহচর। তাই তারা আল্লাহ্কে উপাস্য হিসেবে এবং রসুলকে তাঁর বাণীবাহক হিসেবে মানতে নারাজ। যদি তারা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তবে এমতো অনারোগ্য স্খলন তাদের ঘটতো না।

এর পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মুশরিকদের অন্তরের অবিশ্বাস, অহংবোধ ও অপবিত্রতা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন। তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডও তাঁর অজানা নয়। কারণ তিনি তো সর্বজ্ঞ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ অহংকারও যদি কারো থাকে, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে অনেকেই তো চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক। এটা কি

অহংকার? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ স্বয়ং সুন্দর। তাই তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। সুতরাং সুন্দর পরিচ্ছদাকাংখা অহমিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। চিত্তাকর্ষক পোশাক কখনও অহংকারপ্রকাশক নয়। বরং সত্যের প্রতিপক্ষে দাঁড়ানোর নাম অহংকার। মানুষের তুচ্ছ জ্ঞান থেকে উৎপত্তি হয় দম্ভের। এই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে 'কিবরু মিম বাত্বরিল হাক্ব'। আলেমগণ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। 'নেহায়া' প্রণেতা লিখেছেন, 'বাত্বরিল হাক্ব' অর্থ আল্লাহ্র এককত্ব ও তাঁর ইবাদতকে বর্জনীয় মনে করা। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ সত্যের প্রতিপক্ষে গর্বিত হওয়া। সত্যকে সত্য মেনেও তা প্রত্যাখ্যান করা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, সত্যকে মেনে না নেয়া। এ সকল ব্যাখ্যার আলোকে 'বাত্বরিল হাক্ব' কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাকের ইবাদতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা। তাঁর অগণনীয় অনুগ্রহরাজিকে অধিকার মনে করা। এরকমও মনে করা যে, নেয়ামতসমূহ দান করতে তিনি বাধ্য।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসে অহংকারের বিপরীতে এসেছে ইমানের আলোচনা। কারণ ইমানদারগণ তাঁদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কিত সকল কিছুকেই মনে করেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তাই তাঁরা তাঁদের কৃতি ও সাফল্যে কখনোই গর্বিত হন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা তাদের অস্তিত্ব ও সফলতাকে মনে করে তাদের নিজস্ব কৃতিত্ব। এভাবে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় আল্লাহ্কে। সুফী সাধকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'ফানা' শব্দটির মর্মার্থ এই যে, অস্তিত্বধারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অস্তিত্বহীন বলে অনুভূত হওয়া। আপন সত্তা যে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ বা দান ছাড়া কিছু নয়, তা সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ একথা ভাবা যে, এ সত্তা আমার অধিকারাধীন নয়, আল্লাহ্র অধিকারাধীন। এভাবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হয়ে পড়া।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ২৪, ২৫

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

❒ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন?' তখন উহারা বলে, 'সেকালের উপকথা!'

❒ ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা পূর্ণমাত্রায় বহন করিবে উহাদিগের পাপভার এবং পাপভার তাহাদিগেরও যাহাদিগকে উহারা তাহাদিগের অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট!

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পরলোকে অবিশ্বাসী দাম্ভিক অংশীবাদীদেরকে যখন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে নাকি এক নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তার উপরে নাকি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সে সম্পর্কে জানতে চাই। বলোতো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর কী অবতীর্ণ করেছেন? এমতো প্রশ্নের জবাবে তারা বলে, 'সেকালের কিংবদন্তী'।

রসুল স. এর আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দূর দুরান্তে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকে রসুল স. এর সঙ্গে দেখা করতে আসতে শুরু করলো। বিরুদ্ধবাদী কুরায়েশেরা সৃষ্টি করলো বাধা। তারা রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে পাহারাদার রেখে দিলো। দূরের কেউ আগমন করলে প্রথমে দেখা হতো ওই প্রহরীদের সঙ্গে। আগন্তুকেরা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, হে মক্কাবাসী। তোমাদের উপরে নাকি আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে? কী অবতীর্ণ হয়েছে? তারা জবাব দিতে লাগলো, কী যে বলো তোমরা। ওগুলো আবার আল্লাহ্‌র বাণী না কি? ওগুলো তো প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী মাত্র।

এখানে 'আসাত্বিরুল আউয়ালীন' অর্থ সেকালের উপকথা বা কল্পকাহিনী। 'সত্বর' শব্দটি একবচন। এর অর্থ বইপুস্তক, মানুষ বা বৃক্ষের সারি। এর বহুবচন হচ্ছে 'আসত্বার' বা 'সুত্বর'। বহুবচনের বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'আসাত্বীর'। অথবা 'উস্‌ত্বুরাতুন'।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'ফলে কিয়ামত দিবসে তারা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে তাদের পাপের ভার।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র কালামকে 'সেকালের উপকথা' বলে যে মহাঅপরাধ তারা করে চলেছে, সেই অপরাধের শাস্তি আখেরাতে তাদেরকে পেতেই হবে। তারা নিজেরা বিভ্রান্ত। অপরকেও বিভ্রান্তকারী। তাই তাদের পাপের ভার হবে পূর্ণ ও অতি গুরুভার। ওই গুরুভার সেদিন তাদেরকে বহন করতে হবে পূর্ণ মাত্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে।' একথার অর্থ— উভয় দলকেই সেদিন পাপের বোঝা বহন করতে হবে। যারা অন্যকে বিভ্রান্তকারী, তারা দ্বিগুণ এবং যারা বিভ্রান্তকারীদের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা একগুণ। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের নেতাদের পাপের বোঝা হবে দ্বিগুণ ভারী। আর একগুণ ভারী হবে অনুসারীদের পাপের বোঝা।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাবর্গ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানায়, সে তার অনুসারীদের আমলের সমান পুণ্য পায়।

এতে করে অবশ্য অনুসারীদের পুণ্য এতটুকুও কমে না। তেমনি অসৎপথের প্রতি আহ্বানকারীরা পায় তাদের অনুসারীদের আমলের সমতুল্য পাপ। অবশ্য এতে করে অনুসারীদের পাপও কমে না।

এখানে 'বিগাইরি ইল্‌ম' কথাটির অর্থ অজ্ঞতাবশতঃ। এরকম বলা হয়েছে একারণে যে, অবিশ্বাসীদের অগ্রণীরা তাদের অনুগামীদেরকে বিভ্রান্ত করে কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— অজ্ঞতার কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিভ্রান্তরা একথা বুঝতেই পারে না যে, কে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। ভাবে, তাদের ধর্মনেতারা তো তাদেরকে ঠিকপথেই পরিচালিত করছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'দেখ, তারা যা বহন করবে তা কতো নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারলেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কতো নিকৃষ্ট। আর তারা যে পাপের ভার বইতে বাধ্য হবে তা আরো কতো নিকৃষ্ট।

সুরা নাহল ঃ আয়াত ২৬

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

❐ উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদিগের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন; ফলে, ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি এবং বাগবী কর্তৃক বর্ণিত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের উক্তিরূপে এসেছে, আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে দূরাচার নমরুদ বিন কিনআনের ঘটনা। সে আল্লাহ্‌পাক সম্পর্কে হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রচণ্ড বচসায় লিপ্ত হয়েছিলো। দম্ভ প্রকাশার্থে নির্মাণ করেছিলো এক অত্যুচ্চ স্তম্ভ। ওই স্তম্ভের উচ্চতা ছিলো পনেরো হাজার হাত। কা'ব এবং মুকাতিল বলেছেন, উচ্চতা ছিলো দুই ফরসখ। হঠাৎ একদিন শুরু হলো প্রলয়ংকরী ঝড়। ওই তীব্র তুফান স্তম্ভটির একাংশ উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলো সাগরে। বাকী অংশ আপতিত হলো নগরবাসীদের উপরে। নগরবাসীরা ছিলো নমরুদের অনুসারী। বিধ্বস্ত স্তম্ভের আঘাতে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ওই ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যান-

কারীরা আপনার বিরুদ্ধে যেভাবে ক্রমাগত চক্রান্ত করে চলেছে, তাদের পূর্বসূরীরাও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলগণের বিরুদ্ধে সেরকমই চক্রান্ত করতো, কিন্তু তাদের সে সকল চক্রান্ত আমি কখনো সফল হতে দেইনি। তাদের চক্রান্তের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে যথাসময়ে আমি হেনেছিলাম প্রচণ্ড আঘাত। ফলে তাদের ষড়যন্ত্রের অট্টালিকা ধসে পড়েছিলো। তাদের উপরে আমার শাস্তি কার্যকর হয়েছিলো এমনভাবে, যা ছিলো তাদের ধারণার অতীত। এভাবে নমরুদের সুউচ্চ ইমারতও আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলাম এবং বিনাশ করেছিলাম তার অনুসারীদেরকে। সুতরাং, হে আমার রসুল! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার বিরুদ্ধবাদীদের কোনো চক্রান্ত কখনোই আমি সফল হতে দিবো না।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

❒ পরে, কিয়ামতের দিনে তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন, 'কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদিগের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করিতে?' যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের—

❒ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ উহারা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিবে, 'আমরা কোন মন্দকর্ম করিতাম না।' হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

❒ সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর সেথায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ, অহংকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'পরে, কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।' একথার অর্থ— চক্রান্তকারীদেরকে পৃথিবীতে যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তেমনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে আখেরাতে। অপর এক আয়াতেও

এমতো লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে। যেমন— 'রব্বানা ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলীন্নারা ফাক্বদ আখযাইতাহু (হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে নরকে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে করবে লাঞ্ছিত)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বলবেন, কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে?' একথার অর্থ — আখেরাতের ওই লাঞ্ছনাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, হে অংশীবাদীর দল! পৃথিবীতে যাদের উপাসনায় মগ্ন হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিলে, তোমাদের সেই প্রস্তর প্রতিমাগুলো আজ কোথায়?

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের।' একথার অর্থ— তখন নবী-রসুল ফেরেশতা ও বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে লাঞ্ছনামুক্ত দেখে হেদায়েতপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবেন, আল্লাহ্ দয়া করে পৃথিবীতে আমাদেরকে ইমান ও হেদায়েত দিয়েছিলেন বলে আজ আমরা সকল অকল্যাণ থেকে মুক্ত। আজ সকল লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য। এখানে 'আলইয়াওমা' (আজ) অর্থ হাশরের দিবস। 'আলখিজইয়্যু' অর্থ লাঞ্ছনা বা ক্লেশ। আর 'আস্সূউ' অর্থ শাস্তি, তিরস্কার, অমঙ্গল বা অকল্যাণ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করতে থাকা অবস্থায়।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই আখেরাতে লাঞ্ছিত হবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা প্রতিষ্ঠিত ছিলো অবিশ্বাসের উপর। ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হিসেবেই তাদের জীবন হরণ করে। এ ধরনের হতভাগারা আত্মঅত্যাচারী বা নিজেদের উপরে জুলুমকারী একারণে যে, তারা তাদের সত্তাকে পৃথিবীর সাময়িক সম্ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে আখেরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির হাতে তুলে দেয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা কোনো মন্দ কর্ম করতাম না।' আত্মসমর্পণ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে 'সালাম' শব্দটি। 'সালাম' অর্থ 'ইসতিস্লাম' (সন্ধি বা শান্তির প্রস্তাব)। অর্থাৎ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা তখন উপায়ন্তর না দেখে অনুগত হবে এবং চাইবে শান্তি বা সন্ধি। বলবে, আমরা পৃথিবীতে কোনো মন্দকর্ম করতাম না।

এরপর বলা হয়েছে— 'হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— তাদের অসময়ের শান্তি-প্রস্তাব শুনে ফেরেশতারা বলবে, এখন ওসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ যথাসময়ে তোমরা তওবা করোনি। পৃথিবী পরিত্যাগ করেছো কুফরীর সঙ্গে। আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত যে, পৃথিবীতে সত্যের বিরুদ্ধে কি দোর্দণ্ডপ্রতাপই না প্রদর্শন করতে তোমরা। এখন সংশোধনের সময় নয়। এখন তো প্রতিফল প্রদানের সময়।

ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি ফেরেশতারা উচ্চারণ করেছিলো বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে। এরকমও হতে পারে যে, আলোচ্য উক্তিটি আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাদের নয়।

এর পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো সেখানে স্থায়ী হবার জন্য। দেখো অহংকারীদের আবাসস্থল কতো নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ অথবা ফেরেশতারা তখন একথাও বলবে যে— সুতরাং হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য নির্ধারিত নরকগমনের নির্ধারিত দরজা দিয়ে চিরকালের জন্য প্রবেশ করো নরকে। উল্লেখ্য যে, এখানে নরকগমনের নির্দেশটি হবে ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু তাদের নরকবাস হবে চিরস্থায়ী। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আবওয়াবা জাহান্নাম' (জাহান্নামের দরজা) কথাটির অর্থ হবে— নরকের শাস্তির বিভিন্ন প্রকার অথবা স্তর।

সুরা নাহল ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

❒ এবং যাহারা সাবধানী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছিলেন?' তাহারা বলিবে,'মহাকল্যাণ।' যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মংগল এবং পরলোক আরও উৎকৃষ্ট এবং সাবধানীদিগের আবাস স্থল কত উত্তম!

❒ উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এইভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানীদিগকে,

❒ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ উহারা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে, 'তোমাদিগের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং যারা সাবধানী ছিলো তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, মহাকল্যাণ।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হয়নি এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করার প্রয়াস পায়নি, বিচারদিবসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের প্রভুপালক পৃথিবীতে তোমাদের জন্য কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে এই দুনিয়ায় মঙ্গল এবং পরলোকে আরও উৎকৃষ্ট।' একথার অর্থ— পৃথিবীতে যারা কল্যাণকর্মে ব্রতী হয়, তারা কেবল পৃথিবীতেই কল্যাণ লাভ করেনা, কল্যাণ লাভ করে আখেরাতেও । বরং আখেরাতের কল্যাণ অধিকতর উৎকৃষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'হাসানাতুন' (দুনিয়ার মঙ্গল) অর্থ পুণ্যকর্মের দশগুণ প্রতিদান। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ বিজয় ও সাহায্য। মুজাহিদ বলেছেন, অত্যুত্তম জীবনোপকরণ। আমি বলি, এখানে 'হাসানাতুন' অর্থ ওই বিশুদ্ধ জীবন, যা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানীগুণীদের নিকটেও যা সম্মানার্হ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না, তাঁর স্মরণ ও নৈকট্য চিন্তায় সময় কাটায়, হালালকে হালাল বলে মানে ও গ্রহণ করে এবং হারামকে হারাম বলে জানে ও পরিত্যাগ করে, শরিয়ত বিগর্হিত নিয়মে কাউকে কষ্ট দেয় না এবং এমন নন্দিত কর্মে ব্যাপৃত থাকে, যার জন্য আখেরাতে রয়েছে পুরস্কার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সাবধানীদের আবাসস্থল কতো উত্তম।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র ভয়ে যারা সতর্ক জীবনযাপন করে তাদের ইহলৌকিক আবাস অপেক্ষা আখেরাতের চিরনিরাপদ আবাস কতোইনা উত্তম। পৃথিবীর পুণ্যময় জীবনের বিনিময়ে তাদের আখেরাতের জীবন হবে কতোইনা মর্যাদামণ্ডিত। সেখানে তাদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

হাসান বলেছেন, 'দারুল মুত্তাক্বীন' (সাবধানীদের আবাসস্থল কতো উত্তম) —একথা বলে মুত্তাক্বী বা সাবধানীদের পৃথিবীর জীবনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সাবধানী ব্যক্তিবর্গ ইহজগতেই সংগ্রহ করেন পরজগতের পাথেয়। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'দারুল মুত্তাক্বীন' বলে আখেরাতের অত্যুত্তম আবাসকেই বুঝানো হয়েছে।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তা হবে স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তা-ই থাকবে।' একথার অর্থ— মুত্তাক্বীগণ তখন প্রবেশ করবে

আদ্‌ন নামক স্থায়ী জান্নাতে। সেই জান্নাতের বৃক্ষরাজির নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী। আর সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে। অর্থাৎ সেখানে বিদ্যমান থাকবে তাদের কামনা বাসনার সকল সামগ্রী।

এখানে 'মা ইয়াশাঊনা' কথাটির অর্থ— চিত্তাকর্ষক সুখের সামগ্রীসমূহ, যা পাওয়া যাবে কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে। কথাটির পূর্বে 'ফীহা' উল্লেখ থাকার বিশেষত্ব এই যে, মানুষের হৃদয়জ আশা-আকাঙ্খা প্রশমিত হবে কেবল জান্নাতে। পৃথিবীতে এরকম হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সাবধানীদেরকে।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে শিরিক ও কদর্য কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখে তারাই মুত্তাক্বী বা সাবধানী। আর তাদেরকেই আল্লাহ্‌তায়ালা আখেরাতে এভাবে পুরস্কৃত করবেন।

এর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতাগণ তারা পবিত্র থাকা অবস্থায়।' একথার অর্থ— মুত্তাক্বী বা সাবধানীরা পৃথিবী পরিত্যাগ করে ইমান সহকারে, পবিত্র অবস্থায়। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করে শিরিক থেকে পবিত্র অবস্থায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফেরেশতাগণ বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো।' একথার অর্থ— জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা ওই বিশুদ্ধচিত্ত ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলবে 'সালামুন আলাইকুম' (তোমাদের প্রতি শান্তি)! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দেয়া হলো চির নিরাপত্তা। তোমরা আর কখনো দুঃখ, ক্লেশ অথবা বিপদাপন্ন হবে না। এখন তোমরা তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদানস্বরূপ চিরসুখময় জান্নাতের দিকে গমন করো।

এখানে 'ত্বয়্যিবীনা' কথাটির অর্থ কুফ্‌রী, শিরিক ও অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে মুক্ত, পুত পবিত্র। পূর্ববর্তী আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে, মৃত্যুর ফেরেশতারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যু ঘটায় তাদের আত্মোৎপীড়নরত অবস্থায়। অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়। আর এখানে বলা হয়েছে, মৃত্যুর ফেরেশতারা মুত্তাক্বীগণের মৃত্যু ঘটায় পবিত্রাবস্থায়। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ত্বয়্যিবীনা' অর্থ পবিত্র কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও পুণ্যকর্মের অধিকারী। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— আনন্দিত, উৎফুল্ল। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিবাদন শুনে মুত্তাক্বী বা সাবধানীরা হবে উৎফুল্লচিত্ত। এরকমও অর্থ হতে পারে যে— ওই সকল আল্লাহ্ প্রেমিকেরা আল্লাহ্‌র সন্নিধানলাভের আশায় সারাক্ষণই আনমনা হয়ে থাকেন। কিন্তু তারা জানেন, পৃথিবীতে তাদের অভিলাষ চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। তারা যা চান, তা কেবল আখেরাতেই সম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর তোরণ ছাড়া সেখানে

ভ্রমণ সম্ভবই নয়। তাই তাঁরা মৃত্যুদূত ফেরেশতাকে দেখে ও তাঁর অভিবাদন শুনে উল্লসিত হন।

এখানকার 'সালামুন আলাইকুম' বাক্যটি ফেরেশতাগণের। অনেকের মতে ফেরেশতাগণ ওই অভিবাদন জানান আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে। তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো— একথাটিও ফেরেশতাদের। তাদের একথার অর্থ হবে— এতদিন ধরে যে পুণ্যকর্মসমূহ তোমরা করেছো, তার ফলে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাত। মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশ শেষে তোমরা অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবে। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— মৃত্যুকালে ফেরেশতারা জানাবে শান্তি সম্ভাষণ। আর মহাবিচারের দিনের হিসাব-নিকাশ সমাপনান্তে তারা বলবে— তোমরা যা করতে তার ফলে এবার জান্নাতে প্রবেশ করো।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ○

❒ উহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফেরেশতা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করিত। আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিত।

❒ সুতরাং উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল উহাদিগেরই মন্দকর্মের শাস্তি এবং উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের নিকট ফেরেশতা আসার অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আসার।' একথায় প্রতীয়মান হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ফেরেশতা অথবা আল্লাহ্র শাস্তির জন্য প্রতীক্ষ্যমাণ। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা এলে তারা তড়িঘড়ি করে ইমান আনবে। অথবা ইমান আনবে তখন, যখন চাক্ষুষ করবে মহাপ্রলয় অথবা অন্য কোনো শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণও এরূপ করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সময়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেমন ফেরেশতা অথবা আল্লাহ্‌র আযাবের প্রতীক্ষায় বসে আছে, তেমনি তাদের পূর্বসূরীরাও ছিলো সন্দিগ্ধচিত্ত। তারাও অপেক্ষা করতো মৃত্যুর অথবা শাস্তির। অবশেষে তাদের উপরে শাস্তি নেমেই এসেছিলো। কিন্তু তখন সংশোধিত হওয়ার সুযোগ আর দেয়া হয়নি। অতএব হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার প্রতিপক্ষরা ভেবেছে কী ? শাস্তি আপতিত হলে তারাও তো সংশোধনের সুযোগ পাবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কোনো অত্যাচার করেননি। তারা নিজেরাই তাদের সত্তার উপরে অত্যাচার করে নিজেদেরকে সত্যবিমুখ করে রেখেছিলো। তাদের ক্রমাগত অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও সত্যপ্রত্যাখ্যানই আহ্বান জানিয়েছিলো আল্লাহ্‌র শাস্তিকে। তাই একথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করতো।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো তাদেরই মন্দকর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিলো তা-ই যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্দকর্মের কারণেই তাদের উপরে নেমে এসেছিলো শাস্তি, যে শাস্তির কথা শুনে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

এখানে 'সাইয়্যিআত' অর্থ শাস্তি। 'মা আ'মিলু' অর্থ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা। এই অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকেই এখানে বলা হয়েছে 'মন্দকর্ম'। 'হাক্বাবিহিম' অর্থ আপতিত হয়েছিলো তাদের উপর অথবা পরিবেষ্টন করেছিলো তাদেরকে। 'মা' অব্যয়টি এখানে ধাতুমূল অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওই ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তিই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিলো। অথবা 'মা' অব্যয়টি এখানে সংযোজক। উল্লেখ্য যে, ওই সকল কাফের উপহাসচ্ছলে বলতো, 'আর আমরা যা বলি, তদ্দরুণ আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেনো? তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্‌র গজব।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ
نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي

كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ○

❒ অংশীবাদীরা বলিবে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এবং তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না।' উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এইরূপই করিত। রসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

❒ আল্লাহের ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথভ্রান্তি হইয়াছিল সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?

❒ তুমি উহাদিগের পথ-প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন না এবং উহাদিগের কোন সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অংশীবাদীরা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! লক্ষ্য করুন, অংশীবাদীরা কীরূপ অযৌক্তিক ও অসংগত কথা বলে। তারা বলে, আল্লাহ্র অনুমোদন ব্যতিরেকে যখন কোনো কিছুই ঘটে না, তখন বুঝতে হবে আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমেই ঘটেছে। তাঁর অনুমোদন না থাকলে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ও আমরা নিশ্চয় মূর্তিপূজা করতে পারতাম না। আর যে সকল বিষয়কে আমরা হারাম মনে করি, সেগুলোকেও হারাম বলতে পারতাম না। অতএব রসুল প্রেরণের কথা বলে আমাদেরকে বিব্রত করা হচ্ছে কেনো? কোরআনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধি-বিধান আমাদের উপর প্রয়োগ করাই বা হচ্ছে কেনো? হে আমার প্রিয়তম রসুল! দেখুন, অংশীবাদীরা কতোই না অজ্ঞ। তারা আমার ইচ্ছা ও সন্তোষের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। একথা তো ঠিকই যে, আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো কিছুই

সংঘটিত হয় না। কিন্তু আমি যে আমার নবী-রসুলগণের অনুসারীদের প্রতি পরিতুষ্ট এবং তাদের প্রতিপক্ষদের প্রতি অপরিতুষ্ট। সুতরাং নবী-রসুলগণের মাধ্যমে যে বিধি-বিধান আমি জারি করি তা মান্য করা অত্যাবশ্যক। আর অমান্য করা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। আমি বলেছি, শিরিক বা অংশীবাদ নিষিদ্ধ। অতএব তা পরিত্যাগ করতেই হবে। আর সমগ্র সৃষ্টির একক স্রষ্টা হিসেবে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিধান জারী করার অধিকার কেবল আমার। সুতরাং স্বকপোলকল্পিত হালাল ও হারামের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতেই হবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণ এরূপই করতো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনার সম সময়ের অংশীবাদীরা যেভাবে কথা বলছে, বিগত যুগের অংশীবাদীরাও সেভাবে কথা বলতো। তারা যেভাবে শিরিক করে চলেছে, সেভাবেই শিরিকের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থাকতো তাদের পূর্বসূরীরাও। আল্লাহ্তায়ালার বৈধকৃত বস্তুকে তারা যেমন এখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তেমনি নিষিদ্ধ করতো তাদের পূর্বপুরুষেরাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'রসুলগণের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আমার সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করাই আপনার কর্তব্যকর্ম। আপনার পূর্বে প্রেরিত নবীগণের দায়িত্বও ছিলো এরকম। আমার বার্তাপ্রচার ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব আপনাদের নেই। এটাই আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন বিধান। প্রচার আপনাদের। আর হেদায়েত আমার। আমি যাকে হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করি, সেই হেদায়েত পায়। নবী-রসুলগণকে আমি নির্বাচিত করেছি হেদায়েত প্রদানের মাধ্যমরূপে। তাই হেদায়েতকামীরা তাদের আপনাপন নবীর মাধ্যমে পেয়েছে আমার হেদায়েত ও সন্তোষ। মুক্ত হয়েছে শিরিক ও অন্যান্য মন্দ কর্মের আবিলতা থেকে। আর যারা হেদায়েত চায় না, নবী-রসুল প্রেরণের মাধ্যমে আমি তাদেরকে করেছি বিপদগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে আমি হেদায়েত দিতে ইচ্ছা করিনি। মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণের হেদায়েতের বাণী উপাদেয় খাদ্য সদৃশ। সুস্থ সবল ব্যক্তিরা সেই উপাদেয় খাদ্যের মাধ্যমে হয় পরিপুষ্ট। আর অসুস্থ দুর্বলেরা হয় ব্যাধিগ্রস্ত। ওই ব্যাধিই তাদেরকে নিয়ে যায় মহাসর্বনাশের পথে।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ প্রদানের জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি।' একথার অর্থ— পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মধ্যে আমি আমার বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি। তাদেরকে বলেছি, তোমরা এই মর্মে মানুষকে নির্দেশ দাও যে, ইবাদত করতে হবে কেবল এক আল্লাহ্র। আর বর্জন করতে হবে শয়তান ও প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের পথভ্রান্তি হয়েছিলো সংগতভাবেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাদেরকে সৎপথ দান করতে চেয়েছেন, তারাই হয়েছেন নবী-রসুলগণের অনুসারী। আর যাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে চাননি, অদৃষ্টলিপির নির্ধারণ অনুসারে তারা হয়ে গিয়েছে পথভ্রষ্ট। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে অবিশ্বাসী অবস্থায়। নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে তাদের জনপদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে?' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি অংশীবাদী কুরায়েশদেরকে বলুন, অংশীবাদিতার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ তা যদি তোমরা জানতে চাও, তবে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো। আদ, ছামুদ, হজরত লুতের সম্প্রদায় ও অরণ্যবাসীদের জনপদগুলো একটু দেখে এসো। তাহলেই বুঝতে পারবে সত্যকে মিথ্যা বলার পরিণাম কতোই না মর্মন্তুদ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত অংশীবাদীদের 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতাম না'— এই উক্তিটির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তোষ কখনো এক নয়। তাই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা তাঁর অভিপ্রায়ের অনুকূল হলেও সম্মতি ও সন্তোষের অনুকূল নয়। তিনি ইমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং কাফেরদের প্রতি অসন্তুষ্ট। নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয় তাঁর সন্তোষের দিকে। যারা তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয় না তারা জ্বলতে থাকে আল্লাহ্র অসন্তোষের বহ্নিতে। আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত। তদুপরি বাড়াবাড়ির কারণে পৃথিবীতেও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যেমন শাস্তি দেয়া হয়েছিলো আদ, ছামুদ ও অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোকে।

এর পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের পথপ্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল ! আপনি তো চান, সকল মানুষ হেদায়েত লাভ করুক। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে পথচ্যুত করতে চান তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের জন্য তিনি কোনো সাহায্যকারীও রাখেননি। অতএব আপনি তাদেরকে সাহায্য করবেন কীভাবে? উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতের 'তাদের কতকের পথভ্রান্তি হয়েছিলো সংগতভাবেই' এবং আলোচ্য আয়াতের 'আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন'— কথা দু'টোর মর্মার্থ এক।

'মা লাহুম্ মিন্নাসিরীন' কথাটির অর্থ তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুসারে যারা পথভ্রষ্ট তাদেরকে সহায়তা করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারে চিরঅমুখাপেক্ষী,

চিরস্বাধীন। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি তিনি যে শাস্তি অবতীর্ণ করেন, সে শাস্তি রহিত করার সাধ্য কারোই নেই। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যার হেদায়েত চান না আপনি তাকে হেদায়েত করতে পারেন না।

আবুল আলীয়া সূত্রে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, এক পৌত্তলিক জনৈক মুসলমানের নিকটে কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলো। কিছুদিন পর লোকটি ঋণ পরিশোধের জন্য মুসলমান ব্যক্তির নিকটে গেলো। কথা প্রসঙ্গে মুসলমান লোকটি বললেন, আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকটে এরূপ আশা রাখি। পৌত্তলিক বললো, মনে হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাকে আর জীবিত করেন না। তাদের এরকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝

❒ উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহের শপথ করিয়া বলে যে, 'যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না।' ইহা সত্য নহে; তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে—

❒ তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই যে-বিষয়ে উহাদিগের মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানিতে পারে যে, উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' আলোচ্য বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে ৩৫ সংখ্যক আয়াতের 'ক্বলাল্ লাজীনা আশরাকু' (অংশীবাদীরা বলবে) বাক্যটির সঙ্গে। এভাবে আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে— অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোনো কিছুর ইবাদত করতাম না। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে একথাও বলে যে, যার মৃত্যু হয়, আল্লাহ্ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। অর্থাৎ তারা যেমন আল্লাহ্‌র এককত্বকে অস্বীকার করে, তেমনি অস্বীকার করে পুনরুত্থানকেও।

এরপর বলা হয়েছে— *'এটা সত্য নয় । তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই । কিন্তু* অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয় ।' একথার অর্থ— পুনরুত্থানের বিষয়ে আল্লাহ্‌র অংগীকার সত্য । আর তিনি তো কখনোই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না । পুনরুত্থানের পরে হবে বিচার কার্য । এ বিষয়টিও অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অনবগত । তাই তারা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার দিবস— এ সকল কিছুকে অস্বীকার করে । তাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতা অবরুদ্ধ । তাই তারা জীবন-মৃত্যুর রহস্য অনুধাবন করতে পারে না । বিশ্বাস করতে পারে না যে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র পক্ষে মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার, হিসাব নিকাশ, মিজান, পুলসিরাত, ইত্যাদি বিষয় কার্যকর করা অতি সহজ । আর তিনি এ সকল বিষয় কার্যকর করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই, যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিলো তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য ।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত্যুর পর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটাবেন । মতানৈক্য নিরসনার্থে তিনি বিষয়টি সকলের প্রত্যক্ষগোচর করাবেন । আর এব্যাপারে তিনি তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । সুতরাং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জানতে পারে যে, তারাই ছিলো মিথ্যাবাদী ।' একথার অর্থ— যথাসময়ে পুনরুত্থান ঘটিয়ে অংশীবাদীদের উক্তি যে মিথ্যা, তা তিনি প্রমাণও করবেন । অংশীবাদীরাও তখন জানতে পারবে যে, তারা ছিলো মিথ্যাবাদী ।

এখানে 'তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য' কথাটির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে পুনরুত্থান ও বিচারানুষ্ঠানের যুক্তি এবং কারণ । সত্য-অসত্য কখনো এক নয় । তাই মৃত্যুর পর চিরদিনের জন্য সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়ার কার্যটি সম্পন্ন করা হবে । অংশীবাদীরা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য । তাই তারা বোঝে না যে, এই অস্থায়ী পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাগার । চূড়ান্ত ফলাফল প্রদানের স্থান এটা নয় । চূড়ান্ত সমাধানের স্থান হচ্ছে আখেরাত । অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে, 'তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য' এ কথাটির সংযোগ রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি' (আয়াত ৩৬) কথাটির সঙ্গে । যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি । তাঁরা আমার নির্দেশানুসারে আপনাপন সম্প্রদায়কে বলেন, অংশীবাদকে পরিহার করো । বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে এসো এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথে । সত্য ও মিথ্যা কখনো এক নয় । আল্লাহ্ কখনোই মানুষকে প্রতিমাপূজক হতে বলেন নি । একথাও কখনও বলেননি যে, তোমরা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল সাব্যস্ত করবে ।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

❒ আমি কোন কিছু চাহিলে সে-বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে,উহা হইয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা অজ্ঞ, মূর্খ ও জ্ঞানান্ধ। তাই মনে করে থাকো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একথা কেনো অনুধাবন করতে চাও না যে, এ বিশাল সৃষ্টিকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি কেবল আমার অভিপ্রায়ের মাধ্যমে, বিনা নমুনায় ও উপকরণে। আমি কেবল বলেছি 'হও'। অমনি সৃজিত হয়েছে এই মহাবিশ্ব। এভাবে প্রথমবার যদি আমি সৃষ্টি করতে পারি, তবে দ্বিতীয়বার পারবো না কেনো? এটাই আমার সৃজনায়নের রীতি যে, আমি কোনো কিছু চাইলে কেবল বলি 'হও'। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

এখানে 'ইজা আরাদ্‌নাহু' কথাটির অর্থ যখন আমি কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে ইচ্ছা করি। সেটা প্রথমবার হোক অথবা দ্বিতীয়বার। কিংবা অসংখ্যবার। সুতরাং আমি যে পুনরুত্থান ঘটাতে পারি, একথাটা তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না কেনো? মোট কথা, আল্লাহ্‌পাক এই বিশাল সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেছেন আপন মহিমায়, অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে নয়। কারণ তিনি চির অমুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছা চির অবাধ। সকল প্রকার ঔচিত্য ও বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত ও পবিত্র।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি অসত্যারোপ করেছে। এটা তার জন্য অত্যন্ত অশোভন। আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে। এটাও তার জন্য অসমীচীন। সে বলে, আল্লাহ্ আমাকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ। এটাই আমার প্রতি বান্দার অসত্যারোপ। আর তার গালি এরকম— সে বলে, আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। অথচ আমি এক। একক। অমুখাপেক্ষী। আমি যেমন কারো পিতা নই, তেমনি নই কারো পুত্র। আমি আনুরূপ্যবিহীন।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে— তাদের গালি দেয়ার ধরন এরকম— তারা বলে, আমার সন্তান আছে। অথচ আমি পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে পবিত্র। বোখারী।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

❐ যাহারা তাহাদিগের উপর অত্যাচার হইবার পর আল্লাহের পথে দেশত্যাগ করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এবং পরলোকে তাহাদিগের পুরস্কার সমধিক। হায়, উহারা যদি ইহা জানিত!

❐ আল্লাহের পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অত্যাচারিত হবার পর কেবল আল্লাহ্‌র পরিতোষ সাধনার্থে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে দান করবো উত্তম গৃহ এবং পরবর্তী পৃথিবীতে দান করবো ততোধিক উত্তম পুরস্কার। আল্লাহ্‌র পথে হিজরত বা দেশত্যাগের মধ্যে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ— একথা যদি হিজরতকারীরা জানতো, তবে তারা এর চেয়ে অধিক ক্লেশ ও যাতনা মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠিত হতো না। আর যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথা জানতো, তবে তারাও বন্ধ করে দিতো বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের এই অকথ্য অত্যাচার। এখানে 'ফিল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। 'জুলিমু' অর্থ অত্যাচারিত হবার পর।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এবং দাউদ বিন হিন্দ থেকে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু জনদল বিন সুহাইল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

মক্কার মুশরিকেরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলো। ক্রমাগত অকথ্য উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিলো তাঁর উপর। হজরত কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবদ বিন হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে লক্ষ্য করে। তাঁদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করতো মক্কার অংশীবাদীরা। পরে তাঁদের একদল হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। আরেক দল যান মদীনায়। শেষ পর্যন্ত মদীনাই হয়ে ওঠে হিজরতকারীদের প্রধান কেন্দ্র। তাই মদীনাকে বলা হয় দারুল হিজরত বা দেশান্তরিতদের আবাস। মদীনার নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসীরা হিজরতকারী বা মুহাজিরগণকে প্রেমময় আতিথ্য ও সকল প্রকারে সহায়তা করে 'আনসার' নামে ইতিহাস খ্যাত হয়ে রয়েছেন।

'দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিবো' বলে এখানে মুহাজিরগণকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত করার শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর মুহাজিরগণের কাউকে কখনো কোনো কিছু দেয়ার সময় বলতেন, এটা নাও। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। এটাতো সেই উপহার, যা পৃথিবীতে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশটির অর্থ হবে— আমি দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে কল্যাণজনক সম্পর্ক রাখবো। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন এভাবে— এ পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে দান করবো ইমান গ্রহণের সামর্থ্য ও পুণ্যপথের দিকনির্দেশনা।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগীরা ধৈর্যশীল ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।' এখানে 'সবারু' (ধৈর্যধারণ করেছে) ক্রিয়াটির কর্মপদ উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগীরা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার, দেশত্যাগের বেদনা ও অন্যান্য বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে (বঙ্গানুবাদে এরকমই লেখা হয়েছে)।

'ইয়াতাওয়াক্‌কালূন' অর্থ 'তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল।' অর্থাৎ মুহাজিরগণ ধৈর্যধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে সোপর্দ করে। সর্বাবস্থায় নির্ভরশীল হয় কেবল আল্লাহ্‌র উপর।

অবিশ্বাসীরা রসুল স.কে একবার বললো, মানুষ আবার কখনো আল্লাহ্‌র বাণীবাহক হতে পারে নাকি? অসম্ভব! আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে হেদায়েত করতেই চান তবে বাণীবাহকরূপে কোনো ফেরেশতাকেই তো পাঠাতে পারতেন। তাদের এহেন মূর্খজনোচিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

❐ তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে কিতাবীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

❐ আমি মানুষ পাঠাইয়াছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ; তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল তাহা উহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, হে আমার রসুল! আপনি অজ্ঞ অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যাদেশসহ মানুষ নবী প্রেরণ করাই আমার রীতি। ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল নবী-রসুল মানুষই ছিলেন। আর ছিলেন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! আল্লাহ্তায়ালার এই চিরাচরিত বিধান সম্পর্কে যদি তোমাদের না জানা থাকে, তবে ইতোপূর্বে যাদের নিকট আকাশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিলো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। তারা হচ্ছে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়।

উল্লেখ্য যে, ইহুদী ও খৃষ্টান অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের মধ্যে হজরত মুসা ও হজরত ঈসা সহ বহুসংখ্যক নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। আরো পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। তৎপূর্বে হজরত নুহ্। তাঁরা সকলেই ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহ্র প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের জ্ঞান যার নেই তাকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে বিজ্ঞজনের নিকট থেকে, যিনি নির্ভরযোগ্য।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ।' একথার অর্থ, আমি আমার মনোনীত বার্তাবাহকগণকে প্রেরণ করেছিলাম আসমানী কিতাব ও বহুসংখ্যক মোজেজা সহকারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বসূরীগণের মতো আপনাকেও আমি দান করেছি আসমানী কিতাব। মানুষের হেদায়েতের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে এই কিতাব। এতে রয়েছে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির হুঁশিয়ারী এবং অন্যান্য বৈধ অবৈধ বিধানাবলী। এসকল বিধানের সরল ও জটিল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক আপনি সুস্পষ্টরূপে মানুষকে বুঝিয়ে দিন। মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে এই মহাগ্রন্থটি। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে কোরআনের প্রকাশ্য দিক তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত দিকটিও ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে রসুল স.কে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা চিন্তা করে।' একথার অর্থ— কোরআন মজীদের নির্দেশসমূহের যথাযথ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। চিন্তাভাবনা না করে কেবল শাব্দিক অর্থের অনুসরণ করলে চলবে না। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের শস্যক্ষেত্রে এসো।'

এখানে শস্যক্ষেত্র বলে বোঝানো হয়েছে রমণী-অঙ্গকে। পায়ুপথ বা অন্য কোনো অঙ্গকে নয়। কারণ শস্যক্ষেত্রে যেমন ফসল উৎপাদিত হয়, তেমনি যথাঅঙ্গে রতিক্রিয়া চরিতার্থ করলে পাওয়া যায় সন্তানরূপী ফসল। সুতরাং বিনা চিন্তায় স্থূল অর্থ গ্রহণ করলে চলবে না। এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে, যেমন— এক স্থানে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করছেন, 'তোমরা

অপেক্ষা করো তিন কুরু।' এখন চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে এই 'কুরু' অর্থ কী? তিন ঋতু না তিন পবিত্রাবস্থা (তিন হায়েজ, না তিন তুহুর)। উল্লেখ্য যে, উত্তম তালাক প্রদানের সময় হচ্ছে পবিত্রাবস্থায় তালাক প্রদান। এখন কেউ যদি তালাক দেয় তবে সেটা অবশ্যই হবে একটি ভগ্ন সময়কাল। অর্থাৎ দেখা যাবে, তখন হায়েজ অথবা তুহুরের কিছু অংশ অতীত হয়েছে এবং কিছু অংশ রয়েছে বাকী। এমতাবস্থায় 'তিন কুরু' অর্থ যদি তুহুর বা পবিত্রাবস্থা ধরা হয়, তবে কিছুতেই তিন পবিত্রাবস্থা মেলানো যাবে না। তিন পবিত্রাবস্থার সময়কাল হবে হয়তো বেশী, নয়তো কম। সুতরাং 'তিন কুরু' অর্থ এখানে 'তিন হায়েজ' গ্রহণ করাই যুক্তি সংগত ও সহজ। কারণ তালাক যখনই দেয়া হোক না কেনো, তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হলেই পূর্ণ হবে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতকাল। এভাবে আল্লাহ্‌র দেয়া চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে মর্মোদ্ধার করতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে— 'যাতে তারা চিন্তা করে'।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ○ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

❒ যাহারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না? — অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাতীত?

❒ অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগকে বিধৃত করিবেন না? উহারা তো ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

❒ অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করিবেন না? তোমাদিগের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

মক্কার মুশরিকেরা যখন রসুল স.কে উৎখাত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলো, তাদের পরামর্শ সভায় তাঁকে হত্যা, বন্দী এবং দেশান্তরের ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছিলো এবং যখন ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজকে করে দিয়েছিলো অবরুদ্ধ প্রায়, তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াতত্রয়। রসুল স. এর শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌পাক তখন এই মর্মে হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ করলেন

যে— 'যারা কুকর্মে ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না? অথবা এমন দিক থেকে শাস্তি আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত?' একথার অর্থ— মুশরিকেরা এ কথা বুঝতে পারে না কেনো যে আমি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। যে কোনো মুহূর্তে আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। তাদেরকে বিলীন করে দিতে পারি ভূগর্ভে। অন্য কোনোভাবেও বিনাশ করতে পারি তাদেরকে, যার সম্পর্কে ধারণা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়কে তো আমি এভাবে অতর্কিতে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। সুতরাং আমার রসুলের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছে কীভাবে?

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'অথবা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে বিধৃত করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' একথার অর্থ— ধনাঢ্য অংশীবাদীরা তো বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে গমনাগমন করে। তাদের ওই গমনাগমনকালেও তো আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারি। যে কোনো সময়ে যে কোনো শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারি। আমার ওই শাস্তিকে ব্যর্থ করার ক্ষমতাও তো তাদের নেই। সুতরাং তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে কী-ভাবে?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'তাক্বল্লুব' অর্থ বিরোধ। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, অগ্রগামী ও পশ্চাদ্গামী হওয়া। অর্থাৎ গমনাগমন বা চলাফেরা করা।

এর পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিধৃত করবেন না?' এখানে 'তাখাওউফ' অর্থ কম করে ফেলা, সংকুচিত করা। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিধৃত করা বা ঘিরে ফেলা। যেমন বলা হয় 'তাখাওয়াফুহুদ্ দাহ্রু' (কালচক্র ক্ষতিসাধন করেছে শরীরের ও সম্পদের)। বাগবী লিখেছেন, শব্দটির মর্মার্থ হবে বনী হুজাইল গোত্রের প্রবচনের অনুরূপ। অর্থাৎ কম করার অর্থ হবে এখানে কাউকে আজ, কাউকে কাল, কাউকে পরশু— এভাবে নিপাত করে ধীরে ধীরে সমস্ত সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করে দেয়া। জুহাক ও কালাবী বলেছেন, 'তাখাওউফ' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত, আতংকজনক। আমি বলি, এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— যখন কাউকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, তখন তা অবলোকন করে আতংকিত হবে অন্যেরা। এরকম আতংকিত অবস্থায় নিধনক্রিয়া চলতেই থাকবে তাদের উপর। অথবা মর্মার্থটি হবে এরকম— প্রথমে

দেখানো হবে ভয়াবহ কোনো নিদর্শন। ফলে তারা হয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত । আর ওই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করা হবে তাদেরকে। অবশেষে বিনাশ করা হবে সকলকে। যেমন করা হয়েছিলো ছামুদ সম্প্রদায়কে। আগাম নিদর্শন হিসেবে তারা আল্লাহ্পাকের রুদ্ররোষ প্রত্যক্ষ করেছিলো। প্রথম দিবসে তাদের মুখাবয়ব হয়ে গিয়েছিলো হরিদ্রাভ। রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিলো দ্বিতীয় দিবসে। আর তৃতীয় দিবসে হয়ে গিয়েছিলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এরপর তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিলো চতুর্থ দিবসে। এসকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে, হে মক্কার অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! এরকম শাস্তিও তো আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দিতে পারেন। সুতরাং তোমরা কীভাবে নিশ্চিন্ত হতে পারলে যে, আল্লাহ্র রোষ থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে?

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (রউফুর রহীম)।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা 'রউফ' এবং 'রহীম' বলেই ত্বরিৎ শাস্তি অবতীর্ণ করছেন না। আর এই বিলম্বের কারণেই অংশীবাদীরা আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে হয়েছে নির্ভয়, নিশংকচিত্ত। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর। আর তাঁর প্রতিশোধজনিত শাস্তিকে ব্যাহত করার সাধ্য কারোই নেই।

উল্লেখ্য যে, ৪৫ সংখ্যক আয়াতের 'আফা আমিনা' (তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে তৎপূর্বে উল্লেখিত ৪৪ সংখ্যক আয়াতের 'আমি মানুষ পাঠিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ' কথাটির সঙ্গে। আর 'আফাআমিনা' এর 'ফা' অব্যয়টি এখানে পরম্পরা অর্থে ব্যবহৃত। এভাবে সম্মিলিতরূপে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আমি মানুষকে সুপথে পরিচালিত করবার জন্য ইতোপূর্বে অনেক নবী-রসুল পাঠিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা ওই সকল নবী-রসুলের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। তাদের ওই হঠকারিতার যথোপযুক্ত শাস্তিও আমি দিয়েছি। বিভিন্নভাবে বিনাশ করেছি তাদেরকে। অতএব হে মক্কার মুশরিকেরা! তোমরা আমার শেষ রসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত হও। পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ ছিলেন আমার প্রিয়ভাজন। তেমনি শেষ রসুলও আমার প্রিয়। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তোমাদের উপরেও নেমে আসবে তোমাদের পূর্বসূরীদের মতো লাঞ্ছনা ও ধ্বংস। আল্লাহ্তায়ালা দয়ার্দ্র বলেই তোমাদের হঠকারিতাকে সহ্য করে চলেছেন। কিন্তু একথাটিও তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত কঠোর।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ○ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

❐ উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাহার ছায়া আল্লাহের প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত থাকিয়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়ে?

❐ আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যতকিছু জীবজন্তু আছে সেসমস্ত, এবং ফেরেশতাগণও; উহারা অহংকার করে না।

❐ উহারা ভয় করে উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় উহারা তাহা করে।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার শত্রুরা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না কেনো যে, সৃষ্ট বস্তুসমূহের ছায়া, ঋতু পরিবর্তন ও সূর্য পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয়। বিনয়াবনত ওই ছায়া-প্রতিচ্ছায়া কখনো হয় হ্রস্ব। কখনো দীর্ঘ। কখনো পতিত হয় দক্ষিণে। আবার কখনো বামে। এভাবেই তো সমগ্র সৃষ্টি প্রতিনিয়ত আজ্ঞা পালন করে চলেছে তাঁর। স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যগতভাবে।

এখানে 'সুজ্‌জ্বাদান্‌' অর্থ সেজদাবনত হয়ে— স্বেচ্ছায় অথবা স্বভাবগতভাবে। যেমন বলা হয় 'ওয়া সাজ্বাদাল বাঈরু ইজা ত্বআ ত্বআ রাআসাহু লিইয়ারকাব' (আরোহী বহণের জন্য উট মস্তক অবনত করেছে)। আবার 'সাজ্বাদান্‌ নাখলাতু' (ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে খেজুর গাছ)। মোট কথা, ছায়া-প্রতিচ্ছায়ারাও আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় ও বিধানের অনুগত। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, ছায়া-প্রতিচ্ছায়াসমূহ সেজদার আকৃতিতে ভূপৃষ্ঠে ঢলে পড়ে। কখনো বামে কখনো দক্ষিণে। যেনো সেগুলো ভূলুণ্ঠিত হয়ে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে জানাচ্ছে তাদের ভক্তি ও বিনয়।

পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌কে সেজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যতোকিছু জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করে না।' এখানে 'মা ফিস্‌সামাওয়াত্‌' বলে

বুঝানো হয়েছে আকাশের সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সমূহকে। আর 'মা ফিল আরদ্ব' বলে বুঝানো হয়েছে ভূপৃষ্টের সকল প্রাণীকুলকে। অথবা কথা দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকুলকে (মিন্‌দাব্বাত্‌কে)। উল্লেখ্য যে, সচল, সচেতন ও অবয়বধারী সৃষ্টিকে আরবীভাষীরা বলে থাকে 'দবীব' । স্বর্গের হোক অথবা মর্ত্যের।

'ওয়াল মালায়িকাতু' অর্থ এবং ফেরেশতাগণও। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা সুনির্দিষ্টরূপে আকাশ অথবা পৃথিবীর প্রাণী নয়। তাদের কেউ কেউ দায়িত্বরত আকাশে। কেউ পৃথিবীতে। কেউ আরশে। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ পৃথক একটি সৃষ্টি। এখানে 'ওয়াও' (এবং) সহযোগে তাই তাদেরকে একটি বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে দেখানো হয়েছে। অন্যত্রও এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'তানায্‌যালুল মালায়িকাতু ওয়ার রূহ' (অবতীর্ণ হয় ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাইল)। এখানে হজরত জিবরাইল ফেরেশতা সম্প্রদায়ভূত হলেও তাঁকে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে 'ওয়াও'(এবং) সহযোগে পৃথকভাবে।

'সুজুদ' অর্থ আনুগত্য বা সমর্পণ। এই সমর্পণ হতে পারে দু'ভাবে। বাধ্যগতভাবে অথবা স্বেচ্ছায়। বাধ্যগত সমর্পণ আল্লাহ্‌তায়ালার একটি সাধারণ বিধান। সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি কাফেরকুলও এই সাধারণ সমর্পণের অন্তর্ভুক্ত। জন্ম-মৃত্যু, অস্তিত্ব রক্ষা ইত্যাকার বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাধারণ বিধানে সমর্পিত না হয়ে কারো কোনো উপায়ই নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টির সেজদাবনত হওয়ার বিষয়টি সৃষ্টি-নৈপূণ্যের একটি অনিবার্য প্রকাশ। এই সমর্পণ-সৌন্দর্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে অসমর্থ। তবে আমি বলি, এখানে যে সেজদার কথা বলা হয়েছে, তা বাধ্যগত বা নিশ্চেতন সেজদা নয়। সমগ্রসৃষ্টি স্বেচ্ছাগত ও সচেতনভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সেজদার মাধ্যমে তাদের ভক্তি ও প্রণতি জানায়। জড়-অজড়, মৌলিক-অমৌলিক সকল সৃষ্টিই তাদের আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে অনুভূতিপ্রবণ। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণেই আমরা কোনো কোনো পদার্থকে অনুভূতিহীন বা নিশ্চেতন বলে থাকি। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। কোরআন মজীদের কোনো কোনো আয়াতেও আমার এই অভিমতটির সায় রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে আকাশ কড় কড় রবে আওয়াজ তুললো, এরকম করাই ছিলো তার জন্য শোভন। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, যারা কাফের, তারা ছাড়া আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌কে সেজদা করে। আল্লাহ্‌পাক সুরা হজের সেজদা-বিশিষ্ট আয়াতে ঘোষণা করেছেন— 'ওয়া কাছিরুম্‌ মিনান্‌ নাস' (মানবমণ্ডলীর মধ্যে অধিক সংখ্যক)। এখানে কাফেরদের ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা অহংকার করে না।' এ কথার অর্থ তারা অহংকার করেনা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে। একথাটির মধ্যেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ তারা অহংকারী। আর সেজদাকারীরা নিরহংকার, নির্দর্পিত।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে।' একথার অর্থ— ওই সকল সেজদাকারীরা তাদের মহান পরাক্রমশালী পালনকর্তাকে যথারীতি ভয় করে চলে। কারণ আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'হুয়াল কৃাহিরু ফাওকৃ ইবাদিহী' (তিনি তাঁর বান্দাগণের উপরে মহাপ্রতাপশালী। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— তাঁকে যারা সেজদা করে তারা সদাসন্ত্রস্ত থাকে তাঁরই শাস্তির ভয়ে।

এরপরে বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা করে।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে ওই আদেশ প্রদান করেন, যে আদেশ প্রতিপালনের যোগ্যতা তাদের রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি দান করেন প্রতিপালনসাধ্য আদেশ। এখানে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে সেজদা করে না। কারণ সেজদাকারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ— অনহংকার, আল্লাহ্ ভীতি ও নির্দেশ প্রতিপালন তাদের মধ্যে নেই। এতদসত্ত্বেও যদি পূর্ববর্তী আয়াতের 'সেজদা করে' কথাটিকে বাধ্যগত সেজদারূপে গ্রহণ করে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হয়, তবে 'অহংকার করে না', 'ভয় করে' ও 'যা আদেশ করা হয় তা করে'— এই কথাগুলো প্রযোজ্য হবে কেবল ফেরেশতাবৃন্দের উপর। কারণ এ সকল বৈশিষ্ট্য কেবল ফেরেশতাবৃন্দের মধ্যেই পূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনি, তোমরা তা শোনো না। শপথ ওই সুমহান সত্তার, যার আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, আকাশ মার্গের এমন চার আঙ্গুল পরিমান পরিসর নেই, যেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা সেজদারত অবস্থায় নেই। আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তবে রোদন করতে বেশী, হাস্য করতে কম। রমণীসঙ্গের অভিলাষও উবে যেতো তোমাদের হৃদয় থেকে। উদাসী প্রান্তরে বুক ফাটিয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকাই মনে হতো তখন অধিকতর উত্তম। এরপর হজরত আবু জর বলেছেন, হায়! আমি যদি বৃক্ষ হতাম। তাহলে আমাকে কেটে ফেলা হতো (হিসাব নিকাশ হতো না)। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, বাগবী।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যারা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْــَٔرُوْنَ ○ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করিও না; আমিই তো একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং তাঁহারই আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

❒ তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তাহা তো আল্লাহেরই নিকট হইতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহাকেই বিনীতভাবে আহ্বান কর।

❒ আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদিগের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করে;

❒ আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য! সুতরাং ভোগ করিয়া লও, পরে জানিতে পারিবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ কোরো না; আমিই তো একমাত্র ইলাহ্।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, হে মানুষ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করো। দুই উপাস্যকে নির্ধারণ কোরো না। কারণ দুই উপাস্য হওয়া অসম্ভব। তাই তা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌তায়ালাই একক উপাস্য। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এককত্বকে প্রমাণ করা হয়েছে। কারণ এককত্বই হচ্ছে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমাকেই ভয় করো।' এখানে 'ইয়াছয়া' পদটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। আর 'ফারহাবু' ক্রিয়ার কর্মপদ এখানে উহ্য। ওই উহ্য কর্মপদসহ বক্তব্যটি হতে পারতো এরকম— 'ফাইয়াছয়া ইরহাবু ফারহাবুন' (বিশেষভাবে আমাকেই ভয় করো, বস্তুতঃ আমাকেই ভয় করো)। বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্। এসকল কিছুকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও কেবল তিনিই সংরক্ষণ করেন। তাই তাঁর পক্ষে জুলুম করার বিষয়টি অচিন্তনীয়। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে তাকে বলে জুলুম। কিন্তু অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা তাঁর নেই। কারণ অপর কোনো স্রষ্টাই যে নেই। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে মোতাজিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণাটি অপসৃত হয়। তারা বলে, মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা নেই। অতএব মানুষ তার কর্মের নির্মাতা বটে, স্রষ্টা কদাচ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাঁরই আনুগত্য করা শাশ্বত কর্তব্য।' একথার অর্থ— আনুগত্য গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে কেবল তাঁর । সুতরাং কেবল তাঁরই উপাসনা করতে হবে এবং ভয় করে চলতে হবে একমাত্র তাঁকে । উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের আনুগত্য সার্বক্ষণিক। সুতরাং মানুষের আনুগত্যও সার্বক্ষণিক হওয়া অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। ইমরান, হাকিম বিন আমর গিফারী থেকে যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম।

হজরত আলী থেকে বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যতিরেকে কারো আনুগত্য সিদ্ধ নয়। অনুগত হতে হবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পুণ্যকর্ম সম্পাদনার্থে। আল্লাহ্র নির্দেশ বিরোধী কর্ম অনুসরণীয় নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্পাকের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো আনুগত্য সিদ্ধ নয়। কারণ তিনিই সকলের এবং সকল কিছুর একক অধিকর্তা। কর্তার অনুমতি ছাড়া যেমন তার অধীনস্থরা অর্থ ব্যয় করতে পারে না, তেমনি আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ও অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর বান্দাগণ অন্য কারো আনুগত্য করতে পারে না।

কোনো কোনো ভাষ্যকার লিখেছেন, এখানে 'দ্বীন' কথাটির অর্থ বিনিময়, প্রতিদান বা প্রতিফল। যদি তাই হয়, তবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— প্রকৃত প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান একমাত্র তাঁরই কাজ। তিনিই বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করবেন উত্তম প্রতিদান এবং অবিশ্বাসীদেরকে দিবেন উপযুক্ত শাস্তি।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'দ্বীন' শব্দটির অর্থ শাস্তি। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চিরস্থায়ী দণ্ড দান করার যোগ্যতা রয়েছে কেবল তাঁরই।

'ওয়াসিবা' অর্থ ব্যাধিগ্রস্ত। যেমন বলা হয় ওয়াসিবা জায়েদ (জায়েদ ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লিষ্ট)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক 'ওয়াসিব' শব্দটির মাধ্যমে তাঁর শাস্তির কথা বলেছেন। যেমন— 'ওয়া লাহুম আজাবুঁ ওয়াসিবা' (আর তাদের

জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি)। জননী আয়েশা বলেছেন, আনা ওয়াসব্‌তু রসুলাল্লহ্ (আমি রসুল স.কে ব্যথিত বা দুঃখিত দেখেছি)। নেহায়া গ্রন্থে রয়েছে— নিরন্তর দুঃখ-যাতনাকে বলে 'ওয়াসব'। আর পীড়িতকে বলে 'তাওসিব'। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়াসব' অর্থ ব্যাধি। 'আওসবাহুল্লহ্ অর্থ— আল্লাহ্ তাকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছেন। 'ওয়াসবা আলাল আমর' অর্থ কারো আনুগত্যের ব্যবস্থাপনা করেছে। করেছে তত্ত্বাবধান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে?' একথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা অন্য কাউকে ভয় কোরো না। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কারো উপকার কিংবা ক্ষতি করার সাধ্য নেই।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ করো, তাতো আল্লাহ্‌রই নিকট থেকে'। একথার অর্থ— তোমাদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি আল্লাহ্‌তায়ালার করুণা বই অন্য কিছু নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই বিনীতভাবে আহ্বান করো।' একথার অর্থ— আবার যখন তোমাদের উপরে নেমে আসে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য বিপদাপদ, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই তো সাহায্যপ্রার্থী হও।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে।' একথার অর্থ— তিনিই একমাত্র দাতা। সুখ ও দুঃখ তাঁরই দান। তিনি দুঃখ দেন বটে, কিন্তু তা তো অপসারণও করেন। কিন্তু বিপদ অপসারণের পর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে বসে। বলে, তাদের বাতিল উপাস্যরাই তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী-অংশীবাদী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। কিন্তু এখানে 'মিনকুম' (তোমাদের একদল) কথাটির কারণে প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার সম্বোধিত ব্যক্তিরা অবিশ্বাসী। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— বিপদ অপসারণের পর অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক অংশীবাদী হয়ে যায়। এতে করে বুঝা যায়, সকলেই অংশীবাদী হয় না, কেউ কেউ আবার ফিরে আসে সত্যের পথে। অপর এক আয়াতেও এরকম কথা এসেছে। যেমন— 'অতঃপর সাগরের ভয়াবহ ঝড়তুফান থেকে পরিত্রাণদানের পর আল্লাহ্ যখন তাদেরকে তটভূমিতে পৌঁছে দেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক গ্রহণ করে মধ্যম পন্থা।'

এর পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করবার জন্য' একথার অর্থ— আমিই অনুগ্রহ করে আপতিত বিপদ

অপসারণ করি। অথচ বিপদমুক্তির পর কিছু সংখ্যক লোক আমার এই অনুগ্রহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্থেই আমার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে। এখানে 'লিইয়াকফুরু' কথাটির 'লাম' অব্যয়টি পরিণতিসূচক। অর্থাৎ তাদের শিরিকের পরিণতি এই যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে তারা অগ্রাহ্য করে এবং অকৃতজ্ঞ হয়। উপাসনা শুরু করে অন্যের।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং ভোগ করে নাও, পরে জানতে পারবে।' এখানে 'তামাত্তাউ' শব্দরূপটি অনুজ্ঞাসূচক। এভাবে এখানে অকৃতজ্ঞদেরকে শাসানো হয়েছে। 'ফা সাওফা তা'লামূন' অর্থ শীঘ্রই জানতে পারবে। একথাটিও সতর্ক সংকেত বা শাসনসূচক। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— ঠিক আছে। পৃথিবীর জীবনের যে হায়াত আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি, সেই সময়ের মধ্যেই তোমরা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকো। মৃত্যুর সময়, মহাপ্রলয়কালে অথবা মহাবিচারের দিবসে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে অকৃতজ্ঞতা ও অংশীবাদিতা কত মন্দ ও মর্মন্তুদ।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۚ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

❑ আমি উহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহের, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।

❑ উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহের জন্য কন্যাসন্তান; তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং উহারা স্থির করে নিজদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে!

❑ উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

❐ উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে, না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে! সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

❐ যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহের ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করি, তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।' একথার অর্থ— রিজিক দান করি আমি। অথচ অংশীবাদীরা ওই রিজিকের একাংশ নির্ধারণ করে তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য। অথচ তারা একথা বুঝতেই পারে না যে, ওই জড় প্রতিমাগুলো আসলে কিছুই নয়। উপাসনা লাভ করার যোগ্য তো নয়ই। কারো কোনো লাভ অথবা ক্ষতি করার সাধ্যও সেগুলোর নেই। কতোই না মূঢ় ও মূর্খ অংশীবাদীরা। না জেনে শুনেই তারা আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের বাতিল উপাস্যগুলোর জন্য নির্ধারণ করে অর্ঘ্য, প্রসাদ ও বিভিন্ন রকমের ভোগ। কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে— অংশীবাদীরা একথা জানেই না যে, ওই সকল প্রস্তর প্রতিমাগুলোর প্রাপ্য আসলে কী? মূর্তিগুলো নিজেরাই কি কিছু জানে বা বুঝে? ওগুলোতো নিঃশ্চেতন, নিষ্প্রাণ। অথচ তারা জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত। ওই পাষাণ-বিগ্রহগুলোর জন্যই নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনোপকরণের এক অংশ।

এখানে 'মা রযাক্বনাহুম' অর্থ আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করি। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দান করি যে সকল খাদ্যশস্য, গৃহ, গৃহপালিত পশু, ফলমূল ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা তাদের খাদ্যশস্য দু'ভাগ করে বলতো এই ভাগটি আল্লাহ্‌র, আর এই ভাগটি আমাদের দেব-দেবীদের।

এরপর বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করো, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছো। নিঃসন্দেহে এ কাজ গর্হিততম। আর এ সম্পর্কে মহাবিচারের দিবসে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান, তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত। এবং তারা স্থির করে নিজেদের জন্য তা-ই যা তারা কামনা করে।' 'সুবহানআল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্ পবিত্র, মহিমান্বিত। এই আপ্তবাক্যটি ব্যবহৃত হয় বিস্ময় প্রকাশকালে । উল্লেখ্য যে, বনী খাজআ এবং বনী কেনানা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। 'সুবহানআল্লহ,' বলে তাদের ওই

অপকথনের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কখনোই নয়। আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী। পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন থেকে তিনি সতত মুক্ত, পবিত্র ও মহিমান্বিত।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।' এখানে 'মুস্ওয়াদ্দা' অর্থ কালো, কুশ্রী, বিবর্ণ। আর 'কাজীম' অর্থ অসহনীয় মনোস্তাপ, যা ভিতরে ভিতরে অন্তরকে কুরে কুরে খায়, কিন্তু যা মুখে প্রকাশ করা যায় না। উল্লেখ্য যে, মক্কার অংশীবাদীরা কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে খুবই অবমাননাকর মনে করতো। তাই কন্যা সন্তানের জন্ম-সংবাদ তাদের মুখমণ্ডলকে বিবর্ণ ও অন্তরকে করতো অবহ ব্যথায় ক্লিষ্ট।

এর পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে।' একথার অর্থ— যখন তাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর কন্যা-সন্তান প্রসবের সংবাদ শোনে, তখন সে লজ্জায় ও গ্লানিতে মুখ ঢাকে। স্বজন-বান্ধবদের নিকট থেকে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে।' একথার অর্থ— সে তখন পড়ে যায় চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে। ভাবে, কী করবে এখন। অপমানজনক অবস্থা মেনে নিয়ে সদ্যজাত শিশু কন্যাটিকে লালন-পালন করবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলে অপমানের অবসান ঘটাবে। এখানে 'ইয়াদুস্সু' অর্থ গোপন করবে, মৃত্তিকায় প্রোথিত করবে।

বাগবী লিখেছেন, বনী মুজার, বনী খাজায়া ও বনী তামীম গোত্রের লোকেরা তাদের সদ্যজাত শিশু কন্যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো। তারা মনে করতো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ দারিদ্রের লক্ষণ। কারণ লুণ্ঠন করে তারা উপার্জন করতে পারে না। কেবল গলগ্রহ হয়ে থাকে। আবার কোনো অকুলিনজন দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাবও দিয়ে দিতে পারে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা আরো বেশী অবমাননাকর। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ কন্যাসন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে পশমী বস্ত্র পরিয়ে তাকে নিযুক্ত করতো পশুপাল চরানোর কাজে। আর মেরে ফেলতে চাইলে শিশু কন্যার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাকে জনপদের বাইরে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত কবর দিতো। তার মাকে বলতো, মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাও। মা তখন মেয়েটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতো। অবুঝ শিশু খুশী হয়ে রওনা হতো পিতার সঙ্গে। পিতা তখন তার কন্যাকে নিয়ে রওনা দিতো দূরের কোনো অরণ্য অথবা জনমানবহীন প্রান্তরের দিকে। সেখানে সে আগেই খুঁড়ে রাখতো একটি গর্ত। ওই গর্তের পাড়ে গিয়ে পিতা বলতো,

দ্যাখোতো গর্তের মধ্যে কী দেখা যায়? অবুঝ শিশু কৌতুহল বশতঃ উঁকি দিতো গর্তের ভিতরের দিকে। ঠিক তখনই তার নিষ্ঠুর পিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো গর্তের ভিতরে। তারপর মাটি ও পাথর দিয়ে সেখানেই তাকে চাপা দিয়ে আসতো। কন্যার গগনবিদারী আর্তনাদ শুনে তার পাষাণ হৃদয় এতটুকুও কেঁপে উঠতো না।

ফরজ্দকের পিতামহ ছিলেন কোমল হৃদয়। তিনি এরকম মর্মবিদারক পরিকল্পনার কথা শুনতে পেলেই ছুটে যেতেন কন্যার পিতার বাড়ীতে। কয়েকটি উট পিতার হাতে তুলে দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতেন তার মেয়েকে। ফরজ্দক ছিলেন প্রখ্যাত কবি। তিনি তাঁর কবিতায় এরকম ঘটনার উল্লেখ করে গর্ব প্রকাশ করতেন। যেমন, একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, আমি এমন পিতার সন্তান, যিনি শিশু-কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়ার পরিকল্পনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতেন। এভাবে তিনি রক্ষা করেছেন অনেক শিশু-কন্যার জীবন।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কত নিকৃষ্ট।' একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জঘন্য মনমানসিকতা ও কার্যকলাপ থেকে সাবধান। তাদের সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য। কতোইনা ঘৃন্য তাদের মনোবৃত্তি। তারা নিজেরা কন্যাসন্তানের জনক হওয়াকে অবমাননাকর মনে করে, অথচ বলে, আল্লাহ্‌র কন্যাসন্তান রয়েছে। না। আল্লাহ্ এরকম নন। তিনি সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে চির অমুখাপেক্ষী, চিরপবিত্র। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বর্ণিত অপমানসিকতার বিবরণ এসেছে আর একটি আয়াতে এভাবে— 'আ লাকুমুজ্জাকারু ওয়া লাহুল উন্‌ছা' (তোমাদের হবে পুত্র সন্তান আর তার হবে কন্যা?)

এর পরের আয়াতে (৬০)বলা হয়েছে, 'যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের ধর্ম নিকৃষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্‌র ধর্ম মহান এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' একথার অর্থ— যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অত্যন্ত মন্দ। তারা তাদের বংশবিস্তারের জন্য ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুত্র সন্তান চায়। আর কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণকে মনে করে অশুভ। তাই তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়। সুতরাং তাদের স্বভাব ধর্ম যে অতি নিকৃষ্ট সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র অতুলনীয় স্বভাব অত্যন্ত মহান, সর্বোন্নত। তিনি চিরঞ্জীব, চির অমুখাপেক্ষী। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শক্তি, স্থিতি, পরাক্রম, প্রতাপ ইত্যাদি সকল প্রকার আনুরূপ্যবিহীন গুণের তিনি অধিকারী। তিনি মহামহিম। মহাপবিত্র। তাই তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মাছালুস্ সুই' অর্থ দোজখ। আর 'মাছালুল আ'লা' অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ কলেমার সাক্ষ্য প্রদান।

'ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম' অর্থ— এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি আনুরূপ্যবিহীন পরাক্রমের অধিকারী। আর তাঁর সকল পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ প্রজ্ঞাময়তামণ্ডিত।

সূরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬১, ৬২

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝

❐ আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না।

❐ যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহের প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে মংগল তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।' এখানে 'ইয়ূওয়াখিজু' অর্থ আশু শাস্তিপ্রদান। 'আন্নাস্' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়। 'জুলুম' অর্থ সীমালংঘন। এভাবে এখানে কেবল অবিশ্বাসী ও সীমালংঘনকারীদের শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আন্নাস' বলে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষকে। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহ অবশ্য সেরকমই। তবে এখানে এরকম ধারণা করা সংগত নয় যে, নবী-রসুল ও পুণ্যবানেরাও আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য। সেরকম মনে করলে তাঁরাও তো সীমালংঘনকারীদের পর্যায়ভূত হন। কিন্তু তা অসম্ভব। তবে একথাও ঠিক যে, মানব জাতির এক বিশাল অংশ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় নিমজ্জিত। অধিকাংশ মানুষ এরকম বলেই এখানে এভাবে সমগ্র মানবজাতির উল্লেখ এসেছে। সামগ্রিকতার উল্লেখের মাধ্যমে অধিকাংশকে

বোঝানো অশোভন কিংবা রীতিবিরুদ্ধ নয়। আমি বলি, 'কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না' কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ লোকের অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় গোটা জাতিকে। কিন্তু এরকম অর্থ গ্রহণ করাটাও ঠিক নয়। কারণ একের অপরাধের কারণে অন্যকে শাস্তি প্রদান আল্লাহ্তায়ালার বিধানসম্মত নয়। এক আয়াতে একথা পরিষ্কার করে বলেও দেয়া হয়েছে। যেমন— 'লা তাযিরু ওয়াজিরাতুন ইযরান উখরা (কোনো ভার বা বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না)। সুতরাং নিরপরাধকে কখনো অপরাধের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়।

তাফসীরে মাদেরেকের ভাষ্যকার হজরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তিনি 'দাববাহ' শব্দটির অর্থ করেছেন, পাপিষ্ঠ জীব। অথবা বিচরণশীল পাপী প্রাণী। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— বিশ্বাসীগণ ছাড়া সকল পাপী প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব বিশ্বাসীদেরকে ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত করা কিছুতেই সমীচীন নয়। তবে বিশ্বাসীরা যদি 'সৎকর্মের আদেশ অসৎকার্যের নিষেধ'— এই ফরজ দায়িত্বটি পালন না করে, যদি পাপীদের পাপকর্মের প্রতি মৌন সম্মতি জানায়, তবে তারাও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে ইবনে মাজা ও তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মানুষকে অশ্লীল কার্য করতে দেখে যে প্রতিরোধের চেষ্টা করে না, সে-ও সাধারণভাবে পাপিষ্ঠদের প্রতি আপতিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে আবু দাউদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা কোনো অবস্থাতেই শাস্তিযোগ্য নয়। তবে অত্যাচারী বিশ্বাসীরা অত্যাচারী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে শাস্তির উপযোগী হয়ে যেতে পারে। কারণ তারা উভয়েই কল্যাণকামিতা পরিহার করে থাকে। আর কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব মানুষের। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'খলাক্বা লাকুম মা ফিল আরদ্বি জামীয়া' (ভূপৃষ্ঠের সকল কিছু সৃজিত হয়েছে তোমাদের কল্যাণের জন্য)।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত নুহের যুগে এরকম ঘটেছিলো। যারা তাঁর নৌকায় আরোহণ করেছিলো কেবল তারাই রক্ষা পেয়েছিলো। আর যারা আরোহণ করেনি তারা লাভ করেছিলো সলিল সমাধি। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, অত্যাচারী ব্যক্তি কেবল নিজের ক্ষতি করে। তার উৎপীড়নের শাস্তি অন্য কারো উপরে পড়ে না। এরকম মন্তব্য করার পরক্ষণেই আবার তিনি বলেছেন, কেনো পড়বে না। আল্লাহ্র শপথ! অবশ্যই পড়ে। জালেমদের জুলুমের কারণে পক্ষীকুলও তাদের আপনাপন নীড়ে অভুক্তাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, মানুষের পাপের কারণে ঘুনে পোকাও তার কোটরে শাস্তি পেয়ে থাকে। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার আলোচ্য ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, অবিশ্বাসীদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া হলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতো। অবলুপ্ত হয়ে যেতো তাদের বংশপরম্পরা। এভাবে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো পৃথিবী থেকে। একারণেই হজরত নুহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রার্থনা জানাননি, যতক্ষণ না তিনি একথা জানতে পেরেছিলেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পরবর্তী বংশধরেরাও হবে তাদের পিতৃপুরুষদের মতোই কাফের।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না।' একথার অর্থ— তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন এ কারণে যে, যদি তারা তওবা করে। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে সত্যের সীমানায়। কিন্তু তওবার এই সুযোগ যদি তারা গ্রহণ না করে, তবে নির্ধারিত অবকাশের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে গজব অবতীর্ণ করা হয়। ওই গজবকে মুহূর্তকাল অগ্র-পশ্চাৎ করবার ক্ষমতা কারো নেই।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যা তারা অপছন্দ করে, তা-ই তারা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা দাবী করে যে মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয় তাদের জন্য আছে অগ্নি, এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।'

এখানে 'মা' ইয়াকরাহুন' অর্থ তাদের নিজেদের কাছে যা ঘৃণ্য, অপছন্দনীয়। যেমন কন্যাসন্তান। যেমন রাজার জন্য অপছন্দীয় তার রাজত্বে অন্যের অংশীদারিত্ব। রাজত্ব কেনো, তুচ্ছ কোনো বস্তুর মালিকানার মধ্যে অন্যের অংশীদারিত্ব মানুষের জন্য সুখবর নয়। আর এখানে 'আল হুসনা' অর্থ বেহেশত। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতো, মোহাম্মদের বক্তব্যানুসারে পুনরুত্থান যদি ঘটেই যায়, তবে আমরা থাকবো বেহেশতে। 'লা জারমা' অর্থ নিশ্চয়, অবশ্যই। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা জারমা' অর্থ— কেনো নয়।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের এরকম অর্থ করার কারণ হচ্ছে, 'লা' অর্থ না বা নয়। বক্তব্যের পূর্বে এভাবে 'লা' বসিয়ে অনড় কোনো ধারণাকে নাকচ করা হয়। মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিলো, পুনরুত্থান ঘটলে তারা বেহেশতেই যাবে, দোজখে নয়। এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাদের ওই অপধারণাকে নাকচ করে দিয়ে জানাচ্ছেন, অবশ্যই নয়। তাদের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন, বেহেশতের শান্তি নয়। এভাবে তাদের অপপরিণতির কথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এখানে।

'মুফরাতুন' কথাটি 'ইফরাত' শব্দের কর্মপদরূপ। এর অর্থ নিক্ষেপ করা হবে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, এর অর্থ— নিক্ষেপ করা হবে নরকে। মর্মার্থ— নরকে নিক্ষেপ করে চিরতরে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে তাদের অহমিকা। অথবা সর্বাগ্রে তাদেরকে ফেলে দেয়া হবে জাহান্নামে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— জাহান্নামে নিক্ষেপ করে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে তাদের দম্ভ। মুকাতিল বলেছেন, ছেড়ে দেয়া হবে নরকাভ্যন্তরে। কাতাদা বলেছেন, অতি দ্রুত প্রেরণ করা হবে দোজখে। ফাররা বলেছেন, সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হবে অগ্নিকুণ্ডে। রসুল স. বলেছেন, 'আনা ফারাতুকুম' (আমি হবো তোমাদের অগ্রণী)। সর্বপ্রথম আমিই পৌঁছবো আবে কাওছারের নিকটে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মুফরাতুন' অর্থ— তাদেরকে সম্পর্কচ্যুত করা হবে পরিত্রাণ ও কৃপা থেকে। ঠেলে দেয়া হবে নরকাগ্নিতে।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এরকম— মক্কার মুশরিকেরা নিজেরা যা পছন্দ করে না, তাই আরোপ করে আল্লাহ্‌র উপর। যেমন কন্যা সন্তান তাদের পছন্দ নয়, অথচ তারা বলে আল্লাহ্‌র কন্যা আছে। তারা আরো দাবী করে, তারাই নাকি বেহেশতে যাবে। কখনোই নয়। তারা যাবে দোজখে। সর্বাগ্রে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকেই।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○
وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

❒ শপথ আল্লাহের, আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল; সুতরাং শয়তান আজ উহাদিগের অভিভাবক এবং উহাদিগেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

❒ আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ-বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।

❒ আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে-সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদিগের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'শপথ আল্লাহ্র। আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করেছি, কিন্তু শয়তান ওই সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীর নিকট নবী-রসুল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁদেরকে অমান্য করেছিলো। শয়তান তাদের অপকর্মগুলোকেই তাদের চোখে সুন্দর হিসেবে প্রতিভাত করেছিলো। তাই তারা তাদের প্রেরিত নবী-রসুলগণকে মনে করেছিলো অপাংক্তেয়।

এখানে 'লাহুম' (তাদের দৃষ্টিতে) বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল মানব-গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোককে। আর এখানকার 'আ'মাল' (কার্যকলাপ) কথাটির অর্থ তাদের কুফরী কার্যকলাপ, শিরিক ও নবী-রসুলগণের প্রতি অবজ্ঞা। এসকল অপকর্মকে শয়তানই তাদের নিকট শোভন করে দিয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং শয়তান আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— শয়তান এখন যেমন তাদের অভিভাবক, তেমনি আখেরাতে হবে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি। এখানে 'তাদের অভিভাবক' অর্থ মক্কার মুশরিকদের অভিভাবক। আয়াতের বক্তব্যপ্রবাহের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয়।

'ওয়ালী' অর্থ বন্ধু, সঙ্গী বা অভিভাবক। এখানে শয়তানকেই মক্কার সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বন্ধু, সঙ্গী বা অভিভাবক বলা হয়েছে। এখানে 'ওয়ালীয়্যুহুম' এর 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে অতীতকালের সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সঙ্গে। তখন মর্মার্থ দাঁড়াবে— অতীতের ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের দুষ্কর্মগুলোকে শয়তানই তাদের দৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষকরূপে প্রদর্শন করেছিলো। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আজ' (ইয়াওমা) অর্থ বিচারদিবস ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটির মর্মার্থ হবে— বিচারদিবসে শয়তানই হবে তাদের অভিভাবক। আর মর্মন্তুদ শাস্তি হবে এরকম— তাদেরকে বেঁধে ফেলা হবে শিকল দিয়ে। অথবা মর্মার্থ হবে— বিচারদিবসে শয়তানই হবে তাদের একমাত্র বন্ধু। আর কোনো বন্ধু সেখানে তাদের থাকবে না। কিন্তু শয়তান তখন নিজেরই কোনো উপকার করতে পারবে না। সুতরাং সে অপরের উপকার আর করবে কেমন করে? এমনও বলা যেতে পারে যে, যারা অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো, তাদের অভিভাবক বা বন্ধু শয়তান। এমতাবস্থায় আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— অংশীবাদী কুরায়েশ গোত্র বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতোই। শয়তান তাদের সতীর্থ।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌র এককত্ব, তাক্বদীর, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা যে সকল মতভেদে আকীর্ণ, সে সকল মতভেদ দূর করে সুস্থ, সঠিক ও সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি এই কোরআন। আর এই কোরআন প্রতর্ক ও মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

এর পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শুষ্ক ও নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করে তোলেন শস্যশ্যামল।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে, তাদের জন্য।' এ কথার অর্থ— অবশ্যই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে ফল ও ফসল দ্বারা পুনর্জীবিত করার মধ্যে রয়েছে প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও অনুধাবন শক্তি বিভ্রান্ত নয়, তারাই কেবল বুঝতে পারে এই নিদর্শনটির মর্ম। বুঝতে পারে শুকনো পানি যেমন বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়, তেমনি পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ের বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিরা হবে পুনর্জীবিত।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬৬

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ○

❒ অবশ্যই আন্‌আমের মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। তোমাদিগকে পান করাই উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ; যাহা পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'অবশ্যই আন্‌আমের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। এখানে 'ইবরত' অর্থ এমন ধারণা, যা মানুষকে মূর্খতা থেকে নিয়ে যায় জ্ঞানের পথে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্ত-নিঃসৃত দুগ্ধ ; যা পানকারীদের জন্য বিশুদ্ধ, সুস্বাদু।' এ কথার অর্থ— হে

মানুষ! একবার ভাবতে চেষ্টা করো, তোমাদের প্রতি আমার কতো দয়া। চতুষ্পদ জন্তুদের শরীরে থাকে রক্ত এবং উদরে থাকে গোময়। অথচ আমি তার মধ্য থেকে তোমাদের জন্য বের করে আনি বিশুদ্ধ, সুপেয় ও সুস্বাদু দুগ্ধ।

এখানে 'বুতুনিহী' (তাদের উদরস্থিত) কথাটির 'হী' (তার) সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ও একবচনবোধক। এই সর্বনাম সম্পৃক্ত হবে 'আন্‌আম' (চতুষ্পদ জন্তু) কথাটির সঙ্গে। আর 'আন্‌আম' শব্দটি সমষ্টিবাচক হলেও শব্দ হিসেবে একবচন। সিবওয়াইহ্ বলেছেন, 'আফ্‌য়াল' শব্দরূপে গঠিত আখলাখ, আকরাম ইত্যাদি শব্দগুলো একবচনবোধক। তেমনি একবচন হিসেবে বিবেচিত 'আন্‌আম' শব্দটিও। ফাররা, আবু উবায়দা ও আখফাশও এরকম বলেছেন। আবার 'নাআম' ও 'আন্‌আম'— দু'টো শব্দই একবচন। শব্দ দু'টো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যারা এ দু'টোর শব্দগত অর্থ গ্রহণ করেছেন, তারা এ দু'টোকে ধরে নিয়েছেন পুংলিঙ্গ ও একবচন। আর যারা মর্মগত অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা ধরে নিয়েছেন স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচন অর্থে।

'ফী বুতুনিহী' অর্থ তার বা তাদের উদরস্থিত। এখানে 'তার' বা 'তাদের' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হয়েছে 'মিম্‌মা' কথাটির 'মা' অব্যয়ের সঙ্গে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তার বা তাদের উদরে যা আছে। সকল পশু থেকে দুধ পাওয়া যায় না। তাই এখানে মর্মার্থ হবে— কিছু সংখ্যক পশুর উদরে। এমতো ক্ষেত্রে 'তার উদরে' কথাটির 'তার' সর্বনামটি হবে ঋণাত্মক এবং তা সম্পৃক্ত হবে ওই কিছু সংখ্যক দুগ্ধবতী পশুর সঙ্গে। আবার কারো কারো মতে আন্‌আমান অর্থ পশু। আর সে পশু হচ্ছে জিন্‌সে আন্‌আম বা এক শ্রেণীর পশু। যদি তাই হয়, তবে 'তার উদরে' কথাটির 'তার' সর্বনামটি সংশ্লিষ্ট হবে এক শ্রেণীর পশুর সঙ্গে।

'ফর্‌ছ' অর্থ ওই গলিত পদার্থ, যা সংশ্লিষ্ট থাকে নাড়িভুঁড়িতে। গোবররূপে যা বেরিয়ে আসে, তা কিন্তু 'ফরছ' নয়, বর্জ্য। 'খলিসন্' অর্থ বিশুদ্ধ। অর্থাৎ যা রক্ত ও পাকস্থলিস্থিত গলিত পদার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত। অর্থাৎ দুগ্ধ। লক্ষণীয় যে, রক্ত ও পাকস্থলিস্থিত গলিত পদার্থ থেকে নিঃসৃত হলেও দুধের মধ্যে কিন্তু রক্তের রঙ অথবা ওই গলিত পদার্থের দুর্গন্ধ, কোনোটাই নেই।

'সাইগান' অর্থ সুপেয় বা সুস্বাদু, যা অনায়াসে গলাধঃকরণ করা যায়। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পশুরা ঘাস পাতা ইত্যাদি আহার করে। সেগুলো চলে যায় তাদের পাকস্থলিতে। সেখানে চলে পরিপাক কর্ম। পরিপাক ক্রিয়া সমাপনের পর খাদ্যের নির্যাস হয় ত্রিধাবিভক্ত। উপরের অংশ হয় রক্ত। মধ্যবর্তী অংশ হয় দুগ্ধ । আর তলদেশের অংশ হয় গোবর। অর্থাৎ দুগ্ধ বেরিয়ে আসে রক্ত ও গোবরের মাঝখান থেকে। দুগ্ধ নিঃসরণের এই কাজটি সম্পাদিত হয় যকৃতের তত্ত্বাবধানে। যকৃত রক্ত পরিচালন করে ধমনীতে এবং দুগ্ধ প্রবাহিত করে দুগ্ধাধারে বা ওলানে। আর গোবরকেও রাখে তার যথাস্থানে।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের মর্মার্থ এই হতে পারে যে, দুধের উপাদান থাকে রক্ত ও গোবরের মাঝামাঝি। উপরের অংশে থাকে রক্ত। আর নিচের অংশে থাকে বর্জ্য। পাকস্থলিতে জারিত খাদ্যের প্রথম অংশ টেনে নেয় যকৃত। বর্জ্য পড়ে থাকে তার নির্দিষ্ট স্থানে। অতঃপর জারিত খাদ্যের প্রথম অংশ পুনরায় পরিপাক হয়। পরের পরিপাককৃত পদার্থকে বলে কিমুস। দেহের যাবতীয় উপাদান এতে বিদ্যমান থাকে। জলীয় অংশই থাকে অধিক। এই জলীয় অংশকে বলে এখলাত। এরপর যকৃত তার পৃথকীকরণ শক্তির প্রভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ধমনীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় বৃক্কে। অতঃপর এই মিশ্রণকে প্রয়োজনানুসারে পরিচালনা করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এভাবেই মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্‌র সুব্যবস্থাপনায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পায় তাদের প্রয়োজনীয় প্রাপ্য। পুরুষজাতীয় প্রাণীর স্বভাবে থাকে নমনীয়তার ও শীতলতার প্রাধান্য। তাই তাদের খাদ্যমিশ্রণ হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত। স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটুকু ভ্রূণের লালনপালনার্থে পরিচালিত হয় জরায়ুতে। সন্তান প্রসবের পর ওই অতিরিক্ত খাদ্য পরিচালিত হয় স্তনের দিকে । সেখানে তা জমা হয় দুধরূপে। তখন খাদ্যের নির্যাস পরিপাকতন্ত্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এভাবে উৎপাদিত দুগ্ধ, তার পরিমাণ, রঙ, প্রবাহ ইত্যাদি একটি জটিল প্রক্রিয়া বটে। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এর নেপথ্যে রয়েছে মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র ত্রুটিহীন তত্ত্বাবধান ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনা। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসা ও বিনয়ী অভিনিবেশ সহকারে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করবে, সেই কেবল অবগত হতে পারবে এর অভিজ্ঞান। সে তখন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের বিপুল অনুগ্রহ ও অকৃপণ দানের কথা স্বীকার না করেই পারবে না।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৬৭

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

❒ এবং খর্জুর বৃক্ষ ও আংগুর হইতে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করিয়া থাক; ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য লাভ করে থাকো।' আলোচ্য বাক্যের পূর্বে একটি ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। ওই ক্রিয়াটি হয়েছে 'নুসক্বী' (আমি পান করাই)। আর এখানে 'ছামারাত' অর্থ খেজুর ও আংগুরের নিংড়ানো রস। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আমি তোমাদের পান করাই বা প্রদান করি খেজুর ও আংগুরের নিঃসৃত রস খাদ্য ও পানীয়রূপে। এর পরের 'খাদ্য লাভ করে থাকো' কথাটি একটি পৃথক

বাক্য। অথবা 'খেজুর বৃক্ষ ও আংগুর থেকে' বাক্যটির সম্বন্ধ ঘটবে 'তাত্তাখিজুনা' (তোমরা খাদ্য লাভ করে থাকো) কথাটির সঙ্গে। 'সাকার' অর্থ নেশাজাত দ্রব্য। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'সাকারা' অর্থ— সে বেহুঁশ হয়েছে। জ্ঞান শব্দের বিপরী-তার্থক শব্দ হচ্ছে অজ্ঞান বা বেহুঁশ। 'সুকরুন' 'সুকুরুন' 'সাকরুন' 'সুকরামুন'— এই শব্দগুলো ধাতুমূল। 'সকুর' অর্থ মদ্য বা শরাব। ভুট্টাজাত রস, কসীস নিঃসৃত রস ইত্যাদি নেশাসঞ্চারক রসকেও বলা হয় সুকুর। এছাড়া 'সিরকা' ও খাদ্যকেও বলে সুকুর। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, খেজুরের রস থেকে যা প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলে সাকার। শরীক বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, মদ্য বা নেশাসঞ্চারক সামগ্রী মোবাহ্ বা সিদ্ধ। যদি মদ্য নিষিদ্ধ হতো, তবে এখানে তা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের তালিকায় স্থান পেতো না। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন সকল প্রকার পানীয় ছিলো সিদ্ধ। মদ্য নিষিদ্ধ হয়েছে পরবর্তীতে মদীনায়, অন্য এক আয়াতের মাধ্যমে। আর সাহাবায়েকেরাম সকলেই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছেন ওই নিষেধাজ্ঞাটি। তাই মদ্য হারাম হওয়ার বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

বাগবী লিখেছেন, কারো কারো মতে 'সাকার' অর্থ সুরা। 'রিজক্বান হাসানা' অর্থ ফলের নির্যাস। ভুট্টা ও কিসমিস নিঃসৃত সিরকা। বিধানটি মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বের। এরকম বলেছেন হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান ও মুজাহিদ। বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকম বর্ণনাও পাওয়া গিয়েছে যে, 'সাকার' ওই ফল যা হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর উত্তম খাদ্য বলে বুঝানো হয়েছে হালাল ফলসমূহকে। হজরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ফলের ওই সকল 'সিরকা' বা নির্যাসকেই হারাম করে দেয়া হয়েছে— যা 'সাকার'। আর যে সকল নির্যাসকে হালাল করা হয়েছে, সেগুলো হলো 'রিজক্বান হাসানা' (উত্তম খাদ্য বা উপজীবিকা)।

আবু উবাইদা বলেছেন, 'সাকার' অর্থ আহার্য বা খাদ্য। অপচয়কারীরা বলে— 'হাজা সাকারুললাকা' (এটা তোমার খাবার)। শা'বী বলেছেন 'সাকার' অর্থ পানীয়। আর উত্তম খাবার হচ্ছে উত্তম উপজীবিকা। আউফির বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হিব্রু ভাষায় 'সাকার' অর্থ সিরকা, নির্যাস। জুহাক ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, হিব্রু ভাষায় মত্ততাসঞ্চারক পানীয় ও সিরকাকে বলে সাকার। ভুট্টা এবং কিসমিসের গাঢ় রস জ্বাল দিয়ে ঘনত্ব বাড়ানো হয়। ওই সকল রসের নাম সাকার। তবে সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতটি রহিত বা মনসুখ হয়েছে।

বাগবী এক স্থানে লিখেছেন, মোট কথা মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বমোট চারটি আয়াত। আর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তখন সুরা পানের উপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। পরবর্তীতে

মদীনায় অবতীর্ণ হয় 'লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে'। কিছুদিন পর অবতীর্ণ হয় 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সুরান্মোত্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না'। এরপর অবতীর্ণ হয় সুরা মায়িদার চূড়ান্ত আয়াতটি। ওই আয়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্য শরাবপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— যারা সুস্থবিবেকসম্পন্ন তাদের চোখেই মহাকুশলী আল্লাহ্তায়ালার কার্যকলাপের নিদর্শনসমূহ সতত প্রতিভাত হয়।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

❒ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে;

❒ ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর।' উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; ইহাতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপালয়িতা মধুমক্ষিকাকে এই মর্মে অনুপ্রেরণা দান করেন যে, তোমরা তোমাদের আবাস নির্মাণ করো পর্বতমালায়, বৃক্ষশাখায় ও মানুষের গৃহের অলিন্দের ছাদে। উল্লেখ্য যে, ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় নবী রসুলগণের প্রতি। আর সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি যে কর্মস্পৃহা বা অনুপ্রেরণা প্রদত্ত হয়, তাকে বলে ইল্হাম। এখানকার 'ওহী' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'ইয়া'রিশূনা' অর্থ গৃহের ছাদের ছায়ায়। অথবা 'আরশ' শব্দটির অর্থ এখানে আংগুরের মালঞ্চ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ছাদ। 'মিনাল জিবাল' 'মিনাশ্ শাজার' এবং 'মিম্মা ইয়া'রিশূনা'— এ কথাগুলোতে যে 'মিন' ব্যবহৃত হয়েছে তা আংশিক অর্থ

প্রকাশক। অর্থাৎ মৌমাছিদেরকে মৌচাক নির্মাণের প্রেরণা দেয়া হয় কিছু সংখ্যক পাহাড়ে, কিছু সংখ্যক বৃক্ষে এবং কিছু সংখ্যক গৃহের ছাদের তলদেশে। লক্ষণীয় যে, মধুমক্ষিকাদের মধুচক্রকে এখানে আখ্যা দেয়া হয়েছে গৃহ বা নিবাস। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের বসতবাটিতে যেমন তাদের প্রয়োজন পূরণের বিভিন্ন স্থান ও ব্যবস্থা থাকে, তেমনি মৌমাছিদের মৌচাকেও থাকে দরজা-জানালা, ছাদ, বীজাগার, বিশ্রামাগার ও বিনোদন ব্যবস্থা। আরো থাকে আহার্যাধার, প্রজননাগার ও শিশু সদন। আর তাদের চাকের নির্মাণশৈলীও বিস্ময়কর। এরকম নিখুঁত ও সুন্দর শৈলীর প্রয়োগ মানুষের পক্ষেও অসম্ভব। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন তার অনুসরণ করো।' এখানকার 'আছ্‌ছামারাত' কথাটির 'আলিফ লাম' হচ্ছে জাতিবাচক। আর এখানকার 'কুল' (প্রত্যেক) শব্দটি সমষ্টিবাচক নয়। অর্থাৎ সকল বৃক্ষের সকল ফল ভক্ষণ করতে হবে, এমন নয়। বরং ভক্ষণ করতে হবে ওই সকল ফল, যা চিত্তাকর্ষক, সহজলভ্য ও মধু তৈরীর উপযোগী। এরকম ফল থেকেই শোষণ করে নিতে হবে রেণু বা নির্যাস।

'সুবুলা রব্বিকা' অর্থ— তোমার প্রভুপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন সেই পদ্ধতিতে এবং স্বআবাসে প্রত্যাবর্তনও করবে ওই একই পদ্ধতিতে ও পথে। ভুল পথে নয়। অথবা কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— হে মধুমক্ষিকা সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌পাক প্রদর্শিত এমন পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যাতে করে তোমাদের সংগৃহীত নির্যাস পরিণত হয় পীযূষ-প্রবাহে।

'জুলুলান' অর্থ ওই পদ্ধতি, যা সহজ করে দিয়েছে তোমাদের প্রভুপালয়িতা। অথবা ওই পদ্ধতি, যা আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্যমণ্ডিত। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্যমণ্ডিত পদ্ধতি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি। বর্ণিত হয়েছে, মৌমাছিদের নেত্রী হচ্ছে মক্ষীরাণী বা রাণী মৌমাছি। সে কোথাও যাত্রা করলে তার দলভূত মৌমাছিরা তাকে অবশ্যই অনুসরণ করে। এরপর সে যেখানে অবস্থান গ্রহণ করে, সেখানেই তার অনুসারীরা নির্মাণ করে একটি মধুচক্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'তার উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়।' একথার অর্থ— তাদের উদর থেকে নির্গত হয় নিষ্কলুষ এক পানীয়, যা বিবিধ বর্ণের — লাল, শাদা, হলুদ ও সবুজ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার।' এখানে 'ফিহী' (তাতে, তার মধ্যে) কথাটির 'হী' (তার) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কোরআন

মজীদের সঙ্গে। অর্থাৎ কোরআন মজীদেই রয়েছে মানুষের জন্য ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু কথাটি সম্ভবতঃ ঠিক নয়। কারণ আলোচ্য বাক্যের ধারাক্রমানুসারে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কথিত সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হবে 'শারাবুন' (পানীয়) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ পীযুষ বা মধুর মধ্যেই রয়েছে মানুষের ব্যাধির প্রতিষেধক। 'শিফাউন' শব্দটি এখানে অনির্দিষ্টবাচক। তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, কোনো কোনো সময়ের কোনো কোনো ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে মধু।

একটি সংশয়ঃ প্রতিটি বস্তুই কোনো না কোনো রোগের প্রতিষেধক। জীবননাশক বিষও কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো পীড়ার নিরাময়করূপে ব্যবহৃত হয়। তাহলে প্রতিকার বা প্রতিষেধকরূপে মধুর বিশেষত্ব কোথায়?

সংশয় ভঞ্জনঃ এখানকার 'শিফাউন' শব্দটির তান্‌ভিন— বিভক্তিটি স্বাক্ষর বহন করে উৎকৃষ্টতার। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিকাররূপে মধু উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ মধুর মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ রোগের প্রতিকার।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, তোমরা দু'টো প্রতিষেধকই গ্রহণ কোরো— মধু ও কোরআন। প্রথমটি সকল দৈহিক রোগের নিরাময়ক। আর দ্বিতীয়টি প্রতিষেধক আত্মিক রোগের। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ও হাকেম। এই হাদিসের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মধুর রোগ নিরাময় ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সর্ববিধ ব্যাধির বিনাশক হচ্ছে মধু। আর অন্তরের ব্যাধির নিরাময়ক হচ্ছে কোরআনপাক। সম্ভবতঃ হজরত ইবনে মাসউদ রসুল স. এর নিকট থেকে শুনেই এরকম বলেছেন।

বায়যাবী লিখেছেন, মধু এককভাবে কতকগুলো দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক। যেমন কফ জাতীয় রোগের জন্য মধু অত্যন্ত ফলদায়ক। কোনো কোনো ব্যাধির ক্ষেত্রে আবার মধু ব্যবহৃত হয় আনুষঙ্গিক অনুপান হিসেবে। যেমন মদক জাতীয় ঔষধের প্রধান উপকরণই হচ্ছে মধু ।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার এক লোক রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আমার ভাই উদরাময় রোগে আক্রান্ত। এখন আমি কী করবো? তিনি স. আজ্ঞা করলেন, মধু পান করাও। লোকটি তাই করলো। কিন্তু তাতে করে ব্যাধির কোনো উপশম হলো না। তখন সে পুনরায় পবিত্র সাহচর্যে হাজির হয়ে নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার কথামতো আমি আমার ভাইকে মধু পান করালাম। কিন্তু

উপশমের বদলে তার রোগ গেলো আরো বেড়ে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাকের বাণী সত্য এবং তোমার ভাইয়ের উদরাময় মিথ্যা। একথা শুনে লোকটি ফিরে গিয়ে তার ভাইকে পুনরায় মধু পান করালো। এবার সে লাভ করলো পূর্ণ নিরাময়। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পেটের কোনো কোনো রোগের জন্য মধুই একমাত্র উপশমক। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে যদি কেউ কেবল মধু ব্যবহার করে, তবে সে যে কোনো ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লামা সুয়ূতি এরকম বলেছেন।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন ও হাদিসের কোথাও একথা নেই যে, সব ধরনের মধু সব রকমের ব্যাধির নিরাময়ক। এক এক মৌসুমের মধুর বিশেষত্ব হয় এক এক রকমের। এই বিশেষত্ব নির্ভর করে ওই মৌসুমসমূহের ফুল ও ফলের উপর। কিন্তু সব ঋতুর মধুর মধ্যে রয়েছে ব্যাধির প্রতিকার। অথচ তা প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকমের ফুল-ফল থেকে। এই বিশেষত্বটি অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নেই। অর্থাৎ মধুর প্রতিষেধক গুণটি একটি সাধারণ গুণ। অবশ্য কোন ব্যাধিতে কোন মধু অধিক উপকারী তা নির্ণয়সাপেক্ষ। আবার ঔষধ হিসাবে এর প্রয়োগপদ্ধতি ও পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল কিছুকে বিবেচনায় না এনে ঢালাওভাবে মধু ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। এসকল নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে মধু ব্যবহার করে যদি সুফল না পাওয়া যায়, তবে মধু প্রতিষেধক নয়, একথা কীভাবে বলা যায়?

সকল মধু এক প্রকৃতির নয়। কোনো কোনো প্রকার মধুর মধ্যে রয়েছে অত্যধিক উত্তাপ। কোনোটাতে কম। কোনো কোনো মধু গেঁটে বাত, অর্ধাঙ্গ রোগ— এমনকি ধনুষ্টংকার রোগেও অব্যর্থ। আবার কোনো কোনো মধু এমন নয়। কফ জাতীয় রোগের জন্যও এক ধরনের মধু ফলপ্রসূ। ভেদ রোগের জন্যও মধু উপকারী। আবার মধু জোলাপ হিসেবেও মহা উপকারী। এভাবে অনুপযুক্ত নিষ্ক্রিয় উপাদানসমূহ দেহ থেকে বের করে দিলে সুস্থতা নিশ্চিত হয়। মোট কথা, মধু একাধারে আস্বাদ্য, শক্তি প্রদায়ক, আদর্শ খাদ্য ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। মধুর মধ্যে যতো কল্যাণপ্রদ দিক আছে, অন্যকিছুর মধ্যে ততো নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।' একথার অর্থ— এই মধু নির্মাণের কলাকৌশলের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্র এককত্ব, মহাকুশলতা ও মহাপরাক্রমের অনন্য নিদর্শন। যারা প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান তারাই কেবল এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

❒ আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও করা হইবে জরাগ্রস্ত; ফলে, উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! নিশ্চিতরূপে একথা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্বকে। তোমাদেরকে। আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। শিশুকালে, ভরা যৌবনে, মধ্য বয়সে অথবা বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়। কাউকে কাউকে আবার করেন জরাগ্রস্ত। ফলে তার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। জানা বিষয়ও সে তখন আর স্মরণ করতে পারে না। এসকল কিছু হচ্ছে তাঁর জ্ঞানের অপারতা ও শক্তির সর্বব্যাপিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান

এখানে 'আরজালিল উমর' অর্থ জরাগ্রস্ত বা অথর্ব অবস্থা। কাতাদা বলেছেন, কতিপয় বৃদ্ধের আয়ুষ্কালকে বলে 'আরজালিল উমর'। হজরত আলী বলেছেন, 'আরজালিল উমর' বলে পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকে। কেউ কেউ বলেন, আশি বছরের বয়সকে। রসুল স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! বার্ধক্যজনিত অবসাদ ও জরা থেকে আমি পরিত্রাণপ্রার্থী। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. বলতেন, অথর্ব অবস্থায় উপনীত হওয়া থেকে আমি তোমার শরণপ্রার্থী। এ সকল বর্ণনা বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের।

এখানে 'যা কিছু সে জানতো, সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না' কথাটির অর্থ— ওই জরাগ্রস্তরা তখন তাদের জ্ঞাত বিষয়সমূহ হবে বিস্মৃত। হয়ে যাবে শিশু ও বুদ্ধি-জ্ঞানহীনদের মতো নির্বোধ। ইকরামা বলেছেন, যে সব সময় কোরআন মজীদ পাঠ করে, সে এরকম দুরবস্থায় পতিত হয় না। 'ইন্নাল্লহা আলীম' (নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ) অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সকলের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে সম্যক অবগত। 'ক্বদীর' অর্থ সর্বশক্তিমান। আর তিনি সর্বশক্তিমান বলেই কখনো কখনো ইচ্ছা মতো দুর্বলকে (জরাকবলিতকে) ছেড়ে দেন, আবার প্রাণহরণ করেন শক্তিশালী যুবকের।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনের সকল অবস্থাই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আপনাআপনি কোনো কিছু ঘটে না। বিষয়টি যদি মানুষের স্বেচ্ছাধীন হতো তবে মানুষ নিশ্চয় জরাকে আহ্বান জানাতো না।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭১

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

❐ আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনস্থ দাস দাসীদিগকে নিজদিগের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকেও কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালাই তোমাদের কারো কারো রিজিক করেন সম্প্রসারিত এবং কারো সংকুচিত। তাই কেউ কেউ হয় বিত্তশালী, আবার কেউ কেউ হয় বিত্তহীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়।' একথার অর্থ— আমি যাদেরকে ধনে জনে সম্মানে শ্রেষ্ঠ করেছি, তারা ওই শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের সমান্তরাল করে নেয় না কেনো?

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে অংশীবাদীদের অংশীবাদিতার সমালোচনা করা হয়েছে। বক্তব্য বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে এরকম— অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুকে উপাস্য স্থির করে। এভাবে সৃষ্টিকে করে দেয় স্রষ্টার সমকক্ষ। অথচ আল্লাহ্ চির অসমকক্ষ। অংশীবাদীরা কতোই না মূর্খ ও অবিবেচক! তারা নিজেরা সৃষ্ট হয়েও তাদের ধন-সম্পত্তি ও মর্যাদায় দরিদ্র ও দলিত জনগোষ্ঠীকে সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ দেয় না। অথচ তাদের স্রষ্টার বেলায় তারা এরকমই করে। তাদের প্রস্তর প্রতিমাগুলোকে বানায় আল্লাহ্‌র অংশীদার।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে, প্রভু-ভৃত্য সকলেরই রিজিক দাতা আল্লাহ্। প্রভু কখনোই তার ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের রিজিক দাতা নয়। অতএব বিত্তাধিকারীরা যেনো একথা মনে না করে যে, তারা তাদের অধীনস্থদের রিজিকের মালিক। সারাসৃষ্টির সকল জীবের রিজিক একমাত্র তিনিই দিয়ে থাকেন। এটা তাঁর এক অযাচিত অনুগ্রহ।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?' একথার অর্থ—ওই সকল অংশীবাদীরা কী ধারণা করে? তারা তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকেও কি আল্লাহ্তায়ালার মতো অনুগ্রহপ্রদানকারী বলে ভাবে? আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা একান্ত কৃপাপরবশ হয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁর এককত্ব ও একমাত্র উপাস্য হওয়া সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন বহুসংখ্যক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন । এসকল কিছু তাঁর নিছক অনুগ্রহ। ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্তায়ালার এমতো অনুগ্রহকে কি অস্বীকার করতে চায়?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭২

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

❐ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?—

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! ভাবতে চেষ্টা করো। আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে কতোভাবে অনুগৃহীত করেছেন। তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্বজাতি থেকে। যাতে তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক প্রেম, ভালোবাসা ও সৌহার্দ। তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও তো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরই যুগল-বন্ধনের মাধ্যমে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'জয়ালা লাকুম মিন আনফুসিকুম আজ-ওয়াজ্বা' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা আদি জননী হজরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদি জনক হজরত আদম থেকে। আর পরবর্তী মানবতার উৎসারণ ঘটিয়েছেন ওই জোড়া থেকেই।

'হাফাদাতুন' অর্থ সন্তানের সন্তান, চপল অনুচর। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে— দ্রুত হস্তে যে কাজ করে তাকে বলে 'হাফাদাতুন'। শব্দটির অর্থ পরিচারক বা চাকরও হয়। আবার পুত্র -প্রপৌত্রও হয়। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শেষোক্ত অর্থে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, 'হাফাদাতুন' অর্থ জামাতা। হজরত ইবনে মাসউদের আর এক বর্ণনায় এসেছে, শব্দটির অর্থ বধু। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্পাক তোমাদের পত্নীদের মাধ্যমে তোমাদেরকে দান করেছেন পুত্র ও কন্যা, যাদেরকে বিবাহ দিয়ে তোমরা লাভ করো পুত্রবধু ও জামাতা। ইকরামা, হাসান ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'হাফাদাতান' অর্থ অনুচর বা চাকর। মুজাহিদ বলেছেন, কাজের লোক। আতা বলেছেন, ওই সকল সন্তান, যারা নিয়োজিত থাকে সহায়তায় ও সেবায়। আমি বলি, বর্ণিত অর্থ সমূহের আলোকে দেখা যায় 'হাফাদাতুন' অর্থ পুত্র। বিশেষণগত তারতম্যের কারণে এখানে 'বানীন' শব্দটির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে 'হাফাদাতুন' শব্দটির। অর্থাৎ 'বানীন' অর্থ বংশজাত সন্তান এবং 'হাফাদাতুন' অর্থ বংশের বাইরের সন্তান, যে নিয়োজিত থাকে সেবাকর্মে।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, 'বানীন' অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং 'হাফাদাতুন' অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। কাতাদা বলেছেন, ওই সকল সন্তান-সন্ততি যারা সাহায্য সহযোগিতা করে অথবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করে । হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আপন স্ত্রীর সন্তানেরাই হাফাদাতুন। আমি বলি, এরকম বলা হয় আভিধানিক অর্থানুসারে। আর শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চাকর বা অনুচর। স্ত্রীর সন্তানদের দ্বারা মানুষ যে সকল কাজকর্ম করায়, আপন সন্তানদের দ্বারা তা করায় না। তাই স্ত্রীর সন্তানদেরকে বলা হয় 'হাফাদাতুন'। সব শেষে বায়যাবী শব্দটির একটি ভাবার্থ লিখেছেন। ভাবার্থটি হচ্ছে— কন্যা সন্তান। কারণ কন্যা সন্তানেরাই সংসারের কাজকর্ম করে বেশী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।' এখানে 'ত্বইয়্যেবাত' অর্থ উত্তম, আস্বাদ্য বা বৈধ। 'মিন' অব্যয়টি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। পার্থিব জীবনোপকরণসমূহ পারলৌকিক জীবনো-পকরণের সামান্য নমুনা মাত্র। ওই সকল নেয়ামতের যৎসামান্য দেয়া হয়েছে এই পৃথিবীতে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মিনাত্ ত্বইয়্যেবাত'। অর্থাৎ কিছু কিছু জীবনোপকরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীর জীবনে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবু কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?' একথার অর্থ— তবু কি তারা তাদের মিথ্যা মাবুদগুলোর উপরে আস্থা রাখবে এবং অনুগ্রহপ্রদাতা হিসেবে সেগুলোকে মান্য করে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে একমাত্র অনুগ্রহ দাতা আল্লাহ্র প্রতি? রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, মানুষ, জ্বিন ও আমার মধ্যে আশ্চর্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি তাদের স্রষ্টা অথচ তারা আরাধনা করে অন্যের। আমিই তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। অথচ তারা কৃতজ্ঞতা জানায় অন্যকে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, এখানে 'বাত্বিলা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কল্পিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মুশরিকদের বাহিরা, সায়েবা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোকে। তারা ওগুলোর কোনো কোনোটির গোশত ভক্ষণ কারো কারো জন্য অথবা সকলের জন্য হারাম বলতো। আবার কোনো কোনোটির উপর আরোহণ করাকে বলতো নিষিদ্ধ। আবার আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকে হারামও বলতো তারা। হারামকে বলতো হালাল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাত্বিল' অর্থ শয়তান। আর 'নেয়ামত' অর্থ রসুলেপাক স.। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে, তবুও কি তারা শয়তানকে বিশ্বাস করবে এবং অস্বীকার করবে আমার রসুলকে?

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭৩, ৭৪

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

❒ এবং উহারা কি ইবাদত করিবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাহাদিগের, আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই! —এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।

❒ সুতরাং আল্লাহের কোন সদৃশ স্থির করিও না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের যাদের আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী থেকে কোনো জীবনোপকরণ সরবরাহ করবার শক্তি নেই।' একথার অর্থ— ওই সকল অংশীবাদীরা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর উপাসনা করবে কেনো, যারা আকাশ অথবা পৃথিবী

থেকে কোনো প্রকার উপজীবিকা সরবরাহ করতে পারে না। এখানে আকাশ থেকে উপজীবিকা প্রদানের অর্থ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা। আর পৃথিবী থেকে উপজীবিকা দেয়ার অর্থ ফল, ফসল, সব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন করা। আখনাস বলেছেন, এখানকার 'শাইয়ান' (কোনো) শব্দটি 'রিজ্ক্বান্' (রিজিক বা উপজীবিকা) কথাটির ব্যাখ্যা। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম— মিথ্যা উপাস্যগুলো তো কোনো কিছুরই মালিক নয়। স্বল্প বা অধিক কোনো প্রকার রিজিক প্রদানেও সমর্থ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।' একথার অর্থ— ওই সকল নিঃসাড় দেব-দেবী কোনো কিছুরই অধিকারী নয়। অথবা অর্থ হবে— মূর্তিগুলোতো কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়। কিংবা মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— মূর্তিপূজকেরা সপ্রাণ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কোনো কিছুর অধিকারী নয়। তাহলে অপ্রাণ প্রতিমাগুলো কোনো কিছুর অধিকার লাভ করবে কি করে? এরকম হওয়া তো সম্ভবই নয়।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্র কোনো সদৃশ স্থির কোরো না। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।' একথার অর্থ— সুতরাং হে মানুষ! তোমরা কাউকে অথবা কোনো কিছুকে আল্লাহ্সদৃশ মনে কোরো না। এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন। তোমরা তাঁর সমকক্ষ ও অংশীদাররূপে যে সকল উপাস্যকে দাঁড় করাও সেগুলোর অসারতা সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। কিন্তু তোমরা কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা, তাও জানো না।

আল্লাহ্পাকের কোনো সদৃশ বা সমকক্ষ স্থির করা নিষিদ্ধ একারণে যে, উপমা ও উপমেয় এর মধ্যে তুল্যতা বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা সকল প্রকার তুল্যতা ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। সুতরাং যিনি জ্ঞানাতীত ও দৃশ্যাতীত, তাঁকে জ্ঞানায়ত্ব করতে চাওয়া ও দৃশ্যমান কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা একটি মিথ্যাচার নয় কি?

'আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— 'আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু তোমরা এরকম নও। অথবা কথাটির মর্মার্থ হবে এরকম— তোমরা আল্লাহ্র যে সদৃশ বা সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছো, তা যে মিথ্যা, সে সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবহিত। কিন্তু তোমরা এই তত্ত্বটি জানো না। যদি জানতে, তবে তোমাদের ওই অলীক উপাস্যগুলোকে কিছুতেই আর বিশ্বাস করতে পারতে না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহেরই প্রাপ্য; অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

এখানে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের এবং অংশীবাদীদের দেব-দেবীদের মধ্যে একটি প্রতিতুলনা উপস্থাপন করেছেন। দেব-দেবীদের তুলনা করেছেন ক্রীতদাসের সঙ্গে, যে সম্পূর্ণরূপে অন্যের অধীন। নিজের ইচ্ছামত কোনো কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। আর নিজের তুলনা দিয়েছেন ওই স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্গে, যাকে তিনি দিয়েছেন প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর এইমর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ক্রীতদাস এবং স্বাধীন ধনাঢ্য ব্যক্তি কি সমান? কখনোই নয়। কারণ ক্রীতদাস সম্পূর্ণতঃই অন্যের অধীন। আর স্বাধীন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যয় করতে পারে। বরং মুশরিকদের তথাকথিত উপাস্যগুলোর অবস্থা তো আরো অধিক শোচনীয়। কারণ ইচ্ছাশক্তি রহিত হলেও ক্রীতদাসেরা জীবন্ত। কিন্তু তাদের প্রতিমাগুলোর জীবন বা মৃত্যু কোনোটাই নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তায়ালা তো স্বাধীন ও বিত্তশালী ব্যক্তি অপেক্ষাও অনেক উচ্চ। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই সর্বব্যাপী নয়। আর সে মৃত্যুহীনও নয়। কিন্তু আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, চিরবিদ্যমান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও ইচ্ছাময়। যা কিছু তাই করার ক্ষমতা একমাত্র তিনিই রাখেন। আর তাঁর ধনসম্পদের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অতএব একথা নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালাই একমাত্র উপাস্য। অন্য কেউ বা কোনো কিছু উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে কখনোই তাঁর অংশীদার নয়। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি একে অপরের সমান?'

শেষে বলা হয়েছে— 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালাই সকল কিছুর একক মালিক ও একমাত্র দাতা। তাই তিনিই একমাত্র উপাস্য হওয়ার যোগ্য। আর সকল কৃতিত্ব, গৌরব ও প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের উপাসনায় লিপ্ত হয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যের।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'অপরের অধিকারভুক্ত দাস' বলে বুঝানো হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রবৃত্তির ক্রীতদাস। তাই আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্যই দেননি। সে কারণেই তারা পুণ্যচ্যুত। আর 'তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীগণকে অর্থাৎ তাদেরকেই তিনি দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ এবং প্রকাশ্য ও গোপন ব্যয়ের অনুপ্রেরণা। সে কারণেই তারা পুণ্যবান। এভাবে প্রকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে ইমানদার ও কাফেরকে সুচিহ্নিত করে এমতো প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে যে, পুণ্যচ্যুতরা কি পুণ্যবানদের সমতুল?

ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, এখানে 'অপরের অধিকারভুক্ত এক দাস' বলে বুঝানো হয়েছে আবু জেহেলকে এবং 'এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দিককে।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৭৬

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

❒ আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তিরঃ উহাদিগের একজন মুক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ, তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছুই করিয়া আসিতে পারে না; সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

আলোচ্য আয়াতেও উপস্থাপন করা হয়েছে একটি জ্ঞানগর্ভ উপমা। নির্বাক, নির্বোধ ও অকর্মন্য ক্রীতদাস এবং সবাক, সক্ষম ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তির উপমা দিয়ে সুচিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে। অথবা

অংশীবাদীদের বাতিল উপাস্যসমূহ ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্‌কে। শেষে এই মর্মে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, তাহলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা কি সমান? অথবা কি সমতুল অবিশ্বাসীদের নিঃসাড় প্রতিমা ও চিরঞ্জীব আল্লাহ্?

এখানে 'আব্‌কামু' অর্থ জন্মাবধি মুক বা নির্বাক। বুদ্ধি ও বাকশক্তি রহিত। 'লা ইয়াক্বদিরু আলা শাইয়িন' অর্থ কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না। অর্থাৎ কর্মক্ষমতা রহিত। 'কাল্‌লুন' অর্থ ভার বা বোঝা । 'মাওলা' অর্থ অভিভাবক বা প্রভু। 'লা ইয়া'তি বিখইর' অর্থ সে ভালো কিছু করে আসতে পারে না। এভাবে উপমা স্থাপন করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের অথবা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর। ওই জড় প্রতিমাগুলো মুক, শক্তিহীন ও কর্মক্ষমতারহিত। আর সেগুলো তাদের জন্য অযথা একটি বোঝাও বটে। কারণ সেগুলোর পরিচর্যা, স্থানান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ— সকল কিছু তাদেরকেই করে দিতে হয়। এই কথাগুলো আলোচ্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ঃ তাদের একজন মুক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেনো, সে ভালো কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ওই ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?'

এখানে 'সিরাতুম্ মুসতাক্বীম' অর্থ সহজ সরল পথ, যা সুনিশ্চিত গন্তব্যাভিসারী। 'মাঁইইয়া'মুরু বিল আদ্‌লি' অর্থ যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়। কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নিজের উপমা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করে আতা বলেছেন, এখানে 'তাদের একজন মুক' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কাফেরদেরকে এবং মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে 'যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়' কথাটির মাধ্যমে।

আলোচ্য আয়াতের অবতরণের প্রেক্ষিত সম্পর্কে আতা বলেছেন, এখানে 'মুক' বলা হয়েছে উবাই বিন খালফ্‌কে আর 'যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত হামযা, হজরত ওসমান বিন আফফান এবং হজরত ওসমান বিন মা'জুনকে। মুকাতিল বলেছেন, রবীয়া গোত্রভূত হাসেম বিন আমর বিন হারেস ছিলো রসুল স. এর প্রাণের শত্রু। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্পর্কে। হজরত ইবনে আব্বাসের মন্তব্য উল্লেখ করে ইবনে জারীর বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জনৈক কুরায়েশ ও তার ক্রীতদাস সম্পর্কে। আর 'আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির' এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে হজরত ওসমান ও তাঁর ক্রীতদাস উসায়েদ সম্পর্কে। সে ছিলো ইসলামের ঘোর দুশমন। বিভিন্নভাবে সে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো।

বাগবী লিখেছেন, একদল লোক ছিলো পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারী। তারা এ নিয়ে প্রায়শঃই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। বলতো, পুনরুত্থান যখন হবেই, তখন তাড়াতাড়ি হয় না কেনো? তখন তাদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭৭, ৭৮

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহেরই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❒ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই।' একথার অর্থ— আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য জ্ঞান (এলমে গায়েব) কেবলই আল্লাহ্র। এই অদৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণতই তাঁর সত্তা সম্পৃক্ত। অবশ্য তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে কখনো কখনো এ সম্পর্কে কিঞ্চিত অবহিত করে থাকেন । অর্থাৎ তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকুই জানে। সুরা জ্বিনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর।' একথার অর্থ— মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান চোখের পলক ফেলার মতো একটি বিষয় অথবা চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম।

এখানে 'লামহুন' অর্থ চোখের পলক। কামুস অভিধানে এরকম বলা হয়েছে। আমি বলি, এভাবে উদ্ধৃত বক্তব্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— বজ্রপাতের ফলে মুহূর্তমধ্যে যেমন দৃষ্টি ঝলসে যায়, কিয়ামতের বিষয়টি সেরকমই। বায়যাবী

লিখেছেন, 'লামহুন' অর্থ চোখের উপরের পাতা ও নিচের পাতা মিলিত হওয়ার মুহূর্তে চোখ ঝলসে যাওয়া। চোখের পলকের চেয়েও কম সময় বুঝানোর জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে।

'আও হুয়া আক্বরাবু' অর্থ বরং তা অপেক্ষাও সত্বর । অর্থাৎ চোখের পলক অপেক্ষাও অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। আল্লাহ্পাক তখন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মুহূর্তাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করে দিবেন। আবার 'কুন্' (হও) বলার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হবে পুনরুত্থান। সৃষ্টি পুনরায় ফিরে পাবে তার অস্তিত্ব।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' একথার অর্থ— আল্লাহ্র ক্ষমতা সর্বত্রগামী। তিনি সর্বশক্তিধর। সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাঁর সেই অপার ক্ষমতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়।' একথার অর্থ— হে মানুষ! অনুধাবন করতে চেষ্ট করো, কীভাবে এই পৃথিবীতে এসেছো তোমরা। তোমরা তো তোমাদের মাতৃগর্ভে ছিলে শ্রুতি, দৃষ্টি ও বোধবিবর্জিত অবস্থায়। তারপর আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়।

এখানে 'আস্সামআ' অর্থ ইস্মায় (জ্ঞানাহরণের উপকরণ)। শব্দটি জাতিবাচক ও বহুবচনবোধক। অর্থাৎ তোমরা প্রথমে আংশিক জ্ঞান লাভ করো অনুভূতির মাধ্যমে। পরে ওই অপরিণত অনুভূতি পরিণত হয় গভীর, গভীরতর বোধে।

শেষে বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' একথার অর্থ— শ্রুতি, দৃষ্টি ও উপলব্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান আমি তোমাদেরকে দান করি, তা তোমাদের প্রতি আমার একটি অপার অনুগ্রহ। অতএব এটা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তোমরা অবশ্যই এই দানের মর্যাদা রক্ষা করবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে প্রকাশ্যে ও গোপনে।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৭৯

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

❑ তাহারা কি লক্ষ্য করে না বিহংগের প্রতি যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা কি লক্ষ্য করে না, বিহংগের প্রতি, যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন।' একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমরা আকাশের উড়ন্ত বিহঙ্গমকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না কেনো? কেনো বুঝতে চেষ্টা করো না যে, তাদের শূন্যমার্গের ওই উড্ডয়নকে আমিই তো নির্বিঘ্ন রাখি। বলো, এই অসম্ভব বিষয়টি কি আমার অপার মহিমা ও ক্ষমতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নয়?

'মুসাখ্খরাত্' অর্থ ডানা বা পালক। আল্লাহ্পাকই পক্ষিকুলকে এই উড্ডয়নোপকরণ দু'টো দান করেছেন। তাই তারা উড়তে পারে আকাশমার্গে। 'জাওইস্ সামায়ি' অর্থ আকাশের শূন্যগর্ভ। হজরত কা'ব আহবারের উক্তি উল্লেখ করে বাগবী বলেছেন, পক্ষীকুল বারো মাইল উপরে আকাশে উড়তে সক্ষম। এর উপরে তারা উড়তে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।' উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী, গবেষক ও জ্ঞানবানদের কথা। বর্ণিত নিদর্শনাবলী থেকে তাদের উপকার প্রাপ্তির কথা। আর এখানে বলা হলো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কথা। বলা হলো, দ্যাখো হে বিশ্বাসীবৃন্দ! স্থূল ও ভারী দেহবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পাখিরা কীভাবে আকাশের শূন্যগর্ভে উড়াল দিতে সক্ষম। তাদেরকে এভাবে উড়বার শক্তি দিয়েছেন কে? মহাকুশলী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ্ ছাড়া কি অন্য কেউ? তিনিই তো এভাবে ঘটিয়েছেন ভূচর ও খেচর প্রাণীসমূহের এক অবাক সমন্বয়। তাঁর প্রতি যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাখে, তারাই তো বুঝতে পারে এই বিস্ময়কর নিদর্শনটির প্রকৃত তত্ত্ব।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৮০, ৮১

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

❒ এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার, এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের জন্য ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী।

❒ এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদিগের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো।' এখানে 'পশুচর্মের তাঁবু ' অর্থ পশুচর্ম নির্মিত তাঁবু বা পশমনির্মিত তাঁবু। পশম সব সময় চামড়ালগ্ন থাকে বলেই পশুচর্মকে পশম বলা যেতে পারে। 'ইয়াওমা জ'নিকুম' অর্থ তোমাদের ভ্রমণকালে বা প্রবাসজীবনে। আর 'ইয়াওমা ইক্বামাতিকুম' অর্থ স্বগৃহে বা আবাসস্থলে অবস্থানকালে। 'অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো' কথাটির অর্থ ভ্রমণপথের কোথাও স্থাপন করতে পারো শিবির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ থেকে কিছুকালের জন্য ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী।' 'সুফুন' অর্থ ভেড়া বা দুম্বার লোম। উট থেকে পাওয়া যায় নরম পশম। ছাগল থেকে পাওয়া যায় ওবাল্। এ সকল কিছুই হচ্ছে ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যবহার্য গৃহ-সামগ্রী বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আছাছা' শব্দটি। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হয় না। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'মাতায়্' অর্থ বাণিজ্যিক পণ্য। 'ইলাহীন্' অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি, যে সম্পত্তির স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের উপর।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।' একথার অর্থ— বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা ও গৃহসমূহের ছায়াঘন পরিবেশে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করি প্রখর সূর্যকিরণ থেকে। পর্বত গুহাসমূহেও তোমরা রচনা করতে পারো তোমাদের আশ্রয়স্থল। এখানকার 'আকনানা' শব্দটি কিন্নুন' এর বহুবচন। এর অর্থ আশ্রয়স্থল।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করে।' একথার অর্থ— শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনিই তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শীত অথবা তাপরোধক গাত্রাবরণ। আবার ব্যবস্থা করেন বর্মের, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আঘাত থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' একথার অর্থ— হে মানুষ এতক্ষণ ধরে আলোচিত অনুগ্রহরাজি তোমাদের প্রতি আমার অপার দয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এভাবেই আমি তোমাদের প্রতি আমার দানকে পূর্ণ করে দিয়েছি। এই পূর্ণতার অনন্য উপসংহার হচ্ছেন আমার শেষতম রসুল। তাঁকে আমি সজ্জিত করেছি অসংখ্য মোজেজা দ্বারা। তাঁর উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাকল্যাণের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ আলকোরআন। উত্তরোত্তর সফলতা দান করেছি মানুষের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম ইসলামকে। এরকম করেছি এজন্যে যে, মানুষ যেনো সহজে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে মহামানবতার ধর্ম ইসলামের চিরসুবাসিত সুশীতল ছায়াতলে। হতে পারে আত্মসমর্পিত ও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

আতা খোরাসানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তুলে ধরেছেন তৎকালীন আরবের প্রতিবেশ, যাতে করে তখনকার আরববাসীরা একথা বুঝে নিতে পারে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ কতো বিপুল, কতো বিস্তৃত। লক্ষণীয় যে, এখানে দিগন্ত বিস্তৃত ধূ ধূ মরুভূমির কথা উল্লেখিত হয়নি। উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড়-পর্বতের কথা। আবার তাদের অন্যতম প্রধান জীবিকার মাধ্যম ছিলো পশুপালন। তাই উল্লেখ করা হয়েছে, পশুর চামড়া, চামড়া নির্মিত তাঁবু, পশম ও এ সকল কিছুর দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন সাংসারিক সামগ্রীর কথা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আর তিনি স্বর্গগিরি থেকে তুষারপাত ঘটান।' লক্ষণীয় যে, আকাশ থেকে বরফ পড়ার কথা এখানে বলা হয়নি। অথচ পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে তুষারপাত অপেক্ষা বরফপাত হয় বেশী। আরো উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে।' আরবের মানুষকে প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হয়। তাই 'শীত থেকে' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'তাপ থেকে'।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

❐ অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

❐ উহারা আল্লাহের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদিগের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! মানুষের প্রতি আমার অনুগ্রহসমূহের স্পষ্ট বিবরণ প্রদানের পরও যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যধর্ম গ্রহণ করতে অনীহ হয়, তবে এ বিষয়ে আপনার করনীয় কিছুই নেই। আপনি আমার প্রিয়তম বাণীবাহক। সুতরাং আমার স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করুন। অবিশ্বাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ব্যথিত হবেন না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলো এক বেদুইন। রসুল স. তার সম্মুখে পাঠ করলেন 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল।' বেদুইন বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসুল স. পুনরায় পাঠ করলেন 'এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে তা সহজে বহন করতে পারো এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো।' বেদুইন বললো, যথার্থ। এভাবে রসুল স. একে একে মানুষের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজির বিবরণ সম্বলিত আয়াতগুলো পাঠ করলেন। প্রতিটি আয়াতের আবৃত্তি শেষে বেদুইন বলতে লাগলো, ঠিক ঠিক। ঠিকই বলেছেন আপনি। সবশেষে তিনি স. পাঠ করলেন 'এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' এই আয়াত শুনেই বেদুইন অতি দ্রুত প্রস্থান করলো সেখান থেকে। তখন অবতীর্ণ হলো 'অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া।'

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে, অতঃপর সেগুলো তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার অনুগ্রহের কথা ভালো করেই জানে, কিন্তু তা স্বীকার করে না। সুতরাং বলতে হয়, তারা জেনে শুনেই আমার একক উপাস্য হওয়ার বিষয়টি অমান্য করে। অন্যের

উপাসনা করে প্রমাণ করে যে, তাদের ওই মিথ্যা উপাস্যগুলোই অনুগ্রহদাতা। এভাবে লালন করে চলে অংশীবাদিতাকে। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর নবুয়তকে। যদি তাই হয়, তবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— হে আমার রসুল! তারা ভালো করেই জানে যে, আপনি আমার সত্য রসুল। কিন্তু একগুঁয়েমি, জিদ ও হঠকারিতার কারণে তারা আপনাকে অস্বীকার করে। আর তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী।

একটি সম্ভাব্য সন্দেহঃ অংশীবাদীরা পূর্ব থেকেই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। অথচ এখানে বলা হয়েছে 'ছুম্মা ইয়ুনকিরূনা লাহা' (অতঃপর তারা সেগুলো অস্বীকার করে)। এতে করে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, প্রথমে সত্যকে স্বীকার করার পরে তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে?

সন্দেহের অপনোদনঃ 'ছুম্মা' শব্দটি এখানে কালের দূরত্বকে প্রকাশ করেছে। কখনো কখনো আবার শ্রেণীভেদজনিত পার্থক্য প্রকাশের জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোনো কিছু জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করা অবাস্তব কিছু নয়। জানাও তো এক ধরনের স্বীকৃতি। এ কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্মা' শব্দটি।

আল্লামা বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে প্রদত্ত যে সকল নেয়ামতের কথা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা অবশ্যই সেগুলোর কথা জানতো। কিন্তু সেগুলোর উল্লেখ করে যখনই তাদেরকে বলা হলো, তাহলে এবার নেয়ামতদাতাকে মানো, কার্যকর করো তাঁর বিধানাবলী, তখনই তারা অস্বীকার করে বসলো। বললো, আমরা তো এসকল কিছু পেয়েছি আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট থেকে।

কালাবী বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির কথা জানানোর পর যখন প্রশ্ন করা হলো, বলো এগুলো তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? তারা বললো, আল্লাহ্। তবে এগুলো আমরা পেয়েছি আমাদের দেব-দেবীদের মধ্যস্থতায়। আউন বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, নেয়ামতরাজিকে অস্বীকার করার অর্থ নেয়ামত প্রাপ্তির বাস্তব সম্পর্ককে প্রকাশ্য কার্যকরণ নীতি বা মাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। যেমন বলা হয়— যদি এরূপ না হতো তবে ওইরূপ হতো না। যদি অমুকে ব্যবস্থা না নিতো তবে এগুলো পাওয়া যেতো না। এরকম ধারণা অংশীবাদিতার নামান্তর।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।' একথার অর্থ— তাদের দলের সকল লোক অথবা অধিকাংশ লোক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানে অধিকাংশ বলার কারণ এই যে, সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জেনে শুনে সত্য প্রত্যাখ্যান করে না। তাদের কেউ কেউ

বোধ বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। বিষয়টির মূল তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অনবহিত। অথবা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিধারী। গভীরভাবে কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করার ক্ষমতা তারা রাখে না। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং উন্মাদ। তাদের উপরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং শরিয়তের দায়িত্ব বর্তায় না। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, তাদের সকলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী পদবাচ্য নয়। তবে অধিকাংশই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ○ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ○

❒ যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে কৈফিয়ত দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

❒ যখন সীমালংঘনকারিগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

❒ অংশীবাদিগণ, যাহাদিগকে আল্লাহের শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে; 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে;' অতঃপর, তদুত্তরে উহারা বলিবে, 'তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পুনরুত্থান দিবসে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী-রসুলগণকে ওই সকল সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করবো। তারা তখন সত্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে। ফলে অবিশ্বাসীরা তাদের পক্ষে কোনো কৈফিয়ত বা অজুহাতই খুঁজে পাবে না। তদুপরি এরকম কোনো সুযোগও তাদেরকে দেয়া হবে না। ফলে তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভের কোনো উপায়ই আর পাবে না।

এখানে 'শাহীদ' অর্থ সাক্ষী। অর্থাৎ নবী-রসুলগণ। 'কৈফিয়ত দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না' অর্থ অজুহাত উপস্থাপনের কোনো সুযোগই দেয়া হবে না। অর্থাৎ তাদের নিকট তখন অজুহাত পেশ করার কোনো কিছুই থাকবে না। অথবা অর্থ হবে এরকম— তাদেরকে তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই দেয়া হবে না। তাই তারা তখন কিছুই বলতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— তারা তখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ প্রকাশ করবে। কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না।

'ওয়ালা হুম ইউস্‌তা'তাবুন' কথাটির অর্থ তাদের তখন কোনো পুণ্যকর্ম করার সুযোগ থাকবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ দেয়া হবে না।' মোট কথা, তখন আল্লাহ্‌পাকের সন্তোষলাভ হবে তাদের পক্ষে অসম্ভব।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'যখন সীমালংঘনকারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো বিরাম দেয়া হবে না।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারীরা তখন প্রত্যক্ষ করবে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। তাদেরকে প্রবেশও করানো হবে সেখানে। তারা চাইলেও তাদের শাস্তি তখন এতটুকুও লাঘব করা হবে না। আর শাস্তিও হবে বিরামহীন।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'অংশীবাদীরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক করেছিলো, তাদেরকে যখন দেখবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এরাই তারা, যাদেরকে আমরা তোমার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম তোমার পরিবর্তে।' একথার অর্থ— মহাবিচারের দিন মূর্তিপূজকেরা তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোকে দেখতে পেয়ে উপায়ন্তর না দেখে বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! এরাই ছিলো আমাদের স্বেচ্ছানির্বাচিত উপাস্য। তোমাকে ত্যাগ করে আমরা এ সকলকে গ্রহণ করেছিলাম আমাদের প্রভুপ্রতিপালকরূপে। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরা তখন এরকম বলতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ সত্যস্বীকৃতি দেয়া ছাড়া কোনো উপায়ন্তর তখন তাদের থাকবে না। অথবা তারা তখন এভাবে দোষ স্বীকার করবে এই আশায় যে, এতে করে যদি শাস্তি কিছুটা শিথিল হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' এ কথার অর্থ— তখন তাদের পূজিত প্রতিমাগুলো হবে বাকশক্তিসম্পন্ন। বলবে, তোমরাই তো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক নির্বাচিত করেছিলে। অথবা আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এরকম— প্রস্তর মূর্তিগুলো তখন বলবে, তোমাদের দাবি মিথ্যা, তোমরা প্রকৃত অর্থে আমাদের উপাসনা কখনোই করোনি। তোমরা তো পূজা করেছিলে তোমাদের প্রবৃত্তির। আমরা কি কখনো

বলেছিলাম যে, তোমরা আমাদের পূজা অর্চনা করো? অপর এক আয়াতে একথার সমর্থন বিদ্যমান। যেমন— 'ইয়াকফুরুনা বি ইবাদাতিহিম' (অচিরেই প্রতিমাগুলো অংশীবাদীদের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করবে)। কিংবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— মূর্তিগুলো বলবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আমরা তো তোমাদেরকে এই মর্মে কখনোই উৎসাহিত করিনি যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করো, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো, অথবা এ রকমও বলিনি যে, আমাদের পূজা করতে তোমরা বাধ্য। অভিশপ্ত ইবলিস তখন বলবে, 'তোমাদের উপরে আমার পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো না, তবে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আর তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।'

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৮৭, ৮৮, ৮৯

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ﹰالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

❐ সেই দিন তাহারা আল্লাহের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইবে!

❐ আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের ও আল্লাহের পথে বাধাদানকারীগণের; কারণ, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

❐ সেই দিন আমি উত্থিত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক-একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনিব সাক্ষীরূপে ইহাদিগের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিলাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অংশীবাদীরা তখন তাদের উপাস্যগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখে হতাশ হয়ে পড়বে। এভাবে তাদের মিথ্যা

বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপসারিত হতে দেখে তারা নিরুপায় হয়ে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে আল্লাহ্‌র নিকটে। কিন্তু তাদের তখনকার ওই উপায়হীন আত্মসমর্পণ হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

পরের আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারীদের; কারণ, তারাই অশান্তি সৃষ্টি করতো।' একথার অর্থ— যারা পৃথিবীতে ছিলো অবিশ্বাসী, অংশীবাদী ও সত্যধর্মের পথের অন্তরায়, আখেরাতে আমি তাদের শাস্তি ক্রমাগত বৃদ্ধিই করতে থাকবো। কারণ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী।

এখানে 'আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারী' অর্থ মানুষের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতাসৃষ্টিকারী। অবিশ্বাসের দিকে উৎসাহ সৃষ্টিকারী। 'শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করবো' অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য আমি তো তাদের শাস্তি দিবোই, তদুপরি আরো শাস্তি দিবো আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ 'আজাবান' (শাস্তি) কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— দোজখের বৃশ্চিকগুলো হবে দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষের মতো লম্বা। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে উন্নত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে মারদুবিয়া। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দোজখে থাকবে এক ধরনের সাপ। সেগুলোর আকৃতি হবে বৃহৎ উট সদৃশ। আর সেখানকার বৃশ্চিকগুলো হবে খচ্চর সদৃশ। তাদের একবার দংশনের যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকবে চল্লিশ বছর ধরে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে গলিত লোহা ও তামার পাঁচটি লাভাস্রোত। ভয়ংকর আগুনের মতো উত্তপ্ত ওই লাভা-নির্ঝরিণীতে নিক্ষিপ্ত ও নিমজ্জিত হবে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা। তারা কেউ অবগাহন করবে তিনটি লাভাস্রোতে। আর কেউ অবস্থান করবে দু'টিতে। এভাবে পালাক্রমে তাদের শাস্তি চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে এভাবে— কিছুকাল তাদেরকে দেয়া হবে অগ্নিশাস্তি। আবার শৈত্য-শাস্তি দেয়া হবে কিছুকাল। এভাবে কিছুটা স্বস্তির আশায় উত্তাপ থেকে শীতলতার দিকে, আবার শীতলতা থেকে উত্তাপের দিকে যেতে চাইবে তারা।

এখানকার 'অশান্তি সৃষ্টি করতো' কথাটির অর্থ হবে— তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াতো।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'সেদিন আমি উত্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনবো সাক্ষীরূপে তাদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করলাম।'

এখানে 'শাহীদ' অর্থ প্রত্যেক উম্মতের নবী। 'হাউলাই' অর্থ ইসলামী দল। 'তিবইয়ানান' অর্থ স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা বলিষ্ঠ বিবরণ। 'লিকুল্লি শাই' অর্থ প্রত্যেক বিষয়ে— সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতরূপে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের রসুল যা তোমাদেরকে দান করেছেন, তা গ্রহণ করো। আর যা বারণ করেছেন, তা পরিত্যাগ করো। আর যারা বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথাভিমুখী হয়, আমি তাদেরকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেই। হে দূরদর্শী! অনুধাবন করো।'

'হুদা' অর্থ বিপথ থেকে সুপথের দিকে পরিচালন। অর্থাৎ পথ-নির্দেশক। 'রহমাতান্' অর্থ সার্বজনীন কৃপা, করুণা বা দয়া। যে ব্যক্তি সংকীর্ণচিত্ত ও বিপথগামী, কেবল সে-ই বঞ্চিত হয় এই অযাচিত করুণা থেকে।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

❑ আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

প্রথমে বলা হয়েছে— ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের কথা। এখানে 'আদল' (ন্যায়পরায়ণতা) শব্দটির অর্থ— সমান্তরাল বা সমতুল অবস্থা। কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতেও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— 'আও আদলু জালিকা সিয়ামান্' (অথবা তার সমতুল রোজা), 'ওয়া আন্ তা'দিলু বাইনান নিসায়ি' (আর এই ললনাকুলের মধ্যে সমতা রক্ষা করো)। এই অর্থে ফিদিয়া ও বিনিময়কেও বলা হয় আদল। এভাবে আলোচ্য বাক্যের 'আদল' শব্দটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়পরায়ণতা রক্ষার জন্য বা সমান্তরাল অবস্থা বজায় রাখার জন্য— সততার বিনিময়ে সততা এবং অসততার বিনিময়ে অসততা দ্বারা। সুতরাং বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে। কারো প্রতি পক্ষপাত করা যাবে না। সিদ্ধান্ত দিতে হবে আল্লাহ্তায়ালার বিধানের প্রেক্ষিতে।

'আদল' এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইহসান' (সদাচরণ) কথাটি। সমতা রক্ষা করার নাম যদি 'আদল' হয়, তবে ইহসানের অর্থ হবে এরকম— উত্তমের বিনিময়ে অত্যুত্তম এবং অনুত্তমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা উত্তম আচরণের বিপরীতে

করো অধিকতর উত্তম আচরণ। আর নিকৃষ্ট আচরণের বদলা নাও অপেক্ষাকৃত কম নিকৃষ্ট আচরণের দ্বারা। এভাবে ন্যায়পরায়ণতা যদি হয় বাদী-বিবাদীর মধ্যে পক্ষপাত না করা, তবে সদাচরণ বলা যাবে আল্লাহ্পাকের বিধানানুসারে মীমাংসা করাকে।

আমি বলি, সত্যের উপরে দৃঢ় অবস্থান নেয়াকে বলে 'আদল।' জুলুম ও বক্রতার বিপরীত জ্ঞানের নামও 'আদল।' কামুস প্রণেতা লিখেছেন, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে অত্যাচারের বিপরীত অবস্থা। স্বভাবজাত সারল্যের সুদৃঢ় রূপই হচ্ছে 'আদল।' কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আদল বা ন্যায়পরায়ণতা বলেছেন মধ্যম পন্থাকে। অশোভন কোনো গুণকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত করা অথবা কাউকে বা কোনো কিছুকে তাঁর গুণবত্তার অংশীদার বা সমকক্ষ মনে করার নাম শিরিক। এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম তওহীদ বা আল্লাহ্র অদ্বিতীয়ত্ব। অর্থাৎ তিনি যেমন গুণবিবর্জিত নন, তেমনি সৃষ্টির কেউ বা কোনোকিছু তাঁর মতো নয়। তিনি আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং অংশীবিহীন। এক ও অবিভাজ্য। অস্তিত্বে, গুণাবলীতে ও কার্যকলাপে।

মানুষের সাফল্য ও সুষম অর্জনও নির্ভর করে এই ন্যায়পরায়ণতার উপরে। কারণ সে জড়পদার্থতুল্য নিষ্ক্রিয় যেমন নয়, তেমনি যা খুশী তাই করার ক্ষমতাও সে রাখে না। সে তার কর্মসম্পাদনকারী। কিন্তু তার কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ্। কারণ তিনিই সকল কিছুর একক স্রষ্টা। এভাবে সৃষ্টি আল্লাহ্র সঙ্গে এবং অর্জন তাঁর বান্দার সঙ্গে সম্বন্ধিত।

আল্লাহ্র অধিকার এবং তাঁর বান্দার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে— এরকম অবস্থায় অবস্থান গ্রহণের নামও ন্যায়পরায়ণতা। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতে এতো অধিক নিমজ্জিত হওয়া যাবে না, যাতে করে আল্লাহ্র বান্দাগণের অধিকার পরিত্যক্ত হয়। আবার পার্থিবতার প্রতি এতো বেশী ঝুঁকে পড়া যাবে না, যাতে করে আল্লাহ্র ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। ন্যায়পরায়ণতার এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে আরো অনেক। যেমন কৃপণতা ও অপব্যয়িতার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম দানশীলতা। অযথা আস্ফালন ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী অবস্থার নাম বীরত্ব। স্ত্রীসঙ্গ বর্জন ও ব্যভিচারের মধ্যবর্তী বৈধ যৌন চরিতার্থতার নাম পবিত্রতা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওহীদ বা এককত্ববাদ হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা এবং তা অত্যাবশ্যকরূপে পালন করা হচ্ছে ইহসান বা সদাচরণ। অপর এক সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যরূপে এসেছে বিশুদ্ধ তওহীদের নাম 'ইহসান।' রসুল স. এরশাদ করেছেন, তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের ইবাদত এমনভাবে করো যেনো তুমি তাঁকে দেখছো। যদি এরকম না হয়, তবে মনে কোরো তিনি তো তোমাকে দেখছেন। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

মুকাতিল বলেছেন, তওহীদ হচ্ছে 'আদল।' আর মানুষের সঙ্গে ঔদার্য ও শিষ্টাচার রক্ষার নাম 'ইহসান।' নফল কখনো ফরজের স্থলাভিষিক্ত নয়, কিন্তু তা ফরজের কিঞ্চিত ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তার ব্যয় গ্রহণ করবেন না, গ্রহণ করবেন না 'আদলকেও।' একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাঁর ফরজ, নফল কোনোটাই গ্রহণ করবেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালংঘন।' আত্মীয়স্বজনকে দান করার অর্থ দরিদ্র আত্মীয়দের অভাব অভিযোগ পূরণ করা। 'ফাহ্শা' অর্থ অশ্লীলতা। সকল প্রকারের মন্দ কথা ও কার্যকলাপ অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত।

হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন,'আলফাহ্শা' অর্থ ব্যভিচার এবং 'মুনকার' অর্থ ওই সকল অপকর্ম, শরিয়ত যে গুলোকে মন্দ বলে চিহ্নিত করেছে এবং সুস্থ বিবেকও যেগুলোকে মন্দ বলে জানে।

'আল বাগয়ি' অর্থ সীমালংঘন, আত্মম্ভরিতা। বায়যাবী লিখেছেন, 'ফাহ্শা' অর্থ যৌনোন্দ্রিয়ের যথেচ্ছব্যবহার বা ব্যভিচার। 'মুনকার' হচ্ছে ওই বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত অসৎকর্ম, যা ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় করা হয়। আর 'আল বাগয়ি' অর্থ আত্মগর্ব ও উন্নাসিকতা। মোট কথা ফাহ্শা, মুনকার ও বাগয়ি— এই তিনটি অসৎ স্বভাব সকল অসৎ কর্মের ভিত্তি। প্রতিটি অসুন্দর কর্ম এই তিনটির যে কোনো একটি থেকে উৎসারিত। একারণেই হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআন মজীদের এই আয়াতটি জামেয় (ব্যাপক অর্থবোধক)। হজরত ইবনে মাসউদের এই বক্তব্যটি সাঈদ বিন মানসুর লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'আল আদব' গ্রন্থে। 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বায়হাকী। মোহাম্মদ বিন মানসুর থেকে উল্লেখ করেছেন বোখারী। আরো বর্ণনা করেছেন ইবনে মুনজির থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। বোখারীর আদব অধ্যায়ে এবং আহমদ, ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতটিই ছিলো ওসমান ইবনে মাজউনের ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ।

বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া বলেছেন, অন্তর ও বাহির এক হওয়ার নাম 'ইহসান।' বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ অবস্থা উত্তম হলে তাকে বলা হবে 'ইহসান।' আর অভ্যন্তরীণ অবস্থা অপেক্ষা বাহ্যিক অবস্থা বেশী প্রবল হলে তাকে বলা হয় 'ফাহশা' অথবা 'মুনকার।'

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে এ কারণেই উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, তোমরা যেনো তা পালন করো। আঁকড়ে ধরো শুভকে এবং

পরিত্যাগ করো অশুভকে। এভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে দাও সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত ছাড়া কোরআন মজীদে যদি আর কোনো আয়াত নাও থাকতো, তবুও কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা যেতো— তিব্ইয়ানান্ লি কুল্লি শাইইন ওয়া হুদাওঁ ওয়া রহ্মাতাঁও ওয়া বুশরা লিল মুসলিমীন (প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করলাম)।

বাগবী লিখেছেন, আইয়ুবের বর্ণনাসূত্রে ইকরামার বক্তব্যরূপে এসেছে, রসুল স. একবার এই আয়াত ওলীদকে পাঠ করে শোনালেন। ওলীদ বললো, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র। তুমি যা পড়লে তা আর একবার শোনাও। রসুল স. পুনরায় পাঠ করলেন। ওলীদ বলে উঠলো, আল্লাহ্র শপথ। এ যে দেখছি বিস্ময়কর অমিয় প্রবাহ। এই বাণীর শব্দ ও মর্ম অভূতপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর বাইরের দিক অপার্থিব ফল ও ফসলে ভরা। আর এর ভেতরে রয়েছে অনন্ত সৌরভ।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯১, ৯২, ৯৩

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۭ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

❑ তোমরা আল্লাহের নামে অংগীকার করিলে অংগীকার পূর্ণ করিও এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদিগের জামিন করিয়া প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

❐ অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হইবার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিয়া সেই নারীর মত হইও না, যে সুতা মজবুত হইবার পর উহা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার সুতা কাটা নষ্ট করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তো ইহা দ্বারা তোমাদিগকে কেবল পরীক্ষা করেন। তোমাদিগের যে-বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

❐ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে-বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

এখান থেকে শুরু হয়েছে অঙ্গীকার বিষয়ক আলোচনা। 'আহদ' অর্থ অঙ্গীকার। প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূরণ কোরো এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের জামীন করে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করবার পর তা ভঙ্গ কোরো না।'

হজরত বুরাইদা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, সাহাবীগণ রসুল স. এর নিকটে বায়াতের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এখানে। বায়াতের অঙ্গীকারভঙ্গকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আহদ' অর্থ সাধারণ শপথ বা প্রতিজ্ঞা, যা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা বা ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হয়। শা'বীও এরকম লিখেছেন। আল্লাহ্কে জামীন করে প্রতিজ্ঞা করার অর্থ এখানে বায়াতের শপথ করা অথবা সাধারণভাবে যে কোনো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া। 'বা'দা তাওকীদিহা' অর্থ আল্লাহ্র নামে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর। 'কাফীলা' অর্থ বায়াতের সাক্ষী। কোনো কিছুর দায়িত্ব বহনকারী ও সংরক্ষণকারীকে বলে 'কাফীল।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন।' এ কথার অর্থ— তোমরা তোমাদের কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, না ভঙ্গ করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবহিত। মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে প্রাক ইসলামী যুগের শপথ সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'অন্য দল অপেক্ষা শক্তিশালী হবার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে ওই নারীর মতো হয়ো না, যে সুতা মজবুত হবার পর তা খুলে ফেলে তার সুতা কাটা বন্ধ করে দেয়।' এখানে 'গায্‌লাহা' অর্থ সুতা মজবুত করা। 'আনকাছা' অর্থ খুলে ফেলা বা টুকরো টুকরো করে দেয়া।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর বিন আবু হাফস্ বলেছেন, মক্কার সাঈদা আসাদিয়া নাম্নী এক উন্মাদিনী চুল ও খেজুর গাছের আঁশ সংগ্রহ করে ফিরতো। এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে ওই রমণীটির দৃষ্টান্ত।

বাগবী লিখেছেন, কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, রবতা বিনতে ওমর বিনতে সা'দ নাম্নী এক মস্তিষ্কবিকৃত মহিলা তার চরকায় প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত সুতা কেটে চলতো। দুপুরের পর আবার সেগুলো খুলে খুলে ফেলতো সে। ওই মহিলাকে আলোচ্য আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে শপথ ভঙ্গকারীদের উপমারূপে। বলা হয়েছে— প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রবঞ্চনা করবার উদ্দেশ্যে তোমরা শপথ কোরো না। যদি করো তবে তোমরা হবে ওই রমণীটির মতো, যে সুতা মজবুত করার পর আবার তা খুলে খুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে। শপথ ভঙ্গ হওয়ার আশংকা থাকলে তোমরা শপথ কোরোই না। আর করে ফেললে অবশ্যই তা পূর্ণ কোরো।

এখানে 'দাখালা' অর্থ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা বা ধোকা। আভিধানিক অর্থে একটি বস্তুর ক্ষতি করার মানসে তার মধ্যে আর একটি বস্তু প্রবেশ করানোকে বলে 'দাখাল।' এমতো ক্ষেত্রে 'দাখাল' বলা হবে প্রবিষ্ট বস্তুটিকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন,'দাখাল' ও 'দাগাল' সমার্থক। কথা দু'টোর প্রকাশ্য অর্থ অঙ্গীকারকারী, আর অন্তর্নিহিত অর্থ অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। 'আরবা' অর্থ সংখ্যা ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে প্রাবল্য।

মুজাহিদ বলেছেন, মূর্খতার যুগে একটি গোত্র বা দল অপর একটি গোত্র বা দলের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগী হবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো। পরে যখন দেখতো তাদের মিত্রশক্তির প্রতাপ তেমন যথেষ্ট নয়, তখন তারা প্রবঞ্চনা করে ওই মিত্রের শত্রুর সঙ্গে গিয়ে মিলতো। এভাবে ভঙ্গ করতো অঙ্গীকার। মুজাহিদের এই বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরেও প্রবঞ্চনা করে তোমাদের মিত্রকে ত্যাগ করে তাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলাও— এটা ঠিক নয়। তোমরা তো তাহলে ওই রমণীর মতোই হলে যে সুতা মজবুত করার পরে আবার তা খুলে ফেলে। অথবা মর্মার্থ হতে পারে এ রকম— শপথবাক্য উচ্চারণ করে এক দলের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার পর তোমরা তোমাদের মিত্রশক্তির সামরিক ও সামাজিক পরাক্রমহীনতাকে তোমাদের শপথভঙ্গের অজুহাত হিসেবে দাঁড় কোরো না। উল্লেখ্য যে, সমরশক্তিকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় করে এখানে শপথ ভঙ্গ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পরে কুরায়েশেরা যখন দেখলো, মুসলমানদের চেয়ে তাদের শক্তি বেশী, তখন তারা দু'বছর যেতে না যেতে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেললো। এরকম চুক্তিভঙ্গকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো ইহা দ্বারা তোমাদেরকে কেবল পরীক্ষা করেন। তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ আছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই এক দলকে অন্য দল অপেক্ষা অধিক শৌর্য বীর্য দান করেছেন। মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি এরকম করেছেন। কেউ শপথ ভঙ্গ করে কিনা তা বাস্তব জগতে প্রকাশ করে দেয়াই এমতো পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সম্মুখে প্রতিফল দিবস তো রয়েছেই। ওই দিন

তিনি স্পষ্ট করে দিবেন অঙ্গীকার রক্ষাকারী ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পরিণতি। তখন অতি অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে শপথ রক্ষাকারীদেরকে এবং তিরস্কৃত করা হবে তাদেরকে, যারা শপথ ভঙ্গ করেছে।

এরপরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী করে দিতে পারতেন। তখন তোমরা সকলেই হতে অঙ্গীকার রক্ষাকারী। কিন্তু তিনি এরূপ করেন না। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেককেই সৎপথ আঁকড়ে ধরবার সামর্থ্য দান করেন না। তাই তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আবার কাউকে কাউকে দান করেন পুণ্য পথে চলবার সামর্থ্য। তাই তারা পুণ্যাভিসারী। এভাবেই তিনি একদলকে করেন পথভ্রষ্ট। আরেক দলকে করেন পথপ্রাপ্ত। আর প্রতিফল দিবসে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রশ্ন করা হবে তোমাদের পাপ ও পুণ্য প্রমাণার্থে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি ও স্বস্তি প্রদানার্থে।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ
تَذُوقُوا السُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

❒ পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিও না; করিলে, পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহের পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে; তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

❒ তোমরা আল্লাহের নামে কৃত অংগীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহের নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম— যদি তোমরা জানিতে!

❒ তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহা থাকিবে না এবং আল্লাহের নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে প্রবঞ্চনাস্বরূপ কোরো না। শপথভঙ্গকে বানিয়ো না বিপর্যয়ের উপলক্ষ। তোমাদের অঙ্গীকারের উপরে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে। অথচ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সৃষ্টি করবে যুদ্ধ-বিগ্রহের নতুন সুযোগ। এটা কি নিশ্চিন্ত জনসাধারণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা নয়? এরকম প্রবঞ্চনায় নিপতিত হওয়ার অর্থ দৃঢ়পদ অবস্থা থেকে পা পিছলে পড়ে যাওয়া। এভাবে সত্যপথ থেকে সটকে পড়ার জন্য ও আল্লাহ্র পথে বিবিধ অন্তরায় সৃষ্টির জন্য তোমাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে। নিশ্চিত জেনো, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।

উল্লেখ্য যে, নিরাপদ অবস্থা থেকে কেউ যদি বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, তবে তাকে বলে থাকে— লোকটির পা পিছলে গিয়েছে। অর্থাৎ স্খলিত হয়েছে তার পদবিক্ষেপ। আরো উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হচ্ছে দৃঢ়পদ থাকা বা পা স্থির রাখা। আর এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই হচ্ছে পদস্খলিত হওয়া। 'তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে' অর্থ পার্থিব জীবনে বিপদগ্রস্ত হবে বিভিন্নভাবে। আর 'মহাশাস্তি' (আ'জাবুন আজীম) অর্থ পরকালের শাস্তি।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না।' এ কথার অর্থ— রসুলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পার্থিব লাভালাভের কারণে ভঙ্গ কোরো না। এতে করে তোমরা সাময়িকভাবে কিছু পার্থিব সুবিধা পাবে, কিন্তু চিরতরে হারিয়ে ফেলবে পরকালের অনন্ত কল্যাণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র নিকটে যা আছে কেবল তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম— যদি তোমরা জানতে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা-ই উত্তম। একথা যদি জানতে তবে কিছুতেই অংগীকার ভঙ্গ করতে পারতে না।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'তোমাদের নিকটে যা আছে তা থাকবে না এবং আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা স্থায়ী।' একথার অর্থ — হে উদাসীন মানুষ! ভেবে দেখো, তোমাদের কাছে যা আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে যে করুণার মহাসিন্ধু রয়েছে তা স্থায়ী ও অনিঃশেষ। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'লা তাশতারূ বি আহদিল্লাহ্' (আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় কোরো না) কথাটির কারণ বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

হজরত আবু মুসা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, যে পার্থিব জীবনে মগ্ন, সে তার আখেরাতের ক্ষতিসাধন করে। আর যে আখেরাতের প্রতি আকৃষ্ট, সে ক্ষতি করে তার পার্থিব জীবনের। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসশীলতার উপরে অক্ষয়তাকে প্রাধান্য দেয়া। পরকালের প্রতি অনুরাগী হও। বিরাগী হও ইহকালের প্রতি।

শেষে বলা হয়েছে— 'যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন।' একথার অর্থ— বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও যারা ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানানুসারে জীবন যাপন করবে, নিশ্চয় তাদেরকে তিনি দান করবেন তাদের কর্মের উৎকৃষ্ট পারিতোষিক। ওই পারিতোষিক হবে তাদের পুণ্যকর্মের যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। সাতশত গুণ, অথবা ততোধিক, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা অভিপ্রায় করবেন। কেউ কেউ বলেছেন এখানে 'বি আহসানি মা কানু ইয়া'মালুন' কথাটির অর্থ হবে— তাদের ফরজ ও মোস্তাহাব আমলগুলো হবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের মাধ্যম বা উপকরণ।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৯৭

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

❒ বিশ্বাসী হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ পুরুষ ও রমণীকে আমি দান করবো নন্দিত জীবন এবং তাদের পুণ্যকর্মের জন্য আমি তাদেরকে দান করবো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এখানে দেখা যায়, অবিশ্বাসীরা যদি সৎকর্ম করেও, তবু তারা নন্দিত জীবন ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে না। তবে, পাত্রভেদে অবিশ্বাসী সৎকর্মশীলদের শাস্তি হয়তো কিছুটা লাঘব করা হবে। উল্লেখ্য, যে সৎকর্ম আল্লাহ্‌র সন্তোষ সাধনের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যসহ সম্পাদিত হয় না, তা আল্লাহ্‌তায়ালা গ্রহণ করেন না। আর যা তিনি গ্রহণই করেন না, তার পুরস্কার দিবেন কীভাবে? অবিশ্বাসীদের সৎকর্মের মধ্যে এরকম শুভ উদ্দেশ্য থাকেই না। তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রবৃত্তির তৃপ্তি, অথবা জনমনরঞ্জন, কিংবা খ্যাতি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' (আনন্দময় জীবন) অর্থ হালাল রিজিক। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ 'ক্বানায়াত' (অল্পে তুষ্টি)। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, আনুগত্যমণ্ডিত জীবন। আবু বকর ওয়াররাক বলেছেন, আনুগত্যে নিমগ্ন হওয়ার অর্থই পবিত্র বা নন্দিত জীবন লাভ করা। বায়যাবী বলেছেন, পবিত্র জীবন যাপন করার নামই 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা।' বিত্তশালী যদি সে হয়, তবে তার জীবন হবে কৃতজ্ঞতার আলোকে আলোকিত। আর স্বল্পবিত্তাধিকারীদের জীবন হবে ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির সুবাসে সুবাসিত। এমতো জীবনযাপন অবিশ্বাসীদের জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সুখে যেমন কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না তেমনি বিপদে প্রকাশ করে অসহিষ্ণুতা ও অতুষ্টি । এ কারণেই বিশ্বাসীদের জীবন পবিত্র ও আনন্দময় এবং অবিশ্বাসীদের জীবন অপবিত্র ও আত্মার আনন্দচ্যুত। আমি বলি, 'ইন্না লাহু মাইশাতান দ্বনকান'(তার জন্য রয়েছে অনটন ক্লিষ্ট জীবন) — কথাটির মর্মার্থও এ রকম। আমি আরো বলি, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে, তখন তার কাছে সুখ দুঃখ হয়ে যায় এক বরাবর। আনন্দ ও বেদনা দু'টোই যেহেতু প্রিয়তম আল্লাহ্‌র দান, সেহেতু উভয় অবস্থাই তাদের নিকটে হয় সমান আস্বাদ্য। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, মাহবুব (প্রেমাস্পদ) প্রদত্ত কষ্ট সুখ অপেক্ষা অধিক উপভোগ্য। কারণ, সুখের আস্বাদে প্রবৃত্তির অংশগ্রহণ রয়েছে, কিন্তু দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি অপারগ। তখন কেবল জাগ্রত থাকে মাহবুবের অভিপ্রায় ও সন্তোষ। আর প্রকৃত প্রেমিক তো আল্লাহ্‌রই অভিপ্রায়ানুসারী ও সন্তোষাকাঙ্খী। তাই প্রকৃত প্রেমিক যিনি, তিনিই বিপদ মুসিবতকেই অধিক উপভোগ করেন।

মওলানা রুমী তাঁর কবিতায় লিখেছেন—

আশেকম বর লুত্ফ ওয়া বর কহরত বেজোদ
আয় আজব মান আশেকম বর হর দুজেদ

নাখোশ আয় বে খোশ বুয়াদ দর জানে মান
জাঁ ফেদায়ে ইয়ার দেলে রনজ্যনে মান।

আমি বলি, 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' সম্পর্কে এরকমও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়ভাজনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন— 'লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ্ দুন্ইয়া' (তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে সুসংবাদ)। সুরা ইউনুসের তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের অন্তরে দেয়া হয় ওই আনন্দ যা সে জান্নাতে লাভ করবে। 'তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে সুসংবাদ' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতই

রয়েছে। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কি আনন্দিত ? তারা বলবে, আনন্দিত না হওয়ার কোনো কারণই যে নেই। তুমি তো আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছো, যা আর কাউকে দাওনি। আল্লাহ্ বলবেন, এর চেয়ে বড় নেয়ামত তোমাদেরকে আজ দান করবো। তা হচ্ছে আমার সন্তোষ। আর কখনোই আমি তোমাদের উপরে অসন্তুষ্ট হবো না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। তিবরানী তাঁর 'আওসাত' পুস্তকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। এই হাদিসের মর্মকে উপলক্ষ করে জনৈক সুফী কবি বলেছেন—

এমরোজ চুঁ জামাল তু বেপরদা জাহের আস্‌ত
দর হায়রতান কেহ্ ওয়াদায়ে ফরদ্ আবরায়ে চিসত্।

শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ মোজাদ্দেদী বলেছেন, পৃথিবীতে আনন্দময় জীবন যাপন করে, সে-ই, যে অভাবী। রাজা বাদশাহ্‌রা যদি এই তত্ত্বটি জানতো তবে তাদেরকে হিংসা করতো।

একটি জটিলতাঃ পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রেমিকেরা যদি এরকম আনন্দ লাভ করে তবে তাদের ইমানের অবস্থা আবার কী রকম? ইমান তো ভয় ও আশার মধ্যবর্তীতে।

জটিলতার নিরসনঃ আল্লাহ্ প্রেমিকদের হৃদয়ও আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় থেকে শূন্য নয়। কারণ তাঁরা তো অবশ্যই ইমানদার। এই আল্লাহ্ ভীতির মধ্যেও তাঁরা প্রেমের আস্বাদ অনুভব করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ নবী-রসুলগণই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌প্রেমিক। আর আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়ও তাঁদের সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালার মর্যাদা ও মহত্ব তাদের অনুভবে সতত পরিদৃশ্যমান। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। তাই তাঁকে ভয়ও করি বেশী। সাহাবীগণের অবস্থাও ছিলো এরকম। তাঁদেরকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে বেহেশতের শুভসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রতি অত্যন্ত প্রীত, যখন তারা আপনার হস্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলো তরুতলে।' অন্যান্য আয়াতেও এরকম ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অথচ সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র ভয়ে থাকতেন শংকিত। রসুল স. এবং তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দের অবস্থা যদি এই হয়, তবে পরবর্তী সময়ের আল্লাহ্ প্রেমিকদের অবস্থা কি এর বিপরীত হতে পারে? প্রকৃত কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও আল্লাহ্‌র ভয় কখনো পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। আল্লাহ্ প্রেমিকরাই প্রকৃত আল্লাহ্‌ভীরু। আর প্রকৃত আল্লাহ্‌ভীরুরাই প্রকৃত আল্লাহ্‌প্রেমিক।

আনন্দময় বা পবিত্র জীবন কথাটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে— 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' হচ্ছে ওই জীবন, যা কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসবানদের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তাদের সবকিছুই শুভ ও সুন্দর। তারা সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর দুঃখে ধারণ করে ধৈর্য। এভাবে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাই হয় তার জন্য কল্যাণকর। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর মসনদে। হজরত সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান হজরত আনাস থেকে এবং বায়হাকী হজরত সাঈদ থেকে।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, 'হায়াতে ত্বইয়্যেবা' অর্থ জান্নাতী জীবন। আউফ বলেছেন, হাসান বসরীর অভিমতও এরকম। তিনি আরো বলেছেন, পার্থিব জীবন কখনোই জান্নাতী জীবনতুল্য পবিত্র ও আনন্দময় নয়।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৯৮

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

❑ যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহের শরণ লইবে;

কোরআন মজীদ পাঠকালে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন পাঠের পূর্বক্ষণে পাঠ করতে হবে 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম' (বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ্‌র শরণ যাচ্‌ঞা করি)। শয়তান মানুষের চিরন্তন শত্রু। সে কোরআন তেলাওয়াতের সময় তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বা ধারণা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। নবী-রসুলগণের তেলাওয়াতেও সে এরকম অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকে না। তাই কোরআন তেলাওয়াতের আগে এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা জরুরী।

এখানে 'যখন কোরআন পাঠ করবে' কথাটির অর্থ— যখন তোমরা কোরআন পাঠ করার ইচ্ছা করবে। বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই এখানে অভিপ্রায়কে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি বলা হয়েছে 'কোরআন পাঠ করবে'। এতে করে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের কামনা অন্তরে জাগ্রত হলে তা বাস্তবায়ন করাই সমীচীন।

ইব্রাহিম নাখয়ী এবং ইবনে সিরীন আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'আউজু বিল্লাহ' দোয়াটি পড়তে হবে তেলাওয়াতের পর। তেলাওয়াতের শেষে 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের আর একটি উপকার এই যে, এতে করে ইবাদত লাভ করে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা। শয়তানের অনিষ্ট থেকে এভাবে অন্যান্য সময়েও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা যায়।

বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুল স. 'আউজু বিল্লাহ্' পড়তেন কোরআন পাঠের পূর্বে। বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে একমত। তাঁরা বলেন, এরকম করা সুন্নত। আতা বলেছেন, ওয়াজিব। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতখানি উপস্থাপন করেন। এখানকার 'ইসতাইজ' আমর বা অনুজ্ঞাসূচক শব্দরূপ। অনুজ্ঞা প্রতিপালন ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। তাই কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' দোয়াটির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী হওয়া ওয়াজিব। এ রকম ধারণা অসমীচীন যে, কেবল শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে আউজুবিল্লাহ্ পড়তে হবে। বরং দোয়া পাঠ করতে হবে এজন্য যে, আল্লাহ্র রসুল এরকম করেছেন। কিন্তু প্রমাণটি যেহেতু শিথিল, তাই একে ওয়াজিব বলা যায় না।

শাস্ত্রজ্ঞগণ কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' পড়াকে ওয়াজিব বলেননি। কারণ অনেক সময় রসুল স. কোরআন পাঠের পূর্বে 'আউজুবিল্লাহ্' পড়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাই তাঁরা বলেন, কোনো কোনো সময় কোরআন পাঠের পূর্বে এরকম দোয়া পাঠ থেকে বিরত থাকা সিদ্ধ। কারণ রসুল স. এরকম করেছেন। অনেক বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. নিশীথের তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করলেন। পাঠ করলেন সুরা আল ইমরানের শেষ দশটি আয়াত। তারপর ওজু করলেন..........এভাবে হাদিসের শেষ পর্যন্ত। মুসলিমে রয়েছে, হজরত আনাস বলেন, একবার আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। হঠাৎ তিনি কেমন যেনো আনমনা হয়ে গেলেন। একটু পরেই তাঁর পবিত্র বদনে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। আমরা নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনার মৃদুহাসির কারণ জানতে পারলে আমরা কৃতার্থ হই। তিনি স. বললেন, এক্ষুণি আমার উপর অবতীর্ণ হলো একটি সুরা। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন— বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। ইন্না আ'ত্বইনা কাল কাউছার। ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিয়াকা হুওয়াল আবতার। লক্ষণীয় যে, এখানে 'আউজুবিল্লাহ্' পাঠের কথা নেই। দেখা যাচ্ছে, তিনি এখানে তেলাওয়াত শুরু করেছেন 'বিসমিল্লাহ্' পাঠের পর।

মাসআলাঃ নামাজের প্রতি রাকাতে ক্বেরাতের (কোরআন পাঠের) পূর্বে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করার বিষয়টি বেশ বিতর্কিত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বলেছেন, আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে কেবল প্রথম রাকাতের ক্বেরাতের প্রারম্ভে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রতি রাকাতের ক্বেরাতের পূর্বেই আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতে হবে। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, হাসান, আতা ও

ইবনে সিরীন বলেছেন, প্রতি রাকাতে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করা মোস্তাহাব। ইমাম মালেক বলেছেন, ফরজ নামাজে আউজুবিল্লাহ্ পাঠের প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সমর্থনে বায়যাবী লিখেছেন, শর্তসাপেক্ষ বিধান যতবার কার্যকর করা হবে, ততবারই শর্তের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। সুতরাং যতবারই ক্বেরাত পাঠের প্রয়োজন হবে, ততবারই আউজুবিল্লাহ্ পড়তে হবে, সে ক্বেরাত যে রাকাতেই হোক না কেনো। ইমাম মালেক তাঁর অভিমতের সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, আমি রসুল স. এর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছি। নামাজ পাঠ করেছি আবু বকর, ওমর ও ওসমানের পশ্চাতে। তাঁরা সকলেই উচ্চস্বরে পঠনযোগ্য নামাজগুলোতে সুরা ফাতিহা দ্বারা ক্বেরাত শুরু করতেন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা সকলে নামাজ আরাম্ভ করতেন সুরা ফাতিহা দ্বারা।

বর্ণিত হাদিস সমূহ সম্পর্কে আমরা বলি, সশব্দে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ না করাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা নীরবে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করেননি। আমাদের দলিল এই যে, রসুল স. প্রথম রাকাতে ছানা পাঠ করার পর আউজুবিল্লাহ্ পড়তেন। পরের রাকাতে এরকম করার কোনো প্রমাণ নেই। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম সূত্রে ইবনে আনাসী ও ইবনে মাজা বলেছেন, রসুল স. যখন নামাজে নিমগ্ন হতেন তখন তিনবার পাঠ করতেন— 'আল্লাহু আকবার কাবীরা'। তিনবার বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ্ কাছীরা'। এরপর তিনবার উচ্চারণ করতেন, 'সুবহানাল্লহি বুকরাতাঁও ওয়াআসিলা' এরপর বলতেন, আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 'মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠের পর তিনি স. উচ্চারণ করতেন, 'মিন্ নাফখিহী ওয়া নাফছিহী ওয়া হামজিহী' (আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে এবং তার ফুৎকার, মন্ত্র ও কুমন্ত্রণা থেকে)। হাকেমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ, হাকেম ও সুনান প্রণেতাগণ লিখেছেন, রসুল স. যখন রাতের নামাজে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর উচ্চারণের পর পাঠ করতেন— সুবহানাকাল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারা কাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গইরুক। এরপর তিনবার পড়তেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্। এরপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার পর আবৃত্তি করতেন 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম, মিনাশ শাইত্বনির রজীম মিন নাফখিহী ওয়া নাফছিহী ওয়া হামজিহী। হজরত আবু উমামা থেকে ইমাম

আহমদও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম'। কিন্তু তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত কতিপয় বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখিত হয়নি।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে খুজাইমা ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. পাঠ করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম মিন হামজিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী। ইমাম হাকেম ও বায়হাকীর বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে এই কথাটুকু— যখন তিনি নামাজে মগ্ন হতেন। হজরত আনাস থেকে ইমাম দারা কুতনীও এরকম লিখেছেন। কিন্তু তাঁর সূত্রপরম্পরাভূত বর্ণনাকারী হোসাইন বিন আলী বিন আসওয়াদ সম্পর্কে আলেমগণ সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদের 'মারাসিল' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, রসুল স. 'আউজুবিল্লাহ্' পড়তেন এভাবে— আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম।

দ্রষ্টব্যঃ হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন,' আসতাইজ বিল্লাহ্' বলাই উত্তম। লক্ষণীয় যে, এরকম বলাই আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনার অনুকূল। আর 'আউজু বিল্লাহ্'ও এমতো নির্দেশনার নিকটবর্তী। আমি বলি, অধিকাংশ উচ্চারণ বিশারদ ও আইনবেত্তাগণের অভিমত এই যে, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম দোয়াটিই সুবিদিত। এরকম আর কোনো দোয়া নেই। সা'লাবী এবং ওয়াহেদীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সম্মুখে আবৃত্তি করলাম 'আউজু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীম মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম। রসুল স. বললেন, বলো, আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম। জিবরাইল ফেরেশতা আমাকে এরকমই শিক্ষা দিয়েছেন।

আবু আমর দানী তাঁর 'আত্তা'মীর' গ্রন্থে লিখেছেন, আমি রসুল স. কর্তৃক বর্ণিত 'আউজুবিল্লাহ্' দোয়াটি শিক্ষা করেছি। কোরআন পাঠের পূর্বে আমি এই দোয়াই পাঠ করি। উচ্চস্বরবিশিষ্ট নামাজে পাঠ করি সশব্দে। উচ্চারণ বিশারদগণের কেউ এর অন্যথা করেছেন— এরকম শুনিনি। সুরাসমূহের প্রারম্ভে এরকম পাঠ করা বিধেয়। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। এর মধ্যেই রয়েছে কোরআন ও সুন্নতের অনুসরণ।

উচ্চারণ বিশারদগণের অগ্রণী ক্বারী হামযা সুরা ফাতিহার পূর্বে আউজুবিল্লাহ্ পাঠ করতেন উচ্চকণ্ঠে। অবশিষ্ট ক্বারীগণ কোরআন পাঠের প্রারম্ভে পাঠ করতেন নিম্নকণ্ঠে। পূর্বসূরী ক্বারীগণের সিদ্ধান্তও এরকম। কিন্তু ক্বারী হামযার যে উচ্চারণপদ্ধতি খল্লাদ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উচ্চকণ্ঠ ও নিম্নকণ্ঠ উভয় নিয়মই তাঁর নিকটে গ্রহণীয়। এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণতই পাঠকের

অভিপ্রায়ের উপরে। সে যেমন উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে পারবে, তেমনি পাঠ করতে পারবে নিম্নকণ্ঠে। তবে এ সম্পর্কে অন্য কোনো ক্বারীর কোনো প্রকার অভিমতের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ৯৯, ১০০

❒ উহার কোন আধিপত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা বিশ্বাস করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে।

❒ উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদিগেরই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহের শরীক করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা ইমানদার ও আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল (মুতাওয়াক্কিল) তাদের উপরে শয়তান তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদের সংরক্ষক।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাদের উপরে শয়তান স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে কখনো কখনো বিক্ষিপ্তভাবে তার সাময়িক প্রভাব পড়তেও পারে। তাই 'আউজুবিল্লাহ্' দোয়াটির মাধ্যমে তার প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ এ কারণেই আল্লাহ্‌র শরন প্রার্থনা করবে যে, তারা সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌নির্ভর। তাদের কামনা বাসনা সবকিছুই আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণরূপে সমর্পিত। তাই রসুল স. এর পূর্ণ অনুসরণই তাদের কাম্য। যেহেতু রসুল স. আউজুবিল্লাহ্ দোয়া পাঠ করতেন, সেহেতু তারা তা পাঠ করেন। এতে করে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্‌নির্ভরতার নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে — 'তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে।' একথার অর্থ, যারা শয়তানকে বন্ধু বলে জানে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে শরীক করে, কেবল তাদের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, এরকম লোকের উপরেও কিন্তু শয়তান পরিপূর্ণ ও স্থায়ীরূপে প্রভাবশীল নয়। এক আয়াতে শয়তানের বক্তব্যরূপে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে

এভাবে— 'মা কানা আলাইকুম মিন সুলতানিন ইল্লা আন দাউতুকুম' (তোমাদের উপরে আমার কোনো আধিপত্য ছিলো না। আমি তো তোমাদেরকে কেবল আহ্বান করেছিলাম। আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছিলে)।

এখানে 'হুম বিহী' (যার সাথে) কথাটির 'হী' (যার) সর্বনামটি যুক্ত হবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপরকে শরীক করে। সর্বনামটি শয়তানের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে— যারা শয়তানের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহের শরীক করে।

সুরা নাহ্‌লঃ আয়াত ১০১, ১০২

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

❒ আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি তখন তাহারা বলে, 'তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

❒ বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে জিব্‌রাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি যখন এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' একথার অর্থ, হে আমার রসুল! দেখুন, অবিশ্বাসীদের বক্তব্য কতো জঘন্য। তারা আপনাকে অযথা দোষারোপ করে। আপনাকে কোরআনের বাণী অদল বদল করার অপবাদ দেয়। প্রকৃতপক্ষে আমি তো এ রকম করি। সময় ও প্রেক্ষিতের পরিবর্তনের কারণে কখনো কখনো কোনো কোনো আয়াতের স্থলে অন্য কোনো আয়াত উপস্থিত করি। এভাবে রহিত আয়াতের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় রহিতকারী আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন, তা তিনিই ভালো জানেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।' এ কথার অর্থ— স্থান, কাল ও পাত্রভেদে

কখন কোন বিধান প্রবর্তন করা হবে, তা আল্লাহ্ই তো ভালো জানেন। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী। একমাত্র বিধান দাতা। বিধানাবলীর রহিতকরণ, পরিবর্তন ও পুনঃপ্রচলনের রহস্য তো অন্য কারো জানার কথা নয়। তাই বাস্তব কথা এই যে, অংশীবাদীদের অধিকাংশই একথা জানে না। তাই তারা আল্লাহ্র রসুলকে অযথা অপবাদ দেয়।

এখানে 'মুফতার' অর্থ আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপকারী। বাগবী লিখেছেন, মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, মোহাম্মদ তাদের সাথীদের সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করে। আজ এক বিধান জারী করে, কাল আবার তা রহিত করে দেয়। এভাবে সে আল্লাহ্র সঙ্গেও প্রতারণা করে। 'আকছারুহুম লা ইয়া'লামুন' অর্থ অধিকাংশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এ কথা জানে না। যদি রহিতকরণের রহস্য সম্পর্কে জানতো, তবে অবশ্যই একথা বলতে বাধ্য হতো যে, এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ্র বাণী। মোহাম্মদ এই কোরআনের বাহক ও প্রচারক মাত্র। এই কোরআন অদল বদল করার অধিকার তাঁর নেই।

জনৈক কবি বলেছেন—

তাবারাকাল্লহু, মা ওয়াহ্ইয়ুন বি মুকতাসাব
ওয়া নাবীয়্যুন আ'লা গইবিন বি মুত্তাহিম।

আল্লাহ্ মহান, প্রত্যাদেশ কখনো নয় অর্জিত ধন।
অদৃশ্যের বিষয়ে নবী কখনো অবিশ্বস্ত নন।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে জিবরাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণ-কারীদের জন্য।' এখানে 'রুহুল কুদুস্' (পবিত্র আত্মা) অর্থ হজরত জিবরাইল। 'নায্যালা' শব্দটির ধাতুমূল 'তানযীল'। তানযীল অর্থ ক্রমাগত অবতরণ করা। শব্দটির মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমাবতরণ যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বুঝতে হবে, ক্রমাবতরণের প্রয়োজন না থাকলে সম্পূর্ণ কোরআন অবতীর্ণ হতো এক সাথে একবারে। 'আলহাক্ব' অর্থ সত্য। 'লিইউছাব্বিতাল্ লাজীনা আমানু' কথাটির অর্থ— কোরআন মজীদ এভাবে ক্রমে ক্রমে অবতরণ করার কারণ এই যে, এতে করে যেনো বিশ্বাসীদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়। রহিত আয়াতের স্থলে নতুন আয়াত উপস্থিত হলে তারা তখন অনুধাবন করতে পারে যে, তাইতো! এরকম রহিতকরণই তো ছিলো সঙ্গত। এভাবে রহিতকরণের বিষয়টি তাদের কাছে হয়ে যায় আল্লাহ্র অপার প্রজ্ঞাময়তার একটি অনবদ্য নিদর্শন। তখন তাদের বিশ্বাসও হয়ে যায় অধিকতর বলিষ্ঠ।

আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকমও হতে পারে যে, রহিতকারী আয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা হয় বিশ্বাসীদেরকে। তারা যখন বুঝতে পারে আল্লাহ্তায়ালার কোনো কর্মই প্রজ্ঞাবিহীন নয়, তখন তাদের ইমান হয়ে যায় অধিকতর

শক্তিসম্পন্ন। 'লিলমুসলিমীন' অর্থ বিনয়াবনত, আত্মসমর্পিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি বিনয়াবনত, আত্মসমর্পিত। 'হুদান' অর্থ হেদায়েত বা পথ-নির্দেশ। এখানকার 'পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ সর্বাবস্থায় আত্মসমর্পণ-কারীদের জন্যই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য নয়।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ আমি তো জানিই তাহারা বলে, 'মুহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ'। উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষা তো আরবী নহে; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

❒ যাহারা আল্লাহের নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ পথ-নির্দেশ করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো জানিই তারা বলে, মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' মক্কার মুশরিকেরা মিথ্যা অপবাদস্বরূপ বলতো, একজন লোক মোহাম্মদকে কোরআন শিখিয়ে দেয়। সেই লোকটি কে— সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বাগবী এরকম লিখেছেন। শিথিল সূত্রে তাঁর মসনদে উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কায় অবস্থান করতো এক ভিনদেশী খৃষ্টান। সে ছিলো কর্মকার। নাম ছিলো বালআয। রসুল স. সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তার কাছে যেতেন। মক্কার অংশীবাদীরা তাকে কেন্দ্র করেই এমতো অপপ্রচার চালাতো যে, ওই লোকটি মোহাম্মদকে কোরআন শিক্ষা দেয়। ইকরামা বলেছেন, বনী মুগীরার এক ক্রীতদাসের নাম ছিলো ইয়াঈশ। সে লেখাপড়া জানতো। রসুল স. তাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। অথচ, কুরায়েশরা বলতো, ইয়াঈশই মোহাম্মদকে কোরআন শিক্ষা দেয়। ফাররা বলেছেন, হুয়াইতাব বিন আবদুল উজ্জার এক ক্রীতদাস ছিলো আমেশ। অংশীবাদীরা বলতো, আমেশই মোহাম্মদের শিক্ষক। আমেশ অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে এক সিরিয় খৃষ্টান ক্রীতদাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে উপবেশন করতেন রসুল স.। তার নাম ছিলো জবর। জনৈক বনী হাজরামীর ক্রীতদাস ছিলো সে।

সে পুস্তক পাঠ করতে পারতো। আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম হাজরামী বলেছেন, ইয়েমেনবাসী দু'জন ক্রীতদাস ছিলো আমাদের। ইয়ামান ও জবর নামের ওই ক্রীতদাসদ্বয় ছিলো পরস্পরের ভ্রাতা। তলোয়ার তৈরী করতো তারা। ক্রীতদাস ভ্রাতৃদ্বয় আবার ইঞ্জিলও অধ্যয়ন করতো। রসুল স. তাদের পাশ দিয়ে গমনকালে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে তাদের ইঞ্জিল আবৃত্তি শুনতেন। হোসাইন বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। জুহাক বলেছেন, অংশীবাদীরা যখন রসুল স.কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো, তখন তিনি স. কখনো কখনো ওই ক্রীতদাস ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বসতেন। তাদের ইঞ্জিল আবৃত্তি শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হতেন। অংশীবাদীরা তখন রটনা করতো, মোহাম্মদ তো ক্রীতদাসদ্বয়ের কাছ থেকে কোরআন শিক্ষা করে আমাদের শোনায়। তাদের ওই রটনার কথাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আমি তো জানিই তারা বলে, মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।'

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে তার ভাষাতো আরবী নয়। কিন্তু কোরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।' 'কামুস' অভিধানে রয়েছে 'লাহাজা' ও 'ইলতেহাজা' সমার্থক শব্দ। এর অর্থ ঝুঁকে পড়া বা ফিরে যাওয়া বা ইঙ্গিত করা। এভাবে বলা হয়েছে— তারা সত্য ও নির্ভরশীল কথাকে ওই লোকের বা লোক দু'টোর দিকে ফিরিয়ে দেয়।

যারা আরবী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, তাদেরকে বলে আজমী। কামুস অভিধানে রয়েছে, জাতি বা ব্যক্তি উভয় পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় 'আ'জামু' শব্দটি। যারা শ্রুতিশক্তিহীন ও আরবী কথনে অক্ষম, তাদেরকে বলে আজমী। এ কারণেই অনারবদেরকে বলা হয় আজমী, তারা আরবী ভাষায় বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে পারলেও। কোনো কোনো অভিধানবেত্তা বলেছেন, 'উজমা' শব্দটি 'ইবানত' শব্দের বিপরীত। এক কথায় বিশুদ্ধ ও সাবলীল আরবী যে বলতে পারে না, সে-ই আজমী। 'ইয়জাম' শব্দটির অর্থও বধির। যেমন বলা হয়— ইস্তায়জ্বামাতিদ্দার (গৃহ বধির হয়েছে) অর্থাৎ গৃহবাসীরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের কথার জবাব দেয়ার কেউ নেই।

'হাজা' অর্থ এই। অর্থাৎ এই কোরআন। 'মুবীন' অর্থ স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, বিশুদ্ধ। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীদের বর্ণিত অপবাদের জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। প্রতিবাদের ধারা এখানে দু'রকম। ১. যে বা যাদের কাছ থেকে রসুল স. কোরআন শিক্ষা করেন বলে তারা অপবাদ রটাতো, সে লোকেরা তো ছিলো অনারব। তাই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে— হে মক্কাবাসী! তোমরা এমতো মিথ্যাচার করো কী করে? যাদেরকে তোমরা আমার রসুলের কোরআনের শিক্ষক বলো, তাদের ভাষা তো তিনি বোঝেনই না। তোমরাও তো তা বুঝতে

পারো না। অথচ কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে বিশুদ্ধ ও সুললিত আরবী ভাষায়, যা আমার রসুল বোঝেন। তোমরাও বুঝতে পারো। এমতো সারগর্ভ ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত আরবী বাণীর শিক্ষক কি হতে পারে কোনো অনারব? ২. কোরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়টিই তার শ্রোতা ও পাঠককে হতবাক ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই কোরআন হচ্ছে 'মু'জেয' বা নিষ্ক্রিয়ক। সুতরাং কোরআন তুল্য অতুলনীয় বাণী রচনা করতে পারে কে? এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'এর অনুরূপ একটি সুরা আনো তো দেখি।' এই হুমকির মোকাবিলা কেউতো ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে করতে সক্ষম হয়নি। এতে করে কি প্রমাণিত হয়নি, কোরআন কোনো মানুষের রচনা হতেই পারে না। তাহলে তোমরা এমতো মিথ্যা অপবাদ দাও কেনো যে, মোহাম্মদ এক মানুষের কাছে কোরআন শিক্ষা করেন? আর একটি কথা এই যে, ওই অনারব লোক বা লোকেরা তো পাঠ করে ইঞ্জিল, যার ভাষা আরবী নয়। ভাবের দিক দিয়ে ইঞ্জিলও কোরআন সদৃশ। কিন্তু ওই অনারবেরা ইঞ্জিলকে আরবী ভাষায় প্রকাশই বা করবে কী করে। কারণ, কোরআনের ভাষাও তো মো'জেয(নিষ্ক্রিয়ক, অজেয় বা অক্ষমক)।

আবার এ বিষয়টিও প্রণিধাননীয় যে, আসমানী কিতাবের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যতিরেকে অন্য কেউ কি কোরআনের প্রকৃত মর্ম অন্যকে শিক্ষা দিতে পারে? ওই ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসদ্বয়ের কি সে যোগ্যতা আছে? তারা ভক্তিভরে হয়তো ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে, কিন্তু তারা তো ইঞ্জিলের সুদক্ষ ভাষ্যকার নয়। ক্রীতদাসের পক্ষে এরকম দক্ষতা অর্জনও অসম্ভব। সুতরাং ভিন্ন ভাষাভাষী এরকম সরল ও অদক্ষ ক্রীতদাসের পক্ষে আরবীতে কোরআনের মতো সর্বোৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীশোভিত বাণীসম্ভারের শিক্ষক হওয়া কি কস্মিনকালেও সম্ভব?

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পথনির্দেশ করেন না। এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' এ কথার অর্থ, যারা কোরআনের মতো কালজয়ী নিদর্শন ও অন্যান্য নিদর্শনাবলীতে আস্থাশীল নয়, তাদেরকে আল্লাহ্ কখনোই সুপথে পরিচালিত করেন না। আর তাদের এমতো অপকর্মের জন্য রয়েছে মহাযন্ত্রণাদায়ক অবশ্যম্ভাবী শাস্তি।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১০৫

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ۝

❐ যাহারা আল্লাহের নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র নিদর্শনে যারা বিশ্বাস করে না, তারাই কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারাই মিথ্যার উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী। যারা ইমানদার তাঁরা কখনোই মিথ্যাবাদী নয়। অর্থাৎ যারা রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুচর তাঁরা কখনোই মিথ্যাচারী নয়। তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরকমও হতে পারে যে— মক্কার অংশীবাদীরাই প্রকৃত মিথ্যাচারী। সুস্পষ্ট মোজেজা প্রকাশিত হবার পরও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করে চলেছে। এরকম জঘন্য মিথ্যাচারিতা আর কী হতে পারে?

অথবা 'হুমুল কাজিবুন' কথাটির অর্থ হবে— তারা মিথ্যাচারিতায় অভ্যস্ত। ধর্ম অথবা শিষ্টাচার কোনো কিছুই তাদেরকে মিথ্যাচারিতা থেকে এতটুকুও টলাতে পারে না। অথবা অর্থ হবে — তারা বলে রসুল স.কে কেউ একজন কোরআন শিক্ষা দেয়। এমতো উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মিথ্যাবাদী।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হারাজ বলেছেন, আমি একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মুমিন কি কখনো ব্যভিচার করতে পারে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এরকম কখনো হয়েও যেতে পারে। আমি বললাম, অপহরণ? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো এরকম হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা কথা? তিনি স. বললেন, অসম্ভব। আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শনে যাদের বিশ্বাস নেই, কেবল তারাই মিথ্যার উদ্ভাবক। তারাই মিথ্যাবাদী।'

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, আত্মসাৎ ও মিথ্যা ছাড়া অন্যান্য অশোভন কর্ম বিশ্বাসীদের চরিত্রে ছায়াপাত করতেও পারে। ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে। তাঁর শো'বুল ইমানে এবং ইমাম মালেকের একটি অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, বিশ্বাসী ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? তিনি স. বললেন, পারে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যয়কুণ্ঠ? তিনি স. জবাব দিলেন, তাও হতে পারে। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, মিথ্যাবাদী? তিনি স. বললেন, কখনোই নয়। আমি বলি, এখানে বিশ্বাসী বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর মহান সাহচর্যধন্য বিশ্বাসীগণকে। পরবর্তী যুগের বিশ্বাসীরা এরকম নয়। সাহাবায়ে কেরামই প্রকৃত মুমিন। পরিপূর্ণরূপে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। এই অভিমতটি ঐকমত্যসঞ্জাত। একারণেই ত্রুটিহীনভাবে যে বর্ণনার সূত্রপরম্পরা সাহাবীগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার সমালোচনা করা হয় না। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, বর্ণিত হাদিসসমূহে উল্লেখিত মুমিন অর্থ মুমিনে কামেল (পরিপূর্ণ বিশ্বাসী)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পীর আউলিয়া, যাঁরা লাভ করেছেন ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

❑ কেহ তাহার বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিলে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহের ক্রোধ এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ইমান আনয়নের পর কেউ যদি আবার কাফের হয়ে যায় এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য উন্মুক্ত করে হৃদয়ের দরজা, তার উপরে অবশ্যই আপতিত হবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রচণ্ড রোষ ও মর্মন্তুদ শাস্তি। কিন্তু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যদি কারো সত্যপ্রত্যাখ্যানসূচক মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা হয়, কিন্তু তার হৃদয়ে থাকে অক্ষয় ইমান, তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের উপলক্ষ ছিলেন হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার। মক্কার অংশীবাদীরা তাঁকে, তাঁর পিতা হজরত ইয়াসারকে, মাতা হজরত সুমাইয়াকে, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত খুবাইব ও হজরত সালেমকে অবর্ণনীয় অত্যাচারে জর্জরিত করেছিলো। হজরত সুমাইয়ার দুই পা দু'টি উটের সঙ্গে বেঁধে উট দু'টোকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলো বিপরীত দিকে। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলো তাঁর পবিত্র শরীর। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনি। এরপর তারা তাঁর স্বামী হজরত ইয়াসারকেও শহীদ করে দিয়েছিলো। এমতো মর্মবিদারক দৃশ্য দেখে তাঁদের পুত্র হজরত আম্মার মুখে উচ্চারণ করেছিলেন সত্যপ্রত্যাখ্যানসূচক উক্তি। ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— কাতাদা বলেছেন, হজরত আম্মারকে বন্দী করা হলো। নিয়ে যাওয়া হলো বনী মুগীরার ঝর্ণার পাশে। অংশীবাদীরা তাঁকে ঝর্ণার পানিতে বার বার চুবাতে চুবাতে বললো, বল, মোহাম্মদকে পরিত্যাগ করবি কি না? বাঁচতে চাইলে এক্ষুণি তাকে অস্বীকার কর। উপায়ান্তর না দেখে অংশীবাদীরা যেমনটি চেয়েছিলো, তেমনি করে তিনি মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেন রসুল স. কে। তাঁর ওই মৌখিক অস্বীকৃতি ছিলো তাঁর হৃদয়জ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন একজন গিয়ে রসুল স. কে বললো, আম্মার আপনাকে অস্বীকার করেছে। তিনি স.

বললেন, কখনোই নয়। তার আপাদমস্তক বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত। তার হৃদয় ইমানে ভরপুর। ইমান মিশে আছে তার রক্ত ও অস্থি-মজ্জার সঙ্গে। ওদিকে মৌখিক অস্বীকৃতি শুনে অংশীবাদীরা ছেড়ে দিলো হজরত আম্মারকে। পাষণ্ডদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রসুল স. সকাশে ছুটে গেলেন তিনি। তিনি স. বললেন, বলো কী অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অশুভ। আপনার প্রতি মৌখিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছি আমি। দুশমনেরা যেভাবে চেয়েছিলো, সেভাবে আমি আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছি অসমীচীন উক্তি। রসুল স. বললেন, সে সময় তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিলো? তিনি বললেন, মনতো ছিলো ইমানের আনন্দে প্রশান্ত। রসুল স. বললেন, তাহলে আর চিন্তা কেনো। আবার যদি তারা তোমার উপর এরকম বল প্রয়োগ করে, তবে মৌখিকভাবে তুমিও এরকম উচ্চারণ কোরো। এতে করে তোমার কোনো দোষ হবে না। রসুল স. এর এমতো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সা'লাবী এবং ওয়াকেদীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হজরত ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. যখন মদীনায় হিজরত করার পরিকল্পনা করলেন, তখন অংশীবাদীরা বন্দী করলো হজরত বেলাল, হজরত খুবাইব ও হজরত আম্মারকে। অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগলো তাদের উপরে। তাদের ওই অবর্ণনীয় জুলুম থেকে বাঁচবার জন্য হজরত আম্মার মৌখিকভাবে প্রকাশ করলেন ইমান বিরোধী উক্তি। ফলে তারা তাঁকে ছেড়ে দিলো। তিনি তখন রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। রসুল স. বললেন, সে সময় তোমার মনের অবস্থা ছিলো কেমন? তিনি বললেন, ইমানের প্রশান্তিতে প্রশান্ত। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বাগবী লিখেছেন, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতরণের উপলক্ষ ছিলেন কিছুসংখ্যক বন্দী সাহাবী। মক্কায় বন্দী ওই সকল সাহাবীর নিকট মদীনার কতিপয় মুসলমান এইমর্মে পত্র লিখলেন যে, সত্বর মদীনায় চলে এসো। অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের সমাজভূত করবো না। এরকম চিঠি পেয়ে মুসলমানদের একটি দল মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। তার আগেই অংশীবাদীরা তাদেরকে ধরে ফেললো। তখন তাঁরা আত্মরক্ষার নিমিত্তে বাধ্য হয়ে তাদের মনের বিরুদ্ধে ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দিলেন।

বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, আমের বিন হাজরামীর ক্রীতদাস জিবর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তাঁর মনিব বল প্রয়োগ করেছিলো তাঁর উপর। তাই তিনি বাধ্য হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন কুফরী বাক্য। বাগবী আরো লিখেছেন, পরবর্তী সময়ে তাঁর মনিবও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন এবং জিবরকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছিলেন মদীনায়।

ইমানের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করার অর্থ ধর্মের বিশ্বাসগত দিকটিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখা। এতে করে আর একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, হৃদয়ে সত্য উপলব্ধি ইমানের একটি অপরিহার্য স্তম্ভ। হৃদয়জ বিশ্বাস ব্যতীত কেবল মৌখিক সাক্ষ্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে গ্রহণীয় নয়। অপরদিকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুখ রাখার অর্থ আন্তরিকতার সঙ্গে কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকে স্বীকার করে নেয়া।

বলপ্রয়োগ কীঃ কাউকে তার মনের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলা বা করতে বাধ্য করার নাম 'ইকরাহ্' বা বলপ্রয়োগ। বল প্রয়োগের অবস্থা হতে পারে দু'রকমের। ১. কাউকে তার মনের বিরুদ্ধে এমন কিছু করতে বলা, যা না করলে তাকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আবার করলে তার কোনো শাস্তি নেই। ২. এরকম শর্ত ছাড়াই তার হাত পা কর্তন করা অথবা হত্যা করা। প্রথম অবস্থায় যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয় তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে মনের বিরুদ্ধে কাজ করে সে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সে সুযোগ নেই। উভয় অবস্থায় বলপ্রয়োগকারীর দণ্ড দানের ক্ষমতা থাকতে হবে। যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, তারও একথা জানতে হবে যে, বলপ্রয়োগকারী দণ্ডদান করতে সক্ষম। প্রথম প্রকারের বলপ্রয়োগ সাধারণতঃ প্রযোজ্য হয় ক্রয়-বিক্রয়, দায়-দেনা, বন্ধক ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় বল-প্রয়োগকারী কখনো যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তার আরোপিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া সিদ্ধ। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে তার চুক্তি বাতিল অথবা বহাল দু'টোই করতে পারে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অসিদ্ধ। চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় মতৈক্যে উপনীত হওয়াই সমীচীন। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন— 'ইল্লা আন্‌তাকুনা তিজ্বারাতীন আন তারদ্বিম মিনকুম' (হ্যাঁ, সেটা বাণিজ্যিক, তোমাদের মতৈক্যে)। অর্থাৎ যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, কৃত চুক্তিতে তার আন্তরিক সায় থাকে না। সে কারণেই ব্যবসা ও অন্যান্য লেনদেনের বেলায় বলপ্রয়োগ অসমীচীন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, শেষোক্ত প্রকারের বলপ্রয়োগের কথা। এরকম বলপ্রয়োগের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর আশংকা। অর্থাৎ এমতাবস্থায় বলপ্রয়োগকারীর কথা না শুনলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই আলেমগণের ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, এমতোক্ষেত্রে যার উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে কুফরী বাণী উচ্চারণ করতে পারবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তখনও অন্তরে থাকতে হবে ইমানের সুদৃঢ় ও প্রশান্ত উপস্থিতি। হজরত আম্মারের ঘটনা ও তাঁকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ আলোচ্য আয়াতটিই এর প্রমাণ। হজরত আম্মার তখন ছিলেন নিরুপায়। জীবনরক্ষার বিষয়টিই ছিলো তাঁর ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। তাই মৌখিক স্বীকৃতির কারণে তাঁকে অমুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়নি। প্রয়োগ

করা হয়নি ধর্মত্যাগের দণ্ড। ঘটানো হয়নি বিবাহ বিচ্ছেদও। তবে এরকম সঙ্গিন অবস্থাতেও সত্যকে সমুন্নত রাখা অধিকতর উত্তম। কারণ এভাবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। হজরত আম্মারের মাতা-পিতা এরকমই করেছিলেন। এভাবে আরো জীবন দিয়েছিলেন হজরত খুবাইব, হজরত জায়েদ, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন তারেক প্রমুখ।

রসুল স. এর জীবনী রচনাকারীগণ এক যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনাকালে লিখেছেন, হজরত খুবাইবকে বধ করার পূর্বে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেন, হজরত খুবাইবই প্রথমে মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে নামাজ পাঠের প্রথার উদ্ভাবক। নামাজ পাঠ শেষ হলে তাঁকে বাঁধা হলো একটি তক্তার সঙ্গে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো মদীনামুখী করে। বলা হলো, ইসলাম পরিত্যাগ করো, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হজরত খুবাইব জবাব দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! সারা বিশ্বের ধনসম্পদের বিনিময়েও তো আমি ইসলাম পরিত্যাগ করবো না। অংশীবাদীরা বললো, তুমি কি পছন্দ করো না যে, মোহাম্মদ তোমার স্থলাভিষিক্ত হোক, আর তুমি মুক্ত হয়ে ফিরে যাও স্বগৃহে। তিনি বললেন, আমি তো আমার প্রিয়তম রসুলের মহান চরণে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কষ্টও সহ্য করতে পারি না। তাঁর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক আর আমি মুক্ত হয়ে স্বগৃহে ফিরে যাই, এমতো কল্পনাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তারা বললো, খুবাইব! ইসলাম পরিত্যাগ করো। নিষ্কৃতি পাবে। তিনি বললেন, কখনো নয়। তারা বললো, ইসলাম পরিত্যাগ না করলে আমরা তোমাকে হত্যা করবো। তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জীবনপাত তো সর্বোচ্চ সৌভাগ্য।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পূর্বক্ষণে হজরত খুবাইব কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তার মধ্যে দু'টো কবিতা ছিলো এরকম—

যদি আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, তবে আমার কোনোই পরোয়া নেই। আমি এতোটুকুও চিন্তা করবো না যে, কোন পাশে আমি পতিত হলাম। আমার এই জীবন দান কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে। যদি আমার আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আমার মরদেহের প্রতিটি অণুপরমাণুতে তিনি বরকত দান করবেন।

ইবনে উকবা বলেছেন, হজরত খুবাইব ও হজরত জায়েদ একই দিনে পান করেছিলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। দূরে মদীনায় উপবিষ্ট রসুল স. তখন উচ্চারণ করেছিলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (তোমাদের প্রতি শান্তি, কেবলই শান্তি)। তাঁর সহচরবৃন্দ স্বকর্ণে শুনেছিলেন শহীদদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ওই অভিবাদনের পবিত্র উচ্চারণ।

অপরিণত সূত্রে হাসান বসরী থেকে ইবনে আবী শায়বার এক বর্ণনায় এবং আবদুর রাজ্জাকের তাফসীরে এসেছে, একবার দু'জন সাহাবীকে বন্দী করলো নবী নামের ভণ্ড মুসায়লামা। একজন একজন করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো তাদেরকে। প্রথম জনকে বললো, মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তিনি বললেন, তিনি তো আল্লাহ্‌র রসুল। মুসাইলামা বললো, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? তিনি বললেন, তুমিও। এরপর মুসায়লামা দ্বিতীয় জনকে ডেকে এনে বললেন, বলো, মোহাম্মদ সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী? তিনি বললেন, তিনি তো আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। মুসাইলামা বললো, আর আমি? তিনি বললেন, আমি বোবা। মুসায়লামা এরকম প্রশ্ন করলো তিনবার। তিনিও তিনবার জবাব দিলেন, আমি বোবা। এরপর মুসায়লামা তাঁকে হত্যা করলো। সংবাদ পৌঁছে গেলো মদীনায়। রসুল স. প্রথম জন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে তো আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমোদনকে অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে বললেন, সে তো সমুন্নত করেছে সত্যকে। তার জন্য সাধুবাদ।

মাসআলাঃ যদি কোনো মুসলমানের সম্পদহানির জন্য কাউকে বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে সে সম্পদহানি করতে পারবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন জীবন রক্ষার জন্য অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করতে পারে, এ বিষয়টিও তেমনি। এমতাবস্থায় যার সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে, সে বলপ্রয়োগকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে নয়। কারণ এরকম অবস্থায় সে অস্ত্রধারীর হস্তধৃত অস্ত্রের মতো। ক্ষতিপূরণ তো অস্ত্রধারীর নিকট থেকেই আদায় করতে হয়। অস্ত্রের নিকট থেকে নয়।

মাসআলাঃ যদি বলপ্রয়োগের ফলে কেউ মদ অথবা মৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়, তবে তাতে দোষ নেই। ঐকমত্যানুসারে এরকম করা সিদ্ধ। যদি কেউ এমতাবস্থায় মদ ও মড়া ভক্ষণ না করে জীবন বিসর্জন দেয়, তবে তা সিদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এরকম অবস্থায় হারাম বস্তু পান বা ভক্ষণ করা ওয়াজিব। প্রাণ বিসর্জন সিদ্ধ নয়। প্রাণ রক্ষার জন্য হালাল বস্তু ভক্ষণ যেমন ওয়াজিব, তেমনি ওয়াজিব হারাম ভক্ষণ। এমতাবস্থায় পানাহার না করে মৃত্যুবরণ করা পাপ। আর হারাম পানাহারের জন্য এমতো ক্ষেত্রে গোনাহ্‌গার হবে বল-প্রয়োগকারী। ইমাম ইউসুফ বলেন, এমতাবস্থায় হারাম ভক্ষণে অস্বীকৃত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করাতে পাপ নেই। বিশুদ্ধ সূত্রানুসারে ইমাম শাফেয়ীর মতও এরকম। তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে মদ্য পান ও পরিত্যাগ দু'টোই অনুমোদিত। কিন্তু তা মোবাহ্ (সিদ্ধ) নয়। কারণ মদ্যপান কোনোক্রমেই সিদ্ধ হতে পারে না। মদ্যপান যে হারাম, এই বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে যদি সে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, বিধানটি রুখসত বা শিথিল নয়, বরং শরিয়ত সমর্থিত। সঙ্গিন পরিস্থিতিতে মৃত জন্তুর গোশতও জবেহকৃত বস্তুর মতো বৈধ। কোরআনের বিধানে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে— ইল্লা মাদ্বতুরির তুম ইলাইহি (কিন্তু তোমরা যখন নিরুপায় পরিস্থিতির শিকার হও)। এখানে নিরুপায় বা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধারণ বা স্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে পৃথক করা হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, স্বাভাবিক অবস্থার নিষিদ্ধতা অস্বাভাবিক অবস্থায় সমর্থনযোগ্য। এটা রুখসত বা সহজসাধ্য আমল নয়। তবে হ্যাঁ, অপরের সম্পদ ভক্ষণের বিষয়টি আলাদা। বলপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্যের সম্পদ ভক্ষণে অস্বীকৃত হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে বলা হবে মাজুর বা অক্ষম। এটা ঐকমত্যসম্মত। কারণ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপণ সর্বাবস্থায় অবৈধ। কেবল পানাহারের বিষয়টি রুখসত বা সহজসাধ্য বিধানভূত। কিন্তু পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা দূরীভূত হলে রুখসতের বিধানটি বিলুপ্ত হবে। বিধানের মৌলকত্ব সর্বাবস্থায় অটুটই থাকে।

উল্লেখ্য যে, বল প্রয়োগের বিধানটিও অটুট। এমতাবস্থায় যেনো একই সঙ্গে একই বস্তু মোবাহ ও ফরজ। পুনরায় একই বস্তু আবার নিষিদ্ধও হয়ে যায়। তাই এমতোক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা একটি নীতি নির্ধারণ করেছেন। নীতিটি এরকম— যে সকল ব্যবহারিক বিধান শব্দনির্ভর, সে সকল বিধান বলপ্রয়োগের সময়ও কার্যকর থাকবে। এ ধরনের ব্যবহারিক বিধান দশটি। যেমন— বিবাহ, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, ইলা (শপথ), ফাই, জেহার, ক্রীতদাস মুক্তি, হত্যাদণ্ডের ক্ষমা, সাধারণ শপথ ও মানত। এসকল বিধান শব্দনির্ভর। মনের সমর্থন নির্ভর নয়। মুখে উচ্চারণ করলেই এসকল বিধান কার্যকর হয়। যেমন মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয় বিবাহ। মুখে ক্রীতদাস মুক্তির ঘোষণা দিলেই ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যায় ইত্যাদি। সুতরাং কেউ যদি বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাস মুক্তি ও হত্যাদণ্ডের ক্ষমার স্বীকৃতি দেয়, তবুও তা কার্যকর হবে। ইমাম শা'বী, ইব্রাহিম নাখয়ী ও সুফিয়ান সওরীর অভিমতও এরকম।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেন, বলপ্রয়োগিত ব্যবহারিক বিধান কার্যকর করা যাবে না। উম্মতজননী আয়েশা বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বাধ্যগত অবস্থায় তালাক ও ক্রীতদাস মুক্তির ঘোষণা কার্যকর হবে না। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, ইবনে জাওজী, আবু ইয়ালী ও বায়হাকী। সুফিয়া বিনতে ওসমানের পদ্ধতিতে শায়বা থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। হাকেম এই সূত্রপরম্পরাটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই সুত্রপরম্পরাসংযুক্ত মোহাম্মদ বিন উবাইদ মক্কীকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আবু হাতেম রাজী।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, 'আগ্লাক্ব' (অবরুদ্ধ) শব্দটির প্রকৃত অর্থ—'ইক্‌রাহ্' বা বলপ্রয়োগিত। যেমন, 'আগলাক্বতুল বাব্' অর্থ আমি দরজা বন্ধ করেছি। অবরোধকারী অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ করে রাখে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আগলাক্ব' অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ। আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে এরকম ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম আহমদও শব্দটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এরকম অর্থ অযথার্থ। ইবনে উসায়েদ এটাকে সমর্থন করেননি। বরং তিনি এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'আগ্লাক্ব' অর্থ যদি ক্রোধ হয়, তবে কোনো তালাকই কার্যকর হবে না। কারণ তালাক সাধারণতঃ ক্রোধের অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকে। হাসান বসরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্রটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দিয়েছেন। আর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তোমরা যা করতে বাধ্য হও, তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে জাওজী সূত্রে। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা মূল দাবিটি প্রমাণিত হয় না। কেবল এতোটুকুই প্রমাণিত হয় যে, বল প্রয়োগিত অবস্থায় যে পাপ সংঘটিত হয়, আল্লাহ্পাক তা উপেক্ষা করেন। কিন্তু এতে করে ব্যবহারিক জীবনে বিধান কার্যকর হবে না, এরকম কথাতো এখানে নেই। এই হাদিসের সমর্থক আর একটি হাদিস হজরত ছাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের উপর থেকে ভ্রমজনিত শাস্তি অপসারিত করা হয়েছে। ওই কর্মের শাস্তিও, যা আমার উম্মতেরা করে নিরুপায় হয়ে। হজরত আবু দারদা থেকেও অনুরূপ হাদিস এসেছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার হাদিস দু'টোর সূত্রপরম্পরাকে শিথিল বলেছেন। এই বিষয়ে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের হাদিসকে আওজায়ীর উদ্ধৃতিতে হজরত ইবনে আব্বাসের সংশ্লিষ্টতায় উল্লেখ করেছেন ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, দারা কুতনী, বায়হাকী ও হাকেম। কিন্তু সূত্রপরম্পরা বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনাগুলোকে বলেছেন অদৃঢ়। এ সম্পর্কে হজরত আবু জর থেকে ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত সূত্রপ্রবাহভূত শহর বিন হাওশবও রয়েছেন। তাই সূত্রটি বিতর্কিত। হাদিসটিকে যদি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত বলে মেনে নেয়াও যায়, তবুও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের সমর্থনে এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করলে তা হবে ভুল। 'ভুলক্রটির শাস্তি অপসারিত করা হয়েছে' এ কথার অর্থ কখনোই এরকম নয় যে, এই উম্মতের ভুলক্রটি হবেই না। কারণ বিষয়টি বাস্তবোচিত নয়। বরং বলা যেতে পারে, কথাটির অর্থ হতে পারে তিন রকমের— ১. আখেরাতে তাদের ক্রটিবিচ্যুতির হিসাব হবে না। কারণ আল্লাহ্পাক তা পূর্বাহ্নে মাফ করে দিয়েছেন। এটাই বিশুদ্ধ অর্থ। ২. ভুল-ভ্রান্তির সাধারণ অর্থ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু একথাটি ঠিক নয়।

৩.প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও ভুলভ্রান্তিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এটাও ঐকমত্যবিরোধী। অতএব সর্বসম্মত অভিমত এই যে, এই উম্মতের বিচ্যুতিজনিত আখেরাতের শাস্তিটুকুই কেবল রহিত করা হয়েছে। জাগতিক শাস্তির কথা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এরকম বলেছেন ইবনে হুম্মাম।

আল্লামা ইবনে জাওজী শাফেয়ী অভিমতের পোষকতায় হজরত ওমরের একটি সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন এ রকম— তাঁর খেলাফতের সময় একদিন এক লোক আরোহণ করলো একটি পর্বত শিখরে। এর আগেই পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো তার স্ত্রী। সে বললো, এক্ষুণি আমাকে তিন তালাক দাও। নয়তো আমি এখান থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে তোমাকে বধ করবো। লোকটি তার স্ত্রীকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শন করে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার স্ত্রী তার কথা কানেই তুললো না। বার বার বলতে লাগলো, হয় তালাক দাও, না হয় আমি তোমাকে হত্যা করবো। লোকটি তখন বাধ্য হয়ে তাকে তিন তালাক দিলো। পরে বিষয়টি হজরত ওমরের নিকটে উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, তালাক হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটে গমন করতে পারো।

ইমাম আবু হানিফাও তাঁর অভিমতের সমর্থনে কতকগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা থেকে। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উপহাসার্থে বলা হলেও— বিবাহ, তালাক এবং তালাক প্রত্যাহার। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, আহমদ, হাকেম, দারা কুতনী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত এবং হাকেম বলেছেন, বিশুদ্ধসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত আতা বিন উজলান পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। ইবনে হাজার লিখেছেন, ইবনে জাওজী এ ব্যাপারে প্রমাদমুক্ত নন। তিনি অবশ্য আতাকে আতা বিন উজলান ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আতার পিতার নাম আবী রিবাহ্। আর আতা বিন আবী রিবাহ্ একজন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী হিসেবে সুপরিচিত। আবু দাউদের বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে। হাকেমও এরকম বলেছেন। তবে এই সূত্রপ্রবাহভূত আবদুর রহমান বিন যোবায়ের সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম নাসাঈ তাঁকে পরিত্যক্ত বলেছেন। আবার অপরাপর বিদ্বজ্জন তাঁকে অভিহিত করেছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীরূপে। এমতো মতপ্রভেদের কারণে আমরা হাদিসটিকে বলি উত্তমসূত্রবিশিষ্ট।

একটি সন্দেহঃ শরিয়ত অনুসারে ব্যবহারিক বিষয়ে ব্যবহারকারীকে হতে হয় অধিকারসম্পন্ন। তাই উপহাসচ্ছলে কেউ তালাক প্রদান করলে তা কার্যকর হবে। কারণ বিষয়টি তার অধিকারভূত, যদিও সে তালাক কার্যকর করার ব্যাপারে সম্মত

না হয়। এমতো ক্ষেত্রে মনের কথা ধর্তব্য নয়। কিন্তু বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রটি ভিন্ন। কারণ বলপ্রয়োগের অবস্থায় তার নিজস্ব অধিকার বলে কিছু থাকে না। তাহলে বলপ্রয়োগিত অবস্থার তালাক উপহাসচ্ছলে প্রদত্ত তালাকের মতো কীভাবে হয়?

সন্দেহের অপনোদনঃ আমরা বলি, যার উপরে বলপ্রয়োগ করা হয়, সে তো অধিকারসম্পন্ন। অন্ততঃ মতামত ব্যক্ত করার অধিকার তো তার রয়েছে। উপহাসচ্ছলে তালাক প্রদাতার মতো সে-ও তার কথার পরিণাম সম্পর্কে জানে। আর সে এ কথাও ভালোভাবে জানে যে, বলপ্রয়োগকারীর বিরোধিতা তার জন্য বয়ে আনবে অসহ্য যন্ত্রণা। আবার তালাক দেয়ার ব্যাপারটিও তার জন্য কম দুঃখজনক নয়। এমতাবস্থায় জেনে শুনে তাকে যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত বেছে নিতে হয়। তখন সে যে সিদ্ধান্তটিকে সহজ মনে করে, তাই করে। একারণেই বল প্রয়োগের তালাক অবশ্যই কার্যকর ।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, তালাকের বিধান অকার্যকর করার ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেয়া যেতে পারে। ঘটনাটি এই— হজরত হুযায়ফা ও তাঁর পিতার নিকট থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলো কাফেরেরা। রসুল স. তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন, আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে কৃত অংগীকার পূরণ করবো। সেই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্যও কামনা করবো। রসুল স. এর এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বেচ্ছাকৃত ও বলপ্রয়োগিত শপথ সমগুরুত্ব-সম্পন্ন। অর্থাৎ শপথ যেভাবেই করা হোক না কেনো, তা কার্যকর করতে হবে। যে বিধান কেবল উচ্চারণনির্ভর, বলপ্রয়োগ তাকে অকার্যকর করতে পারে না। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি এরকম নয়। এরকম চুক্তি কার্যকর করার জন্য বাক্য অথবা বাক্যের সমপর্যায়ের কিছু অত্যাবশ্যক। তদুপরি তা মনের সমর্থনপুষ্ট হওয়াও বাঞ্ছনীয়। বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু মনের সমর্থন ধর্তব্য নয়।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে আরো একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হাদিসটি এই— হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কেবল জ্ঞানহীন ও উন্মাদের তালাক ব্যতীত অন্য সকল তালাক কার্যকর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি কেবল ইকরামা বিন খালেদের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আমার নিকটে উপনীত হয়েছে। এদিকে আবার ইকরামা থেকে আতা বিন ওজলানের বর্ণনাসূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আতা বিন ওজলান একজন বিতর্কাহত বর্ণনাকারী। তাই তার সূত্রপরম্পরাকে অগ্রাহ্য ভেবে আমি তা পরিত্যাগ করেছি।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থনে রয়েছে সাফওয়ান বিন আসেমের বর্ণনাকৃত আরো একটি হাদিস। জনৈক সাহাবী থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, এক লোক তার পত্নীর পাশে নিদ্রিত ছিলো। এমতাবস্থায় তার পত্নী একটি ছুরি তার কণ্ঠনালীতে রেখে বলে উঠলো, আমাকে তালাক দাও। নয়তো এক্ষুণি তোমাকে

জবাই করবো। লোকটি তাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিলো। কিন্তু তার পত্নী সেদিকে কর্ণপাতই করলো না। শেষে বাধ্য হয়ে লোকটি তাকে তিন তালাক দিলো। বিষয়টি রসুল স. সকাশে উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তালাকের ব্যাপারে কোনো মধ্যাহ্ন বিশ্রাম নেই।

ইবনে জাওজীর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম বোখারী বলেছেন, জবরদস্তিমূলক তালাকের ক্ষেত্রে সাফওয়ান বিন আসেমের হাদিসটি অগ্রাহ্য। ইবনে হুম্মামের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, চারটি বিষয় অবোধ্য, অসমাধ্য। এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাস মুক্তি ও সদ্‌কা— এই চারটি বিধান বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়।

আমি বলি, প্রকাশ্যতঃ এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার দলিলপ্রমাণগুলো অধিকতর বলিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। এসম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব পরিদৃষ্ট হয়, তবে অনিবার্যরূপে অগ্রসর হতে হবে কিয়াসের দিকে। আর কিয়াসের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, তালাক, দাসমুক্তি, ইত্যাদি জবরদস্তি অবস্থাতেও কার্যকর হবে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১০৭, ১০৮, ১০৯

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○ لَا جَرَمَ
اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

❒ ইহা এই জন্য যে, তাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না।

❒ উহারাই তাহারা, আল্লাহ্ যাহাদিগের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই অনবধান।

❒ নিশ্চয়ই উহারা পরলোকে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা এ কারণে পথপ্রদর্শন করেন না যে, তারা আখেরাত অপেক্ষা দুনিয়াকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আবার এ কারণেও সুপথ দেখান না যে, তাদেরকে পথ-নির্দেশ করা তাঁর অভিপ্রায় নয়। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের দু'টি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্রকাশ্য এবং

আর একটি অন্তর্নিহিত। প্রকাশ্য কারণটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকেই তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্পাকের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখেনি। আর অন্তর্নিহিত কারণটি হচ্ছে— আল্লাহ্পাকও চান না যে তারা পথপ্রাপ্ত হোক। এতে করে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অবস্থান সামর্থ্য ও বলপ্রয়োগের মাঝামাঝি। অর্থাৎ মানুষ তার কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন যেমন নয়, তেমনি নয় পুরোপুরি বাধ্যগত।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'ওরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই অনবধান।' একথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অন্তর মোহরাঙ্কিত থাকার কারণেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যকে সত্য বলে অনুধাবন করতে পারে না। আর মোহরাবদ্ধ শ্রুতির কারণে শুনতে পায় না সত্যের আহ্বান। আবার তাদের দৃষ্টি মোহরাচ্ছাদিত বলেই তারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর দর্শন থেকে রয়ে যায় চিরবঞ্চিত। সুতরাং তারা চিরউদাসীন, চিরভ্রষ্ট।

এর পরের আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তারা পরলোকে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের জীবনকে করেছে বিশ্বাসবিহীন, পুণ্যকর্মহীন। এমতো অপকর্ম তাদের চিরস্থায়ী অগ্নিবাসকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তারা অনুধাবন করতে পারেনি যে, বিশ্বাসহীন নিষ্ফলা জীবন কখনো আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা পাপী হলেও তাদের জীবন এরকম নয়। কারণ তারা সফলতার মূল অবলম্বন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এ কারণেই তাদের পরিত্রাণ অনিবার্য। দুনিয়ায় অথবা আখেরাতে তাদের কৃত পাপের শাস্তি যদি তারা পায়ও, তবে তাদের সে শাস্তি হবে সাময়িক। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো চিরস্থায়ী নয়।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১১০

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

❐ যাহারা নির্যাতিত হইবার পর দেশত্যাগ করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাহাদিগের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে 'ছুম্মা' (অনন্তর বা অতঃপর) শব্দটি। ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে কাফের মুশরিকদের প্রসঙ্গ। ইমানদারগণের প্রসঙ্গ

সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত। তাই 'ছুম্মা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অনন্তর যারা নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগ করে, পরে জেহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।'

এখানে 'ফাতিনু' কথাটির অর্থ নির্যাতিত, ইসলাম গ্রহণের কারণে চরমভাবে অত্যাচারিত। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে কুবরা গ্রন্থে লিখেছেন, আমের বিন হাকেম বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের কারণে হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে অকথ্য ক্লেশ দেয়া হতো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। জ্ঞান ফিরে পেলেও হারিয়ে ফেলতেন বোধশক্তি। ভেবে পেতেন না কী করবেন বা কী বলবেন। হজরত সুহাইব, হজরত আবু ফুকাইহা, হজরত বেলাল, হজরত আম্মার বিন ফুহাইর প্রমুখের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ছিলেন, আবু জেহেলের দুধভাই আয়াশ বিন আবী রবীয়া, আবু জানদাল বিন সুহাইল বিন আমর, ওলীদ বিন মুগীরা, সালমা বিন হিশাম এবং ওবায়দুল্লাহ্ বিন উসায়েদ সাক্বাফী। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাঁরা তখন এমন কথা উচ্চারণ করতেন, যাতে মুশরিকেরা খুশী হয়ে যেতো। একসময় আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের উপরে বিশেষ করুণা বর্ষণ করলেন। তাঁরা হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জেহাদে অংশগ্রহণ করলেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে। তখন ওই সকল সাহাবীদের প্রতি শুভসংবাদ জানিয়ে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাসান বসরী ও ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সাররাহ সম্পর্কে। তিনি ছিলেন রসুল স. এর সচিব। কিন্তু হঠাৎ সে বিভ্রান্ত হয়ে রসুল স. এর পবিত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করে। অন্যত্র গমন ক'রে গ্রহণ করে খৃষ্টধর্ম। মক্কা বিজয়ের পর রসুল স. ওই ধর্মত্যাগীকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। সে ছিলো আবার হজরত ওসমানের বৈপিত্রেয় ভাই। অবস্থা বেগতিক দেখে সে হজরত ওসমানের আশ্রয় যাচ্‌ঞা করে। হজরত ওসমান তার জন্য রসুল স. এর দরবারে সুপারিশ করেন। রসুল স. তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং হত্যার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। আবদুল্লাহ্ এবার মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি ইসলামের প্রতি ছিলেন অকুণ্ঠ বিশ্বাসী।

ক্বারী ইবনে আমর এখানকার 'ফাতিনু' কথাটিকে পড়তেন 'ফাতানু'। এরকম উচ্চারণ করলে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দাঁড়াবে এরকম— তারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানকে যাতনা দেয়ার পর পুনরায় ইমান গ্রহণ করে দেশত্যাগ

করেছিলো ও ধৈর্য ধারণ করেছিলো। এরকম অর্থের মাধ্যমে একথাই স্থিরীকৃত হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিলেন আমের ও তাঁর ক্রীতদাস জিবর। জিবর ইসলাম গ্রহণ করলে আমের তাঁর উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করেছিলো। অত্যাচারের মাত্রা এতো চরমে উঠলো যে, জিবর প্রকাশ্যে ধর্মত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন। কিছুদিন পর আমের নিজেই মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং জিবরকে সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন মদীনায়। এরপর রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হয়ে অংশ গ্রহণ করলেন বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধে। আল্লাহ্‌র পথে সহ্য করলেন অনেক ক্লেশ ও যাতনা।

'মিম বা'দিহা' অর্থ এই সবের পর। অর্থাৎ ইমান, হিজরত, জেহাদ ও ধৈর্য ধারণের পর তাদের উপরে অবশ্যই আপতিত হয়েছে পরিপূর্ণ ক্ষমা ও অশেষ দয়া।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১১

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

❒ স্মরণ কর সেইদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিয়া আসিবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

মহাবিচারের দিনে মানুষের দুর্ভাবনা ও পরিত্রাণ চিন্তা কতো প্রবল হবে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! সেই ভয়াবহ মহাদিবসের কথা স্মরণ করুন, যেদিন নিজের পরিত্রাণ চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কে ঠাঁই পাবে না। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কেউই অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। সকলেই হবে ভীত; চিন্তিত। অবিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের মহান প্রভুপালক! আমাদের সমাজপতিরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। আমরা বিনা বিচারে তাদের কথা মান্য করে মহাপরাধ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হোক। পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক। এবার আর আমরা ভুল করবোই না। জীবন যাপন করবো তোমার আজ্ঞানুসারে। বিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর প্রভুপালক! আমরা নিরাপত্তা চাই। আমাদেরকে তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না।

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, হজরত মুয়াজ বলেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মহাবিচারের দিন জাহান্নামকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি স. বললেন, পৃথিবীর সপ্তম স্তর থেকে। জাহান্নামের রয়েছে একহাজার লাগাম। প্রতিটি লাগাম ধরে টানবে এক হাজার করে ফেরেশতা। মানুষের অবস্থান থেকে এক হাজার বৎসর পথের সমদূরত্বে জাহান্নামকে আনা হলে সে একটি নিঃশ্বাস ছাড়বে। ওই নিঃশ্বাসের ভয়াবহ আওয়াজের প্রভাব থেকে নবী-রসুল ফেরেশতা কেউই বাদ যাবে না। সকলেই তখন নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাবে, ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি। হে আমার মহাদয়ার্দ্র প্রভুপালনকর্তা। বাঁচাও! বাঁচাও!'

বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত ওমর হজরত কা'ব আহবারকে বললেন, আমাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করো। হজরত কা'ব বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অগ্রনায়ক! যার আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আপনি যদি সত্তর জন নবীর সমতুল্য পুণ্যকর্ম নিয়ে মহাবিচারের ময়দানে উপস্থিত হন, তবুও আপনি সেদিন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকবেন। আত্মপরিত্রাণ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই তখন আপনার মাথায় ঢুকবে না। দোজখ তখন এমন ভাবে ফুঁসতে থাকবে যে, ফেরেশতা এবং মহামর্যাদাশালী নবী-রসুলগণও হাঁটুমুড়ে বসে কাতরস্বরে কেবলই উচ্চারণ করতে থাকবেন, ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! এমনকি আল্লাহ্‌র বন্ধু হজরত ইব্রাহিমও তখন বলে উঠবেন, হে চিরঅমুখাপেক্ষী প্রভুপালনকর্তা! আমি আমার নিজের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌তায়ালাও সেদিনের মহাভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে— সেদিনকে যেদিন আত্মসমর্থনের যুক্তি করে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি....(আলোচ্য আয়াত)।

ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে জনগণ লিপ্ত হবে তীব্র বিতণ্ডায়। এমনকি দেহ ও আত্মার মধ্যেও তখন সম্পর্ক হবে অহিনকুল সদৃশ। আত্মা বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমার তো হাত ছিলো না, যদ্দারা আমি কোনো কিছু করি। পা-ও ছিলো না, যদ্দারা চলি। ছিলো না চোখ, যদ্দারা দেখি (কাজেই আমার কোনো দোষ নেই, দেহই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পাপ কর্মসমূহ করেছে)। দেহ বলবে, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তো আমাকে সৃষ্টি করে রেখেছিলে নিঃসাড়। তুমি আমার হাত, পা ও চোখ সৃষ্টি করলেও কোনো কিছু করবার, কোনো পথে চলবার ও কোনো কিছু দেখবার ক্ষমতা আমার ছিলো না। এরপর আত্মা এলো আলোর ছটার মতো। সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে গেলো আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (কাজেই আমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ ওই আত্মার)। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা দেহ ও আত্মার এই বিপদ সম্পর্কে সুন্দর একটি উপমা দান করেছেন। উপমাটি এই— এক অন্ধ ও এক খোঁড়া প্রবেশ করলো এক বাগানে। বাগানের গাছগুলো ছিলো ফলে ভরপুর। অন্ধ

চোখে দেখতে পায় না। আবার খোঁড়া গাছে উঠতে পারে না। শেষে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা ঠিক করলো অন্ধ লোকটি কাঁধে উঠিয়ে নিবে খোঁড়াকে, আর খোঁড়া লোকটি গাছ থেকে ফল পাড়বে। তাই করলো তারা। কিন্তু তাদের চুরি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো। দু'জনকেই সাব্যস্ত করা হলো চোর বলে এবং শাস্তি দেয়া হলো দু'জনকেই।

'তুজ্বাদিলু আন নাফসিহা' কথাটির 'নাফসিহা' অর্থ স্বীয় সত্তা। তাই এখানে 'প্রত্যেক ব্যক্তি' কথাটির অর্থ হবে প্রত্যেক সত্তাধারী। বস্তুর মূল ও সত্তার মূলকে বলে নফস। যা মূল নয়, তাকে বলা হয় গইর। অর্থাৎ সেদিন তারা সত্তার সমর্থনে বা আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' এখানে 'তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না' কথাটির অর্থ— তাদের পুণ্য কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না। শাস্তিও দেয়া হবে না কিছুমাত্র বেশী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত; যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহা আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিল; ফলে, তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে আস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির।

❒ তাহাদিগের নিকট তো আসিয়াছিল এক রসূল তাহাদিগেরই মধ্য হইতে, কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; ফলে, সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি জনপদের কথা বলছেন, যে জনপদের জীবনযাত্রা ছিলো স্বস্তিদায়ক। জনপদবাসীদেরকে দেয়া হয়েছিলো প্রচুর জীবনোপকরণ। বিভিন্ন স্থান থেকে

তাদের জীবনোপকরণ আসতো। কিন্তু তারা আল্লাহ্তায়ালার এই বিশেষ অনুগ্রহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো। হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। কাফের। ফলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ স্থগিত করলেন। তারা হয়ে পড়লো দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও ভীত।

এখানে 'ক্বরিয়া' অর্থ জনপদ। অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে যে কোনো একটি জনপদ। অথবা অতীতের যে কোনো একটি জনপদ, যা মক্কার মতো। অর্থাৎ ওই জনপদের উপমাদৃষ্টে মক্কাবাসীরা যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'এক জনপদ' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কা শহরকে। অর্থাৎ মক্কার জনপদের উপমা দৃষ্টে অপরাপর জনপদবাসীরা যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে।

জ্ঞাতব্যঃ সুলাইম বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, উম্মত জননী হজরত হাফসা মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর সহযাত্রী। পথিমধ্যে খবর পাওয়া গেলো হজরত ওসমান শহীদ হয়েছেন। এই দুঃসংবাদ পেয়ে জননী ফিরে চললেন মক্কায়। বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে ফিরে চলো। যাঁর অধিকারে আমার জীবন, তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ! এটা সেই জনপদ, আল্লাহ্ যার উল্লেখ করেছেন ক্বরিয়ার আয়াতে (আলোচ্য আয়াতে)। ইজালাতুল খাফা।

'আমিনাতান্' অর্থ নিরাপদ । অর্থাৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নির্ভয়। 'মুত্বমাইন্নাতান্' অর্থ নিশ্চিন্ত। অর্থাৎ দুশ্চিন্তাহীন জীবনযাপন, যে জীবনে আর্থিক অসংগতি কিংবা শত্রুভীতি নেই। সারা আরবের মধ্যে কেবল মক্কা শহরই ছিলো এরকম নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও নির্বিঘ্ন। আরবের অন্যান্য জনপদগুলো এরকম ছিলো না। তাই তাদের অধিকাংশই ছিলো মরুচারী। লুণ্ঠনাশংকা ও খাদ্যাভাব তাদের লেগেই থাকতো।

'যেখানে আসতো সর্বদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ' কথাটির অর্থ জলপথে ও স্থলপথে চতুর্দিক থেকে মক্কায় সরবরাহ হতো জীবন যাপনের প্রচুর সামগ্রী।

'ফাকাফারাত্ বি আনউমিল্লাহ্' অর্থ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে অস্বীকার করলো। অর্থাৎ জনপদবাসীরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে হয়ে গেলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এখানকার 'আনউম' শব্দটি 'নি'মাত' (নেয়ামত) শব্দের বহুবচন। যেমন 'দিরউন' এর বহুবচন 'আদরাউ' এবং 'বুউসুন্' এর বহুবচন 'আবউসুন'।

'লিবাসাল জুয়ি ওয়াল খওফি' কথাটির শাব্দিক অর্থ ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক। অর্থাৎ তাদেরকে পরানো হলো ক্ষুধা ও ভীতির পরিচ্ছদ। কিন্তু কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তাদেরকে আস্বাদন করানো হলো ক্ষুধা ও ভীতির লেবাস। 'লিবাস' বা পরিচ্ছদ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে দুর্ভিক্ষের চিহ্নকে, যা বিবর্ণ মুখমণ্ডল ও শারীরিক দৌর্বল্যের আকারে প্রকাশ পায়।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর অপপ্রার্থনার ফলে মক্কাবাসীদের উপরে আপতিত হয়েছিলো একটানা সাত বৎসরের সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষ। জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসম্ভারের সরবরাহ নেমে এলো শূন্যের কোঠায়। অস্থি-ভস্ম, মৃত পশু, কুকুর, উটের পশম, রক্ত ইত্যাদি খেয়ে ও পান করে অতিকষ্টে কোনোক্রমে জীবন ধারণ করে চললো তারা। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের দৃষ্টিশক্তিও হলো বিপর্যস্ত। বার বার তারা তাকাতে শুরু করলো আকাশের দিকে। কিন্তু দেখতে পেলো কেবল ধোঁয়া আর ধোঁয়া। এমতো সঙ্গিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় তারা শরণাপন্ন হলো রসুল স. এর। বললো, মোহাম্মদ! তোমার শত্রুতা তো কেবল আমাদের সঙ্গে। অবলা নারী ও নিষ্পাপ শিশুরা তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। সুতরাং তুমি সদয় হও। তোমার স্বজনেরা যে মরতে বসেছে। রসুল স. দুর্ভিক্ষ অপসারণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে কায়মনো-বাক্যে মিনতি জানালেন। বলাবাহুল্য, তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হলো। দুর্ভিক্ষ গুটিয়ে নিলো তার বীভৎস থাবা। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের অধিকাংশই ছিলো পৌত্তলিক।

আমি বলি, আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। মক্কাবাসীরা দীর্ঘ সাতটি বছর ধরে দুর্ভিক্ষাঘাতে জর্জরিত হয়েছিলো। বহিঃশত্রুর কোনো আক্রমণাশংকা তখন তাদের ছিলো না। রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের কয়েক বছর পর থেকে মক্কাবাসীদের অন্তরে রসুল স. এর পক্ষ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হতে শুরু করেছিলো। এমতাবস্থায় কিন্তু মদীনাকেই আলোচ্য আয়াতের অবতরণস্থল বলে মেনে নিতে হয়। নতুবা এখানে উল্লেখিত 'ক্বরিয়া' (জনপদ) বলে বুঝতে হয় মক্কা ব্যতীত অন্য কোনো জনপদকে। একথাও বলতে হয় যে, অন্য কোনো জনপদকেই আল্লাহ্পাক এখানে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন, যেনো তাদের অশুভ পরিণাম দেখে মক্কাবাসীরা সাবধান হয়ে যেতে পারে। গ্রহণ করতে পারে সদুপদেশ।

পরের আয়াতে(১১৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট তো এসেছিলো এক রসুল তাদেরই মধ্য থেকে, কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো; ফলে সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো।' লক্ষণীয় যে, দৃষ্টান্তরূপী জনপদ সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় এবার এসেছে মক্কাভূমির কথা। এখানকার 'হুম' (তারা) সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে মক্কাবাসীদের সঙ্গে। আর এখানকার 'রসুল' অর্থ রসুলেপাক স. স্বয়ং। আর 'শাস্তি' কথাটির অর্থ এখানে দুর্ভিক্ষ অথবা বদর যুদ্ধ। একথাটিও এখানে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। রসুল স. এর হিজরতের পরে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'সীমালংঘন করা অবস্থায়' কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'অনুগ্রহ অস্বীকার করলো' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় এখানকার 'হুম'

(তারা, তাদেরকে) সর্বনামটি অবস্থা প্রকাশক হিসেবে গণ্য। যদি তাই হয়, তবে 'এক রসুল তাদের মধ্য থেকে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— মক্কা ব্যতীত অন্য কোনো জনপদের এক রসুল, যিনি ছিলেন ওই জনপদবাসীর নবী।

সুরা নাহ্‌ল ঃ আয়াত ১১৪, ১১৫

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহেরই ইবাদত কর তবে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

❒ আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা জবাইকালে আল্লাহের পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তার মধ্য থেকে তিনি যে খাদ্যবস্তুকে হালাল করেছেন, কেবল তা-ই আহার করো। আর যদি তোমরা একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁর ইবাদত করাকে শিরোধার্য ভেবে থাকো, তবে তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞচিত্ত হও।

এখানে 'কুলু' (আহার করো) সম্বোধনটি করা হয়েছে— বিশ্বাসীগণকে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের নিগড় ছিন্ন করে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায়।

'নি'মাতাল্লহ' (আল্লাহর অনুগ্রহ) কথাটির অর্থ এখানে— রসুল স. এর নবুয়ত ও অন্যান্য ধর্মীয় কল্যাণ, যা তিনি দান করেছেন বিশ্বাসীগণকে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে (১১২, ১১৩) একটি অকৃতজ্ঞ জনপদবাসীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বিশ্বাসীগণকে লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে বৈধ ও পবিত্র আহার্য বস্তু ভক্ষণ এবং প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় ও আলোচ্য আয়াতের সম্বোধিতজনেরা একই। পূর্বোক্ত আয়াত দু'টোতে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মর্মন্তুদ পরিণতির কথা। সেই সঙ্গে সত্যধর্ম গ্রহণের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। আর আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হালাল বস্তু ভক্ষণের আদেশ।

মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা তো আল্লাহ্ই ইবাদত করি। তবে প্রতিমাগুলোর পূজা-অর্চনা করি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ওই অপকথনের দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করো।'

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তো কেবল মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেউ অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত এবং আল্লাহ্র নাম না নিয়ে অন্যের নামে জবাইকৃত পশু। কিন্তু হালাল খাদ্যের অভাবে যার জীবন সংকটাপন্ন, এমতো ব্যক্তি যদি কেবল জীবন রক্ষার্থে বর্ণিত হারাম ভক্ষণ করে, তবে তাকে অভিযুক্ত করা হবে না। কারণ সে অনন্যোপায়। এরকম অনন্যোপায় অবস্থা ক্ষমার্হ। আর আল্লাহ্তায়ালা তো পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❐ তোমাদিগের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরা বলিও না 'ইহা বৈধ এবং উহা অবৈধ।' যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

❐ উহাদিগের সুখ-সম্ভোগ সামান্য এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❐ তোমার নিকট পূর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি ইহুদীদিগের জন্য আমি তো কেবল তাহাই নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং আমি উহাদিগের উপর কোন জুলুম করি নাই, কিন্তু উহারাই জুলুম করিত উহাদিগের নিজদিগের প্রতি।

❐ যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও নিজদিগকে সংশোধন করিলে তাহাদিগের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মক্কায় অংশীবাদীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনো কোনো বস্তুকে হালাল, আবার কোনো কোনো বস্তুকে হারাম বলতো। যেমন এ সম্পর্কে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'মা ফী বুতুনি হাজিহিল্ আনআমি খলিসাতুন লি জুকুরিনা' (এ পশুর উদরে যা কিছু আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ)। তারা আরো বলতো— মানতের পশু, দেব-দেবীদের জন্য উৎসর্গীকৃত পশু অবৈধ। তারা আবার এরকমও বলে যে, এগুলোকে আল্লাহ্ই বৈধ-অবৈধ করেছেন। নিঃসন্দেহে অংশীবাদীদের এমতো বক্তব্য একটি চরম মিথ্যাচার। আর মিথ্যাচারীরা কখনো সাফল্য লাভ করে না। তাই এখানে উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না এটা বৈধ, আর ওটা অবৈধ। যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম হবে না।'

উল্লেখ্য যে, সকল হারাম বস্তুর তালিকা কোরআন মজীদে দেয়া হয়নি। হাদিস শরীফেও অনেক হারাম বস্তুর কথা রয়েছে। আর সে সকল হারামের বিধান কোরআন বিরুদ্ধও নয়। বৈধ ও অবৈধ বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা মায়িদার তাফসীরে। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এখানে 'লা তা'কুলু'(তোমরা বোলো না) কথাটির কর্মপদ হচ্ছে 'আলকাজিবু' (মিথ্যা আরোপ করে)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এরকম— তোমরা মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্র নামে এরকম বোলো না যে, 'এটা বৈধ, আর ওটা

অবৈধ।' এটা তোমাদের দলিল প্রমাণহীন রসনার অসত্যারোপ। সাবধান! এ রকম কখনোই বোলো না। এরকম যারা বলে তারা কখনোই কৃতকার্য হতে পারে না।

পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে— 'তাদের সুখসম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' একথার অর্থ— অংশীবাদীরা এই পৃথিবী উপভোগ করবে সামান্য কিছুদিনের জন্য। তারপর আসবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। আর মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য রয়েছে বিরতিহীন, অনন্ত ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

এর পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'তোমার নিকটে পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং আমি তাদের উপরে কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই জুলুম করতো তাদের নিজেদের প্রতি' এখানে 'তোমার নিকটে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি' কথাটি বলা হয়েছে আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ সুরা আনআমের ওই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে যেখানে বলা হয়েছে 'ওয়া আলাল্ লাজীনা হাদু হাররামনা কুল্লা জী জুফুর (আর ইহুদীদের প্রতি আমি অবৈধ করে দিয়েছি সকল নখরবিশিষ্ট প্রাণীকে)। আর এখানে 'আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করিনি' কথাটির অর্থ ইহুদীদের প্রতি আমি জোর করে কোনো হারামের বিধান চাপিয়ে দেইনি। বরং তারাই বৈধ বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম বা অবৈধ করে নিয়েছিলো। তাই শাস্তিস্বরূপ তাদের স্বেচ্ছাকৃত হারামকে আমিও হারাম করে দিয়েছি। উল্লেখ্য যে, ক্ষতিকর কোনো কিছুকেই সাধারণতঃ আল্লাহ্তায়ালা অবৈধ বা নিষিদ্ধ করেন। আবার কখনো নিষিদ্ধ করেন শাস্তি প্রদানার্থে। ইহুদীদের প্রতি কতিপয় বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো শেষোক্ত কারণে। আলোচ্য আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, আমি তাদের উপরে কোনো জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই জুলুম করতো তাদের নিজেদের প্রতি।

এরপরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে— 'যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে তারা পরে তওবা করলে ও নিজেদের সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— যারা অন্যায় করার পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, অর্থাৎ তওবা ক'রে কৃত অন্যায়ের জন্য আল্লাহ্তায়ালার সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাদেরকে তিনি অতি অবশ্যই ক্ষমা করেন। কারণ তিনি পরম ক্ষমাপরবশ ও মহাদয়ার্দ্র। এখানে 'আমিলুস সুআ' অর্থ সকল প্রকারের মন্দ বা অন্যায়। 'বি জ্বাহালাতিন' অর্থ অজ্ঞতাবশতঃ। 'গফুর' অর্থ ক্ষমাপরবশ এবং 'রহীম' অর্থ মহাদয়ার্দ্র।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

❒ ইব্‌রাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক; সে ছিল আল্লাহের অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত;

❒ সে ছিল আল্লাহের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

❒ আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

❒ এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; ইব্‌রাহীম অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হজরত ইব্রাহিম ছিলেন একটি জাতির মহান অধিনায়ক। অথবা এককভাবে একটি মহান জাতিতুল্য। ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত অনুগত ও আন্তরিকভাবে ধর্মনিষ্ঠ। আল্লাহ্‌র যে অনুগ্রহ তিনি পেয়েছিলেন, তার জন্যও ছিলেন কৃতজ্ঞচিত্ত। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর প্রিয় নবী ও প্রিয়তম বন্ধুরূপে। আর তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সহজ, সরল ও নির্ভুল পথের দিকে।

'কামুস' অভিধান রচয়িতা লিখেছেন, এখানে 'উম্মত' অর্থ ওই ব্যক্তি, যিনি দুর্লভ গুণে গুণান্বিত, সত্যাশ্রয়ী ও সকল মিথ্যা ধর্মমতসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। যিনি অনুগত, একনিষ্ঠ ও প্রাজ্ঞ। এসকল বিরল গুণবত্তার কারণেই তিনি ছিলেন মানবজাতির মহান অধিনায়ক ও পথ প্রদর্শক। ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সতত সতর্ক।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ছিলেন সকল শুভ আদর্শের মহান শিক্ষক। বিশ্বমানবতার মহান অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

'উম' অর্থ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা। অথবা যাবতীয় উদ্দিষ্ট। মুজাহিদ বলেছেন, তাঁর সময়ে তিনি একাই ছিলেন অসমকক্ষ মুমিন।

'কুনিতা' অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগত। 'হানিফা' অর্থ মিথ্যাবিমুখ, সত্যাশ্রয়ী। কোনো কোনো আলেম শব্দটির অর্থ করেছেন— সত্য ধর্মের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ বলেছেন, পবিত্রাচারী।

কুরায়েশ অংশীবাদীরা দাবি করতো, 'আমরা ইব্রাহিমের ধর্মমতানুসারী'। তাদের ওই কথার প্রতিবাদস্বরূপ এখানে বলা হয়েছে, 'সে ছিলো না অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।' আর এখানকার 'ইলা সিরাত্বিম মুসতাক্বীম' কথাটির অর্থ— সরল পথের দিকে বা সরলপথে।

এর পরের আয়াতে (১২২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল।' এখানে 'হাসানাতু' কথাটির অর্থ নবুয়ত ও বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহ. বলেছেন, 'হাসানাত' অর্থ এখানে খুল্লত বা পবিত্র বন্ধুত্ব। বন্ধু তার বন্ধুর নিকটেই গোপন রহস্য উন্মোচন করে, অন্যের নিকটে নয়। তাই রসুল স. তাঁর নিজের ও বংশধরের জন্য ওই করুণা কামনা করেছিলেন, যা বর্ষিত হয়েছিলো হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লহ্ ও তাঁর বংশধরের উপর। রসুল স. এর ওই পবিত্র কামনাই প্রতিভাত হয়েছে নামাজে পঠনীয় দরূদ শরীফে এভাবে— আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদ কামা সল্লাইতা আলা ইব্‌রহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

'খুল্লত' অর্থ বন্ধুত্ব। আর 'মাহবুবিয়াত' অর্থ প্রেমানুরুক্তি। প্রেমাসক্তি। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সুনিবিড় সম্পর্ক। হজরত ইব্রাহিম পেয়েছিলেন বন্ধুত্বের মর্যাদা এবং রসুল স. পেয়েছিলেন প্রেমাস্পদত্বের মহিমা। উল্লেখ্য যে, 'খুল্লত' অপেক্ষা 'মাহবুবিয়াতের' মর্যাদা অধিক। একথাটিও উল্লেখ্য যে, রসুল স. 'খুল্লতের' পথেই উপনীত হয়েছিলেন মাহবুবিয়াতের মূল কেন্দ্রে। 'খুল্লত' পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত ছিলো তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌পাক রসুল স. এর বিরল অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর মহাতিরোধানের এক হাজার বছর পর তাঁর এক মহান উম্মতকেও দান করেছিলেন খুল্লতের মর্যাদা। সেই বিরল ব্যক্তিত্বের নাম হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহ.। অবশ্য তাঁর এই মহান মর্যাদা ছিলো অনুসরণজাত। নবী-রসুলগণের মতো সরাসরি নয়। বিষয়টির মূলরূপ এরকম— যেমন কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেনাধিনায়ক জয় করলেন কোনো দুর্গ অথবা নুতন কোনো অঞ্চল। এমতাবস্থায় তাঁর বিজয় প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যের সম্রাট বা মূল সম্রাটের বিজয়। তেমনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির খুল্লতের মর্যাদা প্রকৃত অর্থে রসুল স. এর খুল্লতের প্রতিবিম্বাগত বা প্রতিফলিত প্রতিক্রিয়া বা প্রতিভাস।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।' এখানে 'সলিহীন' (সৎকর্মপরায়ণগণ) অর্থ নবী-রসুলগণ, যারা নিষ্পাপ ও পরিপূর্ণ পুণ্যাধিকারী। যারা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত, এরকম পূর্ণতা লাভ করতে পারেন কেবল তাঁরাই। আর তাঁরাই পরকালে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। পাপ করার পর যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হলেও এমতো পরিপূর্ণতা পর্যন্ত উপনীত হতে সক্ষম হন না। নিষ্পাপ নবীগণই তাই এরকম পরিপূর্ণতা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। অন্য কারো ভাগ্যে এরকম জোটেনি। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হজরত ইব্রাহিমের অনন্য মর্যাদা লাভ হয়েছিলো তাঁর ওই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে তিনি বলেছিলেন— আলহিক্বনি বিস্‌সলিহীন (আমাকে পুণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভূত করো)।

এর পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে— 'এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করো; ইব্রাহিম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে আমি এইমর্মে প্রত্যাদেশ করছি যে, আপনি আমার এককত্ব সম্পর্কীয় বিশ্বাস প্রচারের ক্ষেত্রে এবং শরিয়তের অন্যান্য বিধানাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের আলোককে অধিকতর প্রোজ্জ্বল করে তুলুন। তিনি যেভাবে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পাঠ করতেন, হজ করতেন ও শরিয়তের অন্যান্য বিধান পালন করতেন, আপনিও তেমনি করুন। তিনি যেমন ছিলেন অনুগত, একনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ ও অংশীবাদবিমুখ, আপনিও তেমন হোন। সমগ্র মানবতাকেও প্রদান করুন এই অনন্যসাধারণ শিক্ষা।

দ্রষ্টব্যঃ মাহবুবিয়াতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও রসুল স. খুল্লতের বরকতের অনুরাগী ছিলেন। কেন্দ্র যেমন তার বিস্তারকে ভালোবাসে, তেমনি রসুল স. ভালোবাসতেন খুল্লতকে। তিনি ছিলেন প্রেমের কেন্দ্র। আর খুল্লত ছিলো ওই কেন্দ্রের বিস্তার, বৃত্ত বা ব্যাপ্তি। ওই বৃত্তীয় অনুরাগের কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের অনুসারী হতে বলেছেন। রসুল স. হজরত ইব্রাহিমকে অত্যধিক ভালোবাসতেন বলেই এমতো প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। যেমন, হজরত ইব্রাহিমের পরের নবীগণের কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদিস। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের ভালোবাসার কারণে তিনি মনেপ্রাণে চাইছিলেন কাবা শরীফকেই যেনো পুনরায় কেবলা করা হয়। কোরআন মজীদে একথা এসেছে এভাবে— 'আমি দেখছি, আপনার মুখমণ্ডল বার বার আকাশের দিকে নিবদ্ধ হয়।' অর্থাৎ হে আমার রসুল! কেবলা পরিবর্তনের প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় আপনার দৃষ্টি বার বার আকাশের দিকে ধাবিত হয়।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে রসুল স.কে হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের শরিয়তের রহিত নির্দেশগুলো বাদ দিয়ে অনুসরণ করতে হবে কেবল অরহিত নির্দেশগুলোর।

সুরা নাহ্ল ঃ আয়াত ১২৪

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

❒ শনিবার পালন তো কেবল তাহাদিগেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল, যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত; যে-বিষয়ে উহারা মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে-বিষয়ে উহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

'জুয়িলাস্ সাব্‌তু' অর্থ সপ্তাহের বিশেষ দিবস পালন। অর্থাৎ বিশেষভাবে ইবাদত করার জন্য সপ্তাহের একটি বিশেষ দিবস উদযাপন। 'ইখতালাফুহু ফীহি' কথাটির অর্থ— যারা এসম্পর্কে মতভেদ করতো। কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনতাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে মুক্ত সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে শুক্রবারকে গ্রহণ করো। বাকী ছয়দিন রাখো পার্থিব কাজকর্মের জন্য। বনী ইসরাইল জনতা বললো, আমরা সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে ওই দিনটি উদযাপন করতে চাই, ছয় দিন সৃষ্টি কর্ম সমাপনের পর যেদিন আল্লাহ্ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিন ছিলো শনিবার। আল্লাহ্পাক তাদের ইচ্ছাই পূরণ করলেন। শনিবারকেই করে দিলেন তাদের বিশেষ দিন। এরপর হজরত ঈসা তাঁর উম্মতকে সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন শুক্রবারকে। তারা বললো, আমরা এটা চাই না যে, আমাদের পরে সাপ্তাহিক এই ইবাদতোৎসব পালন করবে ইহুদীরা। বরং আমাদের জন্য সাপ্তাহিক বিশেষ দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হোক রবিবারকে। তাই করা হলো। পরিশেষে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হলো মুসলমানদের জন্য। তাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো এ ব্যাপারে কোনো প্রতর্কের অবতারণা করেননি। বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন শুক্রবারকে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ সম্পর্কিত প্রতর্কের উল্লেখ করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'শনিবার পালন তো কেবল তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো, যারা এ সম্পর্কে মতভেদ

করতো; যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো— তোমার প্রতিপালক তো অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের বিচার মীমাংসা করে দিবেন'।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, পৃথিবীতে আমার আবির্ভাব সকলের শেষে। কিন্তু বিচার দিবসে আমি থাকবো সর্বাগ্রে। আমার পূর্ববর্তী নবী ভ্রাতৃবৃন্দকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে আগে। আমাকে দেয়া হয়েছে সকলের শেষে। সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিনও পূর্ববর্তীগণের উপরে ফরজ করা হয়েছিলো। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তা গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি ও আমার উম্মত পরে এসে তা গ্রহণ করেছি। এদিক দিয়েও আমরা অগ্রগণ্য। আমাদের শুক্রবারের পরেই আসে ইহুদীদের শনিবার ও খৃষ্টানদের রবিবার। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্তরূপে এসেছে এই কথাটুকু— আল্লাহ্ বলেন, সপ্তবাসর তাদের জন্য, যারা মতবিরোধ করেছিলো। হাদিসটি আবার মুসলিম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত হুযায়ফা থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত কিছু কথা। কথাটুকু হচ্ছে— আমি পৃথিবীর শেষতম নবী। কিন্তু মহাবিচারের দিবসে আমার মীমাংসা হবে সর্বাগ্রে।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য আয়াতটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— শনিবার দিবসের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে যারা এ নিয়ে মতবিরোধ করেছিলো। আর তারা ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেছেন, দিন হিসেবে শনিবার শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্তায়ালা মহাবিশ্ব সৃজন সমাপন করেছেন শুক্রবারে। আর শনিবারে গ্রহণ করেছেন বিশ্রাম।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, রবিবারই হচ্ছে মহান দিবস। কারণ রবিবারেই শুরু হয়েছিলো মহাবিশ্বের সৃজনকর্ম। কোনো কোনো ভাষ্যকার আবার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্পাক শনিবার দিনকে ধার্য করেছিলেন অভিসম্পাত দিবস হিসেবে। কারণ ওই দিন সম্পর্কে ইহুদীরা মতোবিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। ওই দিন মৎস্য শিকার ছিলো নিষিদ্ধ। কিন্তু তাদের একদল ওই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করেনি। তারা মনে করতো শনিবারে মৎস্য শিকার বৈধ। আর একদল ছিলো অনুগত। তারা মনে করতো শনিবারের মৎস্য শিকার অবৈধ। এমতো মতোবিরোধের কারণে আল্লাহ্তায়ালা অবাধ্যদের চেহারা পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেই ঘটনার কথা ও এ সম্পর্কে মহাবিচারের দিবসের চূড়ান্ত মীমাংসার কথা বিবৃত হয়েছে।

'লি ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম' কথাটির অর্থ মতোবিরোধজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সেদিন করা হবে চূড়ান্ত মীমাংসা। এক পক্ষকে দেয়া হবে পুরস্কার। অন্য পক্ষকে দেয়া হবে শাস্তি।

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۝

❒ তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদিগের সহিত আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক, তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল। আপনি কোরআন মজীদ ও হৃদয়স্পর্শী কথা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে একমাত্র আচরণযোগ্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকুন। এখানে 'আল হিকমত' অর্থ কোরআন মজীদ। নিঃসন্দেহে কোরআন হচ্ছে সমালোচনার অতীত একটি অভ্রান্ত গ্রন্থ। 'আল মাওয়িজাতিল হাসানা' অর্থ সদুপদেশ— যে উপদেশে থাকে পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয়। অর্থাৎ যে উপদেশ মানলে শান্তি, না মানলে শাস্তি। কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ হৃদয়স্পর্শী বাণী, যা উত্তম উপদেশে ভরপুর।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান।' এ কথার অর্থ— এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন সদ্ভাবে, উত্তম পদ্ধতিতে, কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্যে, তাঁর বাণীকে উচ্চকিত করার মানসে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে, তা-ও তিনি সবিশেষ অবহিত।' একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, কেবল সত্যপ্রচারই আপনার কর্তব্য কর্ম। কে আপনার আহ্বান গ্রহণ করে এবং কে করে না— তা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি ভালো করেই জানি, কে সুপথ-প্রাপ্ত এবং কে নয়। কারণ আমি সর্বজ্ঞ এবং আমিই সকলের যথোপযুক্ত বিনিময়দাতা। আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি পুরস্কার ও তিরস্কার— বাধ্য ও অবাধ্যদের জন্য।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে সৈনিক সাহাবীগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর দেখলেন, রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযা নেই। জনৈক সাহাবী বললেন, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো অমুক টিলার নিকটে। তিনি তখন বীর বিক্রমে শত্রুর মোকাবিলা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের সিংহ। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সকাশে ওই বিষয়ের প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করছি, যা নিয়ে এসেছে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আর মুসলমানদের জন্য আমি কামনা করি বিজয়। একথা শুনেই রসুল স. ছুটে গেলেন রণপ্রান্তরের দিকে। একস্থানে দেখলেন তাঁর প্রিয় পিতৃব্যের ভূলুণ্ঠিত শরীর। কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁর নাসিকা ও কর্ণ কর্তিত। পবিত্র অবয়ব দলিত, মথিত, বিবস্ত্র ও বিধ্বস্ত। তিনি স. ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, হায়! আমার প্রিয় পিতৃব্যকে আচ্ছাদিত করার জন্য কি কোনো বস্ত্র নেই? জনৈক আনসারী সাহাবী তাঁর উর্ধাঙ্গের বসন খুলে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করলেন। তিনি স. বললেন, জাবের! এই বস্ত্রটি তোমার পিতার পক্ষ থেকে গৃহীত হলো। এ দিয়ে ঢেকে দাও আমার প্রিয় পিতৃব্যের শরীর। তারপর হজরত হামযার নিঃসাড় শরীরের দিকে তাকিয়ে তিনি স. বললেন, মহাসৌভাগ্যশালী পিতৃব্য আমার! আপনার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্র অন্তহীন আশীস। আমি তো আপনাকে দেখেছি পুণ্যবান ও আত্মীয় স্বজনের লালন-পালনকারীরূপে। সুফিয়া যদি ব্যথিতা না হতেন, যদি না বেদনাহতা হতেন পুরনারীগণ, তাহলে আমি আপনার এই পার্থিব শরীরকে এভাবেই রেখে দিতাম। আপনাকে ভক্ষণ করতো প্রান্তরের পশু ও আকাশের পাখিরা। আর পুনরুত্থান দিবসে আপনি পুনরুত্থিত হতেন তাদের উদর থেকে। একটু পরে পুনরায় বললেন, হে আমার পিতৃচ্ছায়া! হে পিতৃতুল্য! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। ভ্রাতা জিবরাইল এই মাত্র আমাকে জানালেন, সকল আকাশবাসীদের নিকটে ঘোষণা করা হয়েছে— আবদুল মুত্তালিব তনয় হামযা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শার্দুল। এ ঘোষণার কথা শুনে আমি প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত। আল্লাহ্ কুরায়েশদের উপরে আমাকে যখন আবার বিজয়ী করবেন, তখন আমি আপনার এই বিধ্বস্ত অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। শত্রুকুলের সত্তর জনের নাক ও কান কেটে দিবো আমি। রসুল স. এর এমতো উচ্চারণ শুনে উপস্থিত সাহাবীগণও সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরাও এ রকম করবো। কোনো আরববাসী কোনো দিন যা করতে পারেনি, তাই করবো আমরা। ইবনে সা'দ, ইবনে মুনজির, বায়হাকী ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেন, রসুল স. তাঁর কথা শেষ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে—

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ○ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ○

❒ যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য উহাই তো উত্তম।

❒ ধৈর্য ধারণ করিও, তোমার ধৈর্য তো হইবে আল্লাহেরই সাহায্যে। উহাদিগের আচরণে দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

❒ আল্লাহ্ তাহাদিগেরই সঙ্গে আছেন যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রিয় পিতৃব্যের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে এমতো উত্তেজিত হবেন না, যাতে আপনার মতো মহানতম নবীর ন্যায়পরায়ণতা কিছু মাত্র লংঘিত হয়। যে আঘাত দিয়েছে তাকে প্রত্যাঘাত করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু প্রত্যাঘাত হানতে হবে ততটুকু যতটুকু আঘাত সে করেছে। কিন্তু এমতো ক্ষেত্রে শত্রুকে ক্ষমা করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভার্থে ধৈর্য ধারণ করাই সর্বোত্তম। যারা ধৈর্য ধারণের মহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারে, তাদের জন্য সর্বোত্তম অবস্থাই অধিকতর শোভন।

অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার নাম 'উকুবত্' ও 'ইক্বাব'। এ রকম বলা হয়ে থাকে কেবল শাব্দিক সম্পর্কের কারণে। যেমন 'জ্বাযাউস্ সায়্যিআতি সায়্যিআতি মিছলুহা' (অন্যায়ের প্রতিশোধ সমতুল অন্যায়)। এভাবে এখানকার বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এ রকম— প্রতিশোধ বা বদলা হতে হবে অন্যায়ের সমতুল। সীমাতিক্রম করা যাবে না। আর ধৈর্য ধারণ করার অর্থ, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, আল্লাহ্‌র অধিকতর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে বদলা নেয়া থেকে বিরত থাকা।

'লা হুয়া খইর' কথাটির অর্থ এখানে— প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এখানে 'ইন্ আক্বাবতুম ফা আক্বিবু' কথাটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ক্ষমা ও উদারতার ইঙ্গিত। পরক্ষণে 'ওয়া লাইন-সাবারতুম' বলে সে কথা আবার

প্রকাশ্যে বলেও দেয়া হয়েছে। আর শেষে 'লিস্ সবিরীন' বলে ওই সকল লোকের প্রতি সাধুবাদ দেয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে।

পরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'ধৈর্য ধারণ কোরো। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তাদের আচরণে দুঃখ কোরো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।' আল্লাহ্‌নির্ভরতা ও ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে রসুলেপাক স. সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁকে সম্বোধন করে এখানে বলা হয়েছে— ধৈর্য ধারণ কোরো। আপনার ধৈর্য তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্ প্রদত্ত। এখানে 'আস্‌বির' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— হে রসুল! যে কোনো ক্লেশকর অবস্থায় আপনার জন্য ধৈর্য ধারণই উত্তম। কারণ আপনাকে করা হয়েছে মহাসহিষ্ণু। 'ওয়ামা সাবারু ইল্লা বিল্লাহ্' অর্থ— হে রসুল! আপনার ধৈর্য নামের মহান গুণটি তো আল্লাহ্ প্রদত্ত। সুতরাং আপনার ধৈর্য ধারণের মতো মহান পুণ্যকর্মটি সম্পন্ন হবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সহায়তায়।

'ওয়ালা তাহ্‌যান আলাইহিম' কথাটির অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পক্ষ থেকে আগত দুঃখ কষ্টের কারণে অথবা বিশ্বাসীদের উপরে আপতিত দুঃখ কষ্ট দেখে। আপনি ধৈর্যহারা হবেন না আর 'ওয়ালা তাকু ফী দ্বইক্বিম মিম্‌মা ইয়ামকুরুন' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যতো ষড়যন্ত্রই করুক না কেনো, আপনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে মনোকষ্টে পতিত হবেন না। আপনাকে বিজয়ী করা ও আপনার ষড়যন্ত্রপ্রবণ শত্রুকুলকে দণ্ড দান করার দায়িত্ব তো আমার।

'দ্বয়ক্বিন' অর্থ মনস্তাপে পতিত হওয়া বা মনোক্ষুণ্ন হওয়া। অর্থাৎ হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। 'দ্বয়ক্বিন' ও 'দ্বিক্বুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। আবু আমের বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' অর্থ দুঃখ, আর দ্বিক্বুন অর্থ কষ্ট। আবু উবায়দা বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' অর্থ আহার ও বাসস্থানের সংকট। আর 'দ্বিক্বুন' অর্থ হৃদয়ের সংকট, সংকীর্ণতা বা দুঃখবোধ। আবু কুতাইবা বলেছেন, 'দ্বয়ক্বিন' শব্দটি 'দ্বয়্যিকুন' এর সংক্ষেপিত রূপ।

এর পরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।' এখানে 'মুহসিনুন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণ।' 'ইত্তাক্বাও' অর্থ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা সত্ত্বেও তাঁকে ভয় করে। 'মুহসিনুন' এর অর্থ যারা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে শিষ্টাচার প্রদর্শন করে— এ রকমও হতে পারে। আবার 'ইত্তাক্বাও' অর্থ হতে পারে এ রকম— যারা প্রতিশোধ গ্রহণে সীমাতিক্রম থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ সাবধানতা অবলম্বন করে। 'মুহসিনুন' অর্থ আবার এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— যারা অপরকে মার্জনা করে।

এখানে 'আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন' কথাটির মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্র অনুকম্পা, নৈকট্য, করুণা ও সাহায্য তাদের সঙ্গে আছে। অথবা আল্লাহ্পাক স্বয়ং সত্তাগতভাবে সঙ্গে আছেন আনুরূপ্যবিহীনভাবে। এই সঙ্গে থাকার বিষয়টি ধারণা ও কল্পনার অতীত। তাই তা বর্ণনারও অতীত।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. 'আমি বিজয়ী হলে তাদের সত্তর জনের নাক, কান কেটে দিবো' বলে যে শপথ করেন, তা ভেঙে ফেলেন এবং যথাবিধি শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাও দেন। অবলম্বন করেন ধৈর্য।

আবদুল্লাহ্ বিন ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মুনজির, ইবনে হাব্বান, জিয়া ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত উবাই বিন কা'ব বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন চৌষট্টিজন আনসার এবং ছয়জন মুহাজির। হজরত হামযা ছিলেন মুহাজির শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা সকল শহীদের নাক-কান কেটে নিয়েছিলো। আনসারগণ তখন বলেছিলেন, যদি আমরা কখনো সুযোগ পাই, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে এ রকম করবো। কিছুকাল পর মক্কা বিজিত হলো। তখনই অবতীর্ণ হলো 'যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলগণের জন্য এটাই তো উত্তম।' রসুল স. তখন বললেন, আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার প্রত্যাহার করলাম। ধৈর্য ধারণ করলাম। মাত্র চারজন ব্যতীত অন্য সকলের উপর থেকে আমার প্রতিশোধ পরিকল্পনাকে গুটিয়ে নিলাম।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে উহুদ রণপ্রান্তরের শহীদগণকে উপলক্ষ করে। যুদ্ধ শেষে মুসলমানগণ লক্ষ্য করলেন সকল শহীদের নাক-কান কর্তন করা হয়েছে। চিরে দেয়া হয়েছে কারো কারো পেট। কেবল একজনকে দেখা গেলো অবিকৃত অবস্থায়। তিনি হচ্ছেন হজরত হানযালা বিন আবু আমের। কারণ তাঁর পিতা ছিলো শত্রুপক্ষে। সে-ই বুঝিয়ে শুনিয়ে তার সঙ্গীদের হাত থেকে অবিকৃত রাখতে পেরেছিলো পুত্রের লাশ। তখন মুসলমানেরা বলেছিলেন, আমরা সুযোগ পেলে তাদের নাক-কান এমনভাবে কাটবো, যা পূর্বে কেউ কোনোদিন করেনি। রসুল স. দাঁড়িয়েছিলেন তার প্রিয় পিতৃব্য হজরত হামযার পবিত্র মরদেহের পাশে। দুশমনেরা তাঁর নাক ও কান কেটে দিয়েছিলো। আরো কেটে দিয়েছিলো তাঁর পুরুষাঙ্গ। তাঁর উদরও ফেঁড়ে দিয়েছিলো তারা। উত্বা তনয়া হিনদা চিবিয়ে খেয়েছিলো তাঁর কলিজা। কিন্তু বাধ্য হয়ে তা আবার উগলে ফেলে দিয়েছিলো। রসুল স. এ কথা জানতে পেরে বলেছিলেন, হিনদা যদি ওই কলিজা উদরস্থ করতে পারতো, তবে সে দোজখে জ্বলতো না। কারণ আমার

প্রিয় পিতৃব্যকে আল্লাহ্তায়ালা এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর শরীরের কোনো অংশ দোজখে জ্বলবে না। ওই বেদনাবিধুর পরিবেশে শহীদ চাচাজানের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তখন শোকাহত রসুল বলেছিলেন, হে আবদুস্ সাইব! আল্লাহ্পাকের বিশেষ অনুকম্পা বর্ষিত হোক আপনার উপর। আমি জানি, আপনি ছিলেন মহাপুণ্যবান ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ছিলেন অতি দয়ার্দ্র। আপনার শোকে বিধ্বস্ত আপনার আপনজনেরা যদি সহ্য করতে পারতো, তবে আমি আপনাকে এ অবস্থাতেই রেখে দিতাম। আর পুনরুত্থান দিবসে দেখতাম আপনার উত্থান ঘটছে বিভিন্ন পশু-পাখির উদর থেকে। আল্লাহ্র শপথ! ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের উপরে আল্লাহ্ যদি কখনো আমাকে বিজয় দান করেন, তবে আমি তাদের সত্তর জনের নাক ও কান এভাবেই কর্তন করবো। রসুল স. এর এমতো শপথ উচ্চারণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে— আলোচ্য আয়াতত্রয়। রসুল স. তখন তাঁর শপথ ভঙ্গ করেছিলেন এবং শপথের প্রায়শ্চিত্ত করে বলেছিলেন, আমি ধৈর্য ধারণ করলাম।

উপযোগঃ হজরত উবাই বিন কা'বের বর্ণিত বিবরণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে মক্কা বিজয়ের সময়ে। আর হজরত আবু হোরায়রা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আতা ইবনে ইয়াসারের বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনার সন্নিকটে উহুদ সমর প্রান্তরে। বর্ণনা দু'টোর সামঞ্জস্য বিধানার্থে ইবনে হিশার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো প্রথমে অবতীর্ণ হয় মক্কায়, তারপর উহুদ সমর প্রান্তরে এবং অবশেষে মক্কা-বিজয়ের সময়ে। আয়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে পুনঃপুনঃ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই এ রকম করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ বলবত ছিলো সুরা তওবা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে রসুল স. এর প্রতি অগ্রিম যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণকে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিলো। নির্দেশ ছিলো, যারা আক্রমণোদ্যত হয়, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যাবে। কিন্তু যখন ইসলামের মহাবিজয় সুসম্পন্ন হলো এবং সুরা তওবার মাধ্যমে দেয়া হলো সাধারণভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির অনুমতি, তখন রহিত হয়ে গেলো আলোচ্য আয়াত। কিন্তু নাখয়ী, সওরী, সুদ্দী, মুজাহিদ ও ইবনে সিরীনের মতে আলোচ্য আয়াতত্রয় রহিত নয়, বরং এখনো আলোচ্য আয়াতত্রয়ের বিধান একইরূপে কার্যকর। এখানে বর্ণিত বিধানটির সারমর্ম এই— উৎপীড়িত ব্যক্তি অথবা তার স্বজনেরা উৎপীড়কের প্রতি ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে, যতটুকু উৎপীড়ন সে করেছে। এ ব্যাপারে সীমাতিক্রম নিষিদ্ধ। তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া সর্বোত্তম।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, 'মুছলা' করা (নাক-কান কর্তন করা) সিদ্ধ নয়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মাসুরা বিন জুনদুব বলেছেন, ভাষণ দানের জন্য রসুল স. যেখানে দাঁড়াতেন, সেখানে দানের প্রতি উৎসাহ না দিয়ে এবং নাক-কান কাটা যে নিষেধ, একথা না বলে সেখান থেকে অন্যত্র গমন করতেন না। উল্লেখ্য যে, নাক-কান কাটা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনের নিষেধাজ্ঞার কথা বহুসংখ্যক হাদিসে বিদ্যমান।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মাঈন। আমিন।

ষষ্ঠ খণ্ড শেষ